মাইকেল এইচ. হার্ট

THE HUNDRED

MICHELE H. HEART

MICHELE H. HEART

THE HUNDRED

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী

মূল

মাইকেল এইচ. হার্ট

সম্পাদনায়

অধ্যক্ষ এম, সোলাইমান কাসেমী

বি এ (পাস), বি এ (অনার্স), এম এ, পি এচ

মেমোরি পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল : জুন ২০১৩

প্রকাশনায়
মেমোরি পাবলিকেশন্স
৩৮৬ নবাব সিরাজদৌল্লা রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
ফোন : ৬৩৭৪৯৭

পরিবেশনায় :
গাজী প্রকাশনী এন্ড প্রিন্টার্স
ঢাকা-চট্টগ্রাম।

মূল্য : ১৮০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

১

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

(৫৭০-৬৩২ খ্রিঃ)

যে মহামানবের সৃষ্টি না হলে এ ধরা পৃষ্ঠের কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না, যার পদচারণ ধন্য হয়েছে পৃথিবী। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা, অন্তরের পবিত্রতা, আত্মার মহত্ত্ব, ধৈর্য্য, ক্ষমা, সততা, নম্রতা, বদান্যতা, মিতাচার, আমানতদারী, সুরুচি পূর্ণ মনোভাব, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা ও কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল যার চরিত্রের ভূষণ; যিনি ছিলেন একাধারে ইয়াতীম হিসেবে সবার স্নেহের পাত্র, স্বামী হিসেবে প্রেমময়, পিতা হিসেবে স্নেহের আধার, সঙ্গী হিসেবে বিশ্বস্ত; যিনি ছিলেন সফল ব্যবসায়ী, দূরদর্শী সংস্কারক, ন্যায় বিচারক, মহৎ রাজনীতিবিদ এবং সফল রাষ্ট্র নায়ক; তিনি হলেন সর্বকালের সর্বযুগের এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তিনি এমন এক সময় পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন আরবের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা অধঃপতনের চরম সীমায় নেমে গিয়েছিল।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার প্রত্যুষে আরবের মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে মাতা আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। জন্মের ৫ মাস পূর্বে পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। আরবের তৎকালীন অভিজাত পরিবারের প্রথানুযায়ী তাঁর লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় বনী সা'দ গোত্রের বিবি হালিমার উপর। এ সময় বিবি হালিমার আরেক পুত্র সন্তান ছিল, যার দুধ পানের মুদ্দত তখনো শেষ হয়নি।

বিবি হালিমা বর্ণনা করেন, "শিশু মুহাম্মদ কেবলমাত্র আমার ডান স্তনের দুধ পান করত। আমি তাঁকে আমার বাম স্তনের দুধ দান করতে চাইলেও, তিনি কখনো বাম স্তন হতে দুধ পান করতেন না। আমার বাম স্তনের দুধ তিনি তাঁর অপর দুধ ভাইয়ের জন্যে রেখে দিতেন। দুধ পানের শেষ দিবস পর্যন্ত তাঁর এ নিয়ম বিদ্যমান ছিল।" ইনসাফ ও সাম্যের মহান আদর্শ তিনি শিশুকালেই দেখিয়ে দিয়েছেন। মাত্র ৫ বছর তিনি ধাত্রী মা হালিমার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এরপর ফিরে আসেন মাতা আমেনার গৃহে। ৬ বছর বয়সে তিনি মাতা আমেনার সাথে পিতার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা যান এবং মদীনা হতে প্রত্যাবর্তনকালে 'আবহাওয়া' নামক স্থানে মাতা আমেনা ইন্তেকাল করেন। এরপর ইয়াতীম মুহাম্মদ (সাঃ) এর লালন পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় ক্রমান্বয়ে দাদা আবদুল মোত্তালিব ও চাচা আবু তালিবের উপর। পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ যে মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন সারা জাহানের রহমত হিসেবে; তিনি হলেন আজন্ম ইয়াতীম এবং দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়েই তিনি গড়ে উঠেন সত্যবাদী, পরোপকারী এবং আমানতদারী হিসেবে। তাঁর চরিত্র, আমানতদারী, ও সত্যবাদিতার জন্যে আরবের কাফেররা তাঁকে, 'আল্ আমীন' অর্থাৎ 'বিশ্বাসী' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তৎকালীন আরবে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। 'হরবে ফুজ্জার' এর নৃশংসতা বিভীষিকা ও তান্ডবলীলা দেখে বালক মুহাম্মদ (সাঃ) দারুণভাবে ব্যথিত হন এবং ৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৪ বছর বয়সে চাচা হযরত যুবায়ের (রাঃ) ও কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে অসহায় ও দুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার দীপ্ত অংগীকার নিয়ে গড়ে তোলেন 'হিলফুল ফুজুল' নামক একটি সমাজ সেবামূলক সংগঠন। বালক মুহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যতে জীবনে যে শান্তি স্থাপনের অগ্রদূত হবেন এখানেই তার প্রমাণ মেলে।

যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) এর সততা, বিশ্বস্ততা, চিন্তা চেতনা, কর্ম দক্ষতা ও ন্যায় পরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন আরবের ধনাঢ্য ও বিধবা মহিলা বিবি খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ বিবাহের প্রস্তাব দেন। এ সময় বিবি খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বয়স ছিল ২৫ বছর। তিনি চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে বিবি খাদিজার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বিবাহের পর বিবি খাদিজা তাঁর ধন-সম্পদ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাতে তুলে দেন। কিন্তু তৎকালীন আরবের কাফের, মুশরিক, ইহুদি, নাসারা ও অন্যান্য ধর্ম মতাবলম্বীদের অন্যায়, জুলুম, অবিচার, মিথ্যা, ও পাপাচার দেখে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হৃদয় দুঃখ বেদনায় ভরে

যেত এবং পৃথিবীতে কিভাবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে চিন্তায় তিনি প্রায়ই মক্কার অনতিদূরে 'হেরা' নামক পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। বিবি খাদিজা স্বামীর মহৎ প্রতিভা ও মহান ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করতে পেরে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিশ্চিত মনে অবসর সময় 'হেরা' পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হয় তখন তিনি নবুয়্যত লাভ করেন এবং তাঁর উপর সর্ব প্রথম নাজিল হয় পবিত্র কোরআনের সূরা–আলাকের প্রথম কয়েকটি আয়াত। এরপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন ঘটনা ও প্রয়োজন অনুসারে তাঁর উপর পূর্ণ ৩০ পারা কোরআন শরীফ নাজিল হয়।

নবুয়্যত প্রাপ্তির পর প্রথম প্রায় ৩ বছর তিনি গোপনে স্বীয় পরিবার ও আত্মীয়ের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেন। সর্ব প্রথম ইসলাম কবুল করেন বিবি খাদিজা (রাঃ)। এরপর যখন তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং ঘোষণা করেন, 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' তখন মক্কার কুরাইশ কাফেররা তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করে। এতদিন বিশ্বনবী (সাঃ) কুরাইশদের নিকট ছিলেন 'আল্ আমীন' হিসেবে পরিচিত; কিন্তু এ ঘোষণা দেয়ার পর তিনি হলেন কুরাইশ কাফেরদের ভাষায় একজন জাদুকর ও পাগল। যেহেতু কোরআন আরবী ভাষায় নাজিল হয়েছে এবং আরববাসীদের ভাষাও ছিল আরবী, তাই তারা হযরদ মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণীর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পেরেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) যা প্রচার করছেন তা কোন সাধারণ কথা নয়। যদি এটা মেনে নেয়া হয় তাহলে তাদের ক্ষমতার মসনদ টিকে থাকবে না। তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে বিভিন্ন ভয়, ভীতি, হুমকি; এমনকি ধন-দৌলত ও আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী যুবতী নারীদের দেবার লোভ দেখাতে শুরু করে। মুহাম্মদ (সাঃ) কাফিরদের শত ষড়যন্ত্র ও ভয়–ভীতির মধ্যেও ঘোষণা করলেন, "আমার ডান হাতে যদি সূর্য আর বাম হাতে চাঁদও দেয়া হয়, তবু আমি সত্য প্রচার থেকে বিরত থাকব না।" কাফিরদের কোন লোভ লালসা বিশ্বনবী (সাঃ) কে ইসলাম প্রচার থেকে বিন্দুমাত্র বিরত রাখতে পারেনি। মক্কায় যারা পৌত্তলিকতা তথা মূর্তি পূজা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল কুরাইশরা তাঁদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু ইসলামের শাশ্বত বাণী যারা একবার গ্রহণ করেছে তাঁদেরকে শত নির্যাতন করেও ইসলাম থেকে পৌত্তলিকতায় ফিরিয়ে নিতে পারেনি।

৬২০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন সঙ্গিনী বিবি খাদিজা (রাঃ) এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। জীবনের এ সংকটময় মুহূর্তে তাঁদেরকে হারিয়ে বিশ্বনবী (সাঃ) শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। বিবি খাদিজা ছিলেন বিশ্বনবীর দুসময়ের স্ত্রী, উপদেষ্টা এবং বিপদ আপদে সান্ত্বনা স্বরূপ। চাচা আবু তালিব ছিলেন শৈশবের অবলম্বন, যৌবনের অভিভাবক এবং পরবর্তী নবুয়্যত জীবনের একনিষ্ঠ সমর্থক। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় পালিত পুত্র হযরত যায়েদ বিন হারেসকে সংগে নিয়ে তায়েফ গমন করলে সেখানেও তিনি তায়েফবাসীদের কর্তৃক নির্যাতিত হন। তায়েফবাসীরা প্রস্তরাঘাতে বিশ্বনবীকে জর্জরিত করে ফেলে।

অবশেষে ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২ জুলাই (নবুয়্যতের ত্রয়োদশ বছর) ইতিমধ্যে মদীনায় ইসলামী আন্দোলনের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছিল। মদীনাবাসীগণ মুহাম্মদ (সাঃ) এর কার্যপদ্ধতিতে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। এতদিন মক্কায় ইসলাম ছিল কেবলমাত্র একটি ধর্মের নাম; কিন্তু মদীনায় এসে তিনি দৃঢ় ভিত্তির উপর ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সেখানে চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলে দেন। সে সময় মদীনায় পৌত্তলিক ও ইহুদিরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। মুহাম্মদ (সাঃ) মনে প্রাণে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় লোকের বাস সেখানে সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই তিনি সেখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি আন্তর্জাতিক সনদপত্রও সাক্ষরিত হয়, যা ইসলামের ইতিহাসে, 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র বা সংবিধান। উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার, জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়। মুহাম্মদ (সাঃ) হন ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি। তিনি যে একজন দূরদর্শি ও সফল রাজনীতিবিদ এখানেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মদীনার সনদ নাগরিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

স্থাপিত হয় ঐক্য। বিশ্বনবী (সাঃ) তলোয়ারের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি বরং উদারতার মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ও নবদিক্ষিত মুসলমানগণের (সাহাবায়ে কেরাম) চালচলন, কথাবার্তা, সততা ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে যখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন কুরাইশ নেতাদের মনে হিংসা ও শত্রুতার উদ্রেক হয়। অপরদিকে মদীনার কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাধান্য সহ্য করতে না পেরে গোপনভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্যেই মুহাম্মদ (সাঃ) তলোয়ার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে ঐতিহাসিক বদর, উহুদ ও খন্দক সহ অনেকগুলো যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং সকল যুদ্ধের প্রায় সবগুলোতেই মুসলমানগণ জয়লাভ করেন। বিশ্বনবী (সাঃ) মোট ২৭টি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ষষ্ঠ হিজরীতে ১৪০০ নিরস্ত্র সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) মাতৃভূমি দর্শন ও পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা রওনা দেন। কিন্তু পথিমধ্যে কুরাইশ বাহিনী কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ইসলামের ইতিহাসে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তাবলীর মধ্যে এ কথাগুলো ও উল্লেখ ছিল যে−(১) মুসলমানগণ এ বছর ওমরা আদায় না করে ফিরে যাবে, (২) আগামী বছর হজ্জে আগমন করবে, তবে ৩ দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না, (৩) যদি কোন কাফির স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুসলমান হয়ে মদীনায় গমন করে তাহলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। পক্ষান্তরে মদীনা হতে যদি কোন ব্যক্তি পলায়ন পূর্বক মক্কায় চলে আসে তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না, (৪) প্রথম থেকে যে সকল মুসলমান মক্কায় বসবাস করছে তাদের কাউকে সাথে করে মদীনায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর মুসলমানগণের মধ্যে যারা মক্কায় থাকতে চায় তাদেরকে বিরত রাখা যাবে না।। আর মুসলমানগণের মধ্যে যারা মক্কায় থাকতে চায় তাদেরকে বিরত রাখা যাবে না, (৫) আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলোর এ স্বাধীনতা থাকবে যে, তারা উভয় পক্ষের (মুসলমনি ও কাফির) মাঝে যাদের সঙ্গে ইচ্ছে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে, (৬) সন্ধিচুক্তির মেয়াদের মধ্যে উভয় পক্ষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে যাতায়াতের সম্পর্ক চালু রাখতে পারবে। এছাড়া কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমর সন্ধিপত্র থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং 'মুহাম্মদুর রাসূলল্লাহ' বাক্য দু'টি কেটে দেয়ার জন্যে দাবি করেছিল। কিন্তু সন্ধি পত্রের লেখক হযরত আলী (রাঃ) তা মেনে নিতে রাজি হলেন না। অবশেষ বিশ্বনবী (সাঃ) সুহায়েল বিন আমরের আপত্তির প্রেক্ষিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' এবং 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্য দু'টি নিজ হাতে কেটে দেন এবং এর পরিবর্তে সুহায়েল বিন আমরের দাবি অনুযায়ী 'বিছমিকা আল্লাহুম্মা' এবং কে নির্দেশ দেন। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সন্ধি মুসলমানদের জন্যে অপমানজনক হলেও তা মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনেক সুযোগ সুবিধা ও সাফল্য এনে দিয়েছিল। এ সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা মুহাম্মদ (সাঃ) এর রাজনৈতিক সত্তাকে একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে স্বীকার করে নেয়। সন্ধির শর্তানুযায়ী অমুসলিমগণ মুসলমানদের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে অমুসলিমগণ ইসলামের মহৎ বাণী উপলব্ধি করতে থাকে এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এ সন্ধির পরই মুহাম্মদ (সাঃ) বিভিন্ন রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ (সাঃ) যেখানে মাত্র ১৪০০ মুসলিম সৈন্য নিয়ে হুদায়বিয়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে মাত্র ২ বছর অর্থাৎ অষ্টম হিজরীতে ১০,০০০ মুসলিম সৈন্য নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন। যে মক্কা থেকে বিশ্বনবী (সাঃ) নির্যাতিত অবস্থায় বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেখানে আজ তিনি বিজয়ের বেশে উপস্থিত হলেন এবং মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে গ্রেফতার করে মুহাম্মদ (সাঃ) এর সম্মুখে উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের শত্রুকে হাতে পেয়েও ক্ষমা করে দেন। ক্ষমার এ মহান আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসে আজও বিরল। মক্কায় আজ ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডিয়মান। সকল অন্যায় অসত্য, শোষণ ও জুলুমের রাজত্ব চিরতরে বিলুপ্ত।

৬৩১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক দশম হিজরীতে মুহাম্মদ (সাঃ) লক্ষাধিক মুসলিম সৈন্য নিয়ে বিদায় হজ্জ সম্পাদক করেন এবং হজ্জ শেষে আরাফাতের বিশাল ময়দানে প্রায় ১,১৪,০০০ সাহাবীর

সম্মুখে জীবনের অন্তিম ভাষণ প্রদান করেন যা ইসলামের ইতিহাসে "বিদায় হজ্জের ভাষণ" নামে পরিচিত। বিদায় হজ্জের ভাষণে বিশ্বনবী (সাঃ) মানবাধিকার সম্পর্কিত যে সনদপত্র ঘোষণা করেন দুনিয়ার ইতিহাসে তা আজও অতুলনীয়। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, (১) হে বন্ধুগণ, স্মরণ রেখ, আজিকার এ দিন, এ মাস এবং এ পবিত্র নগরী তোমাদের নিকট যেমন পবিত্র, তেমনি পবিত্র তোমাদের সকলের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ, রক্ত এবং তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের পরস্পরের নিকট। কখনো অন্যের উপর অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করবে না। (২) মনে রেখ, স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের উপরও স্ত্রীদের তেমন অধিকার আছে।(৩) সাবধান, শ্রমিকের মাথায় ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দিবে। (৪) মনে রেখ, যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। (৫) চাকর চাকরাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর হইও না। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তাই খেতে দিবে; তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকে তাই (সমমূল্যের) পরিধান করতে দিবে। (৬) কোন অবস্থাতেই ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না। এমনি ভাবে মানবাধিকার সম্পর্কিত বহু বাণী তিনি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে পেশ করে যান। তিনি হলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মানবজাতির একমাত্র আদর্শ এবং বিশ্ব জাহানের রহমত হিসেবে প্রেরিত।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুয়্যতের ২৩ বছরের আন্দোলনে আরবের একটি অসভ্য ও বর্বর জাতিকে একটি সভ্য ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেছিলেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার সাধিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলে দিয়ে, তিনি ঘোষণা করেন, 'অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের; কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের এবং শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন পার্থক্য নেই। বরং তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে অধিক মুত্তাকিন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সুদকে সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে এমন একটি অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক তাদের আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর কোন মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। বিশ্বনবী (সাঃ) নারী জাতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ঘোষণা করলেন "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত।" নারী জাতিকে শুধু মাত্র মাতৃত্বের মর্যাদাই দেননি, উত্তরাধিকার ক্ষেত্রেও তাদের অধিকারকে করেছেন সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্রীতদাস আযাদ করাকে তিনি উত্তম ইবাদত বলে ঘোষণা করেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেখানে মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা এবং বিভিন্ন বস্তুর পূজা আরববাসীদের জীবনকে কলুষিত করেছিল সেখানে তিনি আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মুদ্দ কথা তিনি এমন একটি অপরাধমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে কোন হানাহানি, রাহাজানি, বিশৃঙ্খলা, শোষণ, জুলুম, অবিচার, ব্যভিচার, সুদ ঘুষ ইত্যাদি ছিল না।

অবশেষে এ মহামানব ১২ রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী মোতাবেক ৭ জুন, ৬৩২ খ্রিঃ ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) গোটা মুসলিম জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলে গিয়েছেন, "আমি তোমাদের জন্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দু'টি জিনিসকে আঁকড়ে রাখবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হল আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কোরআন, আর অপরটি হল আমার সুন্নাহ অর্থাৎ হাদিস। বিশ্বনবী (সাঃ) এর জীবনী লিখতে গিয়ে খ্রিস্টান লেখক ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেছেন, "He was the mater mind not only of his own age but of all ages" অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) যে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাকে শুধু সে যুগেরই একজন মনীষী বলা হবে না, বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।

শুধুমাত্র ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুরই নন, পৃথিবীর বুকে যত মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান বাণী পৃথিবীর বুকে রেখে গেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা–আহযাব, আয়াত ২১)

বর্তমান অশান্ত, বিশৃঙ্খল ও দ্বন্দ্ব মুখর আধুনিক বিশ্বে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শকে অনুসরণ করা হলে বিশ্বে শান্তি ও একটি অপরাধমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে সম্ভব।

২
ইশা (আঃ)

[খ্রীষ্ট পূর্ব ৬-৩০]

বিবি মরিয়ম নাছেরাহ নামক একটি শহরের অধিবাসিনী ছিলেন। নাছেরাহ শহরটি বাইতুল মুকাদ্দাসের অদূরেই অবস্থিত ছিল।

বিবি মরিয়ম পিতামাতার মানত পূর্ণ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই

অতিশয় সুশীলা এবং ধর্মানুরাগিনী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ইমরান এবং নবী জাকারিয়া (আঃ)-এর শ্যালিকা বিবি হান্না তার জননী ছিলেন। একদিন বিবি মরিয়ম নামাজ পড়েছিলেন, হঠাৎ ফেরেশতা জিব্রাঈল অবতীর্ণ হলেন। তিনি বললেন, তোমার প্রতি সালাম, তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তা। আল্লাহ তোমার সাথে রয়েছেন।

বিবি মরিয়ম এই অপ্রত্যাশিত পূর্ব সম্বোধনে ভীত চকিতা হলেন। ভাবতে লাগলেন— কে আসল, কিসের সালাম। হযরত জিব্রাঈল বললেন—আমি আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাঈল। তুমি ভীত হইও না; তুমি পবিত্র সন্তান লাভ করবে, এই সুসংবাদ তোমাকে দিতে এসেছি।

বালিকা ভীত হলেন এবং বললেন—তা কেমন করে হবে? আমি যে কুমারী। আমি স্বামীর সঙ্গ লাভ করি নি।

ফেরেশতা বললেন, "আল্লাহর কুদরতেই এটি হবে। তাঁর কাছে এটি কঠিন কাজ নয়।"।

এই বলে ফেরেশতা অন্তর্নিহিত হলেন। ছয়মাস পূর্বে হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছেন—এখন আবার কুমারী মরিয়ম আল্লাহ্র কুদরতে গর্ভবতী হলেন।

বিবি মরিয়ম যদিও আল্লাহ্র কুদরতে সন্তান সম্ভবা হলেন, কিন্তু দেশের লোকেরা তা মেনে নিবে কেন? কুমারী নারীর এভাবে গর্ভবতী হওয়ার ফলে সবাই তাকে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের করে দিলেন—এমন কি তাকে স্বগ্রামও ছেড়ে যেতে হলো। সঙ্গী সহায়হীন অবস্থায় গর্ভবর্তী মরিয়ম একটি নির্জন প্রান্তরে সন্তান প্রসব করলেন।

বিপদাপন্ন মরিয়ম কোন আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে একটি শহরের দ্বারপ্রান্তে আস্তাবলের একটি পতিত প্রাঙ্গণের একটি খেজুর গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। হায়—যিনি পৃথিবীর মহা সম্মানিত নবী, তিনি সেই নগন্য স্থানে ভূমিষ্ঠ হলেন। যে মহানবীর ধর্মানুসরণকারিরা আজ পৃথিবীময় বিস্তৃত, শক্তি এবং সম্মানে যারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রয়েছে; তাদের নবী ভূমিষ্ঠ হলেন একটি আস্তাবলের অব্যবহার্য আঙ্গিনায়। দরিদ্রতম পিতা-মাতার সন্তানও এই সময় একটু শয্যালাভ করে থাকে, একটু শান্তির উপকরণ পায়, কিন্তু মরিয়মের সন্তান শোয়াবার জন্য আস্তাবলের ঘরটুকু ছাড়া আর কিছুই ভাগ্যে হলো না।

আটদিন বয়সে সন্তানের ত্বক ছেদনা করা হলো। তাঁর নামকরণ হলো ইছা। ইনি মছিহ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

হযরত মুছা (আঃ)-এর শরীয়ত অনুসারে বাদশাহ কিংবা পয়গাম্বর তাঁর পদে বহাল হবার অনুষ্ঠানে, তৈল লেপন করার নিয়ম ছিল। এছাড়া তৌরিত কেতাবে হযরত ইছা (আঃ)-এর নাম মছিহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করলে একজোড়া ঘুঘু জাতীয় পাখী উৎসর্গ করার নিয়ম হযরত মুছা (আঃ)-এর শরীয়তের বিধান ছিল।

মরিয়ম সূচী-স্নাতা হওয়ার পর সন্তান সাথে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে পাখীর মানত পালন করলেন।

এই সময় একদল অগ্নিপূজক হযরত ইছা (আঃ)-কে খুঁজে ফিরছিল। তারা জ্যোতিষী ছিল। নক্ষত্র দেখে তারা 'হযরত ইছা এর জন্ম হয়েছে' এটি জানতে পেরেছিল। হিরুইস বাদশাহ এটি শুনে ভয় পেলেন এবং সেই অনুসন্ধানকারী দলের কাছে গোপনে বললেন যে, তারা যেন সেই বালকের সন্ধান করে কোথায় আছে তা বের করে। অগ্নিপূজকরা খুঁজতে খুঁজতে বিবি মরিয়মের কাছে পৌছল ও সেই ক্ষুদ্র শিশুকে সেজদা করল এবং সেখানে মানত ইত্যাদি সম্পন্ন করল। রাতে তারা স্বপ্নে দেখল, তাদেরকে হিরুইসের কাছে ফিরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা হিরুইস তার জীবনের শত্রু। মরিয়ম এরূপ স্বপ্ন দেখলেন যে, সম্রাট এই সন্তানের শত্রু, সে তাকে হত্যা করতে চায়। সে যেন শিশুকে নিয়ে মিশরে চলে যায়। জ্যোতিষীরা সম্রাটের কাছে

আর ফিরে গেল না। এতে বাদশাহ্ ভয়ানক রাগ হলো। সে হুকুম করল যে, বায়তুল্লাহ্র এবং এর আশেপাশের সকল বস্তির সন্তানদেরকে যেন হত্যা করে ফেলা হয়।

ইতিপূর্বে মরিয়ম তাঁর সন্তান নিয়ে মিশরে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। হিরুইস যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন সন্তান নিয়ে তিনি মিশরেই অবস্থান করলেন।

হিরুইসের মৃত্যুর সংবাদ শুনার পর তিনি নিজ দেশ নাছেরায় চলে আসলেন।

সন্তান দিন দিন বাড়তে লাগল। বয়স বাড়বার সাথে সাথে ইছার মধ্যে প্রখর জ্ঞান এবং তীক্ষ্ণ মেধা শক্তির পরিচয় ফুটে উঠল। আল্লাহর বিশেষ একটি অনুগ্রহ যে, তাঁর উপর রয়েছে, দিন দিন তা প্রকাশ পেতে শুরু করল। ইছার মাতা ইছা সহ প্রতি বৎসর ঈদের উৎসরব ইরুসালেমে যোগদান করতেন। ইছার ১২ বৎসর বয়সে ইরুসালেমে বড় বড় জ্ঞানী এবং পণ্ডিতবর্গের সাথে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর বাকপটুতা এবং তত্ত্বজ্ঞান শুনে পণ্ডিতরা অবাক হয়ে যেতেন। ক্রমান্বয়ে হযরত ইছা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে লাগলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে 'অহী' লাভ করেন এবং নবীরূপে ধর্মপ্রচার করতে শুরু করলেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিবি মরিয়মের খালাত ভাই হতেন। তিনি ইয়ারদন নদীর তীরে লোকদেরকে ধর্মোপদেশ দান করতেন। হযরত ইছা (আঃ) সেখানে গিয়ে ওয়াজ করতে শুরু করেন।—অহী আসা শুরু করার পর থেকে ইন্‌জীল কেতাব অবতীর্ণ হতে থাকে। তিনি তাঁর নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ বহু অলৌকিক কার্যাবলী দেখাতে শুরু করেন। মাটি দিয়ে পাখী তৈরি করে উড়িয়ে দেয়া, অন্ধকে দৃষ্টিদান, বোবাকে বাক্‌শক্তি দান, কুষ্ঠকে আরোগ্য করা, পানির উপরে হাটা ইত্যাদি তার মো'জেজা ছিল।

তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির বলে, বহু রোগী আরোগ্য লাভ করে। বহু লোক ধর্মজ্ঞান লাভ করে। সর্বপ্রথমে যারা হযরত ইছা (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন, সাথে থেকে সাহায্য করেছিলেন তাদেরকে 'হাওয়ারী' বলা হতো। তাঁরা সর্বদা হযরত ইছার (আঃ) সাথে থাকতেন। হযরত ইছা (আঃ) যখন নবী হন, সেকালে ইয়াহুদী ধর্মগুরুরা অতিশয় শিথিল হয়ে পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মানুভূতির পরিবর্তে ভণ্ডামী প্রবেশ করেছিল। তাদের মধ্যে কেবল ধর্মের বাহ্যিক আবরণ বাকী ছিল। হযরত ইছা (আঃ)-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর ওয়াজ বক্তৃতায় ইয়াহুদী ধর্মগুরুদের কঠোর সমালোচনা করতেন। এতে সেই সকল বাহ্যাবরণ বিশিষ্ট ইয়াহুদী ধর্মপ্রচারকরা হযরত ইছা (আঃ)-এর ঘোর শত্রুতে পরিণত হন। কিন্তু হযরত ইছা (আঃ)-এর বাণী ছিল আল্লাহ্রই বাণী। তা এমনই হৃদয়গ্রাহী হতো যে, যে শুনত তার হৃদয়ই তাতে আকৃষ্ট হতো। বিদ্বেষপরায়ণ ইয়াহুদী পুরোহিতরা কোন কথায়ই হযরত ইছা (আঃ)-কে ধরতে পারতেন না। তারা হযরত ইছা (আঃ)-কে নানা ছুতা নাতায় দোষী সাব্যস্ত করবার চেষ্টায় লিপ্ত হলেন।

হযরত ইছা (আঃ) আল্লাহ্র অত্যধিক প্রেমে অভিভূক্ত হয়ে আল্লাহ্কে পিতা বলেছিলেন। এরূপ আরও দুই একটি দৃষ্টান্তমূলক বাক্য নিয়ে হিংসাপরায়ণ ইয়াহুদী আলেমগণ নানা কথা সৃষ্টি করলেন। এভাবে তারা হযরত ইছা (আঃ)-কে ধর্মদ্রোহী কাফের বলে ফতোয়া দিলেন। তাদের শরীয়তে মৃত্যুই সেই সকল অপরাধের একমাত্র সাজা। দেশে তখন রুমীয়দের রাজত্ব ছিল। তখনকার দিনে রাজা ছাড়া আর কারও মৃত্যুদণ্ড দিবার অধিকার ছিল না। সুতরাং তারা সম্রাটের কানে হযরত ইছার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে শুরু করলেন।

হযরত ইছা (আঃ) তার বক্তৃতার অধিকাংশ সময় আসমানী বাদশাহের কথা উল্লেখ করতেন। এতে শত্রুদের একটি সুযোগ জুটে গেল। তারা আসমানী বাদশাহীর ব্যাখ্যা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হযরত ইছা (আঃ)-এর প্রতি রাজদ্রোহীর অভিযোগ সৃষ্টি করল। গোপনভাবে তাকে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা, যে হাওয়ারী দল ইছা (আঃ)-এর সঙ্গী এবং বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে বিরাজ করতেন, তারাই এখন গুপ্তচর হলেন। সেই হাওয়ারীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ইয়াহুদ। শত্রুদের কাছ থেকে তিন টাকার ঘুষ গ্রহণ করে হযরত ইছা (আঃ)-কে রুমীয় সৈন্যদের হাতে ধরিয়ে দিল।

হাওয়ারীদের মধ্যে পিতর ছিল একজন ঘনিষ্ঠ এবং প্রধান সঙ্গী, রাজদ্রোহের অপরাধ থেকে বাঁচবার জন্য তিনিও সম্রাটের দরবারে নিজ পরিচয় গোপন এবং হযরত ইছার সাথে কোনও

সম্পর্ক নেই বলে প্রকাশ করলেন। হযরত ইছা (আঃ) ধৃত হলেন এবং রাজবিচারে তিনি মৃত্যুদণ্ড লাভ করলেন। সে সময়ের মৃত্যুদণ্ডে এখনকার মত গলায় ফাঁসী দিবার ব্যবস্থা ছিল না। ছলীবের সাহায্যে তখন মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

ছলীবের আকৃতি হলো এই—একটি লম্বা কাঠের উপরের অংশে আর একখানি কাঠ আড়াআড়িভাবে জুড়ে দেয়া হতো। তাতে অপরাধীকে এমনিভাবে ঝুলিয়ে দেয়া হতো যে, অপরাধীর পৃষ্ঠদেশ কাষ্ঠদ্বয়ের সংযুক্তি স্থলের উপর রক্ষিত হতো। আড়া কাঠের উভয় দিকে দুই হাত বিস্তারিত করে দিয়ে তাতে পেরেক মেরে দেয়া হতো। কারও হাটুতেও পেরেক ফুড়ে কাঠ-সলগ্ন করে দেয়া হতো। এই অবস্থায় ঝুলে থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে যেত। হযরত ইছা (আঃ) ছলীবে বিদ্ধ করে রাখা হলো। পরদিন ইয়াহুদীদের উৎসবের দিনে কোনও অপরাধীর ছলীবে ঝুলন্ত থাকা তাদের ধর্মমতে বিধেয় ছিল না। হযরত ইছা (আঃ)-কে দুপুরের দিকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। পায়ে কাটা বিদ্ধ করা হচ্ছিল না। তবুও তিনি সেই যাতনায়ই মুষড়িয়ে পড়লেন এবং চেতনা হারালে; তিনি শরীরের দিক দিয়েও কৃশকায় ছিলেন। ঈদের দিনের কারণে যখন সন্ধ্যার দিকে তাকে ক্রুশ থেকে খসান হলো, তখন তাকে মৃত বলেই ধারণা করা হলো। তাকে গোরস্থানে পাঠিয়ে দেয়া হলো এবং দাফন করা হলো। কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাকে কবর থেকে উঠিয়ে এনেছিলেন। পরে তিনি চেতনা লাভ করলেন। অতঃপর তিনি নিরুদ্দেশ হন। তিনি কোথায় কিভাবে আত্মগোপন করেন তার সঠিক তত্ত্ব জানা যায় নি। কোরআন শরীফে তাঁর সম্পর্ক বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁকে হত্যা করা হয় নি। তিনি ক্রুশে প্রাণ দান করেন নি। বরং মৃত্যুর মতোই ধারণা করা হয়েছিল, পরে আল্লাহ তাকে পৃথিবী থেকে তুলে নিলেন। এর ৫০০ শত বৎসর পরে হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) এই পৃথিবীতে সংবাদ দিয়েছেন।

৩
আলবার্ট আইনস্টাইন
[১৮৭৯-১৯৫৫]

জার্মানীর একটি ছোট শহর উলমে এক সম্পন্ন ইহুদী পরিবারে আইনস্টাইনের জন্ম (১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ)। পিতা ছিলেন ইনজিনিয়ার। মাঝে মাঝেই ছেলেকে নানা খেলনা এনে দিতেন।

শিশু আইনস্টাইনের বিচিত্র চরিত্রকে সেই দিন উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি তাঁর অভিভাবক, তাঁর শিক্ষকদের। স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝেই অভিযোগ আসত। পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়া ছেলে, অমনোযোগী আনমনা। ক্লাসের কেউ তাঁর সঙ্গী ছিল না। সকলের শেষে পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতেন।

শুধু তাঁর একমাত্র সঙ্গী তাঁর মা। তাঁর কাছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নানান সুর শোনেন। আর বেহালায় সেই সুর তুলে নেন। এই বেহালা ছিল আইনস্টাইনের আজীবন কালের সাথী। বাবাকে বড় একটা কাছে পেতেন না আইনস্টাইন। নিজের কারখানা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন তিনি। আনন্দেই কাটছিল তাঁর জীবন।

সেই আনন্দে ভরা দিনগুলোর মাঝে হঠাৎ কালো ঘনিয়ে এল। সেই শৈশবেই আইনস্টাইন প্রথম অনুভব করলেন জীবনের তিক্ত স্বাদ। তাঁরা ছিলেন ইহুদী। কিন্তু স্কুলে ক্যাথলিক ধর্মের নিয়মকানুন মেনে চলতে হত।

স্কুলের সমস্ত পরিবশেটাই বিস্বাদ হয়ে যায় তাঁর কাছে। দর্শনের বই তাঁকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করত। পনেরো বছর বয়েসের মধ্যে তিনি কান্ট, স্পিনোজা, ইউক্লিড, নিউটনের রচনা পড়ে শেষ করে ফেললেন। বিজ্ঞান, দর্শনের সাথে পড়তেন, গ্যেটে, শিলায়, শেকসপীয়ার। অবসর সময়ে বেহালার ছড়ে বিঠোফেন, মোৎসোর্টের সুর তুললেন। এরাই ছিল তাঁর সঙ্গী বন্ধু তাঁর জগৎ।

এই সময় বাবার ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিল। তিনি স্থির করলেন মিউনিখ ছেড়ে মিলানে চলে যাবেন। তাতে যদি ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। সকলে মিউনিখ ত্যাগ করল, শুধু সেখানে একা রয়ে গেলেন আইনস্টান।

সুইজারল্যাণ্ডের একটি পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হলেন। প্রথমবার তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় পরীক্ষায় পাশ করলেন।

বাড়ির আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছে। আইনস্টাইন অনুভব করলেন সংসারের দায়-দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে। শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করবার জন্য তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিত নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে শিক্ষকতার জন্য বিভিন্ন স্কুলে দরখাস্ত করতে আরম্ভ করলেন। অনেকের চেয়েই শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর বেশি ছিল কিন্তু কোথাও চাকরি পেলেন না। কারণ তাঁর অপরাধ তিনি ইহুদী।

নিরুপায় আইনস্টাইন খরচ চালাবার প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র পড়াতে আরম্ভ করলেন। এই সময় আইনস্টাইন তাঁর স্কুলের সহপাঠিনী মিলেভা মারেককে বিয়ে করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২। মিলেভা শুধুমাত্র আইনস্টাইনের স্ত্রী ছিলেন না, প্রকৃত অর্থেই তাঁর জীবনসঙ্গী ছিলেন।

আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন শিক্ষকতার কাজ পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। একটি অফিসে ক্লার্কের চাকরি নিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের খাতার পাতায় সমাধান করতেন অঙ্কের জটিল তত্ত্ব। স্বপ্ন দেখতেন প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করবার। তাঁর এই গোপন সাধনার কথা শুধুমাত্র মিলেভাকে বলেছিলেন, "আমি এই বিশ্বপ্রকৃতির স্থান ও সময় নিয়ে গবেষণা করছি।"

আইনস্টাইনের এই গবেষণায় ছিল না কোন ল্যাবরেটরি, ছিল না কোন যন্ত্রপাতি। তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল খাতা-কলম আর তাঁর অসাধারণ চিন্তাশক্তি।

অবশেষে শেষ হল তাঁর গবেষণা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬। একদিন ত্রিশ পাতার একটি প্রবন্ধ নিয়ে হাজির হলেন বার্লিনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা "Annalen der physik"এর অফিসে। এই পত্রিকায় ১৯০১ থেকে পর্যন্ত আইনস্টাইন পাঁচটি রচনা প্রকাশ করলেন। এই সব রচনায় প্রচলিত বিষয়কে নতুনভাবে ব্যাখ্য করা হয়েছে। এতে আইনস্টাইনের নাম বিজ্ঞানীমহলে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কোন সুরাহা হল না। নিতান্ত বাধ্য হয়ে বাড়িতে ছাত্র পড়াবার কাজ নিলেন।

একদিকে অফিসের কাজ, মিলেভার স্নেহভরা ভালবাসা, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা- অবশেষে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হল তাঁর চারটি রচনা-প্রথমটি আলোর গঠন ও শক্তি সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি এটমের আকৃতি প্রকৃতি। তৃতীয়টি ব্রাউনিয়াম মুভমেন্টের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব। চতুর্থটি তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত করল। এই আপেক্ষিকতা বলতে বোঝায় কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বা অন্য কিছুর তুলনা। আইনস্টাইন বললেন, আমরা যখন কোন সময় বা স্থান পরিমাপ করি তখন আমাদের অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে হবে। তিনি বলেছেন আলোক বিশ্বজগৎ, কাল এবং মাত্রা আপেক্ষিক।

আমাদের মহাবিশ্বে একটি মাত্র গতি আছে যা আপেক্ষিক নয়, অন্য কোন গতির সঙ্গেও এর তুলনা হয় না—এই গতি হচ্ছে আলোকের গতি। এই গতি কখনই পরিবর্তন হয় না।

এই সময় জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ জানানো হল। আইনস্টাইনকে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেবার জন্য। ১৯০৭ সালে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হলেন। এরই সাথে পেটেন্ট অফিসের চাকরিও করেন।

বিজ্ঞান জগতে ক্রমশই আইনস্টাইনের নাম ছড়িয়ে পড়ছিল। বিজ্ঞানী কেলভিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানানো হল। এখানে তাঁকে অনায়ারি ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হল। এর পর তাঁর ডাক এল জার্মানীর সলসবার্গ কনফারেন্স থেকে। এখানে জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সামনে তাঁর প্রবন্ধ পড়লেন আইনস্টাইন। তিনি বললেন, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এমন কোন এক তত্ত্ব পাব যা আলোর কণাতত্ত্ব এবং তরঙ্গ তত্ত্বকে সময়ের বাঁধনে বাঁধতে পারবে।

আইনস্টাইনের এই উক্তির জবাবে বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক বললেন, আইনস্টাইন যা চিন্তা করছেন সেই পর্যায়ে চিন্তা করবার সময় এখনো আসেনি। এর উত্তরে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের $E=mc^2$ উৎপত্তিটি আলোচনা করে বোঝালেন তিনি যা প্রমাণ করতে চাইছেন তা কতখানি সত্য। ১৯০৮ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পদ সৃষ্টি করা হল। রাজনৈতিক মহলের চাপে এই পদে মনোনীত করা হল আইনস্টাইনের সহপাঠী ফ্রেডরিখ এডলারকে। ফ্রেডরিখ নতুন পদে যোগ দিয়েই জানতে পারলেন এই পদের জন্য আইনস্টাইনের পরিবর্তে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি কর্তৃপক্ষকে জানালেন এই পদের জন্য আইনস্টাইনে চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই। তার তুলনায় আমার জ্ঞান নেহাতই নগণ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও উপলব্ধি করতে পারলেন ফ্রেডরিখের কথার গুরুত্ব। অবশেষে ১৯০৯ সালে আইনস্টাইন তার পেটেন্ট অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করলেন। জুরিখে এসে বাসা ভাড়া করলেন।

আইনস্টাইন আর কেরানী নন, প্রফেসর। কিন্তু মাইনে আগে পেতেন ৪৫০০ ফ্রাঙ্ক, এখনো তাই। তবে লেকচার ফি বাবদ সামান্য কিছু বেশি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ বহু মানুষের সাথে, গুণী বিজ্ঞানীদের সাথে পরিচয় হয়। এমন সময় ডাক এল জার্মানীর প্রাগ থেকে। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে তাঁকে নিয়োগপত্র দেওয়া হল। মাইনে আগের চেয়ে বেশি। তাছাড়া প্রাগে গবেষণার জন্যে পাবেন বিশাল লাইব্রেরী। ১৯১১ সালে সপরিবারে প্রাগে এলেন আইনস্টাইন। কয়েক মাস আগে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়েছে।

অবশেষে দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত জুরিখের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক এল আইনস্টাইনের। ১৯১২ সালে প্রাগ ত্যাগ করে এলেন জুরিখে। এখানে তখন ছুটি কাটাতে এসেছিলেন মাদাম, কুরী, সঙ্গে দুই কন্যা। দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে গড়ে উঠল মধুর বন্ধুত্ব। পাহাড়ি পথ ধরে যেতে যেতে মাদাম কুরী ব্যাখ্যা করেন তেজস্ক্রিয়তা আর আইনস্টাইন বলেন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। একদিন নিজের তত্ত্বের কথা বলতে বলতে এত তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন, পথের ধারে গর্তের মধ্যে গড়িয়ে পড়লেন আইনস্টাইন। তাই দেখে মেরী কুরীর দুই মেয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল। গর্ত থেকে উঠে তাদের সঙ্গে আইনস্টাইনও হাসিতে যোগ দিলেন।

সেই সময় জার্মানীতে কাইজারের পৃষ্ঠপোষকতায় বার্লিন শহরে গড়ে উঠেছে কাইজার ভিলহেলম ইনস্টিটিউট। বিজ্ঞানের এতবড় গবেষণাগার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে যোগ দিয়েছেন প্লাঙ্ক, নার্নস্ট, হারের আরো সব বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। কিন্তু আইনস্টাইন না থাকলে যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সব কিছু। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হল। বার্লিনে এলেন আইনস্টান। সব কিছু দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। শুধু গবেষণাগার নয়, বহু বিজ্ঞানীকেও কাছে পাওয়া যাবে। একসাথে কাজ করা যাবে। তাঁকে মাইনে দেওয়া হল বর্তমান মাইনের দ্বিগুণ।

১৯১৪ সালে বার্লিনে এলেন আইনস্টাইন। যখন আইনস্টাইন বার্লিন ছেড়েছিলেন তখন তিনি পনেরো বছরের কিশোর। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ফিরে এলেন নিজের শহরে। চেনা-জানা পরিচিত মানুষদের সাথে দেখা হল। সবচেয়ে ভাল লাগল দূর সম্পর্কিত বোন কাছে ফিরে এসেছে। এলসার সান্নিধ্য বরাবরই মুগ্ধ করত আইনস্টাইনকে। অল্পদিনেই অনেকের সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। ছেলেবেলা থেকেই যেখানে সেখানে অঙ্ক করার অভ্যেস ছিল আইনস্টাইনের। কখনো ঘরের মেঝেতে, কখনো টেবিলের উপর। টেবিল ভর্তি হয়ে গেলে মাটিতে বসে চেয়ারের উপরেই অঙ্ক কষে চলেছেন। গবেষণায় যতই মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন আইনস্টাইন, সংসারের প্রতি ততই উদাসীন হয়ে পড়ছিলেন। স্ত্রী মিলেভার সাথে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। ক্রমশই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন মিলেভা। দুই ছেলেকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে চলে গেলেন। কয়েক মাস কেটে গেল আর ফিরলেন না মিলেভা।

এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হল। বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই জড়িয়ে পড়লেন যুদ্ধে। আইনস্টাইন এই যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে ব্যথিত হলেন। এরই সাথে সংসারের একাকিত্ব, স্ত্রী পুত্রকে হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন আইনস্টাইন।

এই সময় অসুস্থ আইনস্টাইনের পাশে এসে দাঁড়ালেন এলসা। এলসার অক্লান্ত সেবা-যত্নে ক্রমশই সুস্থ হয়ে উঠলেন আইনস্টাইন।

তিনি স্থি'র করলেন মিলেভার সাথে আর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব নয়। অবশেষে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। আইনস্টাইন এলসাকে বিয়ে করলেন।

এদিকে যুদ্ধ শেষ হল। ক্যাইজারের পতন ঘটল। প্রতিষ্ঠা হল নতুন জার্মান বিপাবলিকের।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব তখনো প্রমাণিত হয়নি। এগিয়ে এলেন ইংরেজ বিজ্ঞানীরা। সূর্যগ্রহণের একাধিক ছবি তোলা হল। সেই ছবি পরীক্ষা করে দেখা গেল আলো বাঁকে।

বিজ্ঞানীরা উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। মানুষ তাঁর জ্ঞানের সীমানাকে অতিক্রম করতে চলেছে। অবশেষে ৬ই নভেম্বর ইংল্যাণ্ডের রয়াল সোসাইটিতে ঘোষণা করা হল সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার, আলো বেঁকে যায়। এই বাঁকের নিয়ম নিউটনের তত্ত্বে নেই। আলোর বাঁকের মাপ আছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রে।

পরিহাসপ্রিয় আইনস্টাইন তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে কৌতুক করে বললেন, আমার আপেক্ষিক তত্ত্ব সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। এইবার জার্মানী বলবে আমি জার্মান আর ফরাসীরা বলবে আমি বিশ্বনাগরিক। কিন্তু যদি আমার তত্ত্ব মিথ্যা হত তাহলে ফরাসীরা বলত আমি জার্মান আর জার্মানরা বলত আমি ইহুদী।

একদিন এক তরুণ সাংবাদিক বললেন, আপনি সংক্ষেপে বলুন আপেক্ষিক তত্ত্বটা কি?

আইনস্টাইন কৌতুক করে বললেন, যখন একজন লোক কোন সুন্দরীর সঙ্গে এক ঘণ্টা গল্প করে তখন তার মনে হয় সে যেন এক মিনিট বসে আছে। কিন্তু যখন তাকে কোন গরম উনানের ধারে এক মিনিট দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তার মনে হয় সে যেন এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে। এই হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্ব।

আপেক্ষিক তত্ত্বে জটিলতার দুর্বোধ্যতার কারণে মুখরোচক কিছু কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। একদিন এক সুন্দরী তরুণী তার প্রেমিকের সাথে চার্চের ফাদারের পরিচয় করিয়ে দিল। পরদিন যখন মেয়েটি ফাদারের কাছে গিয়েছে, ফাদার তাকে কাছে ডেকে বললেন, তোমার প্রেমিককে আমার সবদিক থেকেই ভাল লেগেছে শুধু একটি বিষয় ছাড়া।

মেয়েটি কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, কোন বিষয়? ফাদার বললেন, তার কোন রসবোধ নেই। আমি তাকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাস করেছি আর সে আমাকে তাই বোঝাতে আরম্ভ করল। হাসিতে ফেটে পড়ল মেয়েটি।

আমেরিকার এক বিখ্যাত সরকার জর্জ তাঁর এক বন্ধুকে বললেন, একজন মানুষ কুড়ি বছর ধরে একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করলেন, আর ভাবলে অবাক হতে হয় সেই চিন্তাটুকুকে প্রকাশ করলেন মাত্র তিন পাতায়। বন্ধুটি জবাব দিল, নিশ্চয়ই খুব ছোট অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।

আইনস্টাইন আমেরিকায় গিয়েছেন, সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরল। একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এক কথায় আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পারেন? আইনস্টাইন জবাব দিলেন, না।

আজকাল মেয়েরা কেন আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে এত আলোচনা করছে? আইনস্টাইন হাসতে হাসতে বললেন, মেয়েরা সব সময়েই নতুন কিছু পছন্দ করে–এই বছরের নতুন জিনিস হল আপেক্ষিক তত্ত্ব।

অবশেষে এল সাধক বিজ্ঞানীর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কিছুদিন ধরেই নোবেল কমিটি আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা চিন্তা করছিল। কিন্তু সংশয় দেখা গেল স্বয়ং নোবেলের ঘোষণার মধ্যে। তিনি বলে গিয়েছিলেন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাবেন আবিষ্কারক আর সেই আবিষ্কার যেন মানুষের কল্যাণে লাগে। আইনস্টাইনর বেলায় বিতর্ক দেখা দিল তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব যুগান্তকারী হলেও প্রত্যক্ষভাবে তা মানুষের কোন কাজে লাগবে না।

তখন স্থির তাঁর ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বা আলোক তড়িৎ ফলকে সরাসরি আবিষ্কার হিসাবে বলা সম্ভব। এবং এর প্রত্যক্ষ ব্যবহারও হচ্ছে তাই ঘোষণা করা হল "Serfvice to the theory of Physics, especially for the Law of the Photo Electric Effect."

আইনস্টাইন তাঁর প্রথমা স্ত্রী মিলেভার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের শর্ত অনুসারে নোবেল পুরস্কারের পুরো টাকাটা তাঁকে পাঠিয়ে দেন।

আমেরিকায় বক্তৃতা দেবার জন্য বার বার ডাক আসছিল। অবশেষে ১৯৩০ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন, সেখানে অভূতপূর্ব সম্মান পেলেন। শুধু আমেরিকা নয়, যখন যে দেশেই যান সেখানেই পান সম্মান আর ভালবাসা।

এদিকে স্বদেশ জার্মানী ক্রমশই আইনস্টাইনের কাছে পরবাস হয়ে উঠেছিল। একদিকে তাঁর সাফল্য স্বীকৃতিকে কিছু বিজ্ঞান, ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে অন্য দিবে হিটলারের আবির্ভাবে দেশ জুড়ে এক জাতীয়তাবাদের নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে একদল মানুষ। ইহুদীরা ক্রমশই ঘৃণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন জার্মানীতে থাকা তাঁর পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু কোথা যাবেন? আহ্বান আসে নানা দেশ থেকে। অবশেষে স্থির করলেন আমেরিকার প্রিন্সটনে যাবেন।

জার্মানী থেকে ইহুদী বিতাড়ণ শুরু হয়ে যায়। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন এইবার তাঁরও যাবার পালা। প্রথমে গেলেন ইংল্যান্ডে। সেখান থেকে ১৯৩৪ সালের ৭ই জুলাই রওনা হলেন আমেরিকায়। তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন।

প্রিন্সটনের কর্তৃপক্ষ আইনস্টাইনের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গুপ্তঘাতকের দল

যে সাগর পেরিয়ে আমেরিকায় এসে পৌছবে না তাই বা কে বলতে পারে। তাই তাঁকে গোপন জায়গায় রাখা হল। সেই বাড়ির ঠিকানা কাউকে জানানো হল না। এইভাবে থাকতে তাঁর আর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরি থেকে এসে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। একদিন সন্ধ্যেবেলায় প্রিন্সটনের ডিরেকটরের বাড়িতে ফোন এল, দয়া করে যদি আইনস্টাইনের বাড়ির নম্বরটা জানান।

আইনস্টাইনের বাড়ির নম্বর কাউকে জানানো হল না বলে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন ডিরেকটার।

খানিক পরে আবার ফোন বেজে উঠল। আমি আইনস্টাইন বলছি, বাড়ির নম্বর আর রাস্তা দুটোই ভুলে গিয়েছি। যদি দয়া করে বলেন দেন।

এ এক বিচিত্র ঘটনা, যে মানুষটি নিজের ঘরের ঠিকানা মনে রাখতে পারেন না, তিনি বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের ঠিকানা খুঁজে বার করেন।

প্রকৃতপক্ষে জীবনের উত্তরপর্বে এসে আইনস্টাইন হয়ে উঠেছিলেন গৃহ সন্ন্যাসী। বড়দের চেয়ে শিশুরাই তাঁর প্রিয়। তাদের মধ্যে গেলে সব কিছু ভুলে যান। শিশুদের কাছে কল্পনার খ্রিস্টমাস বুড়ো। পরনে কোট নেই, টাই নেই, জ্যাকেট নেই। ঢলঢলে প্যান্ট আর গলা-আঁটা সোয়েটার, মাথায় বড় বড় চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঝ্যাটা গোঁফ।–দাড়ি কামাতে অর্ধেক দিন ভুলে যান। যখন মনে পড়ে গায়ে মাখা সাবানটা গালে ঘষে দাড়ি কেটে নেন। কেউ জিজ্ঞেস করলে কি ব্যাপার গায়ে মাখা সাবান দিয়ে দাড়ি কাটা। আইনস্টাইন জবাব দিতেন, দু'রকম সাবান ব্যবহার করে কি লাভ। শুধু নির্যাতিত ইহুদীদের সপক্ষে নয়, তিনি ক্রমশই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করছে, দলমত নির্বিশেষে তিনি তাদের সমর্থন করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন মানুষ এই ধ্বংসের উন্মাদনা ভুলে এক হবেই। আর একত্বতার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পাবে তার ধর্মকে।

আইনস্টাইনের কাছে এই ধর্মীয় চেতনা প্রচলিত কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্ম মানবতারই এক মূর্ত প্রকাশ। বিজ্ঞান আর ধর্মে কোন প্রভেদ নেই। প্রভেদ শুধু দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিজ্ঞান শুধু "কি" তার উত্তর দিতে পারে "কেন" বা "কি হওয়া উচিত" সে উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। অপর দিকে ধর্ম শুধু মানুষের কাজ আর চিন্তার মূল্যায়ন করতে পারে মাত্র। সে হয়ত মানব জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌছবার পথ বলে দেয় বিজ্ঞান।...তাই ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।

মানবতাবাদী আইনস্টাইন একদিকে শান্তির জন্যে সংগ্রাম করছিলেন অন্যদিকে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন একের পর এক তত্ত্ব আবিষ্কার করছিলেন। এই সময় তিনি প্রধানত অভিকর্ষ ও বিদ্যুৎ চৌম্বকক্ষেত্রের মিলন সাধনের প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিকাশের পথে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কিন্তু এই তত্ত্বের সম্ভাব্যতাভিত্তিক চরিত্রে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল না।

১৯৩৬ সালে হঠাৎ স্ত্রী এলসা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুদীর্ঘ ষোলো বছর ধরে এলসা ছিলেন আইনস্টাইনের যোগ্য সহধর্মিনী, তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গী।

আইনস্টাইন সব বুঝতে পারেন কিন্তু অসহায়ের মত তিনি শুধু চেয়ে থাকেন। অবশেষে ১৯৩৬ সালে চিরদিনের মত প্রিয়তম আইনস্টাইনকে ছেড়ে চলে গেলেন এলসা। এই মানসসিক আঘাতে সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেন আইনস্টাইন।

এই সময় পারমাণবিক শক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই শক্তির ভয়াবহতা সকলেই উপলব্ধি করতে পারছিলেন। পরীক্ষায় জানা গেল পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক ধাতু হল ইউরেনিয়াম। আর এই ইউরেনিয়াম তখন একমাত্র পাওয়া যায় কঙ্গো উপত্যাকায়। কঙ্গো বেলজিয়ামের অধিকারভুক্ত। বিজ্ঞানী মহল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল যদি জার্মানদের হাতে এই ইউরেনিয়াম পড়ে তাহলে তারা পরমাণু বোমা বানাতে মুহূর্তে মাত্র বিলম্ব করবে না। গোপনে সংবাদ পাওয়া যায় জার্মান বিজ্ঞানীরা নাকি জোর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আইনস্টাইন উপলব্ধি করলেন তাঁর সমীকরণ প্রমাণিত হতে চলছে। সামান্য ভরের রূপান্তরের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে অপরিমেয় শক্তি। আইনস্টাই লিখেছেন, "আমার জীবনকালে এই শক্তি পাওয়া যাবে ভাবতে পারিনি।"

এদিকে জার্মান বাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন যুদ্ধ জয় করতে গেলে এ্যাটম বোমা তৈরি করা দরকার। এবং তা

জার্মানীর আগেই তৈরি করতে হবে। সকলে সমবেতভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে আবেদন জানাল।

যদিও এই আবেদনপত্র সই করেছিলেন আইনস্টাইন. আমেরিকায় পরমাণু বোমা তৈরির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই তিনি জড়িত ছিলেন না।

শেষ দিকে তিনি চেয়েছিলেন এই গবেষণা বন্ধ হোক। তিনি বিজ্ঞানী মাক্স বোর্নকে বলেন, পরমাণু বোমা তৈরির জন্য আবেদনপত্রে আমার সই করাটাই সবচেয়ে বড় ভুল।

জাপানে এ্যাটম বোমা ফেলবার পর তার বিধ্বংসী রূপ দেখে বিচলিত আইনস্টাইন লিখেছেন, "পারমাণবিক শক্তি মানব জীবনে খুব তাড়াতাড়ি আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে—সে রকম মনে হয় না। এই শক্তি মানবজাতির প্রকৃতই ভয়ের কারণ—হয়তো পরোক্ষভাবে তা ভালই করবে। ভয় পেয়ে মানবজাতি তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা চালু করবে। ভয় ছাড়া মানুষ বোধহয় কখনোই শান্তির পথে অগ্রসর হতে পারবে না।

১৯৫০ সালে প্রকাশিত হল তাঁর নতুন তত্ত্ব (A generalised theory of Gravitation)। মহাকর্ষের সর্বজনীন তত্ত্ব। এত জটিল সেই তত্ত্ব, খুব কম সংখ্যক মানুষই তা উপলব্ধি করতে পারলেন। যখন বিজ্ঞানীরা তাঁকে তাঁর এই নতুন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে বললেন, তিনি সকৌতুকে বললেন, কুড়ি বছর পর এর আলোচনা করা যাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠেছে নতুন ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েল। আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানানো হল নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবার জন্য।

আইনস্টাইন জানালেন, প্রকৃতির তত্ত্ব কিছু বুঝলেও মানুষ রাজনীতির কিছুই বোঝেন না। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির পদ শুধুমাত্র শোভাবর্ধনের জন্য। শোভা হলেও তাঁর বিবেক যা মানতে পারবে না তাকে তিনি কখনোই সমর্থন করতে পারবেন না।

জীবন শেষ হয়ে আসছিল, এই সময়ে ইংরেজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অনুরোধে বিশ্বশান্তির জন্য খড়সা লিখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু শেষ করতে পারলেন না।

১৯৫৫ সালের ১৮'ই এপ্রিল তাঁর জীবন শেষ হল। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে মৃতদেহটা পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হল। শোনা যায় পরীক্ষার জন্যে তাঁর ব্রেন কোন গবেষণাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে সম্বন্ধে কেউই আর কোন কথা প্রকাশ করেনি।

৪

ক্রিস্টোফার কলম্বাস

[১৪৫১-১৫০৬]

ইতালির জেনোয়া শহরে কলম্বাসের জন্ম। সঠিক দিনটি জানা যায় না। তবে অনুমান ১৪৫১ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর, এর মধ্যে কোন এক দিনে জন্ম হয়েছিল কলম্বাসের। বাবা ছিলেন তন্তুবায়। কাপড়ের ব্যবসা ছিল তার। সেই সূত্রেই কলম্বাস জানতে পেরেছিলেন প্রাচ্য দেশের উৎকৃষ্ট পোশাক, নানান মশলা, অফুরন্ত ধনসম্পদের কথা।

সেই ছেলেবেলা থেকেই মনে মনে স্বপ্ন দেখতেন বড় হয়ে জাহাজ নিয়ে পাড়ি দেবেন ভারতবর্ষে। জাহাজ বোঝাই করে বয়ে নিয়ে আসবেন হীরে মণি মুক্তা মাণিক্য।

কলম্বাস ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, অধ্যাবসায়ী। কিন্তু অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ভাগ্য ছিল নিতান্তই প্রতিকূল। তাই অতিকষ্টে জীবন ধারণ করতেন কলম্বাস। কলম্বাসের ভাই তখন লিসবন শহরে বাস করতে। ভাই-এর কাছ থেকে ডাক পেয়ে কলম্বাস লিসবন শহরে গিয়ে বাসা বাধলেন। কলম্বাসের বয়স তখন আটাশ বছর।

অল্পদিনের মধ্যেই ছোটখাট একটা কাজও জুটে গেল। কাজের অবসরে মাঝে মাঝে গীর্জায় যেতেন। একদিন সেখানে পরিচয় হল ফেলিপা মোঞ্জিস দ্য পেরেস্ত্রেল্লো নামে এক তরুণীর সাথে। ফেলিপার বাবা বার্থলোমিউ ছিলেন সম্রাট হেনরির নৌবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ অফিসার।

কলম্বাসের জীবনে এই পরিচয় একগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরিচর্য পর্ব অল্পদিনেই অনুরাগে পরিণত হল। তারপর বিবাহ। বিবাহের পর কলম্বাস শ্বশুরের গৃহেই থাকতেন। শ্বশুরের কাছে শুনতেন তার প্রথম যৌবনের সমুদ্র অভিযানের সব রোমাঞ্চকর কাহিনী। অন্য সময় লাইব্রেরী ঘরে বসে পড়তেন দেশ-বিদেশের নানান ভ্রমণ কাহিনী। এই সময়ে একদিন তার হাতে এল মার্কো পেলোর চীন ভ্রমণের ইতিবৃত্ত। পড়তে পড়তে মনের মধ্যে প্রাচ্য দেশে যাবার স্বপ্ন নতুন করে জেগে উঠল।

এর পেছনে কাজ করছিল দুটি শক্তি। রোমাঞ্চকর অভিযানের দূরন্ত আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয়ত স্বর্ণতৃষ্ণা। তখন মানুষের ধারণা ছিল প্রাচ্য দেশের পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে সোনা-রূপা। সে দেশের মানুষের কাছে তার কোন মূল্যই নেই। ইচ্ছা করলেই তা জাহাজ বোঝাই করে আনা যায়।

কলম্বাস চিঠি লিখলেন সে যুগের বিখ্যাত ভূগোলবিদ Pagolo Toscanelli কে। Pagolo কলম্বাসের চিঠির জবাবে লিখলেন— "তোমার মনের ইচ্ছার কথা জেনে আনন্দিত হলাম। আমার তৈরি সমুদ্র পথের একটা নকসা পাঠালাম। যদিও এই নকশা নির্ভুল নয়, তবুও এই নকশার সাহায্যে প্রাচ্যের পথে পৌঁছতে পারবে। যেখানে ছড়িয়ে আছে অফুরন্ত হীরে জহরৎ সোনা রূপা মণি মুক্তা মানিক্য।

এই চিঠি পেয়ে কলম্বাসের মন থেকে সব সংশয় সন্দেহ দূর হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল তার যাত্রার প্রস্তুতি। কলম্বাসের ইচ্ছার কথা শুনে সকলে অবাস্তব অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিল। অনেকে তাকে উপহাস করল। কেউ কেউ তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়ল না। একটি মানুষও এগিয়ে এল না তার সমর্থনে বা সাহায্যে।

কলম্বাসের অনুরোধে স্পেনের রানী ইসাবেলা সহৃদয় বিবেচনার আশ্বাস দিলেও সম্রাট ফার্দিনান্দ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। ইতিমধ্যে কলম্বাসের স্ত্রী ফেলিপা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সমস্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও অসুখ ক্রমশই গুরুতর হয়ে উঠল। দূর প্রাচ্য অভিযানে পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হল। কিছুদিন পর মারা গেলেন ফেলিপা।

কলম্বাসের জীবনের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। এবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার অভিযানে। দেশের প্রায় প্রতিটি ধনী সম্ভ্রান্ত মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ান। জাহাজ চাই, নাবিক চাই, অর্থ চাই।

কলম্বাসের দাবি ছিল যে দেশ আবিষ্কার হবে, তাকে সেই দেশের ভাইসরয় করতে হবে আর রাজস্বের একটা অংশ দিতে হবে। প্রাথমিকভাবে দু-একজন সম্মতি দিলেও কলম্বাসের দাবির কথা শুনে সকলেই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

কলম্বাসের সাথে এই সময় একদিন পরিচয় হল ফাদার পিরেজ-এর। ফাদার পিরেজ ছিলেন রাজ পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং রানী ইসাবেলা তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

কলম্বাসের ইচ্ছার কথা ফাদার নিজেই রাণী ইসাবেলাকে বললেন। অনুরোধ করলেন যদি তাকে কোনভাবে সাহায্য করা যায়। ফাদারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না রাণী। নতুন দেশ আবিষ্কারের সাথে সাথে বহু মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার পুণ্য অর্জন করা যাবে। ফাদার পিরেজ ছাড়াও আরো কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি কলম্বাসের সমর্থনে এগিয়ে এলেন।

কলম্বাসের সব অনুরোধ স্বীকার করে নিলেন সম্রাট। ১৭ই এপ্রিল, ১৪৯২ তাদের মধ্যে চুক্তি হল। কলম্বাসকে নতুন দেশের শাসনভার দেওয়া হবে আর অর্জিত সম্পদের এক দশমাংশ অর্থ দেওয়া হবে।

সম্রাটের কাছ থেকে অর্থ পেয়ে তিনখানা জাহাজ নির্মাণ করলেন কলম্বাস। সবচেয়ে বড় ১০০ টনের সান্তামারিয়া, পিন্টা ৫০ টন, নিনা ৪০ টন। জাহাজ তৈরির সময় কোন বিঘ্ন দেখা গেল না। সমস্যা সৃষ্টি হল নাবিক সংগ্রহের সময়। কলম্বাসের সাহায্যে এগিয়ে এল পিনজন ভাইরা। তাদের সাথে আরো কিছু বিশিষ্ট লোকের চেষ্টায় সর্বমোট ৮৭ জন নাবিক পাওয়া গেল।

অবশেষে ৩ আগস্ট, ১৪৯২ কলম্বাস তার তিনটি জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিলেন অজানা সমুদ্রে। সেদিন বন্দরে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের অধিকাংশই ভেবেছিলেন কেউই আর সেই অজানা দেশ থেকে ফিরে আসবে না।

ভেসে চললেন কলম্বাস। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হয়। কোথাও স্থলের দেখা নেই, অধৈর্য হয়ে ওঠে নাবিকরা। সকলকে সান্ত্বনা দেন, উৎসাহ দেন কলম্বাস কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য্য রাখতে পারে না নাবিকরা। সকলে একসাথে বিদ্রোহ করে, জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কলম্বাসের চোখে পড়ে ভাঙা গাছের ডাল। সবুজ পাতা। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, তাঁরা স্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। নাবিকদের কাছে শুধু একটি দিনের প্রার্থনা করেন। দিনটি ছিল ১২ই অক্টোবর। একজন নাবিক, নাম রোডারিগো প্রথম দেখলেন স্থলের চিহ্ন। আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠলেন সকলে।

পরদিন কলম্বাস নামলেন বাহমা দ্বীপপুঞ্জের এক অজানা দ্বীপে। পরবর্তীকালে তিনি সেই দ্বীপের নাম রাখেন সান সালভাদর। (বর্তমান নাম ওয়েস্টলিং আইল্যাণ্ড)। এই দিনটি আজও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় কলম্বাস দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন হয়।

কলম্বাস ভেবেছিলেন সমুদ্র পথে তিনি এশিয়ায় এসে পৌছেছেন। যেখানে অফুরন্ত সোনাদানা ছড়ানো আছে। কিন্তু কোথায় আছে সেই সম্পদ...? দিনের পর দিন চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না ধনসম্পদের কোন চিহ্ন। কলম্বাস গেলেন কিউবা এবং হিস্পানিওয়ালাতে দ্বীপে। স্থির করলেন, এখানে সাময়িক আস্তানা স্থাপন করে ফিরে যাবে স্পেনে। এরপর আরো বিরাট সংখ্যক লোক এনে অনুসন্ধান করবেন ধনরত্নের। হিস্পানিওয়ালাতে সাময়িক আস্তানা গড়ে তুললেন। সেখানে ৪২ জন নাবিকের থাকার ব্যবস্থা করে রওনা হলেন স্বদেশভূমির পথে। নতুন দ্বীপে পৌছবার প্রমাণস্বরূপ কিছু স্থানীয় আদিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

শূন্য হাতে ফিরে এলেও দেশে অভূর্তপূর্ব সম্মান পেলেন কলম্বাস। তাঁর সম্মানে রাজা-রাণী বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। স্বয়ং পোপ কলম্বাসকে আশীর্বাদ জানিয়ে ঘোষণা করলেন, নতুন আবিষ্কৃত সমস্ত দেশ স্পেনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সম্রাট ফার্দিনান্দ নতুন অভিযানের আয়োজন করলেন। বিরাট নৌবহর, অসংখ্য লোকজন নিয়ে ১৪৯৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর কলম্বাস আটলান্টিক পার হয়ে দ্বিতীয় সমুদ্র অভিযানে যাত্রা করলেন।

দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর কলম্বাস গিয়ে পৌছলেন হিস্পানিওয়ালাতে। সেখানে গিয়ে দেখলেন তার সঙ্গী-সাথীদের একজনও আর জীবিত নেই। কিছু মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য মারা গিয়েছে। অবশিষ্ট সকলে স্থানীয় আদিবাসীদের হাতে মারা পড়েছে।

এই দ্বিতীয় অভিযানের সময় কলম্বাস চারদিকে ব্যাপক অনুসন্ধান করেও কোন ধনসম্পদের সামান্য মাত্র চিহ্ন খুঁজে পেলেন না। শুধু মাত্র নতুন কিছু দ্বীপ আবিষ্কার করলেন। কোন অর্থ সম্পদ না পেয়ে জাহাজ ভর্তি করে স্থানীয় আদিবাসীদের দাস হিসাবে বন্দী করে স্পেনে পাঠলেন। তখনো ইউরোপের বুকে দাস ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রচলন ঘটেনি। কলম্বাসের এই কাজকে অনেকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারল না। তাছাড়া আদিবাসীদের বিরাট অংশই নতুন পরিবেশে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যে মারা পড়ল। ইসাবেলা কলম্বাসের এই আচরণকে অন্তর থেকে সমর্থন করত পারলেন না।

এই সংবাদ কলম্বাসের কাছে পৌছতে বিলম্ব হল না। তিনি আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করলেন না। আড়াই বছর পর ১৪৯৬ সালের ১১ই জুন ফিরে এলেন স্পেনে। কিন্তু প্রথম বারের মত এবারে কোন সম্বর্ধনা পেলেন না। কিন্তু অজেয় মনোবল কলম্বাসের।

নতুন অভিযানের জন্য আবেদন জানালেন কলম্বাস। প্রথমে দ্বিধাগ্রস্থ থাকলেও শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিলেন সম্রাট।

১৪৯৮, ৩০শে মে তৃতীয়বারের জন্য অভিযান শুরু করলেন কলম্বাস। এই বার তার সঙ্গী হল তার পুত্র এবং ভাই। কলম্বাসের জীবনের সৌভাগ্যের দিন ক্রমশই অস্তমিত হয়ে এসেছিল। হিস্পানিওয়ালার স্থানীয় মানুষেরা ইউরোপীয়ানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘোষণা করল। মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত কলম্বাস অত্যাচারী শাসকের মত কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করলেন। শত শত মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল।

কলম্বাসের সহযোগীরাও তাঁর কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সম্রাটের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, তিনি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তিনি ফ্রান্সিসক্যো দ্য বোবদিলা নামে একজন রাজকর্মচারীকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে পাঠালেন কলম্বাসের বিরুদ্ধে তদন্ত করবার জন্য। কয়েকদিন ধরে অনুসন্ধান করে রাজ্য স্থাপনের কোন অভিযোগ না পেলেও কলম্বাসের বিরুদ্ধে নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ আনা হল। কারণ কলম্বাস কোন সম্পদশালী দেশ আবিষ্কার করবার পরিবর্তে সম্পদহীন দেশ আবিষ্কার করেছেন। যার জন্যে সম্রাটের বিরাট পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়েছে।

এই অভিযোগে প্রথমে বন্দী করা হল কলম্বাসের ভাই ও পুত্রকে। তারপর কলম্বাসকে। কলম্বাসকে শৃঙ্খলিতে করে নিয়ে আসা হল স্পেনে। তাঁকে রাখা হল নির্জন কারাগারে। সেখান থেকেই রানী ইসাবেলাকে চিঠি লিখলেন কলম্বাস।

রানী ইসাবেলা ছিলেন দয়ালু প্রকৃতির। তাছাড়া কলম্বাসের প্রতি বরাবরই ছিল তার সহানুভূতিবোধ। তাঁর চিঠি পড়ে তিনি মার্জনার আদেশ দিলেন।

পঞ্চাশ বছরে পা দিলেন তিনি। শরীরে তেমন জোর নেই কিন্তু মনের অদম্য সাহসে ভর দিয়ে চতুর্থ বারের জন্য সমুদ্র যাত্রার আবেদন করলেন। সম্রাট সম্মতি দিলেন, শুধু হিস্পানিওয়ালাতে প্রবেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন।

১৫০২ সালের ১৯শে মে কলম্বাস শুরু করলেন তার চতুর্থ সমুদ্রযাত্রা। তার ইচ্ছে ছিল আরো পশ্চিমে যাবেন। পথে তুমুল ঝড় উঠল। নিরুপায় কলম্বাস আশ্রয় নিলেন এক অজানা দ্বীপে।

কলম্বাস পৌছেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক দ্বীপে। সেখান থেকে ফিরে যান জামাইকা দ্বীপে। ক্রমশই তার দেহ ভেঙে পড়েছিল। অজানা রোগে তার সঙ্গীদের অনেকেই মারা গিয়েছিল। দু বছর পর নিরুৎসাহিত মনে স্পেনে ফিরে এলেন।

এরপর আর মাত্র দু বছর বেঁচে ছিলেন। যদিও অর্থ ছিল কিন্তু মনের শান্তি ছিল না। রাজ অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছিলেন। তার আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার ক্ষমতা দেশবাসীর ছিল না।

১৫০৬ সালে ভ্যাসাডোলিড শহরে এক সাধারণ কুটিরে সকলের অগোচরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কলম্বাস। সেখানে থেকে তর মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে ডেমিঙ্গোতে সমাধি দেওয়া হয়।

৫
গৌতম বুদ্ধ

[খ্রিঃ পূঃ ৫৬৩-৪৮৩]

প্রাচীন ভারতে বর্তমান নেপালের অন্তর্গত হিমালয়ের পাদদেশে ছিল কোশল রাজ্য। রাজ্যে রাজধানী কপিলাবস্তু। কোশলের অধিপতি ছিলেন শাক্যবংশের রাজা শুদ্ধোধন।

শুদ্ধোধনের সুখের সংসারে একটি মাত্র অভাব ছিল। তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। বিবাহের দীর্ঘদিন পর গর্ভবতী হলেন জ্যেষ্ঠা রানী মায়াদেবী। সে কালের প্রচলিত রীতি অনুসারে সন্তান জন্মাবার সময় পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন মায়াদেবী।

পথে লুম্বিনী উদ্যান। সেখানে এসে পৌছতেই প্রসব বেদনা উঠল রানীর। যাত্রা স্থগিত রেখে বাগানেই আশ্রয় নিলেন সকলে। সেই উদ্যানেই জন্ম হল বুদ্ধের। যিনি সমস্ত মানবের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি রাজার পুত্র হয়েও কোন রাজপ্রসাদে জন্মগ্রহণ করলেন না, মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে নীল আকাশের নীচে আবির্ভূত হলেন।

পুত্র জন্মাবার কয়েক দিন পরেই মারা গেলেন মায়াদেবী। শিশুপুত্রের সব ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন খালা মহাপ্রজাপতি। শিশুপুত্রের নাম রাখা হল সিদ্ধার্থ।

রাজা শুদ্ধোধন জ্যোতিষীদের আদেশ দিলেন শিশুর ভাগ্য গণনা করতে। তাঁরা সিদ্ধার্থের ভাগ্য গণনা করে বললেন, এই শিশু একদিন পৃথিবীর রাজা হবেন। যে দিন এ জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ, রোগগ্রস্ত মানুষ, মৃতদেহ এবং সন্ন্যাসীর দর্শন পাবে সেই দিনই সংসারের সকল মায়া পরিত্যাগ করে গৃহত্যাগ করবে।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন শুদ্ধোধন। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন এই শিশুকে সুখ, বৈভব আর বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়ে দিন, তাহলে এ আর কোনদিন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হবে না।

স্বতন্ত্র প্রাসাদেই স্থান হল রাজপুত্র সিদ্ধার্থের। যেখানে কোন জরা ব্যাধি মৃত্যুর প্রবেশ করার অধিকার নেই। ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলেন সিদ্ধার্থ। যৌবনে পা দিতেই রাজা শুদ্ধোধন তাঁর বিবাহের আয়োজন করলেন। সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুন্দরী কিশোর যশোধরার সাথে বিবাহ হল সিদ্ধার্থের।

বিবাহের পর কিছু দিন আনন্দ উৎসবে মেতে রইলেন সিদ্ধার্থ। যথাসময়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হল। তার নাম রাখা হল রাহুল।

সন্তানের জন্মের পর থেকেই পরিবর্তন শুরু হল সিদ্ধার্থের। একদিন পথে বের হয়েছেন এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল এক বৃদ্ধ। অস্থিচর্মসার, মাথার সব চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। মুখে একটিও দাঁত নেই। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। বৃদ্ধকে দেখামাত্রই রথ থামালেন সিদ্ধার্থ। তাঁর সমস্ত মন বিচলিত হয়ে পড়ল-মানুষের একি ভয়ঙ্কর রূপ?

ভারাক্রান্ত মনে প্রাসাদে ফিরে গেলেন সিদ্ধার্থ। কয়েক দিন পর হঠাৎ সিদ্ধার্থের চোখে পড়ল। একটি গাছের তলার শুয়ে আছে একজন মানুষ। অসুস্থ রোগগস্ত, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

বিমর্ষ হয়ে পড়লেন সিদ্ধার্থ। তাহলে তো যৌবনেও সুখ নেই। যেকোন মুহূর্তে ব্যাধি এসে সব সুখ কেড়ে নেবে।

কিছু দিন পর সিদ্ধার্থের চোখে পড়ল রাজপথ দিয়ে চলেছে এক শবযাত্রা। জীবনে এই প্রথম মৃতদেহ দেখলেন–প্রিয়জনদের কান্নায় চারদিক মুখর হয়ে উঠেছে। বিস্মিত হলেন সিদ্ধার্থ–কিসের এই কান্না? সারথী চন্ন বলল, প্রত্যেক মানুষের জীবনের পরিণতি এই মৃত্যু। মৃত্যুই জীবনের শেষ তাই প্রিয়জনকে চিরদিনের জন্য হারাবার বেদনায় সকলে কাঁদছে।

আনমনা হয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ। এক জিজ্ঞাসা জেগে উঠল তার মনের মধ্যে। মৃত্যুই যদি জীবনের অন্তিম পরিণতি হয় তবে এই জীবনের সার্থকতা কোথায়?

রাজপ্রাসাদের সুখ ঐশ্বর্য বিলাস সব তুচ্ছ হয়ে গেল সিদ্ধার্থের কাছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হল এই জরা ব্যধি মৃত্যুর হাত থেকে কে তাঁকে মুক্তির সন্ধান দেবে?

অকস্মাৎ দেখা হল এক সন্ন্যাসীর সাথে। সিদ্ধার্থ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনি এই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন?

সন্ন্যাসী বললেন, আমি জেনেছি সংসারের সব কিছুই অনিত্য। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু যেকোন মুহূর্তে জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই আমি যা কিছু অবিনশ্বর চিরন্তন তারই সন্ধানে বার হয়েছি। আমার কাছে সুখ-দুঃখ জীবন-মৃত্যু সব এক হয়ে গিয়েছে।

সিদ্ধার্থ সকলের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। দিবারাত্র চিন্তার মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

সকলের অগোচরে গভীর রাতে নিজের কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন সিদ্ধার্থ। পেছনে পড়ে রইল স্ত্রী যশোধরা, পুত্র রাহুল, পিতা শুদ্ধোধন, মহাপ্রজাপতি।

অশ্বশালায় ঘুমিয়ে ছিল সারথী চন্ন। তাঁকে ডেকে তুললেন সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থকে রথে নিয়ে চললেন চন্ন। নগরের সীমানা পার হয়ে, জনপদ গ্রাম পার হয়ে, রাজ্যের সীমানায় এসে দাঁড়ালেন। এবার সারথী চন্নকে বিদায় দিতে হবে। নিজের সমস্ত অলংকার রাজবেশ খুলে উপহার দিলেন চন্নকে। তারপর বললেন, তুমি পিতাকে বলো আমি যদি কোনদিন জরা ব্যধি মৃত্যুকে জয় করতে পারি তবে আবার তাঁর কাছে ফিরে আসব। আমি মানুষকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে আলোর পথ দেখাতে চাই।

চলতে চলতে অবশেষে সিদ্ধার্থ এসে পৌছলেন রাজগৃহ। তখন রাজগৃহ ছিল কোথাও কোন জনমানব নেই, চারদিক নির্জন, শুধু পাখির কূজন আর বয়ে চলা বাতাসের শব্দ। ভাল লেগে গেল সিদ্ধার্থের। তিনি স্থির করলেন এখানেই বিশ্রাম গ্রহণ করবেন। ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ল পাহাড়ের ছোট ছোট গুহায় ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন সব সাধুরা। একটি গুহার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন সিদ্ধার্থ। সেই গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন আলাড়া নামে এক সাধু। সিদ্ধার্থ গুহার অদূরে বসলেন।

আলাড়ার ধ্যান ভঙ্গ হতেই সিদ্ধার্থ তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয়, গৃহত্যাগের কারণ বর্ণনা করে বললেন, আমি মুক্তির পথের সন্ধান করছি। আপনি আমাকে বলে দিন কোন পথ ধরে অগ্রসর হলে আমার লক্ষ্যে পৌছতে পারব।

সেখানেই রয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ। একটি গুহায় তিনি বাসস্থান করে নিলেন। সমস্ত দিন ধ্যান বেদপাঠ শাস্ত্রচর্চার মধ্যে অতিবাহিত হত।

দিন কেটে যায়। গুরু আলাড়ার কাছে শিক্ষা পেয়ে অনেক কিছু জ্ঞানলাভ করেছেন সিদ্ধার্থ কিন্তু তাঁর অন্তরে যেন অতৃপ্তি রয়ে যায়।

নতুন গুরুর সন্ধানে বার হলেন সিদ্ধার্থ। এবার এলেন উদ্দাক নামে এক সাধুর সান্নিধ্যে। দীক্ষা নিলেন তাঁর কাছে। সেই একই জীবনচর্চা শাস্ত্রপাঠ জপ-যজ্ঞ–এতে বাইরের আড়ম্বর আছে কিন্তু অন্তরের স্পর্শ নেই।

সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করতে পারলেন যে, জ্ঞান, পরম সত্যের অন্বেষণ তিনি করছেন, কোন সাধুই তাঁর সন্ধান জানেন না।

হতাশায় ভেঙে পড়লেন। তিনি অনুভব করলেন তাঁর পথের সন্ধান অপর কেউ তাঁকে দিতে

পারবে না। অন্ধকারের মধ্যে তাঁকেই খুঁজে বার করতে হবে আলোর দিশা। ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন উরুবেলা নামে এক নগর প্রান্তে। যেখানে পাঁচজন সাধু বহুদিন তপস্যা করছিলেন। সিদ্ধার্থের আসার উদ্দেশ্য শুনে তারা বলল তুমি তপস্যা কর। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে আমি তপস্যা করব? দিন-রাত্রি একই আসনে বসে ধ্যান করে চলেন।

এত আত্মনিগ্রহ করেও যে প্রজ্ঞা জ্ঞানের সন্ধান করছিলেন তার কোন দিশা পেলেন না সিদ্ধার্থ। মনে হল যাকে তিনি উপলব্ধি করতে চাইছেন, সে পরম সত্য যেন ধরা দিতে গিয়েও দূরে সরে যাচ্ছে। সিদ্ধার্থ স্থির করলেন আর আত্মনিগ্রহের পথে তিনি অগ্রসর হবেন না। কাছেই এক গ্রামে ছিল একটি মেয়ে, নাম সুজাতা। ধর্মপ্রাণা ভক্তিমতী। প্রতি বছর সে মনের কামনা পূরণের আশায় বৃক্ষ দেবতার কাছে পূজা দিত।

প্রতি বছর যে বৃক্ষের তলায় সুজাতা পূজা দিত, সিদ্ধার্থ স্নান সেরে অর্ধমৃত অবস্থায় সেই বৃক্ষের তলায় এসে বসেছিলেন। সুজাতা দাসী পুন্নাকে নিয়ে বৃক্ষতলায় এসে সিদ্ধার্থকে দেখে বিস্মিত হলেন। সুজাতা সিদ্ধার্থের সামনে নতজানু হয়ে তাঁকে পায়েস প্রদান করলেন।

সিদ্ধার্থের মনে হল এও যেন ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। তিনি পায়েস গ্রহণ করে খাওয়া মাত্র সমস্ত শরীরে এক শক্তি অনুভব করলেন। প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠল তাঁর দেহ-মন।

সিদ্ধার্থ এবার সেই গাছের নিচেই ধ্যানে বসলেন। দিন কেটে গেল সন্ধ্যা হল। ধীরে ধীরে পার্থিব জগৎ মুছে গেল তাঁর সামনে থেকে। এক অনির্বচনীয় অনুভূতি প্রজ্ঞা জ্ঞান ধীরে ধীরে জেগে ওঠে তাঁর মধ্যে। তিনি অনুভব করলেন জন্ম-মৃত্যুর এক চিরন্তন আবর্তন। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে রয়েছে এক অসীম অনন্ত শূন্যতা। তার মাঝে তিনি একা জেগে রয়েছেন।

তারই মধ্যে সহসা জেগে ওঠে লোভ, কামনা, বাসনা, প্রলোভন। যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে চালিত করেছে। তারা কি এত সহজে নিজেদের অধিকার ত্যাগ করতে চায়।

ধীরে ধীরে পার্থিব চেতনার জগৎ থেকে তিনি উত্তোরণ করলেন পরম প্রজ্ঞার জগতে। দেহধারণ অর্থাৎ জন্ম থেকে মুক্তির মধ্যেই মানুষ সকল পার্থিক জগতের দুঃখ কষ্ট থেকে উদ্ধার পেতে পারে। এই পরম মুক্তিরই নাম নির্বাণ। এই পরম জ্ঞান উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে যুবরাজ সিদ্ধার্থ হয়ে উঠলেন মহাজ্ঞানী বুদ্ধ।

সেই সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল দুজন বণিক। তাদের দৃষ্টি পড়ল বুদ্ধের দিকে। দেখা মাত্রই মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল তারা। তারা বুদ্ধের পায়ের কাছে বসে বলল, প্রভু, আপনি আমাদের সব পাপ তাপ দুঃখ দূর করে আপনার শিষ্য করে নিন।

বুদ্ধ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর অন্তস্থিত উপলব্ধিকে কি মানুষ গ্রহণ করতে পারবে! দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করার পর মনে হল তাঁর এই সাধনা তো মানুষের মঙ্গলের জন্য, তাদের মুক্তির জন্য। তিনি তো শুধু নিজের নির্বাণের জন্য এই তপস্যা করেনি।

বুদ্ধ স্থির করলেন সর্ব প্রথম তিনি তার উপদেশ প্রদান করবেন সেই পাঁচ সন্ন্যাসীর কাছে যারা তাঁর গুরু। তাঁকে উপহাস করে অন্যত্র চলে গিয়েছেন।

তিনি দুই বণিককে আশীর্বাদ করে তাদের বিদায় দিয়ে সেই নিরঞ্জনা নদীতীরস্থ গাছটিকে প্রণাম করে এগিয়ে চলছেন। যে বৃক্ষের তলায় তিনি বোধি লাভ করেছিলেন। সেই বৃক্ষের নাম হল বোধিবৃক্ষ। যুগ যুগ ধরে মানুষ যার বেদীমূল শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলেছে।

বুদ্ধ চলতে চলতে এসে পৌছলেন সেই পাঁচ সাধুর কাছে। তাঁরা সকলেই কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হয়েছে। বুদ্ধকে দেখামাত্রই তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল।

বুদ্ধ তাঁদের সামনে গিয়ে বললেন, তোমরা এই আত্মনিগ্রহের পথ ত্যাগ কর। এই কৃচ্ছসাধনাও যেমন প্রজ্ঞা লাভের পথের প্রতিবন্ধক তেমনি ভোগসুখ বিলাসের মধ্যেও সত্যকে জানা যায় না।

ধীরে ধীরে পাঁচজন সাধুর মন থেকে সব সংশয় দূর হয়ে গেল। তারা উপলব্ধি করল তথাগত বুদ্ধই তাদের জীবনে আলোর দিশারী হয়ে এসেছেন।

বুদ্ধ তাদের একে একে ধর্মের উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর উপদেশ শোনবার পর পাঁচজন সাধু বলল, আপনি আমাদের দীক্ষা দিন, আজ থেকে আমরা আপনার শিষ্য হব।

বুদ্ধ তাদের দীক্ষা দিয়ে শিষ্য হিসেবে বরণ করে নিলেন। দেখতে দেখতে অল্প দিনের মধ্যেই বুদ্ধের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচীন ভারতে বৈদিক ধর্মে মূর্তিপূজা না থাকলেও ছিল যাগযজ্ঞ আচার-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি। ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজের সবকিছুর চালক। বুদ্ধের

ধর্মের মধ্যে ছিল মানুষের প্রতি ভালবাসা করুণা প্রেম। তাই মানুষ সহজেই তাঁর ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এতদিন পুরোহিত ব্রাহ্মণরা মানুষকে বলত একমাত্র তারাই পারে মানুষকে মুক্তি দিতে। বুদ্ধ বললেন, অন্য কেউ তোমাদের মুক্তি দিতে পারবে না। তোমাদের জীবনচর্চার মধ্যেই আছে তোমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ। মানুষ নিজেই যেমন তার দুঃখকে সৃষ্টি করে তেমনি নিজের চেষ্টার মধ্যে দিয়েই সব দুঃখ থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারে। তুমি সৎ জীবন যাপন কর, পবিত্র আচরণ কর। অন্তরকে শুদ্ধ কর, উদার কর। সেখানে যেন কোন কলুষতা না স্পর্শ করতে পারে। দলে দলে মানুষ আসতে আরম্ভ করল তাঁর কাছে। তিনি তাদের কাছে বললেন, অষ্টমার্গের কথা।

প্রথম হচ্ছে সত্য বোধ–অর্থাৎ মন থেকে সকল ভ্রান্তি দূর করতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে প্রভেদ।

দ্বিতীয় হচ্ছে সংকল্প–সংসারের পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা। যা কিছু পরম জ্ঞান তাকে উপলব্ধি করার জন্য থাকবে গভীর আত্ম সংযমের পথ ধরে এগিয়ে চলা।

তৃতীয়–সম্যক বা সত্য বাক্য। কোন মানুষের সাথেই যেন মিথ্যা না বলা হয়। কাউকে গালিগালাজ বা খারাপ কথা বলা উচিত নয়। অন্য মানুষের সাথে যখন কথা বলবে, তা যেন হয় সত্য পবিত্র আর করুণায় পূর্ণ।

চতুর্থ–সৎ আচরণ। সকল মানুষেরই উচিত ভোগবিলাস ত্যাগ করে সৎ জীবন যাপন করা। সমস্ত কাজের মধ্যেই যেন থাকে সংযম আর শৃঙ্খলা। এছাড়া অন্য মানুষের প্রতি আচরণে থাকবে দয়া ভালবাসা।

পঞ্চম–হল সত্য জীবন বা সম্যক জীবিকা অর্থাৎ সৎভাবে অর্থ উপার্জন করতে হবে এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনে এমন পথ অবলম্বন করতে হবে যাতে রক্ষা পাবে পবিত্রতা ও সততা।

ষষ্ঠ–সৎ চেষ্টা–মন থেকে সকল রকম অশুভ ও অসৎ চিন্তা দূর করতে হবে–যদি কেউ আগের পাঁচটি পথ অনুসরণ করে তবে তার কর্ম ও চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই সংযত হয়ে চলবে।

সপ্তম–সম্যক ব্যায়াম অর্থাৎ সৎ চিন্তা। মানুষ এই সময় কেবল সৎ ও পবিত্র চিন্তা-ভাবনার দ্বারা মনকে পূর্ণ করে রাখবে।

অষ্টম–এই স্তরে এসে মানুষ পরম শান্তি লাভ করবে। তার মন এক গভীর প্রশান্তির স্তরে উত্তীর্ণ হবে।

বুদ্ধ যে অষ্টমার্গের উপদেশ দিয়েছিলেন তা মূলত তাঁর সন্ন্যাসী আশ্রম বা সঙ্গ শিষ্যদের জন্য। কিন্তু তিনি তাঁর প্রখর বাস্তব চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সাধারণ গৃহী মানুষ কখনোই এই অষ্টমার্গের পথকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে পারবে না। তিনি সমগ্র মানব সমাজের জন্য দশটি নীতি প্রচলন করলেন–

১. তুমি কোন জীব হত্যা করবে না।
২. অপরের জিনিস চুরি করবে না।
৩. কোন ব্যভিচার বা অনাচার করবে না।
৪. মিথ্যা কথা বলবে না, কাউকে প্রতারণা করবে না।
৫. কোন মাদক দ্রব্য গ্রহণ করবে না।
৬. আহারে সংযমী হবে। দুপুরের পর আহার করবে না।
৭. নৃত্যগীত দেখবে না।
৮. সাজসজ্জা অলঙ্কার পরবে না।
৯. বিলাসবহুল শয্যায় শোবে না।
১০. কোন সোনা বা রুপা গ্রহণ করবে না।

এই দশটি উপদেশের মধ্যে প্রথম পাঁচটি ছিল সাধারণ মানুষের জন্য। আর সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে দশটি উপদেশই পালনীয়।

বুদ্ধের এই উপদেশ জনগণের মধ্যে প্রচার করার জন্য তার ষাট জন বিশিষ্ট শিষ্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এবার বুদ্ধ তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে রওনা হলেন গয়ার পথে।

বুদ্ধের শিষ্যের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন বিরাট সংখ্যক এই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য প্রয়োজন সঙ্ঘের। যেখানে তাঁরা জীবনচর্চার সাথে ধর্মচর্চা করবেন। সৎ পবিত্র জীবনের আদর্শ গ্রহণ করবেন।

শুরু হল সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কাজ। সেই সময় একদিন যখন বুদ্ধ শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, কপিলাবস্তু থেকে এক দূত এসে মহারাজ শুদ্ধোধনের একটি পত্র দিল বুদ্ধকে।

বুদ্ধ তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে রওনা হলেন কপিলাবস্তুর পথে। মহারাজ শুদ্ধোধনের মনে ক্ষীণ আশা জেগে ওঠে, হয়ত পুত্র তার রাজ্যের ভার গ্রহণ করবে। বুদ্ধ নগরে প্রবেশ করতেই বৃদ্ধ পিতা ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। কিন্তু এ তিনি কাকে দেখলেন! পরনে পীতবস্ত্র, একদিকে কাঁধ অনাবৃত। মস্তক মুণ্ডন। হাতে ভিক্ষাপাত্র। তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে নগরের মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইছেন।

যে কিনা সমগ্র রাজ্যের যুবরাজ সে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। লজ্জায় ক্ষোভে মাথা নত করলেন শুদ্ধোধন। বুদ্ধ এগিয়ে এলেন পিতার কাছে। এসে তাকে প্রণাম করে বললেন, আপনি হয়ত পুত্রস্নেহে আমাকে দেখে ব্যথিত হয়েছেন। মন থেকে এই মায়া আপনি দূর করুন। এই জগৎ অনিত্য।

রাজা শুদ্ধোধন উপলব্ধি করলেন তাঁর সম্মুখে যে দাঁড়িয়ে আছে সে তাঁর পুত্র নয়, মহাজ্ঞানী মানবশ্রেষ্ঠ তথাগত বুদ্ধ। পুত্রকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে গেলেন। প্রাসাদের অন্তঃপুরে বসেছিলেন যশোধারা। তিনি ভাবলেন যতক্ষণ না বুদ্ধ তাঁর কাছে আসে, তিনি কোথাও যাবেন না।

বুদ্ধের হৃদয় যশোধারার সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তিনি দুজন শিষ্যকে নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। বুদ্ধকে দেখামাত্রই উঠে এলেন যশোধারা। তার পরনে কোন রাজবেশ নেই। কোন অলঙ্কার নেই। গৃহে থেকেও সন্ন্যাসিনী। বুদ্ধের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন যশোধারা।

বুদ্ধ তাঁকে শান্ত করে বললেন, হে আমার পুত্রের জননী, আমি জানি তুমিও জন্ম জন্মান্তর ধরে সৎ পবিত্র জীবন যাপন করছ, তাই আমি তোমাকে মুক্তির পথ দেখাতে এসেছি। আমি তোমাকে যে উপদেশ দেব তুমি সেই পথ অনুসরণ কর, তবেই জীবনের সব মায়া বন্ধনের উর্ধ্বে উঠতে পারবে। আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না বুদ্ধ।

পরদিন বুদ্ধ নগরে বেরিয়েছেন ভিক্ষাপাত্র হাতে। এমন সময় প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে যশোধারা তাঁর পুত্র রাহুলকে বললেন, ঐ যে দিব্যকান্তি পুরুষ পথ দিয়ে চলেছেন উনি তোমার পিতা। যাও ওর কাছ থেকে গিয়ে তোমার উত্তরাধিকার চেয়ে নাও।

পুত্র রাহুল গিয়ে দাঁড়াল বুদ্ধের সামনে। তাঁকে প্রণাম করে বলল, আমি তোমার পুত্র। তুমি আমাকে আমার উত্তরাধিকার দাও।

এবার এলেন তাঁর ভাই আনন্দ। আনন্দ প্রজাপতির পুত্র। তিনি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সকলকে নিয়ে বুদ্ধ কপিলাবস্তু ত্যাগ করে এলেন শ্রাবস্তী নগরে। এখানে তাঁর থাকবার জন্য অনাথ পিণ্ডক নামে এক ধনী বণিক জেতবনে এক মঠ নির্মাণ করে দিলেন।

একদিন কপিলাবস্তু থেকে মহাপ্রজাপতির দূত এল বুদ্ধের কাছে। তাঁরা সংসার জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সঙ্ঘে আশ্রয় নিতে চান। তাঁর সাথে যশোধারা ও আরো অনেকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চায়।

কিন্তু বুদ্ধ নারীদের সন্ন্যাস গ্রহণকে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি মাতা মহাপ্রজাপতির অনুরোধ ফিরিয়ে দিলেন।

আনন্দ ছিলেন বুদ্ধের প্রধান শিষ্য। আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ বললেন, বেশ তাহলে তাদের সঙ্ঘে প্রবেশ করার অনুমতি দিলাম। তবে সঙ্ঘের নিয়ম ছাড়াও আরো আটটি নিয়ম তাঁদের মেনে চলতে হবে।

মাতা মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের সমস্ত নিয়ম মেনে চলার অঙ্গীকার করলেন। বুদ্ধ অনুমতি দিলেও নারীদের এই সংঘে প্রবেশ করার বিষয়টিকে কোন দিনই অন্তর থেকে সমর্থন করতে পারেননি।

বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, যদি নারীরা সঙ্ঘে প্রবেশ না করত তবে বৌদ্ধ ধর্ম হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের বুকে রয়ে যেত। কিন্তু নারীরা প্রবেশ করার জন্য কিছু দিনের মধ্যেই আমার প্রবর্তিত সব নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। বুদ্ধের এই আশঙ্কা সত্য বলেই পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল।

তাঁর এই সমস্ত উপদেশের সাথে সাথে বিভিন্ন গল্প বলতেন বুদ্ধ। এই গল্পগুলোর মধ্যে থাকত নীতিশিক্ষা। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ সহজেই এই শিক্ষা গ্রহণ করত। এই সমস্ত গল্পগুলো পরবর্তীকালে সংকলন করে তৈরি হল জাতক। বৌদ্ধদের বিশ্বাস প্রাচীনকালে ভগবান

বুদ্ধ অসংখ্যবার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কখনো মুনষ, কখনো পশু-পাখি। প্রত্যেক জন্মেই তিনি কিছু পুণ্য কাজ করেছিলেন। এই ধারাবাহিক পুণ্য সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়েই তিনি অবশেষে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন।

বুদ্ধের প্রতিটি উপদেশ ছিল সরল। তাঁর উপদেশের উৎস ছিল তাঁর হৃদয়-তিনি কোন সংস্কারে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর শিক্ষার মূল কথাই ছিল নারী পুরুষ সকলেরই আধ্যাতিক জ্ঞান অর্জনের সমান অধিকার আছে। সে যুগে পুরোহিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মানুষের মধ্যে যে ভেদরেখা সৃষ্টি করেছিল তিনি সকল মানুষের জন্য। শুধু উপদেশ দিয়েই কখনো তিনি নিজেকে নিবৃত্ত রাখতেন না। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন পশুবলি হচ্ছে অন্যতম কুসংস্কার-ব্রাহ্মণদের বাক্য অনুসারে যদি পশুবলি কল্যাণকর হয় তবে তো মানুষ বলি আরো বেশি কল্যাণকর।

বুদ্ধ বলেছেন, আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ অর্থহীন, জগতে একটি মাত্র আদর্শ আছে, অন্তরে সব মোহকে বিসর্জন দাও। তবেই তোমার অন্তরের অজ্ঞানতার মেঘ মুছে গিয়ে সূর্যালোক প্রকাশিক হবে। তুমি নিজেকে নিঃস্বার্থ কর।

বৌদ্ধ ধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে বিপুলভাবে প্রসার লাভ করেছিল। এর পেছনে দুটি কারণ ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের সহজ সরলতা, দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রতি ভালবাসা। বুদ্ধ তাঁর সমস্ত জীবন ধরে মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা দিয়েছেন। এই ভালবাসা শুধু মানুষের জন্য নয়, সমস্ত প্রাণীর জন্য। তিনিই প্রথম সমস্ত পশু-প্রাণী-কীট-পতঙ্গকে অবধি করুণা প্রদর্শন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

এই দয়া ক্ষমা করুণাই বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ দান। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর শিক্ষা ছিল ঈশ্বর বলে কিছু নেই। ঈশ্বর সম্বন্ধে সে যুগে প্রচলিত সব ধারণাকেই তিনি অস্বীকার করেছিলেন। বুদ্ধ এক জায়গায় বেশি দিন থাকতেন না। ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম প্রচার করতেন, নীতিশিক্ষা দিতেন। জীবনের দিন যতই শেষ হয়ে আসছিল ততই মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বিশেষত বর্ষার প্রকোপেই বেশি অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

জীবনের অন্তিম পর্বে (বুদ্ধ তখন আশি বছরে পা দিয়েছেন) বুদ্ধ তাঁর কয়েকজন শিষ্য নিয়ে এলেন হিরণ্যবতী নদীর তীরে কুশীনগরে। ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালেন এক শালবনের নিচে। আনন্দ গাছের নিচে বিছানা পেতে দিলেন। সামান্য কয়েকজন শিষ্য সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারছিলেন ভগবান তথাগত এবার তাঁদের ত্যাগ করে যাবেন।

এবার আনন্দকে কাছে ডাকলেন বুদ্ধ। বললেন, আমি যখন থাকব না, আমার উপদেশ মত চলবে- আমার উপদেশই তোমার পথ নির্দেশ করবে।

বুদ্ধদেব তাঁর কোন উপদেশ লিপিবদ্ধ করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধ স্থবির শ্রমণরা মিলিতভাবে তাঁর সমস্ত উপদেশ সংকলিত করেন। এই সংকলিত উপদেশই ত্রিপিটক নামে পরিচিত। ত্রিপিটক বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

বুদ্ধ শেষ বারের মত শিষ্যদের কাছে ডেকে তাঁদের উপদেশ দিলেন তারপর গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। সে ধ্যান আর ভাঙল না।

বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধ দেহত্যাগ করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৪ সালে। কিন্তু আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের মতে বুদ্ধের মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ বা ৪৮৩।

৬

স্যার আইজাক নিউটন

[১৬৪২—১৭২৭]

১৬৪২ সালের বড়দিনে আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের কয়েক মাস আগেই পিতার মৃত্যু হয়। জন্মের সময়ে আইজাক ছিলেন দুর্বল শীর্ণকায় আর ক্ষুদ্র আকৃতির, ধাই তাঁর জীবনের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিল। হয়ত বিশ্বের প্রয়োজনেই বিশ্ববিধাতা তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

বিধবা মায়ের সাথেই নিউটনের জীবনের প্রথম তিন বছর কেটে যায়। এই সময় তাঁর মা বারনাবাস নামে এক ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ করেন। নব বিবাহিত দম্পতির জীবনে শিশু নেহাতই অবাঞ্ছিত বিবেচনা করে মা শিশু নিউটনকে তাঁর দাদির কাছে রেখে দেন।

১২ বছর বয়েসে নিউটনকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। জন্ম থেকেই রুগ্ন ছিলেন নিউটন। তবু তার দুষ্টুমি কিছু কম ছিল না। কিন্তু শিক্ষকরা তাঁর অসাধারণ মেধার জন্য সকলেই ভালবাসতেন।

কলেজে ছাত্র থাকাকালীন অবস্থাতেই তিনি অঙ্কশাস্ত্রের কিছু জটিল তথ্যের আবিষ্কার করেন— বাইনমিয়াল থিওরেম Binomial theorem, ফ্লাক্সসন (Fluxions) যা বর্তমানে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস (Interegal Calculus) নামে পরিচিত। এ ছাড়া কঠিন পদার্থের ঘনত্ব (The method for Calculating the area of curves or the volume of solids)। ১৬৬৬ সাল—এই সময় নিউটন একটি চিঠিতে লিখেছেন আমি Fluxions পদ্ধতি উদ্ভাবনের সাথে সাথেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছি। ভাবতে অবাক লাগে তখন নিউটনের বয়স মাত্র চব্বিশ। নিউটন চাঁদ ও অন্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বের মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকার জন্য তাঁর প্রচেষ্ট অসম্পূর্ণ ও ভুল থেকে যায়।

এই সব অসাধারণ কাজ ও মৌলিক তত্ত্বের জন্য সেই তরুণ বয়েসেই নিউটনের খ্যাতি পণ্ডিত মহলে ছড়িয়ে পড়ল। ১৬৬৭ সালে তাঁর কৃতিত্বের জন্য ট্রিনিটি কলেজ তাকে ফেলো হিসাবে নির্বাচন করলেন। একজন ২৫ বছরের তরুণের পক্ষে এ এক দুলর্ভ সম্মান।

এইবার তিনি আলোর প্রকৃতি ও তাঁর গতিপথ নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করলেন এবং এই কাজের প্রয়োজনেই তিনি তৈরি করলেন প্রতিফলক টেলিস্কোপ (Reflecting telescope)। পরবর্তীকালে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনে যে উন্নত ধরণের টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হয়, তিনিই তাঁর অগ্রগামী পথিক।

নিউটন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক হিসাবে নির্বাচিত হলেন। সেই সাথে আলোর বর্ণচ্ছটা নিয়ে গবেষণার কাজ আরম্ভ করলেন। ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটিও নিউটনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৯। ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের পাশে তাঁর স্থান হল। সোসাইটির প্রথম সভায় তাঁর আলোকতত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করলেন। তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে একমত হতে না পারলেও সোসাইটির সমস্ত বিজ্ঞানীই উচ্চকণ্ঠে তার বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের প্রশংসা করলেন। তিনি যেন এক আত্মমগ্ন সাধক। নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন। নিজের বেশবাস সাজগোজ কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রায়ই দেখা যেত তিনি কলেজে আসছেন, তাঁর জামার বোতাম খোলা, পায়ের মোজা গুটিয়ে আছে, এলোমেলো চুল। তন্ময় হয়ে চলেছেন কোন নতুন বৈজ্ঞানিক ভাবনায় বিভোর।

কল্পনাপ্রবণ এই মনের জন্যই বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অস্পষ্ট। একদিন একজন লোক তাঁর বাড়িতে এসে একটা প্রিজম (তিনকোণা কাঁচ) দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল এর কত দাম হতে পারে? প্রিজমের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বিবেচনা করে নিউটন বললেন, এর মূল্য নির্ণয় করা আমার সাধ্যের বাইরে। লোকটি নিউটনের কথা শুনে অস্বাভাবিক বেশি দামে প্রিজমটি বিক্রি করতে চাইল। কোন দরদাম না করেই সেই দামে প্রিজমটি কিনে নিলেন নিউটন। নিউটনের বাড়িওলা সব কথা শুনে বললেন, তুমি নেহাতই বোকা। এটা সাধারণ একটা কাচ, এই কাচের যা ওজন হবে সেই দামেই এটা কেনা উচিত ছিল।

নিউটন কোন কথা না বলে শুধু হাসলেন। পরবর্তীকালে এই প্রিজম থেকেই উদ্ভাবন করেন বর্ণতত্ত্ব (theory of colour)। কলেজের ছুটির অবকাশে মায়ের কাছে গিয়েছেন নিউটন। দিনের বেশির ভাগ সময়ই বাগানের মধ্যে বসে থাকেন। প্রাণ ভরে উপভোগ করেন প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ। একদিন হঠাৎ সামনে খসে পড়ল একটা আপেল। মুহূর্তে তার মনের কোণে উঁকি মারে এক জিজ্ঞাসা—কেন আপেলটি আকাশে না উঠে মাটিতে এসে পড়ল? এই জিজ্ঞাসাই মানুষের চিন্তার জগতে এক যুগান্তর নিয়ে এল। জন্ম নিল মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের। যদিও এই চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল বহু পূর্বেই। তার পূর্ণ পরিণতি ঘটল ১৬৮৭ সালে। নিউটন প্রকাশ করলেন তার কাল জয়ী গ্রন্থ (Mathematical Principles of Natural Philosophy)। মানুষ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা সামান্য কিছু জানলেও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে যে তার অস্তিত্ব সে কথা কেউ জানত না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এই আকর্ষণ গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবীকে একসূত্রে বেধে রেখেছেন।

একদিন রাতে এক বন্ধুর বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ হয়েছে। কাজ করতে করতে রাত হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল বন্ধুর বাড়িতে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বার হলেন নিউটন। যখন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে পৌছলেন তখন গভীর রাত। চারদিক অন্ধকার। নিউটন বুঝতে পারলেন নিমন্ত্রণ পর্ব আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বাড়ি ফিরে এসে আবার কাজে বসলেন। রাতে খাওয়ার কথা মনেই হল না তাঁর।

এই নিরলস গবেষণার মধ্যে দিয়েই নিউটন প্রমাণ করলেন, If the force varied as the inverse square, the orbit would be an elipse with the centre of the force in one focus— এই আবিষ্কারের মাধ্যমে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ সহজসাধ্য হল। এতদিন মানুষের জানা ছিল না চন্দ্র-সূর্যের সঠিক আয়তন। নিউটন তা নির্ণয় করলেন।

প্রতিষ্ঠা হল মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব—এই তত্ত্বের যাবতীয় বিবরণ তিনি লিখলেন তাঁর প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থটিতে Principia Mathematica)। যখন এই বই প্রকাশিত হল তখন অধিকাংশ মানুষের কাছেই মনে হল এই বই যেমন জটিল তেমনি দুর্বোধ্য। নিউটনের এক দার্শনিক বন্ধু একদিন নিউটনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে তোমার লেখার অর্থ বোঝা সম্ভব।

নিউটন তাকে একটি বই-এর তালিকা দিয়ে বললেন, আপনি আগে এই বইগুলো পড় ন তাহলে আমার তত্ত্ব-বোঝার কাজ সহজ হবে। ভদ্রলোক তালিকাটি দেখে বললেন, নিউটনের তত্ত্ব বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে। কারণ প্রাথমিক তালিকার এই কটি বই পড়া শেষ করতেই আমার অর্ধেক জীবন কেটে যাবে।

Philosophiac naturalis Principia Mathematica প্রকাশিত হয় ১৬৪৭ সালে। লাটিন ভাষায় লেখা এই বইটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে নিউটন গতিসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনটি গতিসূত্র হল, (১) প্রত্যেকটি বস্তু চিরকাল সরল রেখা অবলম্বন করে সমবেগে চলতে থাকে। (২) বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে, ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে। (৩) প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি গ্যাস, ফ্লুইড বস্তুর গতির কথা আলোচনা করেছেন। গ্যাসকে কতকগুলো স্থিতিস্থাপন অণুর সমষ্টি ধরে নিয়ে তিনি বয়েলের সূত্র প্রমাণ করেন। গ্যাসের উপর চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে শব্দ তরঙ্গের গতিবেগও নির্ধারণ করেন। তাঁর এই তত্ত্বে কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল। উত্তরকালে অন্য বিজ্ঞানীরা এই সব ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেন। তৃতীয় খণ্ডে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবেই সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো ঘুরছে। তেমনি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে চাঁদ। দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষীরা বল তাদের ভরের সমানুপাতিক ও দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৬০ গুণ। এই দূরত্ব থেকে চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। নিউটন লক্ষ্য করেছিলেন সূর্য ও গ্রহগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীর সমুদ্র ও চাঁদ এবং সূর্যের মধ্যে এমনকি জোয়ার-ভাটা ও সাধারণভাবে জগতের যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যে একই মহাকর্ষ তত্ত্ব কার্যকরী। এছাড়াও তিনি আরো একটি সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করলেন একটি সমরূপ গোলাকার বস্তুর ভেতরের প্রতিটি কণা যদি বাইরের একটি কণাকে মাধ্যাকর্ষণ বলের সূত্র অনুসারে আকর্ষণ করে তাহলে বাইরের কণাটির উপর যে বল কাজ করবে সেটি এমন হবে যেন গোলাকার বস্তুটির সমস্ত ভর তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তাঁর প্রতি সমালোচনা করা হল, তিনি তাঁর তত্ত্বে বিশ্বপ্রকৃতিকে যেভাবে বিবেচনা করেছেন তা থেকে মনে হয় এ সমস্তই যেন এক বিশৃঙ্খল মনের প্রাণহীন সৃষ্টির কাহিনী।

নিউটন তাঁর জবাবে বললেন, প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বপ্রকৃতি এমন সুশৃঙ্খল সুসামঞ্জস্যভাবে সৃষ্টি হয়েছে মনে হয় এর পশ্চাতে কোন ঐশ্বরিক স্রষ্টা রয়েছেন।

নিউটনের এই বিচিত্র মানসিকতার জন্য কোন মানুষই তাঁকে সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। হয়ত নিজেই নিজের বিরাটতত্ত্বকে সঠিকভাবে চিনতে পারেননি। অসাধারণ আবিষ্কারের পরও তিনি ছিলেন অসুখী মানুষ।

Principia প্রকাশের পরই নিউটন সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে নামলেন। যখন দ্বিতীয় জেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইলেন, তিনি তার সক্রিয় বিরোধী হয়ে উঠলেন। রাজপরিবারের উৎখাতের পর ১৬৯৪ সালে নতুন সংবিধান তৈরির জন্য যে কনভেনশন গড়ে উঠল, নিউটন তার সদস্য হলেন।

রাজনীতিবিদ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নিউটন। ১৬৯০ সালে কনভেনশনের পরিসমাপ্তি ঘটল, নিউটনের রাজনৈতিক জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটল।

১৭০৩ সালে নিউটনের জীবনের এল এক অভূতপূর্ব সম্মান। তিনি রয়াল সোসাইটির সভাপতি হলেন। আমৃত্যু তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৭০৫ সালে রানী এ্যানি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন। রানীর পক্ষ থেকে নিউটনকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করা হল। এই সময় ডিফারে-ন্সিয়াল ক্যালকুলাস (Differential Calculus)—এর প্রথম আবিষ্কর্তা হিসাবে জার্মান দার্শনিক লিবনিজ (Leibniz/ Leibnitz) সাথে বির্তকে জড়িয়ে পড়লেন। ইংলন্ডের রয়াল অ্যাকাডেমি জানতে পারে লিবনিজ Differential Calculus—এর আবিষ্কর্তা হিসাবে দাবি জানাচ্ছেন। রয়াল একাডেমির সদস্যরা ক্রোধে ফেটে পড়ল। তাদের সভাপতির কৃতিত্বকে এক বিদেশী চুরি করে নিজের নামে প্রচার করতে চাইছে। কারণ তারা বিশ্বাস করতেন নিউটনই প্রথম Calculus—এর সম্ভাবনা, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে লিবনিজের কাছে বলেছিলেন। লিবনিজ একে উন্নত করেছে, সঠিক বিস্তৃতি দিয়েছে কিন্তু আবিষ্কার করেনি।

তবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে নিউটন ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের উদ্ভাবক হলেও লিবনিজের পদ্ধতি ছিল অনেক সহজ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১৭২৭ সাল, নিউটন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসাতে কোন সুফল পাওয়া গেল না। অবশেষে ২০শে মার্চ মহাবিজ্ঞানী নিউটন তার প্রিয় অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির বুকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন। সাত দিন পর তাকে ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবিতে সমাধিস্থ করা হল।

সমস্ত দেশ অবনত মস্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই জ্ঞানতাপসকে। যদিও নিজেকে তিনি কখনো পণ্ডিত বা জ্ঞানী ভাবেননি। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন, "পৃথিবীর মানুষ আমাকে কি ভাবে জানি না কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমি মনে করি আমি একটা ছোট ছেলের মত সাগরের তীরে খেলা করছি আর খুঁজে ফিরেছি সাধারণের চেয়ে সামান্য আলাদা পাথরের নুড়ি বা ঝিনুকের খোলা। সামনে আমার পড়ে রয়েছে অনাবিষ্কৃত বিশাল জ্ঞানের সাগর।"

৭
উইলিয়ম শেকস্‌পীয়র
[১৫৬৪–১৬১৬]

বিশ্বের ইতিহাসে উইলিয়ম শেকস্‌পীয়র এক বিস্ময়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার–যার সৃষ্টি সম্বন্ধে এত বেশি আলোচনা হয়েছে, তাঁর অর্ধেকও অন্যদের নিয়ে হয়েছে কিনা সন্দেহ। অথচ তাঁর জীবনকাহিনী সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না বললেই চলে।

ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত এভন নদীর তীরে স্ট্রাটফোর্ড শহরে এক দরিদ্র পরিবারে শেকস্‌পীয়র জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় চার্চের তথ্য থেকে যা জানা যায় তাতে অনুমান তিনি সম্ভবত ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতা জন শেকস্‌পীয়রের মা ছিলেন আর্ডেন পরিবারের সন্তান। শেকস্‌পীয়র তাঁর As you like it নাটকে মায়ের নামকে অমর করে রেখেছেন।

আঠার বছর বয়সে শেকস্‌পীয়র বিবাহ করলেন তাঁর চেয়ে ৮ বছরের বড় এ্যানি হাতওয়েকে।

বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যে এ্যানি এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। তার নাম রাখা সুসানা। এর দু'বছর পর দুটি যজম সন্তানের জন্ম হয়। ছেলে হ্যামলেট মাত্র ১ বছর বেঁচে ছিল।

শোনা যায় সংসার নির্বাহের জন্য তাঁকে নানান কাজকর্ম করতে হত। একবার ক্ষুধার জ্বালায় স্যার টমাসের একটি হরিণকে হত্যা করেন। গ্রেফতারি পরোয়ানা এড়াতে তিনি পালিয়ে আসেন লন্ডনে। কিন্তু এই কাহিনী কতদূর সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়। তবে যে কারণেই হোক তিনি স্ট্রাটফোর্ড ত্যাগ করে লন্ডন শহরে আসেন।

সম্পূর্ণ অপরিচিত শহরে কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

নাট্যজগতের সাথে এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ই তাঁর অন্তরের সুপ্ত প্রতিভার বীজকে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত করে তোলে।

নাট্য সম্পাদনা কাজ করতে করতেই শেকস্‌পীয়র অনুভব করলেন দর্শকের মনোরঞ্জনের উপযোগী ভাল নাটকের একান্তই অভাব। সম্ভবত মঞ্চের প্রয়োজনেই শেকস্‌পীয়রের নাটক লেখার সূত্রপাত। ঠিক কখন, তা অনুমান করা কঠিন। তবে সুদীর্ঘ গবেষণার পর প্রাথমিকভাবে একটি তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে অনুমান করা হয় যে তাঁর নাটক রচনার

সূত্রপাত ১৫৯১ থেকে ১৫৯২ সাল। এই সময় তিনি রচনা করেন তাঁর ঐতিহাসিক নাটক হেনরি VI-এর তিন খণ্ড। নাটক রচনার ক্ষেত্রে এগুলি যে তার হাতেখড়ি তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ এতে শেকস্‌পীয়রের প্রতিভার সামান্যতম পরিচয় নেই। এর পরের বছর লেখা নাটক রিচার্ড থ্রি (Richard III) অনেকাংশে উন্নত।

১৫৯২ সালে ইংল্যান্ডে ভয়াবহ প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল। তখন প্লেগের অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। দলে দলে মানুষ শহর ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল। অনিবার্যভাবে রঙ্গশালাও বন্ধ হয়ে গেল। নাটক লিখবার তাগিদ নেই; শেকস্‌পীয়র রচনা করলেন তাঁর দুটি কাব্য, ভেনাস ও অ্যাডোনিস এবং দি রেপ অফ্ লুক্রি। এই দুটি দীর্ঘ কবিতাই তিনি সাদমটনের আর্লকে উৎসর্গ করেন।

কবি নাট্যকার হিসাবে শেক্সপীয়রের খ্যাতি ক্রমশই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাদের দলভুক্ত হবার জন্য তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসছিল। তিনি লর্ড চেম্বারলিনের নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দিলেন (১৫৯৪)। এই সময় থেকে শেক্সপীয়রের হাত থেকে বার হতে থাকে এক একটি অবিস্মরণীয় নাটক–টেমিং অব দি সু,রোমিও জুলিয়েট, মার্চেন্টঅাব ভেনিস, হেনরি ফোর, জুলিয়াস সিজার, ওথেলো, হ্যামলেট। তাঁর শেষ নাটক রচনা করেন ১৬১৩ সালে–হেনরি এইট।

একদিন যিনি তস্করের মত স্ট্রাটফোর্ড ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন, সেখানেই বিরাট এক সম্পত্তি কিনলেন। ইতিপূর্বে লন্ডন শহরেও একটি বাড়ি কিনেছিলেন। সম্ভবত ১৬১০ সাল পর্যন্ত এই বাড়িতেই বাস করেছিলেন শেক্সপীয়র। এরপর তিনি অবসর জীবন যাপন করবার জন্য চিরদিনের জন্য লন্ডন শহরের কলকোলাহল, প্রিয় রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে চলে যান স্ট্রাটফোর্ড। একটি মাত্র নাটক ছাড়া এই পর্বে আর কিছুই লেখেননি। ছয় বছর পর ১৬১৬ সালের ২৩ শে এপ্রিল (দিনটি ছিল তার বাহান্নতম জন্মদিন) তাঁর মৃত্যু হল। আগের দিন একটি নিমন্ত্রিত বাড়িতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করেন। শীতের রাতে পথেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর সুস্থ হয়ে ওঠেনি শেক্সপীয়র। জন্মদিনেই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন।

অথচ সবচেয়ে বিস্ময়ের, শেক্সপীয়র তার নাটকের প্রায় প্রতিটি কাহিনী ধার করেছেন তিনি উত্তোরণ ঘটিয়েছেন এক অসাধারণত্বে। ক্ষুদ্র দীঘির মধ্যে এনেছেন সমুদ্রের বিশালতা।

শুধু নাটক নয়, কবি হিসাবেও তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদরে অন্যতম। তাঁর প্রতিটি কবিতাই এক অপূর্ব কাব্যদ্যুতিতে উজ্জ্বল। দুটি কাব্য এবং ১৫৪টি সনেট তিনি রচনা করেছেন। শেক্সপীয়রের প্রথম কাব্য ভেনাস এবং অ্যাডোনিস। মানুষের অন্তরে দেহগত যে কামনার জন্ম, সাহিত্য তার প্রকাশ ঘটেছে রেনেসাঁ উত্তর পূর্বে। একদিকে দেহগত কামনা অন্য দিকে সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে ভেনাস এবং অ্যাডোনিসে। কিশোর অ্যাডোনিসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ভেনাস। তার যৌবনে রক্তের স্পন্দন। সে সমস্ত মন প্রাণ সত্ত্বা দিয়ে পেতে চায় অ্যাডোনিসকে। পূর্ণ করতে চায় তার দেহমনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পুরুষ কি শুধুই নারীর দেহের মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেতে পারে? সে যেতে চায় বন্য বরাহ শিকার করতে। চমকে ওঠে ভেনাস। মনের মধ্যে জেগে ওঠে জেগে শঙ্কা যদি কোন বিপদ হয় তার প্রিয়তমের, বলে ওঠে–

বরাহ...সে যখন ক্রুদ্ধ হয়
তার দুই চোখ জ্বলে ওঠে জোনাকির মত
যেখানেই সে যাক তার দীর্ঘ নাসিকায়
সৃষ্টি করে কবর।....
যদি সে তোমাকে কাছে পায়...
উৎপাদিত তৃণের মতই
উপড়ে আনবে তোমার সৌন্দর্য।

তবুও শিারে যায় অ্যাডোনিস। দুর্ভাগ্য তার, বন্য বরাহের হিংস্র আক্রমণে ছিন্ন হয়ে তার দেহ। হাহাকার করে ওঠে ভেনাস। প্রিয়তমের মৃত্যুর বেদনায় সমস্ত অন্তর রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।

রচনার কাল অনুসারে শেক্সপীয়রের নাটকগুলিকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের বিস্তার ১৫৮৮ থেকে ১৫৯৫ সাল পর্যন্ত। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নাটক রিচার্ড থ্রি, কমেডি অব এররস, টেমিং অফ দি শ্রু রোমিও জুলিয়েট।

১৫৯৬ থেকে ১৬০৮। এই সময়ে রচিত হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ চারখানি ট্রাজেডি–হ্যামলেট,

ওথেলো, কিং লিয়ার, ম্যাকবেথ। শেষ পর্বে যে পাঁচখানি নাটক রচনা করেন তার মধ্যে দুটি অসমাপ্ত, তিনখানি সমাপ্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দি টেম্পেস্ট।

শেক্সপীয়রের এই নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে কমেডি, ঐতিহাসিক নাটক, ট্রাজেডি, রোমাঞ্চ।

কমেডি–শেক্সপীয়রের উল্লেখযোগ্য কমেডি হল লাভস লেবার লস্ট, দি টু জেন্টলম্যান অফ ভেরোনা, দি টেমিং অফ দি শ্রু, কমেডি অফ এররস, এ মিড সামার নাইটস ড্রিম, মার্চেন্ট অফ ভেনিস, ম্যাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং টুয়েলফথ নাইট, অ্যাজ ইউ লাইক ইট।

এর মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে বাদ দিলে সমস্ত নাটকগুলিই এক অসাধারণ সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত প্রাণবন্ত সজীবতায় ভরপুর।

শেক্সপীয়রের বিখ্যাত কমেডিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কমেডি হল, দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস (The Merchant of Venice)।

শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ তিনটি কমেডি হল অ্যাড ইউলাইক ইট, টুয়েলফথ নাইট মাচ এ্যাডো এবাউট নাথিং। এই কমেডিগুলির মধ্যে মানব জীবন এক অসামান্য সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। হাসি কান্না আনন্দ সুখ দুঃখ মজার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে এই নাটকগুলির মধ্যে। নাটকের সেই সমস্ত পাত্র-পাত্রী যারা সকল অবস্থার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে, অন্যকে ভালবেসেছে, তারাই একমাত্র জীবনে সুখী হতে পেরেছে। এই কমেডির নায়িকারা সকলেই আদর্শ চরিত্রের। অন্যের প্রতি তারা সহৃদয়। পরের জন্য তারা দ্বিধাহীন চিত্তে নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দেয়। একদিকে তারা করুণাময়ী অন্যদিকে তারা বুদ্ধিমতী, শেক্সপীয়রের কমেডিতে নারী চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে পুরুষের ম্লান হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক নাটক–ইতিহাসের প্রতি শেক্সপীয়রের ছিল গভীর আগ্রহ। একদিকে ইংল্যান্ডের ইতিহাস অন্যদিকে গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের ঘটনা থেকেই তিনি তার ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রিচার্ড থ্রি, হেনরি ফোর, জুলিয়াস সীজার, এ্যান্টোনি ও ক্লিওপেট্রা। হেনরি ফোর নাটকের এক আশ্চর্য চরিত্র ফলস্টাফ, রাজবিদূষক, সে অফুরন্ত প্রাণরসের উৎস। তার চরিত্রের নানান দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মনকে কেড়ে নেয়। এমন আশ্চর্য চরিত্র বিশ্বসাহিত্য বিরল।

জুলিয়াস সীজার শেক্সপীয়রের আরেকটি বিখ্যাত নাটক। এই নাটকের মুখ্য চরিত্র সীজারম, ব্রুটাস এবং অ্যান্টোনি। রোমের নেতা জুলিয়াস সীজার যুদ্ধ জয় করে দেশে ফিরেছেন। চারদিকে উৎসব। সীজারও উৎসবে যোগ দিতে চলেছেন। সাথে বন্ধু অ্যান্টোনি। হঠাৎ পথের মাঝে এক দৈবজ্ঞ এগিয়ে এসে সীজারকে বলে, আগামী ১৫ই মার্চ আপনার সতর্ক থাকবার দিন।

সীজার দৈবজ্ঞের কথায় গুরুত্ব দেন না। কিন্তু দেশের একদল অভিজাত মানুষ তাঁর এই খ্যাতি ও গৌরবে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তারা সীজারের প্রিয় বন্ধু ব্রুটাসকে উত্তেজিত করতে থাকে। সীজারের এই অপ্রতিহত ক্ষমতা যেমন করেই হোক খুব করতেই হবে। না হলে একদিন সীজার সকলকে ক্রীতদাসে পরিণত করবে।

কিন্তু ব্রুটাস কোন ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে চাইছিলেন না। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীর দল নানাভাবে ব্রুটাসকে প্ররোচিত করতে থাকে। মানসিক দিক থেকে দুর্বল ব্রুটাস শেষ পর্যন্ত অসহায়ের মত ষড়যন্ত্রকারীদের ইচ্ছার কাছেই আত্মসমর্পণ করেন।

১৫ই মার্চ সেনেটের অধিবেশনের দিন। সকল সদস্যরা সেই দিন সেনেটে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু আগের রাতে বারংবার দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকেন সীজারের স্ত্রী ক্যালপুর্নিয়া। তার নিষেধ সত্ত্বেও বীর সীজার সেনেটে গেলে সুযোগ বুঝে বিদ্রোহীর দল একের পর এক ছোরা সীজারের দেহে বিদ্ধ করে। শেষ আঘাত করে ব্রুটাস। প্রিয়তম বন্ধুকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে সীজার, ব্রুটাস তুমিও!

সীজারের মৃত্যুতে উল্লাসে ফেটে পড়ে ষড়যন্ত্রকারীর দল। শুধু একজন প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে, সে অ্যান্টোনি। প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের কাছে সীজারকে হত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে ব্রুটাস। তার বক্তৃতায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে জনগণ। তারা ব্রুটাসের জয়ধ্বনি করে ভুলে যায় সীজারের কথা। ব্রুটাস চলে যেতেই বক্তৃতা শুরু করে অ্যান্টোনি। সে সুকৌশলে সীজারের প্রতি জনগণের ভালবাসা জাগিয়ে তোলে। তাদের কাছে প্রমাণ করে সীজার একজন মহান মানুষ, তাকে অন্যায়ভাবে ব্রুটাস ও অন্যরা হত্যা করেছে।

এমন সময় তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ওথেলোকে পাঠনো হল সাইপ্রাসে। তাঁর অনুগামী হল ডেসডিমোনা, বেসিও, ইয়াগো ও তার বৌ এমিলিয়া।

যুদ্ধে জয়ী হয় ওথেলো। তাঁর সম্মানে আনন্দ উৎসব হয়। রাত গভীর হতেই নগর রক্ষার ভার বেসিওর ওপর দিয়ে ডেসডিমোনার শয়নকক্ষে যায় ওথেলো। ইয়াগো এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বেসিওকে মদ খাইয়ে মিথ্যা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। তারই জন্যে তাকে কর্মচ্যুত করে ওথেলো। দুঃখে অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে বেসিও। ইয়াগো তাকে বলে ডেসডিমোনার কাছে গিয়ে অনুরোধ করতে। স্ত্রীর কথা ওথলো কখনোই ফেলতে পারবে না।

বেসিও যায় ডেসডিমোনার কাছে। গোপনে ওথেলো ইয়াগোকে ডেকে বলে দুজনের মধ্যে গোপন প্রণয় আছে। ওথেলোর মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ জেগে ওঠে। ওথেলো ডেসডিমোনাকে একটি মন্ত্রপূত রুমাল দিয়েছিল। ডেসডিমোনা কখনো সেই রুমালটি নিজের হাতছাড়া করত না একদিন ডেসডিমোনার কাছ থেকে রুমালটি হারিয়ে গিয়েছিল। তা কুড়িয়ে নিয়ে এমিলিয়াকে দিল। ইয়াগো দিল বেসিওকে। ডেসডিমোনার কাছে রুমাল না দেখে ওথেলোর সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। তারই সাথে ওথেলোর মনকে আরো বিষাক্ত করে তোলে ইয়াগো। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ওথেলো ঘুমন্ত ডেসডিমোনাকে গলা টিপে হত্যা করে। তারপরই আসল সত্য প্রকাশ পায়। ইয়াগোকে বন্দী করা হয় আর ওথেলো নিজেকে বুকে ছুরিবিদ্ধ করে আত্মহত্যা করে। বীর ওথেলোর এই মৃত্যু আমাদের সমস্ত অন্তরকে ব্যথিত করে তোলে।

শেক্সপীয়রের আর একখানি বিখ্যাত নাটক ম্যাকবেথ। শেক্সপীয়রের ট্রাজিডির সব নায়িকার মধ্যেই যে মহিয়সী রূপের প্রকাশ দেখতে পাই, লেডি ম্যাকবেথের মধ্যে তা পাই না। ম্যাকবেথ সাহসী বীর কিন্তু মানসিক দিক থেকে কিছুটা দুর্বল, তাই স্ত্রীর কথায় সে চালিত হয়। লেডি ম্যাকবেথের প্ররোচনায় সে খুন করে তার রাজাকে। তারপর সিংহাসন অধিকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রের মধ্যে পাপের পূর্ণ প্রকাশ ঘটলেও তার চরিত্রের অসাধারণ দৃঢ়তা, অদম্য তেজ, দৃপ্ত ভঙ্গি, অরাজের মনোবল আমাদের মুগ্ধ করে। তার প্রতিটি কাজের পেছনে ছিল এক উচ্চাশা। কোন নীচতার স্পর্শ নেই সেখানে। শেক্সপীয়রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে তাঁর হ্যামলেট নাটকে। এক আশ্চর্য চরিত্র এই হ্যামলেট। সে মানুষের চির রহস্যের, কখনো তার উন্মাদের ভাব, কখনো উচ্ছ্বাস, কখনো আবেগ, এরই সাথে ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা। তার চরিত্রেরর অন্তর্দ্বন্দ্ব যুগ যুগ ধরে পাঠককে বিভ্রান্ত করে তোলে। তাই বোধহয় নাট্যকার বান্যাডশ কৌতুক করে বলেছিলেন ডেনমার্কের ঐ পাগল ছেলেটা কি করে তাঁর ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে পৃথিবীটাকে জয় করে ফেলল, ভাবতে ভাবতে আমার দাড়ি পেকে গেল।

ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট। সবেমাত্র পিতার মৃত্যু হয়েছে। মা তারই কাকাকে বিবাহ করেছে। পিতার মৃত্যুতে শোকাহত হ্যালেট একদিন রাতে তার কয়েকজন অনুচর দুর্গপ্রকার পাহারা দিতে দিতে দেখতে পায় হ্যামলেটের পিতার প্রেতমূর্তি। হ্যামলেট পিতার সেই প্রেতমূর্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। সেই প্রেমমূর্তি তাকে বলে তার বাগানে ঘুমাবার সময় তারই ভাই (হ্যামলেটের কাকা) কানের মধ্যে বিষ ঢেলে দেয় আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। হ্যামলেট যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। হ্যামলেট বুঝতে পারে তার পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। সে উন্মাদের মত হয়ে ওঠে। তার প্রিয়তমার ওথেলিয়ার সাথে অবধি এমন আচরণ করে যা তার স্বভাববিরুদ্ধ। নিজের অসান্তে ওফেলিয়াল সাথে অবধি এমন আচরণ করে যা তার স্বভাববিরুদ্ধ। নিজের অজান্তে ওফেলিয়ার পিতা পলোনিয়াসকে হত্যা করে। মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত ওফেলিয়া আত্মহত্যা করে। আর হ্যামলেট আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। সে শুধু তার পিতার হত্যাকারীকেই হত্যা করতে চায় না, সে চায় রাজপ্রসাদের সব পাপ কলুষতা দূর করতে। ষড়যন্ত্রের জাল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হ্যামলেটের কাকা তাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করতে চায় কিন্তু সেই বিষ পান করে মারা যান হ্যামলেটের মা। ক্রুদ্ধ হ্যামলেট তরবারির আঘাতে হত্যা করে কাকাকে। কিন্তু নিজেও বিষাক্ত ছুরির ক্ষতে নিহত হয়।

হ্যামলেটের এই মৃত্যু এক বেদনাময় গভীর অনুভূতির স্তরে নিয়ে যায়।

শেষ লেখা–শেক্সপীয়রের শেষ পর্যায়ের লেখাগুলি ট্রাজেডি বা কমেডি থেকে ভিন্নধর্মী। রোমাঞ্চ, মেলোড্রামা, বিচিত্র কল্পনার এক সংমিশ্রণ ঘটেছে এই সব নাটকে। সিমবেলিন, উইন্টার্সটেল, টেমপেস্ট উল্লেখযোগ্য।

৮

হযরত মুসা

[খ্রীষ্ট পূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী]

প্রাচীন মিশরের রাজধানী ছিল পেন্টাটিউক। নীল নদের তীরে এই নগরে বাস করতেন মিশরের "ফেরাউন" রামেসিস। নগরের শেষ প্রান্তে ইহুদিদের বসতি।

মিশরের "ফেরাউন" ছিলেন ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। একবার কয়েকজন জ্যোতিষী গণনা করে তাকে বলেছিলেন, ইহুদি পরিবারের মধ্যে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে ভবিষ্যতে মিশরের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। জ্যোতিষীদের কথা শুনে ভীত হয়ে পড়লেন ফ্যারাও। তাই "ফেরাউন" আদেশ দিলেন কোন ইহুদি পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই যেন হত্যা করা হয়।

"ফেরাউন" এর গুপ্তচররা চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াত। যখনই কোন পরিবারে সন্তান জন্মবার সংবাদ পেত তখনই গিয়ে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করত।

ইহুদি মহল্লায় বাস করতেন আসরাম আর জোশিবেদ নামে এক সদ্যবিবাহিত দম্পতি। যথাসময়ে জোশিবেদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। সন্তান জন্মাবার পরই স্বামী-স্ত্রীর মনে হল যেমন করেই হোক এই সন্তানকে রক্ষা করতেই হবে। কে বলতে পারে এই সন্তানই হয়ত ইহুদি জাতিকে সমস্ত নির্যাতন থেকে রক্ষা করবে একদিন।

সকলের চোখের আড়ালে সম্পূর্ণ গোপনে শিশুসন্তানকে বড় করে তুলতে লাগলেন আসরাম আর জোশিবেদ। কিন্তু বেশিদিন এই সংবাদ গোপন রাখা গেল না। স্বামী-স্ত্রী বুঝতে পারলেন যে কোন মুহূর্তে "ফেরাউন"-এর সৈনিকরা এসে তাদের সন্তানকে তুলে নিয়ে যাবে। ঈশ্বর আর ভাগ্যের হাতে শিশুকে সঁপে দিয়ে দুজন বেরিয়ে পড়লেন। নীল নদের তীরে এক নির্জন ঘাটে এসে শিশুকে শুইয়ে দিয়ে তারা বাড়ি ফিরে গেলেন।

সেই নদীর ঘাটে প্রতিদিন গোসল করতে আসত "ফেরাউনের" কন্যা। ফুটফুটে সুন্দর একটা বাচ্চাকে একা পড়ে থাকতে দেখে তার মায়া হল। তাকে তুলে নিয়ে এল রাজপ্রাসাদে। তারপর সেই শিশু সন্তানকে নিজের সন্তানের মত স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে মানুষ করে তুলতে লাগল। রাজকন্যা শিশুর নাম রাখল মুসা।

এ বিষয়ে আরেকটি কাহিনী প্রচলিত। মুসার মা জোশিবেদ জানতেন প্রতিদিন "ফেরাউন"-এর কন্যা সখীদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে আসেন। একদিন ঘাটের কাছে পথের ধারে শিশু মুসাকে একটা ঝুড়িতে করে শুইয়ে রেখে দিলেন। নিজের গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর রাজকুমারী সেই পথ দিয়ে স্নান করতে যাবার সময় দেখতে পেল মুসাকে। পথের পাশে ফুটফুটে একটা শিশুকে পড়ে থাকতে দেখে তার মায়া হল। তাড়াতাড়ি মুসাকে কোলে তুলে নিল। জোশিবেদকেই মুসাকে ধাত্রী হিসাবে নিয়োগ করে রাজকুমারী। নিজের পরিচয় গোপন করে রাজপ্রাসাদে মুসাকে দেখাশুনা করতে থাকে জোশিবেদ। মা ছাড়া মুসা কোন নারীর স্তন্যপান করেনি।

ধীরে ধীরে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিলেন মুসা। ফ্যারাওয়ের অত্যাচার বেড়েই চলছিল। ইহুদির উপর এই অত্যাচার ভাল লাগত না মুসার। পুত্রের মনোভাব জানতে পেরে একদিন জোশিবেদ তার কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। তারপর থেকে মুসার অন্তরে শুরু হল নিদারুণ যন্ত্রণা।

একদিন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন মুসা। এমন সময় তার চোখে পড়ল এক হতভাগ্য ইহুদিকে নির্মমভাবে প্রহার করছে তার মিশরীয় মনিব। এই দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না মুসা। তিনি সেই ইহুদিকে উদ্ধার করবার জন্য নিজের হাতে তরবারী দিয়ে আঘাত করলেন মিশরীর মনিবকে। সেই আঘাতে মারা গেল মিশরীয় লোকটি। ইহুদি লোকটি চারদিকে এ কথা প্রকাশ করে দিল। গুপ্তচররা "ফেরাউনকে" গিয়ে সংবাদ দিতেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন "ফেরাউন"। তিনি বুঝতে পারলেন রাজকন্যা মুসাকে মানুষ করলেও তার শরীরে বইছে ইহুদি রক্ত, তাই নিজের ধর্মের মানুষের উপর অত্যাচার হতে দেখে মিশরীয়কে হত্যা করেছে। একে যদি মুক্ত রাখা যায় তবে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তখনই সৈনিকদের ডেকে হুকুম দিলেন, যেখানে থেকে পার মুসাকে বন্দী করে নিয়ে এস।

"ফেরাউন"-এর আদেশে কথা শুনে আর বিলম্ব করলেন না মুসা। তৎক্ষণাৎ নগর ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন।

দীর্ঘ পথশ্রমে মুসা ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চোখে পড়ল দূরে একটি কুয়ো। কুয়োর সামনে সাতটি মেয়ে তাদের ভেড়াকে পানি খাওয়াচ্ছিল। হঠাৎ একদল মেষপালক সেখানে এসে মেয়েদের কাছে থেকে জোর করে ভেড়াগুলিকে কেড়ে নিল। সাথে সাথে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল সাত বোন। তাদের চিৎকার শুনে ছুটে এলেন মুসা। তারপর মেষপালকদের কাছ থেকে সবকটা ভেড়া উদ্ধার করে মেয়েদের ফিরিয়ে দিলেন। মেয়েরা তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

সাত বোনের বাবার নাম ছিল রুয়েন। সাত বোন এসে মুসাকে ডেকে নিয়ে গেল। তাদের বাড়িতে। তাঁর পরনের মূল্যবান পোশাক, সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল। রুয়েন তার পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই কোন কথা গোপন করলেন না মুসা। অকপটে নিজের পরিচয় দিলেন। রুয়েন মুসার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিল। অল্প কিছুদিন পর এক মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দিলে রুয়েন।

সেই যাযাবর গোষ্ঠীর সাথে থাকতে থাকতে অল্প দিনেই মেষ চরানোর কাজ শিখে নিলে মুসা। এক নতুন পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মানিয়ে নিলেন। দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ওদিকে মিশরে ইহুদিদের অবস্থা ক্রমশই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। মিডিয়াতে পশুপালকের জীবন যাপন করলেও স্বজাতির কথা ভুলতে পারেননি মুসা। মাঝে মাঝেই তার সমস্ত অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠত।

একদিন মেষের পাল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নির্জন পাহাড়ের প্রান্তে এসে পৌঁছলেন মুসা। সামনেই বেশ কিছু গাছপালা। হঠাৎ মুসা দেখলেন সেই গাছপালা পাহাড়ের মধ্যে থেকে এক আলোকছটা বেরিয়ে এল। এত তীব্র সেই আলো, মনে হল দু চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। তবুও স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেই আলোর দিকে। তার মনে হল ঐ আলো যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এক সময় শুনতে পেলেন সেই আলোর মধ্যে থেকে এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল: মুসা মুসা।

চমকে উঠলেন মুসা। কেউ তাঁরই নাম ধরে ডাকছে। তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন, কে আপনি আমায় ডাকছেন? সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর বলে উঠল, আমি তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের একমাত্র ঈশ্বর।

ঈশ্বর তাঁর সাথে কথা বলছেন, এ যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মুসা। ভীত হয়ে মাটিতে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন প্রভু?

দৈবকণ্ঠস্বর বলল, তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে মিশরে যাও। সেখানে ইহুদিরা অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করছে। তুমি ইহুদিদের মুক্ত করে নতুন দেশে নিয়ে যাবে।

মুসা বললেন, আমি কেমন করে তাদের মুক্তি দেব?

দৈববাণী বলল, আমি অদৃশ্যভাবে তোমাকে সাহায্য করব। তুমি ফ্যারাও-এর কাছে গিয়ে বলবে, আমিই তোমাকে প্রেরণ করেছি। সকলেই যেন তোমার আদেশ মেনে চলে।

মুসা বললেন, কিন্তু যখন তারা জিজ্ঞেস করবে ঈশ্বরের নাম, তখন কি জবাব দেব?

প্রথমে ঈশ্বর তাঁর নাম প্রকাশ না করলেও পরে বললেন তিনিই এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ।

মুসা অনুভব করলেন তাঁর নিজের শক্তিতে নয়, ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিতেই তাঁকে সমস্ত কাজ সমাধান করতে হবে। এতদিন ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রথম অনুভব করলেন ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কাজের জন্যই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। আর আল্লাহ তাঁর একমাত্র ঈশ্বর।

এর কয়েক দিন পর দ্বিতীয়বার ঈশ্বরের আদেশ পেলেন মুসা। তিনি পুনরায় আবির্ভূত হলেন মুসার সামনে। তারপর বললেন, তোমার উপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। একমাত্র তুমিই পারবে ইহুদি জাতিকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করতে। আর বিলম্ব করো না, যত শীঘ্র সম্ভব রওনা হও মিশরে। অল্প কয়েক দিন পর স্ত্রী-সন্তানদের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে মিশরের পথে যাত্রা করলেন যাত্রা করলেন মুসা।

যথাসময়ে মিশরে গিয়ে পৌছলেন মুসা। গিয়ে দেখলেন সত্যি সত্যিই ইহুদিরা অবর্ণনীয় দুরবস্থায় মধ্যে বাস করছে।

মুসা প্রথমেই সাক্ষাৎ করলেন ইহুদিদের প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে। তাদের সকলকে

বললেন ঈশ্বরের আদেশের কথা। মুসার আচার-আচরণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, আন্তরিক ব্যবহার, গভীর আত্মপ্রত্যয় দেখে সকলেই তাঁকে বিশ্বাস করল।

মুসা বললেন, আমরা "ফেরাউন"-এর কাছে গিয়ে দেশত্যাগ করবার অনুমতি প্রার্থনা করব। মুসা তার ভাই এ্যাবন ও কয়েকজন ইহুদি নেতাকে সাথে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন "ফেরাউন"-এর দরবারে। মুসা জানতেন সরাসরি দেশত্যাগের অনুমতি চাইলে কখনোই ফ্যারাও সেই অনুমতি দেবেন না। তাই তিনি বললেন, সম্রাট, আমাদের স্রষ্টা আদেশ দিয়েছেন সমস্ত ইহুদিকে মিডিয়ার মরুপ্রান্তরে এক পাহাড়ে গিয়ে প্রার্থনা করতে। আপনি যদি কয়েক দিনের জন্য সেখানে যাবার অনুমতি দেন।

"ফেরাউন" মুসার অনুরোধে সাড়া দিলেন। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন, তোমাদের আল্লাহ্‌র আদেশ আমি মানি না। তোমরা মিশর ত্যাগ করে কোথাও যেতে পারবে না।

মুসা বললেন, আমরা যদি মরুভূমিতে গিয়ে প্রার্থনা না করি তবে তিনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন। হয়ত আমাদের সকলকেই ধ্বংস করে ফেলবেন।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন মুসা। কি করবেন কিছুই ভাবতে পারছিলেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করলেন। তার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন আল্লাহ। তিনি মুসাকে বললেন, তোমার ভাই এ্যারনকে বল, সে যেন নদী, জলাশয়, পুকুর ঝর্ণায় গিয়ে তার জাদুদণ্ড স্পর্শ করে, তাহলেই দেখবে সমস্ত পানি রক্ত হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ নির্দেশের এ্যারন মিশরের সমস্ত পানীয় জলকে রক্তে রূপান্তরিত করে ফেলল। ফ্যারাও আদেশ দিলেন মাটি খুড়ে পানি বার কর।

সৈনিকরা অসংখ্যা কূপ খুঁড়ে ফেলল। সকলে সেই জল পান করতে আরম্ভ করল। এ্যারনের জাদু বিফল হতেই মুসা পুনরায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন।

এইবার মিশর জুড়ে ব্যাঙের মহামারী দেখা গেল। তার পচা গন্ধে লোকের প্রাণান্তরক অবস্থা কেউ আর ঘরে থাকতে পারে না। সকলে গিয়ে "ফেরাউনের" কাছে নালিশ জানাল। নিরুপায় হয়ে "ফেরাউন" ডেকে পাঠালেন মুসাকে। বললেন, তুমি ব্যাঙের মড়ক বন্ধ কর। আমি তোমাদের মরুভূমিতে গিয়ে প্রার্থনা করবার অনুমতি দেব।

মুসার ইচ্ছায় ব্যাঙের মড়ক বন্ধ হলেও ফ্যারাও নানান অজুহাতে ইহুদিদের যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। নিরুপায় হয়ে মুসা আবার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। ফ্যারাওয়ের আচরণে এই বার ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন আল্লাহ। সমস্ত মিশর জুড়ে শুরু হল ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টি মহামারী। তবুও "ফেরাউন" অনুমতি দিতে চানা ন।

এই বার আল্লাহ নির্মম অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। হঠাৎ সমস্ত মিশরীয়দের প্রথম পুত্র সন্তান মারা পড়ল। দেশজুড়ে শুরু হল হাহাকার। সমস্ত মিশরীয়রা দলবদ্ধভাবে গিয়ে "ফেরাউন"-এর কাছে দাবি জানাল, ইহুদিদের দেশ ছাড়ার অনুমতি দিন, না হলে আরো কি গুরুতর সর্বনাশ হবে কে জানে। ভয় পেয়ে গেলেন ফ্যারাও। "ফেরাউন" মুসাকে ডেকে বললেন, প্রার্থনা করবার জন্য তোমাদের মরুভূমিতে যাবার অনুমতি দিচ্ছি। যদি মনে কর, তোমাদের যা কিছু আছে, গৃহপালিত গবাদি পশু, জীবজন্তু, জিনিসপত্র, সব সাথে নিয়ে যেতে পার।

দেশত্যাগের অনুমতি পেয়ে ইহুদিরা সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল। তারা সকলেই মুসাকে তাদের নেতা বলে স্বীকার করে নিল। মিশর ছাড়াও মাকুম নগরেও বহু ইহুদি বাস করত। সকলে দলবদ্ধভাবে মুসাকে অনুসরণ করল।

মুসা জানতেন আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ফ্যারাও দেশত্যাগের অনুমতি দিলেও তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করবেন যাতে তাদের যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যায়। তাই যথাসম্ভব সতর্ক ভাবে পথ চলতে লাগলেন। কয়েকদিন চলবার পর তারা সকলে এসে পড়ল লোহিত সাগরের তীরে।

এদিকে ইহুদিরা মিশর ত্যাগ করতেই "ফেরাউন"-এর মনের পরিবর্তন ঘটল। যেমন করেই হোক তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসে আবার ক্রীসদাসে পরিণত করতে হবে। তৎক্ষণাৎ ইহুদিদের বন্দী করবার জন্য বিশাল এক সৈন্যবাহিনীকে পাঠালেন "ফেরাউন"।

এদিকে দূর থেকে মিশরীয় সৈন্যদের দেখতে পেয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল সমস্ত ইহুদীরা। সামান্যতম বিচলিত হলেন না মুসা।

প্রার্থনায় বসলেন মুসা। প্রার্থনা শেষ হতেই দৈববাণী হল, মুসা, তোমার হাতের দণ্ড তুলে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে যাবে। সমুদ্রের পানি তোমাদের স্পর্শ করবে না।

মুসা তাঁর হাতের দণ্ড তুলে সমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়াতেই সমুদ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। তার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয়েছে প্রশান্ত পথ। সকলের আগে মুসা. তার পেছনে সমস্ত ইহুদি-নারী-পুরুষের দল সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল। তারা কিছুদূর যেতেই মিশরীয় সৈন্যরা এসে পড়ল সমুদ্রের তীরে। ইহুদিদের সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে যেতে দেখে তারাও তাদের অনুসরণ করে সেই পথে ধরে এগিয়ে চলল। সমস্ত মিশরীয় বাহিনী সমুদ্রের মধ্যে নেমে আসতেই আল্লাহর নির্দেশ শুনতে পেলেন মুসা, তোমার হাতের দণ্ড পেছন ফিরে নামিয়ে দাও।

মুসা তাঁর হাতে দণ্ড নিচু করতেই সমুদ্রের জলরাশি এসে আছড়ে পড়ল মিশরীয় সৈন্যদের উপর। মুহূর্তে বিশাল সৈন্যবাহিনী সমুদ্রের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেল। ইহুদিরা নিরাপদে তীরে গিয়ে উঠল। মুসা সকলকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। সামনে বিশাল মরুভূমি। সামান্য পথ অতিক্রম করতেই তাদের সঞ্চিত পানি, খাবার ফুরিয়ে গেল। মরুভূমির বুকে কোথাও পানির চিহ্নমাত্র নেই। ক্রমশই সকলে তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ছিল। অনেকে আর অগ্রসর হতে চাইছিল না।

মুসা বিচলিত হয়ে পড়লেন, এতগুলো মানুষকে কোথা থেকে তৃষ্ণার পানি দেবেন। কিছুদূর যেতেই এক জায়গায় পানি পাওয়া গেল। এত দুর্গন্ধ সেই পানি, কার সাধ্য তা মুখে দেয়। প্রার্থনায় বসলেন মুসা। প্রার্থনা শেষ করে আল্লাহর নির্দেশে কিছু গাছের পাতা ফেলে দিলেন সেই পানির মধ্যে। সাথে সাথে সেই পানি সুস্বাদু পানীয় হয়ে উঠল। সকলে তৃষ্ণা মিটিয়ে সব পাত্র ভরে নিল। যারা মুসাকে দোষারোপ করছিল, তারা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা চাইল। সকলে মুসাকে তাদের ধর্মগুরু ও নেতা হিসাবে স্বীকার করে নিল। সকলে তাঁর নির্দেশ মত এগিয়ে চলল। কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত খাবার ফুরিয়ে গেল। আশেপাশে কোথাও কোন খাবারবের সন্ধান পাওয়া গেল না। খিদের জ্বালায় সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আবার তারা দোষারোপ করতে আরম্ভ করল মুসাকে। তোমার জন্যেই আমাদের এত কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে।

মুসা সকলকে শান্ত করে বললেন, তোমরা ভুলে গিয়েছ আমাদের ঈশ্বর আল্লাহর কথা। তিনি "ফেরাউনকে" তোমাদের দেশত্যাগের অনুমতি দিতে বাধ্য করেছেন। তিনি সমুদ্রকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন, সৈন্যদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। তোমাদের পানীর ব্যবস্থা করেছেন। তবুও তোমরা তাঁর শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করছ।

মুসার কথা শেষ হতেই কোথা থেকে সেখানে উড়ে আসে অসংখ্য পাখির ঝাঁক। ইহুদিরা ইচ্ছামত পাখি মেরে মাংস খায়। আর কারো মনে কোন সংশয় থাকে না। মুসাই তাদের অবিসংবাদিত নেতা। সকলে শপথ করে জীবনে-মরণে তারা মুসার সমস্ত আদেশ মেনে চলবে।

মুসা সমস্ত ইহাদিদের নিয়ে এলেন এফিডিম নামে এক নির্জন প্রান্তে। চারদিকে ধু ধু বালি, মাঝে মাঝে ছোট পাহাড়, কোথাও পানীর কোন উৎস নেই।

মুসা আবার এগিয়ে চললেন। কিছুদূর গিয়ে একটা বড় পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আল্লাহর নির্দেশে একটা পাথর সরাতেই বেরিয়ে এল স্বচ্ছ পানির এক ঝর্ণাধারা। সেই পানিতে সকলের তৃষ্ণা মিটল। মুসা যেখানে এসেছিলেন তার অদূরেই প্যালেস্তাইনে তখন বাস করত আমালেক নামে এক উপজাতি সম্প্রদায়। নতুন একদল মানুষকে তাদের অঞ্চলে প্রবেশ করতে দেখে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। অপরদিকে ইহুদিরা দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অবসন্ন, সকলে মুসাকে বলল, এই যুদ্ধে আমাদের নিশ্চিত পরাজয় হবে। তুমি অন্য কোথাও আশ্রয়ের সন্ধানে চল। মুসা সকলকে সাহস দিয়ে তাঁর দলের সমস্ত পুরুষদের একত্রিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধ পরিচালনার ভার দেওয়া হল জোশুয়া নামে এক সাহসী যুবককে। শুরু হলে গেল তুমুল যুদ্ধ। মুসা নিজে যুদ্ধে যোগ দিলেন। আল্লাহ্র নির্দেশে পাহাড়ের উপর উঠে তার হাতের দণ্ড আকাশের দিকে তুলে ধরলেন। যুদ্ধের প্রথমে আমালেকরা ইহুদিদের বিপর্যস্ত করছিল। কিন্তু মুসা তাঁর দণ্ড উর্ধ্বাকাশে তুলে ধরতেই যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হল। ইহুদিরা বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমালেকদের উপর। ইহুদিদের সেই প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করতে পারল না আমালেকরা। বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত হয়ে তারা পালিয়ে গেল।

ইহুদিরা নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলল প্যালেস্তানেই দিকে। পথে সিনাই পর্বত। এখানে পানি ও গাছপালার কোন অভাব নেই দেখে মুসা সেখানেই সকলকে তাবু খাটাবার নির্দেশ দিলেন।

সেই সময় মুসার শ্বশুর জেথ্রো তার স্ত্রী, দুই পুত্র, সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সেই পথ ধরে যাচ্ছিল। কাছে আসতেই বুঝতে পারলেন এরা দেশত্যাগী ইহুদি জাতি। তার জামাই-এর নেতৃত্বে এখানে বসতি স্থাপন করেছে।

জেথ্রো ছিলেন উপজাতি সম্প্রদায়ে পুরোহিত। নানান দেবদেবীর পূজা করতেন তিনি। মুসাকে বললেন, তোমাদের আল্লাহর কথা শুনে উপলব্ধি করতে পেরেছি, তিনি সকল দেবতার ঊর্ধ্বে. তিনিই সমস্ত শক্তির উৎস। এতদিন আমি ভুল পথে চালিত হয়েছি। যে সব দেবতাকে পূজা-অর্চনা করেছি তারা কেউই আল্লাহর সমকক্ষ নন। আমি তার ইবাদত করতে চাই।

মুসা ইহুদিদের মধ্যে থেকে সৎ ন্যায়বান জ্ঞানী মানুষদের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করলেন।

এই সময় মুসা একদিন গভীর রাতে আল্লাহর দৈববাণী শুনতে পেলেন মুসা: আমি আমার এক দূতকে তোমাদের কাছে পাঠাব। তোমরা সকলে তাঁকে অনুসরণ করবে। যে পথে তোমরা যাবে সেই পথে নানান বাঁধা আসবে। শত্রুরা তোমাদের যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমার আশীর্বাদে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। তুমি বীরদর্পে এগিয়ে যাবে। পথে অন্য কোন দেবতার মূর্তি বিগ্রহ মন্দির দেখলেই তা ধ্বংস করবে। আর সর্বত্র আমার উপদেশ প্রচার করবে। যারা মূর্তি পূজা করবে তারা আমার শত্রু, তুমি তাদের ধ্বংস করবে।

পরদিন মুসা ইহুদিদের সকলকে ডেকে বললেন তোমরা সকলে আগামী দুদিন শুদ্ধ পবিত্রভাবে থাকবে। তৃতীয় দিন দেবদূতের আবির্ভাব হবে। তখন আমরা তাঁকে অনুসরণ করব।

দুদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন ভোর থেকেই ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। তারই সাথে ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক, বজ্রের নির্ঘোষ। হঠাৎ ঘন মেঘপুঞ্জের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক তীব্র আলোকছটা। তার আলোয় সব অন্ধকার কেটে গেল। দেখা গেল এক টুকরো ভাসমান মেঘ আকাশ থেকে নেমে এল সিনাই পর্বতের মাথায়। এক মেঘ থেকে সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডুলি বার হয়ে পাহাড়ের সমস্ত চূড়াকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

এমন সময় সেই মেঘপুঞ্জ থেকে অলৌকিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, মুসা, তুমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এস। পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেই মুসা শুনতে পেলেন আল্লাহর কণ্ঠস্বর, হে আমার প্রিয় ভক্ত, আমি তোমার মাধ্যমে সমস্ত ইহুদিদের দশটি নিয়ম জানাতে চাই। শুধু মাত্র আমাকে মানলেই চলবে না। এই দশটি নিয়ম তোমাদের সকলকে মেনে চলতে হবে।

আল্লাহ তখন মুসার কানে কানে দশটি নির্দেশ দিলেন। এদের বলে টেন কম্যান্ডমেন্টস্।

মুসাকে আরো কিছু নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বাতাসে মিলিয়ে গেল। ঝরে গেল সেই আলোকরশ্মি মেঘপুঞ্জ। সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এল।

নিয়ম দশটি নিম্নরূপ ঃ

এক—আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই। তোমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কোন দেবতার ইবাদত করবে না।

দুই—আল্লাহকে শুধু মাত্র উপাস্য হিসাবে মান্য করলেই হবে না। তাঁর প্রতিটি নির্দেশ আদেশ মেনে চলতে হবে।

তিন—সপ্তাহের ছয় দিন কাজ করবে। সপ্তম দিন কোন কাজ করবে না। এই দিন স্যাবাথ বা পবিত্র বিশ্রামের দিন।

চার—পিতামাতাকে ভক্তি করবে, শ্রদ্ধা করবে, তাঁদের প্রতি পালনীয় কর্তব্য অবশ্যই পালন করবে।

পাঁচ—কোন মানুষকে হত্যা করো না।

ছয়—কোন নারী বা পুরুষ কখনোই ব্যভিচার করবে না।

সাত—অপরের দ্রব্য অপহরণ করবে না।

আট—মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

নয়—অন্য জিনিসের প্রতি কোন লোভ করবে না, বা যাতে অন্যের অধিকার আছে তা গ্রহণ করবে না।

দশ—উপাসনাস্থল বেদী নির্মাণ করে পশুবলি দিতে হবে।

পাথর স্থাপন করা হল পাহাড়ের গায়ে। যাতে ইহুদিদের ভবিষ্যৎ বংশধররা জানতে পারে ঈশ্বরের আদেশের কথা।

এইবার মুসা ঈশ্বরের ধ্যান করবার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেন। দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধরে গভীর সাধনায় মগ্ন হয়ে রইলেন মুসা।

এদিকে মুসা অনুপস্থিতিতে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। সকলে এসে ধরল মুসার ভাই

হারুনকে সে ভুলে গেল টেন কম্যান্ডমেন্টস্-এর নির্দেশ। সে একটি সোনার বাছুর তৈরি করে বলল, এই বাছুরটিকেই আল্লাহর প্রতীক বলে পূজা কর। তারপর একে বলি দিয়ে পূজা শেষ করব।

সকলে বাছুর পূজার আনন্দে মেতে উঠল। ইহুদিদের এই মূর্তিপূজা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন আল্লাহ। তিনি মুসাকে বললেন, ওদের এই গর্হিত কাজের জন্য আমি সকলকে ধ্বংস করব। সৃষ্টি করব নতুন এক জাতি।

মুসা বুঝতে পারলেন আল্লাহ ইহুদিদের অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তিনি নতজানু হয়ে বসে বললেন, হে প্রভু, তুমি তোমার সন্তানদের এই অপরাধ মার্জনা কর।

মুসার কথায় শান্ত হলেন আল্লাহ। তিনি তাঁর উপদেশ-নির্দেশ লেখা আরো দুটি পাথর দিলেন। মুসা সেই পাথর দুটি নিয়ে পাহাড় থেকে নিচে নামতেই দেখতে পেলেন সোনার বাছুরে মূর্তিকে ঘিরে ইহুদিরা আনন্দ উৎসবে মেনে উঠেছে। ইহুদিদের এই অসংযমী ধর্মবিরুদ্ধ আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন মুসা। তাই তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জন করে উঠলেন, তোমরা এই নাচ ও পূজা উৎসব বন্ধ কর। ইহুদিরা কোনদিন মুসার এই ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখেনি। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। মুসা বললেন, তোমরা যারা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে আমার সঙ্গী হতে চাও তারা আমার ডানদিকে এসে দাঁড়াও। যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে না চাও তারা সকলে বাঁ দিকে যাও।

ইহুদিরা সকলেই মুসার ডান দিকে এসে দাঁড়াল। মুসা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমরা যে অন্যায় করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মুসা বললেন, প্রত্যেক পরিবারের একজন তরবারি নিয়ে এগিয়ে এস।

সকলে তরবারি নিয়ে আসতেই মুসা বললেন, এই তরবারী দিয়ে তোমাদের যে কোন একজন ভাই, বন্ধু কিম্বা প্রিয়জনকে হত্যা কর। এ আমার নির্দেশ নয়, আল্লাহর আদেশ।

সকলেই নতমস্তকে সেই আদেশ মেনে নিল। মুসা আর ইহুদিদের সাথে একত্রে বাস করতেন না। তিনি আলাদা তাবুতে থাকতেন। দিনরাত আল্লাহর ধ্যানেই মগ্ন হয়ে থাকতেন। মাঝে শুধু আল্লাহর নির্দেশগুলি প্রচার করতেন। দশটি অনুশাসন ছাড়াও এগুলি ছিল স্বতন্ত্র নির্দেশ।

এক—বিদেশীদের স্বজাতির মানুষদের মতই ভালবাসবে।

দুই—কেনাবেচার সময় ব্যবসায়ীরা যেন ওজনের কারচুপি না করে সঠিক দাম নেয়।

তিন—অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করা চলবে না।

চার—মূর্তিপূজা, জাদুবিদ্যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

আল্লাহর নির্দেশে সকলে প্যালেস্তাইনের যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হল। তিন দিন চলবার পর তারা এসে পড়ল ক্যানান নগরের প্রান্তে। এখানেই শিবির স্থাপন করা হল।

মুসা ইহুদিদের মধ্যে থেকে বারো জন অভিজ্ঞ মানুষকে পাঠালেন প্যালেস্তাইনে। তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তর পরিদর্শন করে এসে জানাল প্যালেস্তাইনের দক্ষিণ দিকটাই সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল।

মুসা বললেন, আমরা প্যালেস্তাইনের দক্ষিণেই বসতি স্থাপন করব, তোমরা সকলে এগিয়ে চল।

প্যালেস্তাইনের সীমান্ত প্রদেশে তখন বাস করত আমালেকিত ও কানানিত নামে দুটি উপজাতি। এই দুই উপজাতি বহুদিন ধরেই প্যালেস্তাইনে বাস করছিল। দুই উপজাতির মানুষেরা এক সঙ্গে ইহুদিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচমক এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না ইহুদিরা। তারা আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গেল হর্মা নামে এক নির্জন প্রান্তরে।

মুসা বুঝতে পারলেন প্যালেস্তাইনে প্রবেশ করতে গেলে অন্য পথ দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। তারা এসে পড়লেন ক্যানানিত রাজ্যের প্রান্তে। অপরিচিত ইহুদিদের দেখেই ক্যানানিতে রাজা তাদের আক্রমণ করলেন। এইবার আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল ইহুদিরা। মুসার বুদ্ধি-কৌশলে তারা পরাজিত হল।

সকলকে উপদেশ দিয়ে তিনি প্রার্থনায় বসলেন। বুঝতে পারলেন তাঁর সময় শেষ হয়েছে। দীর্ঘ ১২০ বছর ধরে পৃথিবীর কত কিছুই তো প্রত্যক্ষ করলেন। গত চল্লিশ বছর মেষপালক যেমন তার মেষের চালকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তিনি তেমনি সমগ্র ইহুদি জাতিকে মিশর থেকে নিয়ে এসেছেন প্যালেস্তাইনের প্রান্তরে। জীবনে কোনদিন সুখভোগ করেননি। বিলাসিতা করেননি। ধর্মের পথে সৎ সরল জীবন যাপন করেছেন। প্রতিমুহূর্তে নিপীড়িত ইহুদি জাতির প্রতি নিজের অন্তরের অকুণ্ঠ ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। তাদের নানান বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এতদিনের তাঁর সব কাজ শেষ হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ

[১৮৩৩-১৮৮৬]

ছেলে বড় হল। পাঁচ বছরে পড়ল গদাধর। কামারপুকুর গ্রামের লাহাবাবুদের বাড়ির নাটমন্দিরে পাঠশালা। বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছেলে গদাধরকে সেই পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দিলেন। কিন্তু পড়াশোনায় খুব বেশি মন নেই গদাধরের। শুধু বাংলাটা পড়তে ভাল লাগে। অংক কষতে গেলেই মাথা গুলিয়ে যায়।

বামুনের ছেলে। ছোটবেলাতেই মুখে মুখে শিখেছে দেবদেবীর প্রণাম মন্ত্র। সেগুলো কিন্তু সে বেশ গড়গড়িয়ে বলে যেতে পারে। তার কিছুদিন পরেই রামায়ণ পড়তে পারে সুর করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলার সুর এবং বলার ভঙ্গিও তার সুন্দর হয়েছে। তাই মধুযোগীর বাড়িতে তার রামায়ণ পড়া শুনতে ভিড় জমে যায়।

একদিন বিকেলবেলা সে রামায়ণ পাঠ করছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও শুনছে মনোযোগ দিয়ে। কাছেই আমগাছের ওপর বসে ছিল একটা হনুমান। সে লাফ দিয়ে ঠিক গদধরের কাছে এসে পড়ল। তারপর পা জড়িয়ে ধরল গদাধরের। হইচই করে উঠল সবাই। কেউ বা ভয় পেয়ে উঠে চলে গেল। কিন্তু গদাধর একটুও নড়ল না। সে হনুমানের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। বুঝি শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ পেয়েই খুশী হয়ে রামভক্ত হনুমান আবার লাভ দিয়ে গাছে উঠে গেল।

অদ্ভুত ছেলে গদাধর! সব সময়েই ভাবাবেশে মত্ত হয়ে থাকে। পথে পথে ঘুরে গান করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। লোকজন ছুটে এসে মাথায় ও মুখে জল ছিটিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে।

কামারপুকুর থেকে দু'মাইল দূরে আনুড় গ্রাম। সেখানে বিরাট এক গাছের তলায় আছে বিশালাক্ষীর থান। গাঁয়ের মেয়েরা দল বেঁধে চলেছে সেই বিশালাক্ষী দেবীর পূজা দিতে। হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে গদাধর সেখানে সেই দলে ঢুকে পড়ল। গাঁয়ের মেয়েরা ভাবল, যাক্ ভালই হয়েছে। গদাইয়েরও গান গেয়ে খুব আনন্দ। বাবার কাছ থেকে শেখা দেবতার ভজন কি সুন্দর গায়।

কিন্তু বিশালাক্ষী থানের কাছাকাছি যেতেই তার গান থেমে গেল। দু'চোখ বেয়ে পড়তে লাগল জলের ধারা। প্রসন্ন বলে মেয়েটি এগিয়ে এসে তাকে ধরতেই তার কোলে অবসন্ন হয়ে ঢলে পড়ল। গদাইয়ের জ্ঞান হতেই সে বলল, ওরে গদাইকে কিছু খেতে দে।

কিন্তু কি খেতে দেবে গদাইকে? কারুর সঙ্গে ভোগের সামগ্রী ছাড়া যে আর কিছু নেই। প্রসন্ন বলল, ভোগের জিনিসই আলাদা করে ওকে দে। ওকে খাওয়ালেই তোদের পুণ্যি হবে।

অনেকে পূজার জন্য আনা নৈবেদ্য থেকে কলা, দুধ ও বাতাসা গদাইয়ের মুখে তুলে দেয়।

বড় খামখেয়ালী ছেলে গদাধর। পড়াশুনা মোটেই করছে না। শুধু আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দল বেঁধে ছেলেদের সঙ্গে যাত্রা করে। কখনো সাজে কৃষ্ণ, কখনো শিব।

দেখতে দেখতে বড় হতে লাগল গদাধর। দাদা রামকুমার বলেন, গাঁয়ে ওর লেখাপড়া কিছু হবে না। আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব। লেখাপড়া শেখাব।

রামকুমার কলকাতায় ঝামাপুকুরে থাকেন। সেখানে একটা টোল খুলেছেন। সেখানেই ছোটভাইকে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু সে গাঁ ছেড়ে যেতে চায় না।

১৮৩৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এই কামারপুকুর গ্রামে জন্ম হয়েছে গদাধরের। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছে এখানকার পথ-ঘাট, পুকুর, মা-বাবা ও গাঁয়ের লোক-জনদের। এসব ছেড়ে যেতে কি ভাল লাগে।

পৈতে হয়েছে। দাই-মা ধনী কামারনীর আদর পেয়েছে। মা চন্দ্রমণির দিকে যেমন টান, ধনী কামারনীর দিকেও টান তার কম নয়। বাবাকেও ভালবাসে খুব। কিন্তু সাত বছর বয়সেই বাবাকে হারাতে হল হঠাৎ। ছিলিমপুরে থাকেন বাবার ভাগনে রামচাঁদ। তার বাড়িতে দুর্গাপূজায় পুরোহিত হয়ে পূজা করতে গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। সেখানেই ভাসানের দিন রাত্রিবেলায় মারা গেলেন। সেই খবর পেয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল গদাধর।

রাসমণির আর কাশী যাওয়া হল না। গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্মাণ করলেন। খরচ হল নয় লাখ টাকা। নবরত্ন বিশিষ্ট কালী মন্দির, উত্তর ভাগে রাধাগোবিন্দ মন্দির, পশ্চিমে গঙ্গার তীর জুড়ে দ্বাদশ শিবের মন্দির। মূর্তিও তৈরী হল। মূর্তি ছিল বাক্সের মধ্যে। দেখা গেল মূর্তি

ঘামছে। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন রাণীমা। ভবতারিণী কালী বলছেন, আমাকে আর কতদিন এভাবে কষ্ট দিবি? এবার আমায় মুক্তি দে।

১২৬১ সালে বারোই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিনে মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু মায়ের অন্নভোগ দেওয়ার কি হবে? মার যে অন্নভোগ দেবার অধিকার তোমার নেই; কারণ তুমি যে জেলের মেয়ে। দেবীকে ভোগ দেবো, তাতেও জাতবিচার? রানীর হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠল। রানীর জামাতা মথুরামোহন সব কিছু দেখাশুনা করতেন। তিনি নানা দেশের পণ্ডিতদের কাছে বিধান নিতে ছুটলেন। কিন্তু সব পণ্ডিতেরই এক কথা। অচ্ছুৎ রামকুমারের কাছে। রামকুমার বিধান দিলেন মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি যদি রানী কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন তবেই অন্নভোগ দেওয়া চলতে পারে। রানী অকূলে যেন কূল পেলেন। তিনি ঠিক করলেন গুরুর নামে মন্দির দান করবেন। কিন্তু গুরুর বংশের কেউ পুরোহিত হয় এ তাঁর কাম্য নয়। কারণ তাঁরা সকলেই অশাস্ত্রজ্ঞ এবং আচারসর্বস্ব। অন্য সৎ ব্রাহ্মণও পাওয়া গেল না। অন্য কেউ মন্দিরের পূজা করতে রাজী হলেন না।

মন্দির প্রতিষ্ঠা-উৎসবের দিন রামকুমার এলেন গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে। বিরাট আয়োজন কালীবাড়িতে। যাত্রাগান, কালীকীর্তন, ভাগবত পাঠ। মহা ধুমধাম কাণ্ড। সকাল থেকে চলছে খাওয়া-দাওয়া আহূত কে অনাহূত, কার কি জাত তার খোঁজ-খবরও করে না কেউ।

গদাধর কিন্তু কিছুই খেলেন না। বাজার থেকে মুড়ি কিনে খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলেন। রাত্রিবেলা রামকুমার গদাধরকে জিজ্ঞেস করলেন, এখনকার ভোগের প্রসাদ তুই নিলিনে কেন? ব্রাহ্মণের হাতে রাঁধা মাকে নিবেদন করা ভোগ আমি নিলাম, তুই নিলি না কেন?

গদাধর জবাব দিলেন, এমনি নেইনি।

রামকুমার অবাক হলেন। অথচ এই গদাধরই ছোটবেলায় ধনী কামারনীর কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়েছেন। শিয়র গ্রামের রাখালদের সঙ্গে বসে খেয়েছিল। খেয়েছিল ছুতোর বাড়ির বউয়ের হাতে খিচুড়ি রান্না। চিনিবাস শাঁখারীর হাতে মিষ্টি। আনুড়ে বিশালাক্ষী মায়ের থানে নানা জাতের মেয়েদের দেওয়া পূজার প্রসাদ খেয়েছিল। তখন তো জাতবিচার করেনি। আশ্চর্য!

কারণ জিজ্ঞেস করলে গদাধর জবাব দিলেন, ওরা দিয়েছিল অতি যত্নের বিদুরের খুদ। কিন্তু এ যে হেলায় ফেলায় দেওয়া দুর্যোধনের রাজভোগ।

জবাব শুনে অবাক হয়ে গেলেন রামকুমার। বাঃ, রামায়ণ মহাভারত পড়ে আর টোলের নানা বই ঘাঁটাঘাঁটি করে অনেক কিছু তো এ বয়সে গদাধর শিখে ফেলেছে।

রামকুমার বললেন, তা হলে কি করতে বলিস আমাকে? ঝামাপুকুরে ফিরে যাব? রাণীমা যে আমাকে এখানে পুরোহিত করতে চান। সে কাজ তা হলে নেব না?

গদাধর বললেন, কথা যখন দিয়েছ তখন ছাড়বে কেন? আর তোমার টোলও তো প্রায় উঠেই গেছে। তুমি এখানেই থাক।

মথুরামোহন সেই মূর্তি নিয়ে গেলেন জানবাজারের বাড়িতে। রাসমণিকে দেখিয়ে বললেন, দেখুন মা, পুরুত ঠাকুরের ছোটভাই গড়েছে।

রাসমণি বললেন, বাঃ বেশ তো। ওঁকে আমাদের মন্দিরের বিগ্রহের সাজনদার করলে বেশ হয়।

মথুরামোহন বললেন, আচ্ছা, আমি বলে দেখি পুরুত ঠাকুরকে।

পরদিন মথুরামোহন দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকুমারকে ব্যাপারটা জানালেন। রামকুমার বললেন, গদাই যা খামখেয়ালী ছেলে। আমার কথা কি শুনবে? আপনি বললে যদি রাজী হয়।

মথুরামোহন তখন ডেকে পাঠালেন গদাধরকে। গদাধর ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন মথুরাবাবুর সামনে। মথুরাবাবু বললেন, তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াও কেন? তোমার মনের মতো একটা কাজ দিলে করবে?

–কি কাজ?

–মা ভবতারিণীকে তুমি নিজের মতো করে সাজাবে।

ভয়ে কুঁকড়ে উঠলেন গদাধর। বললেন, একা সাহস হয় না সেজবাবু। ঘরে সব দামী দামী জিনিস। সঙ্গে হৃদয় থাকে তো পারি।

–বেশ তো। সে তোমার সাগরেদ থাকবে। কাজ করবে দু'জনে মিলে।

মনের মতো কাজ পেয়ে খুশীই হলেন গদাধর।

জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব। রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও ভোগ অনুষ্ঠান। সেই বিগ্রহের পূজারী ক্ষেত্রনাথ। দুপুরে পূজোর পর পাশের ঘরে শয়ন দিতে নিয়ে যাচ্ছেন রাধা-গোবিন্দকে। হঠাৎ পা পিছনে ক্ষত্রনাথ পড়ে গেলেন। হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল গোবিন্দের একটি পা।

মন্দিরে হইচই পড়ে গেল। হায়, একি অঘটন।

রানী রাসমণিকে খবর পাঠানো হল। তিনি মথুরামোহনকে বললেন, পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিধি নাও, কি ভাবে ঐ বিগ্রহের পূজা করা হবে?

মথুরামোহন অনেক পণ্ডিতের সঙ্গেই পরামর্শ করলেন। তাঁরা বললেন, ঐ বিগ্রহকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হবে। তার জায়গায় বসাতে হবে নূতন মূর্তি।

কিন্তু রাণীর মন তাতে সায় দিল না। সে গোবিন্দকে এতদিন গৃহদেবতা রূপে পূজা করা হয়েছে, তাকে বিসর্জন দিতে হবে?

গদাধরের কানে সে কথা যেতেই তিনি বললেন, সে কি কথা। কোন জামাইয়ের যদি ঠ্যাং ভেঙ্গে যায়, তাতে কি ফেলে দিতে হবে, না চিকিৎসা করাতে হবে। গোবিন্দ গৃহদেবতা, নিতান্ত আপন। সেই আপনজনকে ফেলে দেব কেন? আমিই ঠাকুরের পা জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি।

একথা শুনে রাসমণির মনের চিন্তা দূর হয়ে গেল। তিনি বললেন, ছোট ভট্টাচার্য যা বলেছেন তাই ঠিক।

গদাধর মাটি দিয়ে সুন্দরভাবে জুড়ে দিলেন গোবিন্দের পা। বোঝাই গেল না যে পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেই মূর্তিই সিংহাসনে বসানো হল।

ক্ষেত্রনাথ পুরোহিতের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। গদাধরকে নিযুক্ত করা হল রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পুরোহিত। গদাধর কোন আপত্তি করলেন না। মতিগতি দিন দনি একটু ভাল হচ্ছে তাঁর। নিজেই একদিন বললেন, আমাকে দীক্ষা দাও।

কেনারাম ভট্টাচার্য নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে এনে গদাধরকে দীক্ষা দেওয়া হল। তারপর থেকে পূজার দিকে খুব মন দিলেন গদাধর। রামকুমার ভাবলেন, গদাইয়ের হাতে ভবতারিণীর পূজার ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্য দেশ থেকে ঘুরে আসি। তাই গদাধরকে শক্তি পূজার ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্য দেশ থেকে ঘুরে আসি। তাই গদাধরকে শক্তি পূজার পদ্ধতি শেখাতে লাগলেন।

গদাধর এখন আগের চেয়ে অনেক সংযত ও ধীরস্থির। কিছুদিন পর ভবতারিণীর পূজার ভার গদাইয়ের আর রাধাগোবিন্দের পূজার ভার হৃদয়ের হাতে দিয়ে রামকুমার দেশের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু বিধির কি আশ্চর্য লীলা! রামকুমার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতে পারলেন না। পথেই অসুস্থ হয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সেখানেই মারা গেলেন।

সে খবর শুনে কি কান্নাই না কেঁদেছিলেন গদাধর।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে।

দেশ থেকে ঘুরে এসে ভবতারিণীর পূজায় মন দিয়েছেন গদাধর। কিন্তু পূজার ধরন-ধারণ যেন পালটে গেছে অনেক। হৃদয় অবাক হয়ে গেল তার ছোটমামার হাবভাব দেখে। একদিন দেখল গদাধর মায়ের মূর্তির হাত টিপে দেখলেন তারপর ছুটে চলে গেলেন বাইরে। ভূত প্রেত সাপ নেউলের ভয় নেই। পঞ্চবটী বনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। পরনের কাপড় খুলে গেল, গলার পৈতে লুটোপুটি খেতে লাগল মাটিতে।

আর একদিন দেখল হৃদয়, গদাধর মা কালীর মূর্তির সামনে বসে কাঁদছেন। বলছেন, মা গো রামপ্রসাদকে তুই দেখা দিয়েছিস, আমাকে দেখা দিবি না কেন?

হৃদয় একদিন জিজ্ঞেস করল, মামা, এসব ঢং করো কেন?

গদাধর জবাব দিলেন, ওসব ঢং নয় রে। মাকে পেতে হলে পাশমুক্ত হতে হবে। অষ্ট পাশ। ক্ষুধা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাত, দম্ভ এসব ছাড়তে হয়।

পঞ্চবটিতে সারারাত পঞ্চমুণ্ডিত আসনে বসে ধ্যান করেন গদাধর। রাত্রি শেষে বেরিয়ে আসেন। পা টলছে মাতালেন মত। মন্দির খুলতে না খুলতেই ঢুকে পড়লেন ভেতরে। বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখা দিবি না? বেশ, চাই না দেখতে। রাক্ষসী তুই তাই তো রক্ত মেখে মুণ্ডুমালা গলায় রাকিস। আরো খাবি রক্ত?

মন্দিরের দেওয়ালে ঝুলছে বলির খাঁড়া। সেই খাঁড়াটি নিয়ে নিজের গলা কাটবার জন্য তুলে ধরলেন। মন্দিরের আঙিনায় তখন ভিড় জমে গেছে। কিন্তু কেউ হঠাৎ প্রতিমার পায়ের কাছে

মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন গদাধর। ধরাধরি করে অচেতন গদাধরকে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর ঘরে। পরের দিনও নয়। সময় সময় একটু জ্ঞান হয় আর কি যেন বিড় বিড় করে বলেন। আবার জ্ঞান হারিয়ে যায়।

সিয়রে হৃদয়ের বাড়িতে গেলেন গদাধর। সেদিন সেখানে গানের আসর বসেছিল। একটি স্ত্রীলোকের কোলে ছিল একটি ফুটফুটে মেয়ে। টুল-টুল করে তাকিয়ে চারদিক দেখছিল। স্ত্রীলোকটি রহস্য করে জিজ্ঞেস করল মেয়েটিকে, বিয়ে করবি? মেয়েটি ঘাড় নাড়ল? কাকে বিয়ে করবি এত লোকের মধ্যে? মেয়েটি গদাধরকে দেখিয়ে বলল, ঐ যে!

মেয়েটি জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়ে সারদামণি। একদিন শুভলগে গদাধরের সঙ্গে ওরই বিয়ে হল। প্রায় দু'বছর কামারপুকুরে থাকার পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন। মা কালীর পূজার ভার আবার তাঁরই ওপর পড়ল।

রানী রাসমণির অসুখ। হঠাৎ একদিন পড়ে গিয়ে কোমরে ব্যথা পেলেন। শয্যাশায়ী হলে একেবারে।

মনে শান্তি নেই রাসমণির। দক্ষিণেশ্বরের পূজোর খরচ চালানোর জন্য দু'লাখ চব্বিশ হাজার টাকায় জমিদারি কিনেছেন। কিন্তু সেই সম্পত্তি এখনো দেবোত্তর করেননি। তাঁর চার মেয়ের মধ্যে দু'মেয়ে শুধু বেঁচে আছে। সেই দুই মেয়ে সই করে দিলেই সব গোল চুকে যায়। কিন্তু বড় মেয়ে পদ্মমণি কিছুতেই সই দিল না। রাণী ভাবনায় পড়লেন। হঠাৎ যেন দেখলেন, গদাধর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, নাই বা সই করল, মেয়ে কি মায়ের সঙ্গে মামলায় জিততে পারবে?

অভয় পেলেন রাসমনি। আঠারোশো একষট্টি সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি সেই সম্পত্তির দানপত্র রেজিষ্ট্রি হয়ে গেল। পরের দিন রাসমণি বললেন, আমাকে কালীঘাটে নিয়ে চল। সেখানেই মায়ের কাছে শেষ নিঃশ্বাস ফেলব।

বিছানা সাজিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী রানীর দেহ আনা হল আদিগঙ্গার তীরে। অমাবস্যার অন্ধকার রাতে রানীর পুণ্যাত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেল। দক্ষিণেশ্বরে ঘরের বারান্দায় অস্থির ভাবে পায়চারি করেছিলেন গদাধর। হঠাৎ বলে উঠলেন, চলে গেল রে, চলে গেল রাসমণি। মায়ের অষ্টনায়িকার এক নায়িকা।

একদিন সকালবেলা বাগানে ফুল তুলছেন গদাধর। এমন সময় বকুলতলার ঘাটে একটি নৌকা এসে ভিড়ল। এক সুন্দরী স্ত্রীলোক নামলেন নৌকা থেকে। পরনে গেরুয়া শাড়ি, হাতে ত্রিশূল। বয়স হয়েছে ভৈরবীর। কিন্তু কী রূপের ছটা। গদাধরকে বললেন, এই যে বাবা, তুমি এখানে। জানি তুমি গঙ্গাতীরে আছ। তাই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

শুনে গদাধর অবাক। তুমি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ মা?

মা মহামায়াই পাঠিয়ে দিলেন।

পঞ্চবটীতে ভৈরবীর থাকবার ব্যবস্থা হল। তিনি সেখানে থাকেন। তাঁর ঝোলায় আছে তন্ত্রশাস্ত্র, গীতা, ভাগবত। গদাধরকে পড়ে শোনান। নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান ভৈরবীর। কিন্তু নানা লোকের মনে নানা রকম সন্দেহ। সুন্দরীর ভৈরবী কি রম্ভা মেনকার মত গদাধরের মনের পরিবর্তন ঘটাতে এসেছেন? কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, ভৈরবী এসেছেন গদাধরের প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য। তিনি বললেন, গদাধর মানব দেহধারী শ্রীরামচন্দ্র। তান্ত্রিক মতে শক্তি-দীক্ষা তিনি দিলেন গদাধরকে।

একদিন মড়ার মাথার খুলিতে মাছ রেঁধে ভোগ সাজালেন। কালীকে নিবেদন করে গদাধরকে বললেন, প্রসাদ নাও। গদাধর নির্বিবাদে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

ভৈরবী বললেন, এবার বৈষ্ণবমতে সাধনা কর বাবা। চারটি বেদ, আঠারোটি পুরাণ, চৌষট্টি তন্ত্রে যে রাস মেলে না, তাই মেলে না, তাই মেলে বৈষ্ণব মতে সাধনায়।

গদাধর রাজী হলেন। কী অপূর্ব যোগাযোগ! সেই সময়ে এলেন বেদান্তপন্থী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী পরমহংসদেবের দল। তাঁদের সঙ্গে করেন শাস্ত্র আলোচনা। অতি সহজভাবে গভীর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন। সাধুরা খুশী হলে আশীর্বাদ করে গদাধরকে বললেন, তুমি ধর্মের সারমর্ম বুঝেছ। তুমি পরমহংস।

কিছুদিন পর এলেন সন্ন্যাসী তোতাপুরী। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় তাঁর মঠ। চল্লিশ বছর সাধনা করেছেন। বেরিয়েছেন তীর্থ দর্শনে। তাঁকে দেখে গদাধর ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। যেন কতকালের পরিচিত। গদাধর বললেন, আমাকে দীক্ষা দিন।

তোতাপুরী বললেন, দিতে রাজী আছি, কিন্তু তোমাকে গৈরিক বস্ত্র পরতে হবে। গদাধর বললেন, গৈরিক পরতে পারব না। ছোটবেলাতেই মায়ের কাছে কথা দিয়েছি। সন্ন্যাসী না সেজেও আমি সন্ন্যাস নেব।

তোতাপুরী ভাবলেন, মনে যার রং ধরেছে, তার দেবহারণের রং বিচার করে লাভ নেই। তাই তিনি গদাধরকে দীক্ষা দিলেন। বললেন, আজ তোমার নতুন জন্মলাভ হল। তোমার নাম এখন হবে রামকৃষ্ণ আর পদবী হবে পরমহংস। পরমহংস কাকে বলে জান তো? দুধে জলে এক সঙ্গে থাকলেও যিনি হাসের মত জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন, তিনিই পরমহংস।

তোতাপুরী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ক'দিন পরেই এলেন গোবিন্দ রায়। জাতে ক্ষত্রিয়। কিন্তু মুসলমান হয়েছেন। আরবী ফারসীতে পণ্ডিত। রামকৃষ্ণ তাকে বললেন, আমি মুসলমান ধর্মমতে সাধন ভজন করব। কত মানুষ কত পথে সাধনা করে বাঞ্ছিত ধামে গিয়ে পৌছায়। আমি এই পথটাকে বাদ দেব কেন?

গোবিন্দ রায় দীক্ষা দিলেন রামকৃষ্ণকে। কাছা খুলে ফেললেন। কাপড় পরলেন লুঙ্গির মত করে। পাঁচ বেলা নামাজ পড়তে লাগলেন। একদিন মুসলমানদের রান্নার মত রান্না করিয়ে খেলেন।

একদিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রামকৃষ্ণ দেখলেন গৌরবর্ণ সুপুরুষ যীশুখ্রীস্ট এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছেন। যীশুর ভজনা করতে করতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

মা চন্দ্রমণিও ছেলে গদাধরকে দেখবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে এলন। তিনি নহবতের ঘরে থাকেন। ছেলের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হয়। কিছুদিন পর স্ত্রী সারদামণিরও এসে হাজির হলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি গো, তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?

সারদা জবাব দিলেন, না। তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করার জন্যই আমি এসেছি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের শিক্ষায় শ্রীমতী সারদা সুনিপুণা হতে লাগলেন। প্রকাশ পেতে লাগলেন জগতের মঙ্গলসাধিকা শক্তিরূপে।

চন্দ্রমণির বয়স অনেক হয়েছিল। শেষ বয়সে ছেলেকে দেখবার আকাঙ্খা হয়েছিল ভিষণ। সে আশা তাঁর পুরণ হল। একদিন দক্ষিণেশ্বরেই রোগশয্যায় পুত্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ বুজলেন।

রামকৃষ্ণ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরও হয়ে উঠেছে তীর্থভূমি। সেখানে মাঝে মাঝেই এসে উপস্থিত হন কত সাধুপুরুষ, কত গুণী জ্ঞানী। বিখ্যাত মানুষ। তিনিও মাঝে মাঝে বিখ্যাত মানুষদের বাড়ি যান। একদিন গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি। খ্রীষ্টধর্মের বন্যায় যখন দেশটা ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছিল তখন ব্রাহ্মণধর্মের জীবন তরণী ভাসিয়ে বহু মানুষকে উদ্ধার করেছেন। দেবেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণ বললেন, তুমি তো পাকা খেলোয়াড় হে। একসঙ্গে দু'খানা তলোয়ার ঘোরাও, একটি কর্মের আর একটি জ্ঞানের।

ব্রাহ্মণধর্মের অন্যতম প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িও গেলেন একদিন। সেখানে গিয়ে গান করতে করতে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আর একদিন গেলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। বললেন, এতদিন খাল বিল দেখেছি, এবার সাগর দেখলুম। বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান। রামকৃষ্ণ বললেন, না গো! নোনা জল কেন? তুমি যে বিদ্যার সাগর, ক্ষীরসমুদ্র।

নরেন্দ্রনাথ নিজেই এসেছিলেন রামকৃষ্ণের কাছে। বিখ্যাত দত্ত বাড়ির ছেলে, শিক্ষিত তরুণ। রামকৃষ্ণের প্রভাবে তিনি হয়ে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ শুধু সাধকই নন, তিনি যে প্রেমাবতার। প্রেম বিলাতে বিলাতে তিনি মানুষের মনের কলুষকে দূর করতে লাগলেন, মানুষের মনের পাপ হরণ করতে গিয়ে নিজেই হলেন নীলকণ্ঠ।

গলায় তাঁর ক্ষতরোগ হল। ক্যান্সার। চিকিৎসার জন্য তাঁকে চিকিৎসকের নির্দেশে শিষ্যদের এবং সাধারণ মানুষের তাঁর কাছে যেতে মানা। কিন্তু প্রেমের ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই নিষেধ উপেক্ষা করে কল্পতরু উৎসবের অনুষ্ঠান করলেন। সর্বধর্মের সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশে হৃদয়ের প্রেম নিঃশেষে বিতরণ করতে লাগলেন।

ইংরেজি ১৮৮৬ সাল, বাংলা ১২৯৩ সালের ১লা ভাদ্র মহাসমাধিতে নিমগ হলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

১০

শ্রীচৈতন্য

[১৪৮৬-১৫৩৩]

মধ্যযুগে মুসলমানরাই ছিলেন এ দেশের শাসক। ইসলাম ছিল রাজধর্ম। ইসলাম ধর্ম ছিল উম্মুক্ত। ধর্মের মধ্যে উচু-নিচু ভেদাভেদ, জাতিভেদ ছিল না। মসজিদে ছিল সকলের প্রবেশাধিকার। মক্তব-মাদ্রাসায় যে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত।

অপরদিকে হিন্দুসমাজ ছিল একেবারে বিপরীত। ধর্মের এক অচলায়তন। জাতিবেদ আর সংকীর্ণ গোঁড়ামিতে সমস্ত সমাজ শতবিভক্ত। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, ব্রাহ্মণ সকলেই অন্যের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত। পরস্পরের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ আর ঘৃণা। মন্দির, পূজামণ্ডপের দ্বার শুধু মাত্র উচ্চবর্ণের মানুষদের জন্যেই উন্মুক্ত। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের কোন স্থান নেই সেখানে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে কোন সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না। হিন্দুদের উপর চলত সুলতানী সৈন্যদের অত্যাচার। লুঠতরাজ ছিল সাধারণ ঘটনা। সুন্দরী মেয়েদের উপর ছিল না তার। সমাজ তাকে রক্ষা করত না শাস্তি দিতে দ্বিধা করত না।

জীবনের সর্বস্তরে ছিল হাজার ছুৎমার্গের বেড়াজাল। ব্রাহ্মণদের জন্যেই শুধু ছিল শিখার সুযোগ। তাদের প্রবল প্রতাপে অতিষ্ঠ হয়ে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দু সমাজের এই সর্বনাশা অবক্ষয়ের যুগে শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব।

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে ফেব্রুয়ারি। বাংলা ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমা। সেদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ। নবদ্বীপের মায়াপুর পল্লীতে নিমাইয়ের জন্ম হল। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীনদেবী। সেই সময় দাদা বিশ্বরূপের বয়স ছিল দশ। ছেলেবেলা থেকেই বিশ্বরূপ ছিলেন শান্ত, সংসারের প্রতি উদাসীন। মাত্র ষোল বছর বয়েসে সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আর তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

জ্যেষ্ঠপুত্রের এই বিচ্ছেদ ব্যথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না জগন্নাথ মিশ্র। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। বালক পুত্রকে নিয়ে সংসারের সব ভার নিজের কাধে তুলে নিলেন শচী দেবী।

বালক নিমাই ভর্তি হলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে। যেমন মেধাবী তেমনি চঞ্চল। কৈশোর উত্তীর্ণ হতেই হয়ে উঠলেন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কিন্তু যেমন তার্কিক তেমনি অহংকারী। কূট প্রশ্ন তুলে মানুষকে বিব্রত করতে আনন্দ পেতেন।

সংসারে অভাব অনটন, তাই নিজেই টোল স্থাপন করলেন নিমাই পণ্ডিত। তাঁর খ্যাতি আর পাণ্ডিত্যের আকর্ষণে অল্প দিনেই টোল ভরে উঠল। পুত্রকে উপার্জনক্ষম দেখে শচীমাতা লক্ষ্মী নামে সুলক্ষণা এক কন্যার সাথে তার বিবাহ দিলেন।

এই সময় কেশব নামে কাশ্মীরের এক পণ্ডিত বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে নবদ্বীপে এলেন। তার পাণ্ডিত্যের কথা শুনে স্থানীয় কোন পণ্ডিতই তার সাথে বিচারে অবতীর্ণ হতে সাহসী হলেন না। অবশেষে কেবশ নিমাই পণ্ডিতের দর্শন পেয়ে তাঁকেই বিচারে আহ্বান করলেন। কেশব মুখে মুখে গঙ্গার স্তব রচনাা করলেন। সকলে মুগ্ধ। কিন্তু নিমাই প্রতিটি শ্লোকের অশুদ্ধি আর অপপ্রয়োগ নির্ণয় করে কেশবকে পরাজিত করলেন। নিমাইয়ের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুদিনের জন্য পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গেলেন নিমাই। সেখানে যথেষ্ট খ্যাতি সম্মান অর্থ পেলেন। নবদ্বীপে ফিরে এসে এক বেদানাদায়ক সংবাদ পেলেন। স্ত্রী লক্ষ্মী সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে। শোকের আবেগটা স্তিমিত হয়ে আসতেই শচীদেবী পুনরায় নিমাইয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। কন্যার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পিতা জগন্নাথ মিশ্র বহুদিন মারা গিয়েছেন। তাঁর পিণ্ডদান করতে গয়ায় গেলেন নিমাই। সেখানে বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে তার মধ্যে জেগে উঠল এক পরিবর্তন। চঞ্চল উদ্ধত অহংকারী নিমাই চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন। তার মধ্যে জন্ম নিল কৃষ্ণ অনুরাগী এক প্রেমিক সাধক। দিন রাত শুধু কৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল। যা কিছু দেখেন তাকেই কৃষ্ণ বলে আলিঙ্গন করেন। তার এই আকুলতা দেখে সকলে বিস্মিত। এতো পরম সাধকের লক্ষণ।

টোলে অধ্যাপনায় আর কোন আগ্রহ নেই। সামনে খোলা পুঁথি পড়ে থাকে। ছাত্ররা কলরব করতে থাকে। নিমাই তাদের নিয়ে নামকীর্তন আরম্ভ করেন। এক এক সময় ভাবে বিভোর হয়ে

যান। বাহ্য জ্ঞান থাকে না। তার এই অপ্রকৃতিস্থ ভাব দেখে শচীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

সেই সময় বৈষ্ণবদের সমাজে তেমন কোন প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। সংখ্যাতেও তারা ছিল নগণ্য। নিমাইকে পেয়ে বৈষ্ণব সমাজের বুকে যেন প্রাণের জোয়ার বয়ে যায়।

অদ্বৈত আচার্য ছিলেন বৈষ্ণব সমাজের প্রধান। জ্ঞান ভক্তিতে তাঁর কোন তুলনা ছিল না। নিমাইকে দেখা মাত্রই তাঁর মনে হল মানব যেন তার আরাধ্য দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। এতদিন তিনি যেন এই মানুষটিরই প্রতীক্ষা করছিলেন। বৃদ্ধ দ্বৈত পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে নিমাইকে বরণ করে নিলেন। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজ তাকে নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিল।

একদিন নগর কীর্তন করতে করতে নিমাই এসে পড়লেন নন্দন আচার্যের গৃহে। সেখানে ছিলেন সুদর্শন এক অবধূত। বয়সে, তরুণ, মুখে স্নিগ্ধ ভাব, নাম নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দের জন্ম রাঢ় অঞ্চলের একচাকা গ্রামে। বাবার নাম হাড়াই ওঝা। মায়ের নাম পদ্মাবতী। এঁরা ছিলেন রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণনি বৃন্দাবন থেকে বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে করতে এলেন নবদ্বীপে। নিমাইয়ের দর্শন পেতেই আকৃষ্ট হলেন তাঁর প্রতি। তিনি হয়ে উঠলেন নিমাইয়ের প্রধান পার্ষদ।

শ্রীবাসের গৃহপ্রাঙ্গণে চলে নিত্যদিন নামগান আর কীর্তন। সেখানেই শুধুমাত্র গৃহপ্রাঙ্গণে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে সর্ব মানুষের দ্বারে দ্বারে। তিনি নামগান করার ভার দিলেন তার দুই প্রধান ভক্ত নিত্যানন্দ আর যবন হরিদাসকে। একজন হিন্দু অন্যজন মুসলমান। সেই যুগে এ এক দুঃসাহসিক কাজ। সমস্ত ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্দ্ধে উঠে একজন মুসলমানকে দিয়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার-মধ্যযুগে এ ছিল কল্পনীয়।

নগরের পথে পথে ঘুরে ঘুরে তারা কীর্তন করতনে। অনেকে ভাবরসে আপ্লুত হয়ে তাদের সঙ্গী হত। অনেকে বিদ্রূপ করত, উপহাস করত। বিশেষত ব্রাহ্মণ সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। নীচ ধর্মের মানুষেরা যদি এভাবে অপর সকলের সাথে সমমর্যাদা পায় তবে যে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি রসাতলে যাবে। জগাই আর মধ্যেই নামে দুই পাপাচারী ব্রাহ্মণ, যারা সকল পাপকর্মে সিদ্ধ, তারেদ প্ররোচিত করে। একদিন নগরের পথে নামগান করছেন নিমাই আর নিত্যানন্দ। মদ্যপ অবস্থায় দুই ভাই নামকীর্তন বন্ধ করার জন্য চিৎকার করে ওঠে। আত্মহারা নিমাইয়ের কোন কথাই কানে যায় না। রাগেতে মাধাই কলসীর ভাঙা টুকরো তুলে নিয়ে ছুড়ে মারে। নিত্যানন্দের মাথায় এসে আঘাত লাগে। অঝোরে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ে। সেই দৃশ্য দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন নিমাই। তার সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে বহু কষ্টে শান্ত করান নিত্যানন্দ। দুই ভাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপে লজ্জায় শিষ্যত্ব গ্রহন করেন নিমাইয়ের। জয় হয় প্রেমধর্মের।

এই ঘটনা নবদ্বীপের মানুষের মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। চারদিকে বেড়ে চলে সমবেত কীর্তন আর নামগান। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন হোসেন শাহ। বৈষ্ণবদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ভাল চোখে দেখলেন না। তাছাড়া কিছু গোড়া মুসলমানও এর বিরুদ্ধে নালিশ জানাল। চাঁদ কাজী প্রকাশ্য পথে সমবেত কীর্তন বন্ধ করার হুকুম দিলেন।

ভক্তমণ্ডলী ভীত হয়ে পড়ল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ আদেশ দিলেন সন্ধ্যাবেলায় নগরের পথে কীর্তন হবে। শুদু বৈষ্ণবরা নয়, সাধারণ মানুষও দলে দলে যোগ দিল সেইনগর কীর্তনে। প্রকৃত পক্ষে সেদিন নিমাই যে জনজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন, ইতিহাসে তা বিরল। তাঁর এই শক্তির উৎস ছিল জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ। তিনি ধর্ম বর্ণ বৈষম্য মুছে ফেলে সকল মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন। তাই মানুষ তার ডাকে অমন করে সাড়া দিয়েছিল।

নিমাইয়ের ডাকে বার হতেই সস্নেহে নিমাই তার সাথে কথা বললেন। নিমাইয়ের মধুর সম্বোধন, তার আন্তরিকতা, অকৃত্রিম ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন কাজী। হরিনাম সংকীর্তনের উপর থেকে সব বাধানিষেধ তুলে নিলেন। প্রকৃতপক্ষে নিমাই তার প্রেমের শক্তিতে মুসলমান শাসকের কাছ থেকে অবাধ ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন।

গয়াধাম থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নিমাইয়ের জনপ্রিয়তা শুধু বৃদ্ধি পায়নি, তার অনুগামী বৈষ্ণবদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন শুধু নবদ্বীপ নয়, তাঁর কর্মক্ষেত্রকে ছড়িয়ে দিতে হবে আরো বৃহৎ জগতের মাঝখানে। তাঁর এই ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন নিত্যানন্দ ও আরো কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের কাছে। জননী শচীদেবীর কাছেও প্রকাশ করলেন নিজের মনের ইচ্ছা। কিন্তু কোন্ মা তাঁর পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেয়?

১৫১০ খ্রীস্টাব্দে ২৬ শে মাঘ গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করলেন নিমাই। সকলে গভীর ঘুমে অচেতন। নিমাই গঙ্গা পার হয়ে অপর পারে কাটোয়ায় গেলেন। সেখানে ছিলেন কেশব ভারতী। তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে সন্ন্যাস নিলেন। তার নতুন নাম হল শ্রীচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্যের লক্ষ্য নীলাচল। তার অনুগামী ভক্তরা দলে দলে এসে হাজির হয় কাটোয়ায়। প্রভুর বিরহ তারা কেমন করে সহ্য করবে! সকলের অনুরোধে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে কয়েকদিনের জন্য রয়ে গেলেন। শচীদেবী এসে পুত্রের সাথে দেখা করলেন। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে শ্রীচৈতন্য এবার যাত্রা করলেন উড়িষ্যায় পথে। নীলাচলে প্রভু জগন্নাথের দর্শন পাবার জন্যে তার সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

উড়িষ্যা যাত্রা পথে তার সঙ্গী অল্প কয়েকজন ভক্তশিষ্য আর অনুগামী। জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করতেই ভাবে বিহ্বল চৈতন্যদেব জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন; প্রহরীরা বাধা দিতে ছুটে এল। সেই সময়ে সেখানে এসেছিলেন উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের গুরু মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি শ্রীচৈতন্যের অপরূপ দেহলাবণ্য প্রেমবিহ্বল ভাব দেখে তাকে নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন।

বাসুদেব সার্বভৌম শুধু যে উৎকলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক। তার এই আত্মসমর্পণ শুধু যে উড়িষ্যায় আলোড়ন তুলল তাই নয়, সমস্ত দেশের পণ্ডিতরা বিস্মিত হল। মাত্র ২৪ বছরের এক তরুণ কোথা থেকে পেল এমন ঐশীশক্তি যার বলে বাসুদেব সার্বভৌমের মত মানুষ নিজের সব সত্তা বিসর্জন দিয়ে শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। অল্প দিনের মধ্যেই নীলাচলের মানুষ প্রভুর প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেল।

কিছুদিন পর শ্রীচৈতন্য স্থির করলেন দক্ষিণ ভারতে যাবেন। সেখানকার সব তীর্থ দর্শন করবেন। কোন সঙ্গী নেই সাথী নেই, একাই রওনা হলেন।

বিদ্যানগরের শাসক ছিলেন রামানন্দ রায়। উৎকল রাজ্যের প্রতিনিধি পরম ধার্মিক বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্যকে দেখামাত্রই ভাবে আবিষ্ট হয়ে গেলেন রামানন্দ রায়। মনে হল শ্রীচৈতন্যই তার ধ্যানের দেবতা। রামানন্দ রায়ের অনুরোধে সেখানে কয়েক দিনের জন্য রয়ে গেলেন শ্রীচৈতন্য।

দশ দিন পর আবার শ্রীচৈতন্য যাত্রা করলেন দক্ষিণের পথে। একের পর এক তীর্থ দর্শন করতে থাকেন। গেলেন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে, রামেশ্বর, ত্রিবাঙ্কর, আরো বহু স্থান। যেখানেই যান সেখানেই কৃষ্ণনামের জোয়ার বয়ে যায়। শ্রীচৈতন্যের এই দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ ঐতিহাসিক দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যে প্রেমধর্মের প্রচার করেছিলেন তা দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল।

প্রায় দু বছর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে আবার নীলাচলে ফিরে এলেন শ্রীচৈতন্য। তার বিরহে ভক্ত শিষ্যরা সকলেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্যকে ফিরে পেয়ে সমস্ত নীলাচল যেন উৎসব নগরী হয়ে উঠে।

যে সব ভক্ত শিষ্যরা যারা নবদ্বীপ ছেড়ে প্রভুর সাথে নীলাচলে এসেছিল, দীর্ঘ দিন পরবাসে থেকে সকলেরই মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্য ও উপলব্ধি করেছিলেন। তাছাড়া তার অবর্তমানে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের জন্য উপযুক্ত মানুষের প্রয়োজন। সে কাজের ভার তুলে দিলেন নিত্যানন্দের উপর। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন সংসারী হয়ে তুমি গৃহী মানুষের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার কর।

১৫১৪ সালে বিজয়া দাশমীর দিন নীলাচল ত্যাগ করে যাত্রা করলেন নবদ্বীপের পথে। প্রথমে এলেন কটকে। স্থানীয় মুসলমান শাসকরাও তার প্রেমগানে এতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে নদী পার করে গৌড়ে পৌঁছবার সকল ব্যবস্থা করে দিলেন।

শ্রীচৈতন্য এলেন কুমারহট্ট গ্রামে শ্রীবাসের গৃহে। তারপর শান্তিপুর হয়ে এলেন নবদ্বীপে। তার শৈশব কৈশোর যৌবনের কিছু অংশের লীলাভূমি এই নবদ্বীপে। নবদ্বীপবাসীরাও শ্রীচৈতন্যের নামগানে বিভোর।

শচীমাতা এলেন পুত্র দর্শনে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কুলবধূ, তাছাড়া সন্ন্যাস গ্রহণের পর তো সন্ন্যাসীর স্ত্রীমুখ দর্শন নিষিদ্ধ। তবুও তার সমস্ত অন্তর স্বামী দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সব দ্বিধা-সংকোচ দূর করে বিষ্ণুপ্রিয়া এলেন। শ্রীচৈতন্যের কাছে এসে প্রণাম করতেই প্রভু বললেন, তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও।

শ্রীচৈতন্য নিজে কোন ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেননি। নিজে কোন ধর্মগ্রন্থও রচনা করেননি।

সচরাচর উপদেশও দিতেন না তবুও হাজার হাজার মানুষ এক অদৃশ্য আকর্ষণে বার বার তাঁর কাছে ছুটে এসেছে। কারণ তার মত এমন করে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে কেউ প্রেমের মন্ত্র প্রচার করেনি। তিনি সে যুগের অধিকাংশ সাধু-সন্তের মত মানবতা-বিমুখী সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে ছিল মানবীয় চেতনা, তাই তিনিই প্রথম দক্ষিণ ভারতের ঘৃণা দেবদাসী প্রথা বিলোপ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। নারীদের প্রতি তার ছিল অপরিমেয় শ্রদ্ধা। তিনি পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত ভারতবর্ষের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন শান্তি আর ঐক্য। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় হোসেন শাহ ও রাজা প্রত্যপরুদ্র পারস্পরিক যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

তিনি মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন মানুষ হিসেবে। তাঁর মধ্যেই বাংলার মানুষ খুঁজে পেয়েছিল একসাহাসী ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষকে যিনি অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন গণ প্রতিরোধ। কিন্তু তিনি যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের সূচনা করেছিলেন, যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে সেই মহৎ সম্ভাবনা পূর্ণ হয়নি।

১৫২২ খৃষ্টাব্দে, শ্রীচৈতন্যের তখন ৩৬ বছর বয়স প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই তার মধ্যে শুরু হয় দিব্যোন্মাদ অবস্থা। বাহ্য জগতের সাথে সম্পর্ক ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসে। অধিকাংশ সময়ই কৃষ্ণনামে বিভোর হয়ে থাকতেন।

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জুন,আশাঢ় মাস। শ্রীচৈতন্য তখন অধিকাংশ সময়ই ভাবে বিহ্বল হয়ে থাকতেন। এক এক সময় বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মত পথে বার হয়ে পড়তেন। শিষ্যরা প্রতিনিয়ত তাকে পাহারা দিত।

প্রতিদিন প্রভু একবার করে জগন্নাথের মন্দিরে যেতেন। সেদিনও মন্দিরে গিয়েছেন। তিনি সাধারণত নাটমন্দিরের গরুর স্তম্ভের নীচে গিয়ে দাড়াতেন, সেখান থেকে দর্শন করতেন প্রভু জগন্নাথকে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি মন্দিরের মূল গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন। সাথে সাথে মন্দিরের দরজা বন্ধ হইল। সেই সময় মন্দিরের মধ্যে কি ঘটেছিল তা জানা যায় না। কিন্তু যখন মন্দিরের দরজা খোলা হল তখন ভেতরে প্রভু নেই। চারদিকে প্রচার করা হয় তিনি জগন্নাতের সাথে লীন হয়ে গেছে। ভক্তজনের কাছে একথা বিশ্বাসযোগ্য হলেও প্রকৃত সত্য কি তাই?

বহু ঐতিহাসিকের অনুমান নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব জনপ্রিয়তা দেখে জগন্নাথ মন্দিরের পূজারীরা চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। বহু মানুষ জগন্নাথদেবকে না দেখে শুধুমাত্র শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করতেন। এতে ক্ষুব্ধ পূজারীরা তাকে মন্দিরের মধ্যে হত্যা করে কোন গোপন পথে দেহ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। তাই বোধ হয় সাহিত্যিক কালকূট লেখেন–কোথায় গেলেন শ্রীচৈতন্য? কাদের হাতে তোমার রক্ত লেগে রইল? আমরা কি সেই সব রক্তাক্ত হাতে পূজার ডালি সাজিয়ে দিই?

১১
অ্যারিস্টটল

[খ্রীঃ পূর্ব ৩৮৪—৩২২]

বিশ্ববিজয়ী বীর সম্রাট আলেকজান্ডার দুঃখ করে বলেছিলেন জয় করবার জন্য পৃথিবীর আর কোন দেশই বাকি রইল না। তাঁর শিক্ষক মহাপণ্ডিত অ্যারিস্টটল সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। জ্ঞানের এমন কোন দিক নেই তিনি যার পথপ্রদর্শক নন। তাঁর Politics গ্রন্থ আধুনিক রাষ্ট্রনীতির সূচনা করেছে। Poetice গ্রন্থের নাট্যতত্ত্ব কাব্যতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আধুনিক জীবনবিজ্ঞানের তিনিই জনক। বহু দার্শনিক তত্ত্বের প্রবক্তা।

তাঁর চিন্তা জ্ঞান মনীষা প্রায় দুই হাজার বছর ধরে মানব সভ্যতাকে বিকশিত করেছিল।

৩৮৪ খ্রীস্ট পূর্বে থ্রেসের অন্তর্গত স্তাজেইরা শহরে অ্যারিস্টটল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন চিকিৎসক। নাম নিকোমাকাস।

শৈশবে গৃহেই পড়াশুনা করেন অ্যারিস্টটল। ১৭ বছর বয়েসে পিতা-মাতাকে হারিয়ে গৃহত্যাগ করেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এথেন্সে এসে উপস্থিত হন। সেই সময় এথেন্স ছিল শিক্ষার কেন্দ্র সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গড়ে তুলেছেন নতুন এ্যাকাডেমি। সেখানে ভর্তি হলেন অ্যারিস্টটল। অল্প দিনের মধ্যেই নিজের যোগ্যতায় তিনি হয়ে উঠলেন এ্যাকাডেমির সেরা ছাত্র। প্লেটোও তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

শিক্ষাদান ছাড়াও নানান বিষয় নিয়ে গবেষণার কাজ করতেন অ্যারিস্টটল তর্কবিদ্যা,

অধিবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর গভীর জ্ঞান, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপেরও অজ্ঞাত ছিল না। পুত্র আলেকজান্ডারের জন্ম সময়েই তাঁর শিক্ষার ভার অর্পণ করেন অ্যারিস্টটলের উপর। তখন অ্যারিস্টটল আটাশ বছরের যুবক।

আলেকজান্ডার যখন তেরো বছরের কিশোর, রাজা ফিলিপের আমন্ত্রণে অ্যারিস্টটল এসে তাঁর শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। শ্রেষ্ঠ গুরুর দিগ্বিজয়ী ছাত্র। বহু প্রাচীন ঐতিহাসিকের ধারণা অ্যারিস্টটলের শিক্ষা উপদেশই আলেকজান্ডারের অদম্য মনোবল লৌহকঠিন দৃঢ় চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে একজনের ছিল সমগ্র পৃথিবীকে জয় করে তার উপর প্রভুত্ব করবার প্রবল ইচ্ছা। অন্য জনের ছিল জ্ঞানের নতুন নতুন জগৎ আবিষ্কার করে মানুষের জন্য তাকে চালিত করার ইচ্ছা।

অ্যারিস্টটলের প্রতি রাজা ফিলিপেরও ছিল গভীর শ্রদ্ধা। শুধু পুত্রের শিক্ষক হিসাবে নয়, যথার্থ জ্ঞানী হিসাবেও তাকে সম্মান করতেন। অ্যারিস্টটলের জন্মস্থান স্তাজেইরা কিছু দুর্বৃত্তের হাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেখানকার বহু মানুষ বন্দী জীবন যাপন করছিল। রাজা ফিলিপ অ্যারিস্টটলের ইচ্ছায় শত্রু সেনার হাত থেকে শুধু স্তাজেইরা উদ্ধার করেননি, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে শহরকে নতুন করে গড়ে তুললেন।

অ্যারিস্টটল একদিকে ছিলেন মহাজ্ঞানী, অন্যদিকে সার্থক শিক্ষক। তাই গুরুর প্রতি আলেকজান্ডারের ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তিনি বলতেন, পিতার কাছে পেয়েছি আমার এই জীবন আর গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছি কিভাবে এই জীবনকে সার্থক করা যায় তার জ্ঞান। যখন অ্যারিস্টটল জীবন বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার কাজ করছিলেন, আলেকজান্ডার তাঁর সাহায্যের জন্য বহু মানুষকে নিযুক্ত করেছিলেন, যাদের কাজ ছিল বিভিন্ন ধরনের মাছ, পাখি, জীবজন্তুদের জীবন পর্যবেক্ষণ করা, তার বিবরণ সংগ্রহ করে পাঠানো। দেশ-বিদেশের যেখানেই কোন পুথি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যেত, আলেকজান্ডার যে কোন মূল্যেই হোক সেই পুঁথি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে গুরুর হাতে তুলে দিতেন।

যখন আলেকজান্ডার এশিয়া জয়ের নেশায় সৈন্যবাহিনী নিয়ে বার হলেন, অ্যারিস্টটল ফিরে গেলেন এথেন্সে। তখন এথেন্স ছিল শিল্প সংস্কৃতি শিক্ষার পীঠস্থান। এখানেই স্কুল স্থাপন করলেন অ্যারিস্টটল। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর। স্কুলের নাম রাখা হল লাইসিয়াম। কারণ কাছেই ছিল গ্রীক দেবতা লাইসিয়ামের মন্দির।

৩২৩ খ্রীস্টপূর্বে আলেকজান্ডারের আকস্মিক মৃত্যু হল। এতদিন বীর ছাত্রের ছত্রছায়ায় যে জীবন যাপন করতেন তাতে বিপর্যয় নেমে এল। কয়েকজন অনুগত ছাত্রের কাছ থেকে সংবাদ পেলেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সক্রেটিসের অন্তিম পরিণতির কথা অজানা ছিল না অ্যারিস্টটলের। তাই গোপনে এথেন্স ত্যাগ করে ইউরিয়া দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু এই স্বেচ্ছানির্বাসের যন্ত্রণা বেশিদিন ভোগ করতে হয়নি অ্যারিস্টটলকে। ৩২২ খ্রীস্ট পূর্ব তাঁর মৃত্যু হল।

অ্যারিস্টটলের এই সব ভ্রান্ত মতামত কয়েক শতাব্দী ধরে সমাজকে চালিত করেছে। তার জন্যে অ্যারিস্টটলকে অভিযুক্ত করা যায় না। উত্তরকালের মানুষেরই দায়িত্ব ছিল তাঁর গবেষণার সঠিক মূল্যায়ন করা। কিন্তু সে কাজে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

সমস্ত ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও অ্যারিস্টটল মানব ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞা—যার সৃষ্ট জ্ঞানের আলোয় মানুষ নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে, মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

১২
আর্কিমিডিস

[২৮৭—২১২ খৃষ্ট পূর্ব]

সাইরাকিউসের সম্রাট হিয়েরো এক স্বর্ণকারকে দিয়ে একটি সোনার মুকুট তৈরি করেছিলেন। মুকুটটি হাতে পাওয়ার পর সম্রাটের মনে হল এর মধ্যে খাদ মিশানো আছে। কিন্তু স্বর্ণকার খাদের কথা অস্বীকার করল। কিন্তু সম্রাটের মনের সন্দেহ দূর হল না। তিনি প্রকৃত সত্য নিরূপণের ভার দিলেন রাজদরবারের বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের উপর।

মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন আর্কিমিডিস। সম্রাটের আদেশে মুকুটের কোন ক্ষতি করা যাবে না। আর্কিমিডিস ভেবে পান না মুকুট না ভেঙে কেমন করে তার খাদ নির্ণয় করবেন। কয়েকদিন

কেটে গেল। ক্রমশই অস্থির হয়ে ওঠেন আর্কিমিডিস। একদিন দুপুরবেলায় মুকুটের কথা ভাবতে ভাবতে সমস্ত পোশাক খুলে চৌবাচ্চায় স্নান করতে নেমেছেন। পানিতে শরীর ডুবতেই আর্কিমিডিস লক্ষ্য করলেন কিছুটা পানি চৌবাচ্চা থেকে উপছে পড়ল। মুহূর্তে তাঁর মাথায় এক নতুন চিন্তার উন্মেষ হল। এক লাফে চৌবাচ্চা থেকে উঠে পড়লেন। তিনি ভুলে গেলেন তাঁর শরীরে কোন পোশাক নেই। সমস্যা সমাধানের আনন্দের নগ্ন অবস্থাতেই ছুটে গেলেন রাজ দরবারে।

মুকুটের সমান ওজনের সোনা নিলেন। একপাত্র পানিতে মুকুটটি ডোবালেন। দেখা গেল খানিকটা পানি উপছে পড়ল। এইবার মুকুটের ওজনের সমান সোনা নিয়ে জলপূর্ণ পাত্রে ডোবানো হল। যে পরিমাণ পানি উপছে পড়ল তা ওজন করে দেখা গেল আগের উপছে পড়া পানি থেকে তার ওজন আলাদা। আর্কিমিডিস বললেন, মুকুটে খাদ মেশানো আছে। কারণ যদি মুকুট সম্পূর্ণ সোনার হত তবে দুটি ক্ষেত্রেই উপছে পড়া পানির ওজন সমান হত।

এই আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হল একটি বৈজ্ঞানিক সূত্র। "তরল পদার্থের মধ্যে কোন বস্তু নিমজ্জিত করলে সেই বস্তু কিছু পরিমাণে ওজন হারায়। বস্তু যে পরিমাণে ওজন হারায় সেই পরিমাণ ওজন বস্তুর অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান।" এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর্কিমিডিসের সূত নামে বিখ্যাত।

আর্কিমিডিসের জন্ম আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২৮৭ সালে। সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সাইরাকিউস দ্বীপে। পিতা ফেইদিয়াস ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ।

কৈশোর ও যৌবনে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে পড়াশুনা করেছেন। সেই সময় আলেকজান্দ্রিয়া ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান। ছাত্র অবস্থাতেই আর্কিমিডিস তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সুমধুর ব্যক্তিত্বের জন্য সর্বজন পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর গুরু ছিলেন ক্যানন। ক্যানন ছিলেন জ্যামিতির জনক মহান ইউক্লিডের ছাত্র। পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি চেয়েছিলেন গণিতবিদ হবেন। অঙ্কশাস্ত্র, বিশেষ করে জ্যামিতিতে তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। ইউক্লিড, ক্যানন যেখানে তাঁদের বিষয় সমাপ্ত করেছিলেন আর্কিমিডিস সেখান থেকেই তাঁর কাজ আরম্ভ করেন।

আর্কিমিডিস যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন। কারো আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করাও তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন সাইরাকিউসের প্রজা, সম্রাট হিয়েরার রাজকর্মচারী তাই নিরুপায় হয়েই তাঁকে সম্রাটের আদেশ মেনে চলতে হত।

সম্রাটের আদেশেই তিনি প্রায় ৪০টি আবিষ্কার করেন। তার মধ্যে কিছু ব্যবসায়ীকে জিনিস হলেও অধিকাংশই ছিল সামরিক বিভাগের প্রয়োজন।

আর্কিমিডিসের একটি আবিষ্কার পুল ও লিভার। একবার কোন একটি জাহাজ চরায় এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে তাকে আর কোনভাবেই পানিতে ভাসানো সম্ভব হচ্ছিল না। আর্কিমিডিস ভালভাবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর মনে হল একমাত্র যদি এই জাহাজটাকে উঁচু করে তোলা যায় তবেই জাহাজটাকে পানিতে ভাসান সম্ভব। আর্কিমিডিসের কথা শুনে সকলে হেসেই উড়িয়ে দিল।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই উদ্ভাবন করলেন লিভার আর পুলি। জাহাজ ঘাটে এটা উঁচু জায়গার লিভার খাটাবার ব্যবস্থা করলেন। তার মধ্যে বিরাট একটা দড়ি বেঁধে দিলেন। দড়ির একটা প্রান্ত জাহাজের সঙ্গে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা হল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে সম্রাট হিয়েরো নিজেই এলেন জাহাজ ঘাটায়। নগর ভেঙে যেখানে যত মানুষ ছিল সকলে জড় হয়েছে। আর্কিমিডিস সম্রাটকে অনুরোধ করলেন লিভার লাগানো দড়ির আরেকটা প্রান্ত ধরে টানতে। আর্কিমিডিসের কথায় সম্রাট তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়িটা ধরে টান দিলেন। সাথে সাথে অবাক কাণ্ড। নড়ে উঠল জাহাজটা। চারদিকে চিৎকার উঠল। এবার সম্রাটের সাথে দড়িতে হাত লাগালেন আরো অনেকে। সকলে মিলে টান দিতেই সত্যি সত্যি জাহাজ শূন্যে উঠতে আরম্ভ করল। সম্রাট আনন্দে বুকে জুড়িয়ে ধরলেন আর্কিমিডিসকে।

এই আবিষ্কারের ফলে বড় বড় পাথর, ভারী জিনিস, কুয়া থেকে জল তোলার কাজ সহজ হল। একবার আর্কিমিডিস গর্ব করে বলেছিলেন, আমি যদি পৃথিবীর বাইরে দাঁড়াবার একটু জায়গা পেতাম তবে আমি আমার এই লিভার পুলির সাহায়ে পৃথিবীটাকেই নাড়িয়ে দিতাম।

সৈনিকটি বলে উঠল, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমাদের সেনাপতি তোমার খোঁজ করছেন।

বৃদ্ধ আর্কিমিডিস বলে উঠলেন, আমি এখন ব্যস্ত আছি। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যেতে পারব না।

এ ধরণের কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিল না রোমান সৈন্যটি। তাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাকে তা পালন করতেই হবে। আর্কিমিডিসের হাত ধরতেই এক টানে ছাড়িয়ে নিলেন আর্কিমিডিস।

আমার কাজ শেষ না হলে কোথাও যেত পারব না।

আর সহ্য করতে পারল না সৈনিক। পরাজিত দেশের এক নাগরিকের এতদূর স্পর্ধা, তার হুকুম অগ্রাহ্য করে! একটানে কোমরের তলোয়ার বার করে ছিন্ন করল মহা বিজ্ঞানীর দেহ। রক্তের ধারায় শেষ হলে গেল তাঁর অসমাপ্ত কাজ।

আর্কিমিডিসকে হত্যা করা হয়েছিল সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ২১২ সালে। বিজ্ঞানীর ছিন মুণ্ডু দেখে গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন মার্কিউলাস। তিনি মর্যাদার সাথে আর্কিমিডিসের দেহ সমাহিত করেন।

মহাবিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের আবিষ্কার সম্বন্ধে সঠিক কোনতথ্য জানা যায় না। সামরিক প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলেও ঐ বিষয়ে তার কোন আগ্রহ ছিল না। মূলত গাণিতিক বিষয়েই ছিল তাঁর আগ্রহ। দিনের অধিকাংশ সময়েই তিনি গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন। বাইরের জগতের সব কথাই তিনি তখন ভুলে যেতেন। এমন বহু সময় গিয়েছে তাঁর কাজের লোক তাঁকে খাবার দিয়ে গিয়েছে, সারাদিনে তিনি সেই কাবার স্পর্শই করেননি। ভুলেই গিয়েছেন খাবার কথা। আবার কখনো স্নান করতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানেই কাটিয়ে দিতেন। খোঁজ করতে দেখা গেল তিনি স্নানাগারের দেওয়ালেই অঙ্ক কষে চলেছেন। বলবিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতিবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা বারোটি। এছাড়াও তিনি আর যে সমস্ত রচনা করেছিলেন তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

গণিত সংক্রান্ত ব্যাপারে আর্কিমিডিসের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল—

(১) বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত ৩10/৭১ ও ৩1/৭ এর মধ্যে অবস্থিত।

(২) অধিবৃত্তীয় অংশগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করেছিলেন।

(৩) শঙ্কুকৃতি এবং গোলাকৃতি বস্তুর সম্বন্ধে ৩২টি প্রতিজ্ঞা উদ্ভাবন করেছিলেন।

(৪) বলবিদ্যার তত্ত্বের ভীত হিসাবে সমতল ক্ষেত্রের সাম্যতা সম্বন্ধে তত্ত্ব নির্ধারণ করেন।

তাঁর বহু আবিষ্কৃত সত্য আজও বিজ্ঞানীদের পথ নির্দেশ করে।

১৩
লেভ তলস্তয়
[১৮২৮–১৯১০]

এই মহান রুশ মনীষী, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, মানবতাবাদী তলস্তয়ের জন্ম হয় ১৮২৮ সালের ২৮শে আগস্ট (৯ সেপ্টেম্বর) রাশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বাবা-মা দুই দিক থেকেই তলস্তয় ছিলেন খাঁটি অভিজাত। তলস্তয়ের বাবা নিকোলাস ছিলেন বিশাল জমিদারির মালিক।

লিও তলস্তয় ছিলেন তাঁর পিতামাতার চতুর্থ পুত্র। তাঁর জন্মের এক বছর পরেই তাঁর মা মারা গেলেন। তাঁর দেখাশুনার ভার ছিল এক ফুফুর উপর।

পাঁচ বছর বয়সে বাড়িতেই শুরু হল তাঁর পড়াশুনা, একজন জার্মান শিক্ষক তাঁকে পড়াতেন।

যখন তাঁর আট বছর বয়স, ভাইদের সাথে তাঁকে পলিয়ানার গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে যেতে হল মস্কোতে।

বেশিদিন তাঁকে মস্কোতে থাকতে হল না। এক বছর পর হঠাৎ নিকোলাস মারা গেলেন। তাঁদের অভিভাবিকা হলেন ফুফু। বড় দুই ভাই মস্কোতে রয়ে গেল, তলস্তয় ফিরে গেলেন ফুফুর কাছে পলিয়ানায়। বাড়িতে শিক্ষক ঠিক করা হল। তাঁর কাছেই শিখতে আরম্ভ করলেন জার্মান আর রুশ ভাষা।

আবার নতুন করে সৃষ্টির কাজে হাত দিলেন তলস্তয়। এই পর্যায়ে তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কিছু ছোট গল্প। মানুষ কি নিয়ে বাঁচে, দুজন বৃদ্ধ মানুষ যেখানে ভালবাসা সেখানেই ঈশ্বর, বোকার ইভানের গল্প, তিনজন সন্ন্যাসী, মানুষের কতটা জমি প্রয়োজন, ধর্মপুত্র—এই

গল্পগুলির মধ্যে একদিকে রয়েছে নৈতিক শিক্ষা অন্যদিকে সৎ সরল জীবন পথের নির্দেশ। এক অসাধারণ সৌন্দর্য ফুটে রউঠেছে প্রতিটি গল্পে। পাঠকের হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে তা স্পর্শ করে। পরবর্তীকারে এই গল্পগুলি সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয় ২৩টি গল্প (১৯০৬)।

১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হল তাঁর সবচেয়ে বিতর্কিত উপন্যাস ক্রয়োজার সোনেটা। তখন তলস্তয়ের বয়স ৬১ বছর। এতে লিখলেন এক বৃদ্ধ কি প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় ঈর্ষাপ্রণোদিত দ্বিচারিণী স্ত্রীকে হত্যা করেছিল। এই রচনা প্রকাশের সাথে সাথে চারিদিকে বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল। নিন্দা বিদ্রূপ আর কটূক্তিতে ছেয়ে গেল চারদিক—সমালোচনা করা হল এক বিকৃত যৌনতা ফুটে উঠেছে এর মধ্যে। লেখক সমস্ত সমাজ সংসারক ধ্বংস করবার কাজে নেমেছেন। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল এই বই। কিন্তু তার আগেই হাজার হাজার কপি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র।

সোভিয়েত রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হাজার হাজার মানুষ অনাহারক্লিষ্ট দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। দেশের সরকার এই ঘটনায় সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে রইলেন। কিন্তু তলস্তয় গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। লণ্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি দেশের সরকার তার আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করে বললেন, দেশের দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী বর্তমান প্রশাসন, তাঁর এই সমালোচনার ফলে রুশ দেশের প্রকৃত ছবি পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

ক্ষোভে ফেটে পড়ল জারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা। সকলে বুঝতে পারল রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে এই বার তলস্তয়কে বন্দী করা হবে।

কিন্তু জার গ্রেফতারের অনুমতি দিলেন না।

দুর্ভিক্ষের বিবাদ মিটতে না মিটতেই তলস্তয়ের জীবনে নেমে এল বিরাট এক আঘাত। তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যু হল। এই মৃত্যুতে সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেন তলস্তয়।

ইতিমধ্যে তাঁর আরো কিছু রচনা প্রকাশিত হল। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও তাঁর সৃজনশক্তি এতটুকু হ্রাস পায়নি। এই সময় তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন তাঁর একটি বড় গল্প "হাজি মুরাদ" (Hadji Murad)। এই গল্পটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। এটি তাঁর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। হাজি মুরাদ রচনার সাথে সাথে তিনি তাঁর আর একটি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস! "নবজন্ম" (Resurrection)। রাশিয়ার জার তৃতীয় আলেকজান্ডার মারা গেলেন। নতুন জার হলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস। তৃতীয় আলেকজান্ডার ছিলেন অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী। কিন্তু তাঁর পুত্র ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমনি নিষ্ঠুর। সমস্ত দেশ জুড়ে শুরু হল ধরপাকড় আর নির্যাতন। তলস্তয়ের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করলেও তাঁর অনুগামীদের কারাগারে পাঠানো হল। শুরু হল তাদের উপর নির্যাতন। সরকারের অনুগত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের তরফে বলা হল কোন যাজক তাঁর সংকারে যেন অংশ না নেয়।

এদিকে দেশ জুড়ে লেলিনের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল বিপ্লবী আন্দোলন। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হল তাঁর আবেগময় প্রবন্ধ, "আমি নীরব থাকতে পারি না।" এতে তিনি বিপ্লবীদের উপর অত্যাচারের তীব্র ভাষায় নিন্দা করলেন সাথে সাথে এই রচনা নিষিদ্ধ করা হল।

আশি বছরে পা দিলেন তলস্তয়। সমস্ত দেশের মানুষের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মানবতা আর রুশ সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক।

সমস্ত পৃথিবী তাঁকে সম্মান জানালেও সংসারে চরম অশান্তি। তলস্তয় তাঁর সমস্ত রচনায় গ্রন্থস্বত্ব সমগ্র মানবজাতিকে দান করেছিলেন। তার স্ত্রী সোফিয়া এটি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর অর্থের প্রতি লোভ ক্রমশই বেড়ে চলছিল। এক এক সময় বিবাদ তীব্র আকার ধারণ করত। ক্রমশই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তলস্তয়। এই সময় তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করতেন তাঁর ছোট মেয়ে আলেকজাণ্ডার। কিন্তু স্ত্রী নির্যাতন এমন অবস্থায় পৌছাল তিনি আর ঘরে থাকতে পারলেন না। বেরিয়ে পড়লেন অজানার উদ্দেশ্যে।

পথে আস্তাপগে নামে এক স্টেশনে এসে নেমে পড়লেন। তখন তাঁর প্রচণ্ড জ্বর সেই সাথে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে। স্টেশন সংলগ্ন একটি বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ১৯১০-এর ৭ই নভেম্বর।

১৪

আল ফারাবী

(৮৭০-৯৬৬ খ্রিঃ)

মুসলিম জাতির বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই তাদের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে জানে না। জানার তেমন আগ্রহও নেই। আগ্রহ থাকলেও জানার তেমন কোন পথ ও পাথেয় নেই। রাষ্ট্রশক্তি হারা মুসলমানরা তাদের অতীত ঐতিহ্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানকে ধরে রাখতে পারেনি। মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করে অমুসলিম বিশ্ব আজ উন্নত। অন্যদিকে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব তাদের পূর্ব পুরুষদের দেয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে হারিয়ে আজ মূর্খ ও পরনির্ভরশীল জাতিতে হয়েছে পরিণত। এমন এক যুগ ছিল

যখন সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য ও সভ্যতায় মুসলিম জাতি ছিল উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাকের আশীর্বাদে মুসলিম জাতির মধ্যে ধন্য মানুষের জন্ম হয়েছিল, যারা ছিল ঐশী জ্ঞানে মহিমান্বিত। তাঁদের মধ্যে এবং মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে হতভাগা মুসলমানদের অনেকেই জানে না। না জানাটাও অস্বাভাবিক নয়। কারণ মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে আজ বিকৃত করে রচনা করা হয়েছে। এছাড়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মুসলিম সভ্যতাকে বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণের অধিকাংশের নামই বিকৃত করে লিপিবদ্ধ করেছে। তাই বর্তমান প্রজন্মের জানতে হবে তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল হারানো দিনগুলো সম্পর্কে এবং বিভিন্ন মুসলিম মনীষীদের দেয়া জ্ঞান বিজ্ঞান ও আবিষ্কার সম্পর্কে। অগ্নিপুরুষ সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী বাঙালি মুসলমানদের চোখের সামনে তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস তুলে ধরার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর 'স্পেন বিজয়' কাব্য গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন—

"গাবো সে অতীত কথা, গৌরব কাহিনী,
নাচাইতে মুসলেমের দিস্পন্দন ধমনী।
গাবো সে দুর্দম বীর্য দীপ্ত উন্মাদনা,
কৃপা করি অগ্নিময়ী করো এ রসনা।"

পৃথিবীতে মুসলমানদের উন্নতির জন্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আশীর্বাদ হিসেবে যুগে যুগে যে সকল মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন আল ফারাবী তাঁদের অন্যতম। তাঁর জন্ম তারিখ কত তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। তাঁর জন্ম তারিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এর অন্যতম কারণ হল তৎকালীন যুগে কারো জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। যতদূর জানা যায় এ মনীষী ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কিস্তানের অর্ন্তগত 'ফারাব' নামক শহরের নিকটবর্তী 'আল ওয়াসিজ' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'ফারাব' নামক শহরের নামানুসারে আবু নাসের মোহাম্মদ পরবর্তীতে 'আল ফারাবী' নামে পরিচিত হন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায়, অনেকেই তাঁদের জন্মস্থান, নিকটবর্তী শহর কিংবা দেশের নামে পরিচিত ছিলেন। আল ফারাবীর ক্ষেত্রেও তার বিপরীত ঘটেনি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁর নামকে বিকৃত করে 'ফারাবিয়াস' লিপিবদ্ধ করেছে। আল ফারাবীর পিতা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত এবং সেনাবাহিনীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও রাজনৈতিক কারণে তাঁর পূর্ব পুরুষগণ পারস্য ত্যাগ করে তুর্কিস্তানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

আল ফারাবী বাল্যকাল থেকেই ছিলেন জ্ঞান পিপাসু। অজানাকে জানার এবং অজেয়কে জয় করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর হৃদয়ে। তাই জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁর সারাটা জীবন। জ্ঞানের সন্ধানে তিনি ছুটে চলেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় ফারাবায়। সেখানে কয়েক বছর শিক্ষা লাভের পর শিক্ষার উদ্দেশ্যে চলে যান বোখারায়। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে তিনি গমন করেন বাগদাদে। সেখানে তিনি সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। কয়েকটি ভাষার উপর ছিল তাঁর পূর্ণ দখল। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিলেন তিনি পারদর্শী। দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি আস্তে আস্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা বাকি ছিল না, যেখানে ফারাবীর প্রতিভা বিস্তৃত হয়নি। কিন্তু তারপরও জ্ঞানের পিপাসা তাঁর মিটেনি। জ্ঞানের অন্বেষণে তিনি ছুটে গিয়েছেন দামেস্কে, মিসরে এবং দেশ বিদেশের আরো বহু স্থানে। গবেষণা

করেছেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখা নিয়ে। পদার্থ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতিতে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে বিজ্ঞান ও দর্শনে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক। পদার্থ বিজ্ঞানে তিনিই 'শূণ্যতার' অবস্থান প্রমাণ করেছিলেন। দার্শনিক হিসেবে ছিলেন 'নিয়প্লেটনিস্ট'দের পর্যায় বিবেচিত। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হিসেবে তিনি আরোহণ করেছিলেন জ্ঞানের শীর্ষে।

একবার রাজা সাইফ আদ দৌলার শাহী দরবারে মনীষী আল ফারাবী উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে রাজা বিজ্ঞানী আল ফারাবীর নাম শুনেছিলেন কিন্তু ফারাবীর সাক্ষাৎ পাননি। ফারাবিকে নিকটে পেয়ে রাজা খুব খুশি হন এবং ফারাবীর সাথে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনায় ফারাবীর জ্ঞান ও গুণাবলীতে রাজা মুগ্ধ হন এবং তাঁকে খুব সম্মান দেখান। বিজ্ঞানী আল ফারাবী রাজার সংগী হিসেবে এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন।

বিজ্ঞানী আল ফারাবী সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বহু রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। এ সকল অমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশেরই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর রচিত 'আলা আহলে আল মদীনা আল ফাদিলা (দর্শন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত) গ্রন্থটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে ও তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ তাঁকে বিখ্যাত করেছে। তিনি আজ পৃথিবীতে বেঁচে নেই। কিন্তু মুসলিম জাতির কল্যাণে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের যে মৌলিত আবিষ্কার রেখে গেছেন তা চর্চা করলে মুসলমানরা আজও জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করতে পারবে। তিনি কত সালে ইন্তেকাল করেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। যতদূর জানা যান তিনি ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেছিলেন।

১৫

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

[১৪৫২-১৫১৯]

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যদি পূর্ণ হিসাবে কারো নাম বিবেচনা করতে হয়, তার একটি নাম উচ্চারণ করতে হয়, তিনি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। এমন বহু বিচিত্র প্রতিভার সম্মেলন সম্ভবত অন্য কোন মানুষের মধ্যেই দেখা যায়নি।

তিনি চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, গায়ক, প্রকৃতি বিজ্ঞানী, শরীরতত্ত্ববিদ, সামরিক বিশেষজ্ঞ, আবিষ্কারক, স্টেজ ডিজাইনার দার্শনিক।

প্রতিটি বিষয়েই তিনি চেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে এবং অনেকাংশে তিনি সফলও হয়েছিলেন। এ যেমন একদিকে তাঁর জীবনের গৌরব, অন্যদিকে ব্যর্থতা। তিনি মানবীয় সীমায়িত শক্তি নিয়ে চেয়েছিলেন ঈশ্বরের মত সীমাহীন হতে। তাই সাফল্যের চূড়ায় উঠেও কখনো তৃপ্তি অনুভব করেননি। মনে হয়েছে তাঁর জীবন এক অসমাপ্ত যাত্রাপথ। যে পথের শেষ তাঁর কাছে অগম্যই রয়ে গেল।

ইতালির রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ দ্য ভিঞ্চি বিধাতার পরিহাসে এক কুমারী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (১৪৫২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম) তাঁর বাবার নাম ছিল পিয়েরো এ্যান্টানিও দ্য ভিঞ্চি। পিয়েরো ছিলেন উকিল।

শৈশব থেকেই তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবীকার লিখেছেন, অঙ্কে তাঁর এত মেধা ছিল যে শিক্ষকরা তাঁকে পড়াত, তারা মাঝে মাঝেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। লিওনার্দোর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। তাঁর জিজ্ঞাসায় বিরক্ত হয়ে উঠত শিক্ষকরা। অঙ্ক ছাড়াও সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ। বাঁশি বাজাতেন তিনি। পরবর্তীকালে যখন তিনি বাঁশি বাজাতেন, এক স্বর্গীয় সুষমায় ভরে উঠত সমস্ত পরিমণ্ডল। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল সুমিষ্ট। তাঁর গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হত। সে যুগে চিত্রশিল্পকে কোন সম্মানীয় হিসাবে গণ্য করা হত না। তাছাড়া এতে ছেলের কোন প্রতিভা আছে কিনা সে বিষয়েও পিয়েরো নিশ্চিত ছিলেন না। তাই লিওনার্দো যখন ছবি আঁকা শেখবার অনুরোধ জানাল, সরাসরি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন।

লিওনার্দো উপলব্ধি করতে পারলেন, বাবার অনুমতি ছাড়া আঁকা ছবি সম্ভব নয় তাই একটি বুদ্ধি করলেন। একটা বড় কাঠের পাটাতনের উপর গুহায় ছবি আঁকলেন। গুহার মধ্যে আধো আলো আধো ছায়ার এক অপার্থিব পরিবেশ। তার সামনে এক ভয়ঙ্কর ড্রাগনের ছবি, তার মাথায় শিং। চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে। ভয়ঙ্কর হিংস্র দাঁতগুলো যেন ছুরির ফলা, নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের লেলিহান শিখা।

ছবি আঁকা শেষ হতেই ঘরের মধ্যে ছবিটাকে রেখে সব জানলা বন্ধ করে দিলেন। পিয়েরো কিছুই জানেন না। ঘরে ঢোকামাত্রই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে বেরিয়ে এলেন। পিয়েরো শান্ত হতেই লিওনার্দো গম্ভীর গলায় বললেন, আমি মনে হয় আমার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পেরেছি।

এইবার আর ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করলেন না পিয়েরো। তিনি ছবি আঁকবার অনুমতি দিলেন। সেই সময় ফ্লোরেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন ভেরক্কিয়ো। চিত্রশিক্ষার জন্যে তার স্কুলে গেলেন লিওনার্দো। তখন তাঁর বয়স আঠারো।

লিওনার্দো শুধু ভেরক্কিয়োর কাছে ছবির আঙ্গিক শিক্ষা করেননি, তিনি দু চোখ মেলে দেখতে শিখেছিলেন প্রকৃতির অপরূপ রূপলাবণ্য, তার নিসর্গ শোভা, দেখেছেন নদীস্রোতের মধ্যে জীবনের প্রবাহ। তার সুখ, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা শ্রদ্ধায় গভীরে দেখেছেন নারীকে। ভেরক্কিয়োর কাছেই লিওনার্দো শিখেছিলেন কেমন করে মানব জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে তার অপার রহস্যময়তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয় রঙের তুলিতে। এই কারণেই লিওনার্দো ভেরক্কিয়োকেই তাঁর গুরু হিসাবে স্বীকার করেছেন। দু বছর শিক্ষানবিশী শেষ করে লিওনার্দো স্থির করলেই নিজেই স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা করবেন। ফ্লোরেন্সে শিল্পীদের একটি সঙ্ঘ ছিল। তিনি তাতে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন।

ছবির পাশাপাশি চলছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে ঘটেছিল বিজ্ঞানী আর শিল্পীর এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। তাঁর চিন্তা কল্পনা অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ লিখে রাখতেন খাতার পাতায়। দেখতে দেখতে দশ বছর ফ্লোরেন্সে কাটিয়ে দিলেন লিওনার্দো। এই সময় তিনি এঁকেছেন বেশ কিছু ছবি—এ্যানোনসেশন, মেরি ও যীশুর দুখানি ছবি, এক রমণীয় প্রতিকৃতি।

ফ্লোরেন্সে থাকাকালীন সময়ে লিওনার্দো যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন, তার অধিকাংশই ছিল প্রচলিত শিল্পীরীতির থেকে স্বতন্ত্র। তার এক শিল্পীর স্টুডিওর চার-দেওয়ালের মধ্যে বসেই সব ছবি আঁকতেন। লিওনার্দোই প্রথম শিল্পী যিনি প্রকৃতির ছবি আঁকবার জন্যে প্রকৃতির কাছে যেতেন। যা প্রত্যক্ষ করতেন তাকেই যানে রঙে রাঙিয়ে রূপ দিতেন। ছবির মধ্যে তিনিই প্রথম শেডের ব্যবহার আরম্ভ করেন।

লিওনার্দো স্থির করলেন, তিনি মিলানে যাবেন। মিলানের অধিপতি ছিলেন লুডোভিকো। ১৪৮২ সালে লিওনার্দো মিলানো এলেন। সেই সময় ফ্লোরেন্সের ডিউকের প্রাসাদে এক সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে লিওনার্দো তাঁর বাঁশি বাজালেন। তাঁর অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন ডিউক। তাকে নিজের প্রাসাদে আমন্ত্রণ করলেন। কয়েকদিনের পরিচয়েই ডিউক উপলব্ধি করতে পারলেন কি অসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষ এই লিওনার্দো! তিনিই তাকে মিলানের অধিপতি লুডোভিকোর কাছে পত্র লিখতে অনুরোধ করলেন। লিওনার্দো লিখলেন তাঁর সেই বিখ্যাত পত্র। এতে তিনি লিখলেন সামরিক প্রয়োজন ৯টি মৌলিক সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কারের কথা।

মিলানোর অধিপতি আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন লিওনার্দোকে। প্রথম সাক্ষাতেই মুগ্ধ হলেন লুডোভিকো। লিওনার্দোকে নিজের রাজদরবারের অন্যতম প্রধান সভাসদ করে নিলেন। রাজপ্রাসাদেই তাঁর থাকার আয়োজন করা হল।

শুরু হল লিওনার্দোর জীবনের আরেক অধ্যায়। দীর্ঘ আঠেরো বছর লিওনার্দো ছিলেন মিলানে উদার হৃদয় লুডোভিকোর সাহচর্যে এখানেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল।

বহুদিন ধরেই লিওনার্দো কল্পনা করতেন এক আদর্শ শহরের। যে শহর হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, যেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকবে। তিনি দুদিকে বিভক্ত। একদিকে মানুষ, যানবাহন যাবে, অন্যদিকে আসবে। শহর হবে ছোট। তাতে ৫০০০-এর বেশি বাড়ি থাকবে না। ছোট ছোট শহর রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ। শহর বড় হলে লোকসংখ্যা বাড়বে। তখন দেখা দেবে নানান সমস্যা। তাছাড়া শহরের সামর্থ্যের তুলনায় মানুষের সংখ্যা বেশি হলে তা হবে খোঁয়াড়ের মত। অস্বাস্থ্যকর অসুবিধাজনক। শহরের কোন নর্দমাই বাইরে হবে না। প্রতিটি নর্দমা হবে মাটির নিচে। সেখান দিয়ে শহরের সব আবর্জনা শহরের বাইরে নদীতে গিয়ে পড়বে। লিওনার্দোর এই আদর্শ শহরের পরিকল্পনা সর্বযুগে সর্বকালেই প্রযোজ্য। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লুডোভিকো লিওনার্দোর এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি।

শুরু হল লিওনার্দোর ভাবনা। কি ছবি আঁকবেন? দীর্ঘ ভাবনার পর স্থির করলেন যীশুর শেষ ভোজের ছবি আঁকবেন—The last supper । চিত্রশিল্পের জগতে লাস্ট সাপার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। "যীশু তার বারোজন শিষ্যকে নিয়ে শেষ ভোজে বসেছেন। তাঁর দু পাশে ছয়জন ছয়জন করে শিষ্য। সামনে প্রশস্ত টেবিল। পেছনে জানলা দিয়ে মৃদু আলো এসে পড়েছে। যীশু বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে ধরিয়ে দেবে। শিষ্যরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে তাদের মধ্যে কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।"

ছবিটি সান্তামারিয়া কনভেন্টের এক দেওয়ালে আঁকা হয়েছিল। দি লাস্ট সাপার লিওনার্দোর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সমালোচকদের মতে এখানে লিওনার্দোর মানসিকতা, তাঁর ভাবনা কল্পনার সাথে মিলিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। লাস্ট সাপার শুধু যে একখানি সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র তাই নয়, মানুষের শিল্প প্রতিভা যে কোন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছতে পারে এ তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রথমে তিনি এঁকেছিলেন যীশুর বারোজন শিষ্যর মুখ। এই শিষ্যদের মুখে ফুটে উঠেছিল বিচিত্র অনুভূতি। কারো মুখে বিস্ময়, কারো মুখ ভয়, কারো বেদনা সন্দেহ। এক আশ্চর্য সুষমায় প্রতিটি মুখ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। পরিশেষে তিনি আঁকলেম যীশুর মুখ। শোনা যায় কেমন হবে যীশুর মুখ, দীর্ঘ এক বছর তা স্থির করতে পারেননি। অবশেষে আঁকলেন যীশুর মুখ। এ মুখে ভয় নেই, ঘৃণা নেই, উদ্বেগ নেই। তিনি তো জানতেন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে। তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এইবার তাকে মর্ত্যজগৎ ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। অনুভূতিহীন এক স্বর্গীয় ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে। লাস্ট সাপার ছাড়াও আরো দুটি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন লিওনার্দো। ভার্জিন অব দি রকস ও মেসিলিয়া।

১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফারাসী সম্রাট মিলান আক্রমণ করলেন। তিনি মিলান ত্যাগ করে পালিয়ে এলেন ভেনিসে। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে মিস্টান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে ফারসী অধিকারে চলে গেল।

লিওনার্দো আশা করেছিলেন যুদ্ধ মিটে গেলেন আবার মিলানে ফিরে যাবেন। কিন্তু যখন সেই আশা পূর্ণ হল না, তিনি ভেনিস ত্যাগ করে রওনা হলেন মাতৃভূমি ফ্লোরেন্সের দিকে। এই সময় সীজার বর্জিয়ার অনুরোধে মধ্য ইতালির বিস্তৃত অঞ্চল পরিদর্শন করে ছটি ম্যাপ তৈরি করেন। সেই ম্যাপগুলি আজও উইন্ডসর লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। সেগুলো দেখলে অনুমান করা যায় কি নির্ভুল ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং মানচিত্র অঙ্কন করবার সহজাত দক্ষতা।

ইতিপূর্বে তিনি একটি ছবি এঁকেছিলেন–ভার্জিন অব দি রকস। ঝুলে পড়া এক পর্বত। তার মধ্যে ফুটে উঠেছে চিরন্তন মানব আত্মার এক রূপ। এই সময় লিওনার্দো আঁকলেন তাঁর জগৎ বিখ্যাত মোনালিসা। এই ছবিটি আঁকতে তাঁর তিন বছর সময় লেগেছিল।

চিত্রশিল্পী হিসাবে লিওনার্দোর খ্যাতি জগৎ বিখ্যাত হলেও তাঁর মৃত্যুর পর পাওয়া গিয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার পাতার হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপিতে তিনি সমস্ত জীবন ধরে যে সব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, পরীক্ষা করেছিলেন, তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পাণ্ডুলিপি লেখা হয়েছিল ইতালিয়ান ভাষায় এবং সমস্ত পাণ্ডুলিপিটাই লেখা হয়েছিল উলটো করে। ফলে সোজাসুজি পড়া যেত না। পড়তে হত আয়নার মাধ্যমে। প্রতিটি লেখার সঙ্গে থাকত অসংখ্য ছবি। তাঁর এই পাণ্ডুলিপিতে অসংখ্য বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। চীন উপকথা, মধ্যযুগীয় দর্শন, সমুদ্রস্রোতের কারণ, বাতাসের গতি, তার চাপ, পৃথিবীর ওজন। নিশাচর পাখির গতিপ্রকৃতি। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব। উড়ন্ত যান। সাঁতার কাটবার যন্ত্র। আলোর প্রকৃতি, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রের নক্সা। সুগন্ধ সেন্ট তৈরির ফর্মূলা। বিভিন্ন পাখি জন্তু-জানোয়ারদের আচার-আচরণ, বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র। তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এত গভীর ছিল যে গোপনে বেশকিছু মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছিলেন দেহের গঠন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেশ কিছু শরীরতত্ত্বের ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবি এত নির্ভুল ছিল, পরবর্তীকালে চিকিৎসকরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। আধুনিক উড়োজাহাজের তিনিই প্রথম নক্সা আঁকেন।

১৫১৬ সালে লিওনার্দো ফারসী সম্রাটের আমন্ত্রণে প্যারিসে গেলেন। সম্রাট লিওনার্দোকে খুবই সম্মান করতেন।

ক্রমশই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। ডান হাত অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিল। বাঁ হাতেই তিনি ছবি আঁকতেন। এই সময় তিনি ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত পড়েন। অবশেষে ৬৭ বছর বয়সে, ২রা মে ১৫১৯, চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি–ইতালিয় রেনেসাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।

১৬

অশোক

[খ্রিঃ পূঃ ৩০০–২৩২]

প্রতিবেশী দুটি সাম্রাজ্য মগধ এবং কলিঙ্গ। মগধ অপেক্ষাকৃত বড়, তার শক্তিও তুলনায় বেশি। তবুও মগধ সম্রাটের মনে শান্তি নেই। প্রতিবেশী এক শত্রুকে রেখে কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়!

দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনীই শক্তিশালী। কিন্তু মগধের সৈন্যরা অনেক বেশি যুদ্ধপটু আর কৌশলী। কলিঙ্গের সৈন্যরা বীর বীক্রমে লড়াই করেও পরাজিত হল। আহত আর নিহত সৈন্যে ভরে উঠল যুদ্ধক্ষেত্র। রক্তাক্ত হল সমস্ত প্রান্তর। কলিঙ্গরাজ নিহত হলেন।

বিজয়ী মগধ সম্রাট হাতির পিঠে চেপে যেতে যেতে দেখলেন তাঁর দুপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কত অসংখ্য মৃতদেহ। কত আহত সৈনিক। কেউ আর্তনাদ করছে, কেউ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করছে। কেউ সামান্য একটু পানির জন্য ছটফট করছে। আকাশে মাংসের লোভে শকুনের দল ভিড় করছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের সেই বিভীষিকাময়দৃশ্য দেখে সম্রাট বিষণ্ন হয়ে গেলেন। অনুভব করলেন তাঁর সমস্ত অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে নিজের তাবুতে ফিরে শিবিরের সামনে দিয়ে চলেছে এক তরুণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী বললেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবা করতে চলেছি।

মুহূর্তে অনুতাপের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সম্রাটের হৃদয়। সম্রাটের অন্তরে জ্বলে উঠল, নতুন এক প্রজ্ঞার আলোক। তিনি শপথ করলেন আর যুদ্ধ নয়, আর হিংসা নয়, ভগবান বুদ্ধের করুণায় আলোয় অহিংসা মন্ত্রে ভরিয়ে দিতে হবে সমগ্র পৃথিবী।

একদিন যিনি ছিলেন উন্মত্ত দানব–এবার হলেন শান্তি আর অহিংসার পূজারী প্রিয়দর্শী অশোক। খ্রিস্টপূর্ব ২৭২ সালে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিবাদ শুরু হচ্ছিল। বিন্দুসারের জেষ্ঠ্য পুত্রের নাম সুষীন, দ্বিতীয় পুত্র আশোক। সুষীম ছিলেন উদ্ধত বিলাসী। অশোক ছিলেন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। ভাইকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করলেন। অশোকের পরের ভাই-এর নাম ছিল তিষ্য। অশোক অনুভব করলেন তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছেন, এতে রাজ্যের অনেকেই ক্ষুব্ধ। তার উপর যদি তিষ্যকে হত্যা করেন, প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। তাই তাকে পাঠিয়ে দিলেন তক্ষশীলায় সেখানকার শাসনকর্তা করে।

অশোক বৌদ্ধ হলেও অন্য কোন ধর্মের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না। সকলেই যে যার ধর্মপালন করত। একটি শিলালিপিতে তিনি লিখেছেন, নিজের ধর্মের প্রতি প্রশংসা, অন্যের ধর্মের নিন্দা করা উচিত নয়। পরস্পরের ধর্মমত শুনে তার সারবস্তু, মূল সত্যকে গ্রহণ করা উচিত। ধর্মাচরণে অধিক মনোযোগী হলেও রাজ্যশাসনের ব্যাপারে সামান্যতম দুর্বলতা দেখাননি। পিতা-পিতামহের মত তিনিও ছিলেন সুদক্ষ প্রশাসক। সুবিশাল ছিল তাঁর রাজ্যসীমা। তিনি শাসন কাজের ভার উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতেই দিতেন এবং প্রয়োজন মত তাদের নির্দেশ দিতেন।

সম্রাট অশোক তাঁর সমস্ত জীবন প্রজাদের সুখ কল্যাণে, তাদের আত্মিক উন্নতির জন্য ব্যয় করেছিলেন। তবুও তাঁর অন্তরে দ্বিধা ছিল। একজন সম্রাট হিসাবে তিনি কি তাঁর যথার্থ কর্তব্য পালন করছেন? একদিন গুরুকে প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, সর্বশ্রেষ্ঠ দান কি?

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ দান ধর্মদান। একমাত্র ধর্মের পবিত্র আলোতেই মানুষের অন্তর আলোকিত হয়ে উঠতে পারে। তুমি সেই ধর্মদান কর।

গুরুর আদেশ নতমস্তকে গ্রহণ করলেন অশোক। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের সুমহান বাণী। কিন্তু যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের কোন আলো গিয়ে পৌছায়নি, কে যাবে সেই দাক্ষিণাত্যের, সুদূর সিংহলে?

অশোকের অবর্তমানে তার সিংহাসনে বসলেন তার নাতি সম্পতি। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি খুব একটা অনুরক্ত ছিলেন না। অশোকের আমলে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রজাদের কল্যাণের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হত, সম্পত্তি সেই ব্যয় কমিয়ে দিলেন।

একদিন যিনি ছিলেন সমগ্র ভারতের সম্রাট, আজ তিনি রিক্ত। বুঝতে পারলেন পৃথিবীতে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এইবার বিদায় নিতে হবে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বেদনাহত চিত্তে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন নৃপতি মহামতি অশোক।

লুই পাস্তুর

[১৮২২-১৮৯৫]

প্যারিসের এক চার্চে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে। কন্যাপক্ষের সকলে কনেকে নিয়ে আগেই উপস্থিত হয়েছে। পাত্রপক্ষের অনেকেই উপস্থিত। শুধু বর এখনো এসে পৌঁছাননি। সকলেই অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে কখন বর আসবে। কিন্তু বরের দেখা নেই।

চার্চের পাদ্রীও অধৈর্য হয়ে ওঠে। কনের বাবা পাত্রের এক বন্ধুকে ডেকে বললেন, কি ব্যাপার, এখনো তো তোমার বন্ধু এল না? পথে কোন বিপদ হল না তো?

বন্ধু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। দু-চার জায়গায় খোঁজ করল কিন্তু কোথাও বরের দেখা নেই। হঠাৎ মনে হল একবার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে খোঁজ করলে হত। যা কাজপাগল মানুষ, বিয়ের কথা হয়ত একেবারেই ভুলে গিয়েছে।

ল্যাবরিটরিতে গিয়ে হাজির হল বন্ধু। যা অনুমান করেছিল তাই সত্যি। টেবিলের সামনে মাথা নিচু করে আপন মনে কাজ করে চলেছে বর। চারপাশের কোন কিছুর প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নেই। এমনকি বন্ধুর পায়ের শব্দেও তাঁর তন্ময়তা ভাঙে না। আর সহ্য করতে পারে না বন্ধু, রাগেতে চেঁচিয়ে ওঠে, আজ তোর বিয়ে, সবাই চার্চে অপেক্ষা করছে আর তুই এখানে কাজ করছিস!

মানুষটা বন্ধুর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, বিয়ের কথা আমার মনে আছে কিন্তু কাজটা শেষ না করে কি করে বিয়ের আসরে যাই!

বিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসর্গীকৃত এই মানুষটির নাম লুই পাস্তুর। ১৮২২ সালের ক্রীসমাস পর্বের দুদিন পর ফ্রান্সের এক ক্ষুদ্র গ্রাম জেলেতে পাস্তুর জন্মগ্রহণ করেন। বাবা যোসেফ পাস্তুর প্রথম জীবনে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করতেন। ওয়ার্টার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর যোসেফ পাস্তুর প্রথম জীবনে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করতেন। ওয়ার্টার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়েনের পরাজয়ের পর যোসেফ পাস্তুর নিজের গ্রামে ফিরে এসে ট্যানারির কাজে যুক্ত হন। অল্প কিছুদিন পরেই স্বগ্রাম পরিত্যাগ করে আরবয় নামে এক গ্রামে এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন। এখানেই ট্যানারির (চমড়া তৈরির কাজ) কারখানা খুললেন।

যোফেস কোনদিনই তাঁর পুত্র লুইকে ট্যানারির ব্যবসায়ে যুক্ত করতে চাননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল পুত্র উপযুক্ত শিক্ষালাভ করুক। কয়েক বছর স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করবার পর যোফেস পুত্রকে পাঠালেন প্যারিসের এক স্কুলে।

গ্রামের মুক্ত প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা লুই প্যারিসের পরিবেশ কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। শহরের দমবন্ধ পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠত তাঁর কাছে। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এই সময় একটা চিঠিতে লিখেছেন, "যদি আবার বুক ভরে চামড়া গন্ধ নিতে পারতাম, কয়েকদিনেই আমি সুস্থ হয়ে উঠতাম।"

অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ধীরে ধীরে শহরের নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন লুই। তাঁর গভীর মেধা অধ্যাবসায় পরিশ্রম শিক্ষকদের দৃষ্টি এড়াল না। ছাত্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, লুই পাস্তুর একজন কৃতি শিক্ষক হবে, তার সে ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে হয়নি।

এরপর তিনি ভর্তি হলেন রয়েল কলেজে। সেখান থেকে ১৮ বছর বয়েসে স্নাতক হলেন। এই সময় নিজের কলেজেই তিনি একদিকে শিক্ষকতার কাজ শুরু করলেন, অন্যদিকে বিজ্ঞানে ডিগ্রী নেবার জন্য পড়াশুনা করতে থাকেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়েসে তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পাস্তুরের প্রিয় বিষয় ছিল রসায়ন। রসায়নের উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে আরম্ভ করলেন। দু'বছর পর মাত্র বছরে লুই পাস্তুর স্টাপবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য ডাক পেলেন। আনন্দের সঙ্গে এই পদ গ্রহণ করলেন পাস্তুর।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন মসিঁয়ে লরেন্ট। তাঁর গৃহে নিয়মিত যাতায়াত করতে করতে রেক্টরের ছোট মেয়ে মেরির প্রেমে পড়ে যান। কয়েক সপ্তাহ পরেই রেক্টরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন পাস্তুর। মঁসিয়ে লরেন্টও অনুভব করেছিলেন পাস্তুরের প্রতিভা। তাই এই বিয়েতে তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন।

পাস্তুরও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ১৮৬৭ সালে তাঁকে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হল। এখানে এসে শুরু করলেন জীবাণু তত্ত্ব (Bacteriology) সম্বন্ধে গবেষণা। দু বছর ধরে চলল তাঁর গবেষণা। এই সময় ফ্রান্সের মুরগীদের মধ্যে ব্যাপক কলেরার প্রভাব দেখা দিল। পোলট্রি ব্যবসায়ের উপর বিরাট আঘাত নেমে এল। পাস্তুরের উপর রোগের কারণ অনুসন্ধানের ভার পড়ল। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাস্তুর আবিষ্কার করলেন এক জীবাণুর। এবং এই জীবাণুই ভয়াবহ এনথ্রক্স (Anthrox) রোগের কারণ এই এনথ্রক্স রোগ মাঝে মাঝে মহামারীর আকার ধারণ করত। গবাদি পশু-পাখি, শূয়র, ভেড়ার মৃত্যুর হার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেত। পাস্তুর এনথ্রক্স রোগের সঠিক কারণ শুধু নির্ণয় করলেন না, তার প্রতিষেধক ঔষধও আবিষ্কার করলেন। রক্ষা পেল ফ্রান্সের পোলট্রি শিল্পী। বলা হত জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্সের যা ক্ষতি হয়েছিল, পাস্তুরের এক আবিষ্কার তার চেয়েও বেশি অর্থ এনে দিয়েছিল। পাস্তুরের এই আবিষ্কার, তাঁর খ্যাতি, সম্মান কিছু মানুষের কাছে ঈর্ষাণীয় হয়ে ওঠে। তারা নানাভাবে তাঁর কুৎসা রটনা করত। কিন্তু নিন্দা প্রশংসা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমান উদাসীন। একবার কোন সভায় পাস্তুর চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। গুরিয়েন নামে এক ডাক্তার কিছুতেই মানতে পারছিলেন না একজন রসায়নবিদ চিকিৎকদের কাছে চিকিৎসা বিদ্যার উপদেশ দেবেন। নানাভাবে তাঁকে বিব্রত করতে লাগলেন। কিন্তু সামান্যতম ক্রুদ্ধ হলেন না পাস্তুর। রাগে ফেটে পড়লেনস গুরিয়েন। সভা থেকে তাকে বার করে দেওয়া হল।

পরদিন গুরিয়েন ডুয়েল লড়বার জন্য পাস্তুরকে আহ্বান করলেন। কিন্তু গুরিয়েনের সেই আহ্বান ফিরিয়ে দিলেন পাস্তুর, বললেন, আমার কাজ জীবন দান করা, হত্যা করা নয়।

এতদিন শুধু কীটপতঙ্গ আর জীবজন্তুর জীবনদানের ওষুধ বার করেছেন। তখনো তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটুকু বাকি ছিল। হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক ছিল সে যুগের এক মারাত্মক ব্যাধি। এনথ্রক্স-এর চেয়েও তা মারাত্মক। যখন কোন মানুষকে পাগলা কুকুরে কামড়াত, সেই ক্ষতস্থান সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত হয়ে উঠত না। অধিকাংশ সময়েই সেই ক্ষত কয়েকদিনেই শুকিয়ে যেত। কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রকাশ পেত সেই রোগের লক্ষণ। রুগী অবসন্ন হয়ে পড়ত। তেষ্টা পেত কিন্তু জলস্পর্শ করতে পারত না। এমনকি প্রবাহিত জলের শব্দ শুনেও অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ত। দু-তিন দিন পরই মৃত্যু হত রুগীর।

কয়েক বছর যাবৎ হাইড্রোফোবিয়া নিয়ে কাজ করছিলেন পাস্তুর। নিজের গবেষণাগারের সংলগ্ন এলাকায় পাগলা কুকুরদের পুষেছিলেন। যদিও কাজটা ছিল অত্যন্ত বিপদজনক তবুও সাহসের সাথে সেই কুকুরদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। একদিন এক বিশালদেহি বুলডগ কুকুর পাগলা হয়ে উন্মত্তের মত চিৎকার করছিল। তার মুখ দিয়ে ঝরে পড়ছিল বিষাক্ত লালা। তাকে বন্দী করে খাঁচায় পোরা হল। সেই খাঁচার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল একটা খরগোশকে। কিন্তু আশ্চর্য হলেন পাস্তুর। পাগলা কুকুরটি একটি বারের লালা খরগোশের দেহে প্রবেশ করানো একান্ত প্রয়োজন ছিল।

গবেষণার প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিলেন পাস্তুর। বহু কষ্টে দড়ি বেঁধে ফেললেন সেইহিংস্র কুকুর। তারপর একটা টেবিলের উপর শুইয়ে মুখটা নিচু করলেন। তারপর মুখে রসামনে একটা কাচের পাত্র ধরলেন, টপ টপ করে তার মধ্যে গড়িয়ে পড়তে লাগল বিষাক্ত লালা। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন পাস্তুর ঐ বিষাক্ত লালা দিয়েই তৈরি হয় জলাতঙ্কের সিরাম।

এবার পরীক্ষা শুরু হল। প্রথমে তা প্রয়োগ করা হয় খরগোশের উপর, তারপর অন্যান্য জীব-জন্তুর উপর। প্রতিবারই আশ্চর্য ফল পেলেন পাস্তুর। জীব-জন্তুর দেহে তা কার্যকর হলেও মানুষের দেহ কিভাবে তা প্রয়োগ করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না পাস্তুর। কতটা পরিমাণ ঔষুধ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে তার কোন সঠিক ধারণা নেই। সামান্য পরিমাণের তারতম্যের জন্য রোগীর প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য জেনেও সমস্ত দায় এসে বর্তাবে তাঁর উপর। কিভাবে এই জটিল সমস্যার সমাধান করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না পাস্তুর।

অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবেই একটা সুযোগ এসে গেল। জোসেফ মিস্টার বলে একটি ছোট ছেলেকে কুকুরে কামড়েছিল। ছেলেটির মা তাকে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার তাকে পাস্তুরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

পাস্তুর জোসেফকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন তার মধ্যে রোগের বীজ সংক্রামিত

হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য। পাস্তুর স্থির করলেন জোসেফের উপরেই তাঁর আবিষ্কৃত সিরাম প্রয়োগ করবেন। নয় দিন ধরে বিভিন্ন মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করতে লাগলেন পাস্তুর। একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে জোসেফ। তবুও মনের উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ দূর হয় না। অবশেষে তিন সপ্তাহ পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল জোসেফ। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল পাস্তুরের আবিষ্কারের কথা। এক ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করলেন পাস্তুর।

বৃষ্টিধারার মত চতুর্দিক থেকে তাঁর উপরে সম্মান বর্ষিত হতে থাকে। ফরাসী একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হলেন তিনি।

১৮৯২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর পাস্তুরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা প্যারিসে জমায়েত হলেন। Antiseptic Surgery-র আবিষ্কর্তা জোসেফ লিস্টার বললেন, পাস্তুরের গবেষণা অস্ত্র চিকিৎসার অন্ধকার জগতে প্রথম আলো দিয়েছে। শুধুমাত্র অস্ত্র চিকিৎসা নয়, ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মানব সমাজ চিরদিন তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

দেশ-বিদেশের কত সম্মান, উপাধি, পুরস্কার, মানপত্র পেলেন। কিন্তু কোন কিছুতেই বিজ্ঞান সাধক পাস্তুরের জীবন সাধনার সামান্যতম পরিবর্তন ঘটেনি। আগের মতই নির অহঙ্কার সরল সাদাসিদা রয়ে গেলেন।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সম্মেনের সভাপতি। তিনি এগিয়ে এসে পাস্তুরকে বললেন, এই সংবর্ধনা যুবরাজের জন্য নয়, এ আপনারই জন্য।

প্যারিসে ফিরে এলেন পাস্তুর, তাঁর সম্মানে গড়ে উঠেছিল পাস্তুর ইন্সটিটিউট–এখানে সংক্রামক রোগের গবেষণার কাজ চলছিল।

পাস্তুর অনুভব করতে পারছিলেন তাঁর দেহ আর আগের মত কর্মক্ষম নেই। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। সকলের অনুরোধে কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন। এই সময় বাইবেল পাঠ আর উপাসনার মধ্যেই দিনের বেশির ভাগ সময় কাটতেন। তবুও অতীত জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। মাঝে মাঝেই তাঁর ছাত্ররা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত। তিনি বলতেন তোমরা কাজ কর, কখনো কাজ বন্ধ করো না।

তাঁর সত্তরতম জন্মদিনে ফ্রান্সে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হল। সোরবোনে তাঁর সম্মানে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। এরপর আরো তিন বছর বেঁচে ছিলেন পাস্তুর। অবশেষে ১৮৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন বিজ্ঞান-তপস্বী লুই পাস্তুর। যাঁর সম্বন্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন বলেছিলেন, ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান।

১৮
ফিওদর মিখাইলভিচ দস্তয়ভস্কি
[১৮২১-১৮৮১]

ফিওদর দস্তয়ভস্কি (জন্ম অক্টোবর ৩০, ১৮২১। মৃত্যু ২৮ জানুয়ারি, ১৮৮১)। সাত ভাইবোনের মধ্যে দস্তয়ভস্কি ছিলেন পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। পিতা মিখায়েল আন্দ্রিয়েভিচ ছিলেন মস্কোর এক হাসপাতালের ডাক্তার। কয়েক বছর পর দস্তয়ভস্কির পিতা টুলা জেলায় Darovoye তে একটা সম্পত্তি কিনলেন।

প্রতিবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে মা ভাই বোনেদের সাথে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যেতে দস্তয়ভস্কিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল Chernak's বোর্ডিং স্কুলে। তিন বছর সেখানে (১৮৩৪-৩৭) পড়াশুনা করার পর বাড়িতে ফিরে এলেন দস্তয়ভস্কি। এক বছরের মধ্যে মার মৃত্যু হল।

স্ত্রী মৃত্যু মাইকেলের জীবনে এক পরিবর্তন নিয়ে এল। শহরের পরিমণ্ডলে থাকতে আর ভাল লাগল না, হাসপাতালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। দস্তয়দস্কি আর তার ভাইকে ভর্তি করে দিলেন মিলিটারি ইনজিনিয়ারিং একাডেমিতে। গ্রামে গিয়ে অল্পদিনেই সম্পত্তি বাড়িয়ে ফেললেন মাইকেল। মাইকেলে অত্যাচার অন্যায় আচরণে প্রজাদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। কয়েকজন তাঁর কোচওয়ানের সাথে শলাপরামর্শ করে নির্জনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে হত্যা করল। পিতার মৃত্যু দস্তয়ভস্কির জীবনে নিয়ে এল বিরাট আঘাত। পিতা নিহত হবার পর এক অপরাধবোধ তাঁর মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পিতার মৃত্যুর পর নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হল তাঁর। এর থেকে জন্ম নিল এক অসুস্থ মনোবিকার। তাই পরবর্তীকালে কোন মৃত্যু শোক আঘাত উত্তেজনার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেই তিনি অসুস্থ হয়ে

পড়তেন, ঘন ঘন দেখা দিত মৃগীরোগ। সমস্ত জীবনে আর তিনি এই রোগ থেকে মুক্তি পাননি। ইনজিনিয়ারিং একাডেমি থেকে পাশ করে সামরিক বিভাগে ডিজাইনারের চাকরি নিলেন. নিঃসঙ্গতা ক্লান্তি ভোলবার জন্য জুয়ার টেবিলে গিয়ে বসেন দস্তয়ভস্কি। অধিকাংশ দিনই নিজের শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন। মাইনের টাকা কয়েকদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়।

অর্থ সংগ্রহের তাগিদে ঠিক করলেন ফরাসী জার্মান সাহিত্য অনুবাদ করলেন। তিনি এবং তাঁর ভাই মিখায়েল একসঙ্গে ফরাসী সাহিত্যিক বালজাকের উপন্যাস অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। ১৮৪৪ সালে একটি রাশিয়ান পত্রিকায় তা প্রকাশিত হতে আরম্ভ হল। কিছু অর্থও পেলেন। ক্রমশই চাকরির জীবন অসহ্য হয়ে উঠল। সাহিত্য জগৎ তাঁকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করছিল। তিনি চাকরি ছাড়লেন। নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করলেন সাহিত্য সাধনায়।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ তাঁর ভাইকে একটা চিঠিতে দস্তয়ভস্কি লিখলেন "একটা উপন্যাস শেষ করলাম। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের লেখা। এখন পাণ্ডুলিপি থেকে নকল করছি। একটা পত্রিকায় পাঠাব। জানি না তারা অনুমোদন করবে কি না। তা আমি এই রচনায় সন্তুষ্ট হয়েছি।"

প্রথম উপন্যাস পুওর ফোক বা অভাজন প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েকটি ছোট গল্প রচনা করলেন দস্তয়ভস্কি। তারপর লিখলেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "দি ডবল"। প্রথম উপন্যাসে তিনি লেখক হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন, দ্বিতীয় উপন্যাসে পেলেন খ্যাতি। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছিল মানুষের বেদনাময় জীবনের ছবি। মানুষ সহজেই তাঁর রচনার প্রতি আকৃষ্ট হল। সমাজের শিল্পী সাহিত্যিক সমালোচক মহলের দ্বার তাঁর কাছে উন্মুক্ত হল।

এই সময় দস্তয়ভস্কির জীবনে নেমে এল বিপর্যয়। রাশিয়ার সম্রাট জার ছিলেন এক অত্যাচারী শাসক। তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট সংগঠন। এক বন্ধুর মারফত দস্তয়ভস্কি পরিচিত হলেন এর একটি সংগঠনের সাথে। এদের আসর বসত প্রটাসভস্কি নামে এক তরুণ সরকারী অফিসারের বাড়িতে।

কিন্তু অত্যাচারী জার প্রথম নিকোলাসের গুপ্তচরদের নজর এড়াল না। তাদের মনে হল এরা রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। রিপোর্ট গেল সরকারী দপ্তরে। যথারীতি একদিন প্রটাসভস্কির আসর থেকে বাড়িতে ফিরে এসে খাওদা-দাওয়া করে রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়লেন দস্তয়ভস্কি। হঠাৎ শেষ রাতে পুলিশের পদশব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখলেন তাঁর ঘরে জারের পুলিশ বাহিনী। কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই তাঁকে গ্রেফতার করা হল (এপ্রিল ১৩,১৮৪৯)।

অন্য অনেকের সাথে তাকে বন্দী করে রাখা হল আলোবাতাসহীন ছোট্ট একটি কুঠুরিতে। দিনে মাত্র তিন-চারবার ঘরের বাইরে আসার সুযোগ মিলত। এক দুঃসহ মানসিকতার মধ্যেই তিনি রচনা করলেন একটি ছোট গল্প "ছোট্ট নায়ক" A little Hero)।

নানান প্রশ্ন অনুসন্ধান-তারপর শুরু হল বিচার। বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য দণ্ডাদেশ পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল সম্রাট নিকোলাসের কাছে। সম্রাট তাদের মৃত্যুদণ্ড রোধ করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। দস্তয়ভস্কির চার বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসন আর তারপর চার বছর সৈনিকের জীবন যাপন করবার আদেশ দেওয়া হল।

খ্রিস্টমাস ডেতে পায়ে চার সের ওজনের লোহার শেকল পরিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল সাইবেরিয়ার বন্দীনিবাসে (জানুয়ারি ১৮৫০)। চারদিকে নরকের পরিবেশ। খুনী বদমাইশ শয়তানের মাঝখানে দস্তয়ভস্কি একা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। ছোট অন্ধকার কুঠুরিতে শীতকালে অসহ্য ঠাণ্ডা। ছাদের ফুটোদিয়ে বরফ ঝরে পড়ে মেঝেতে পুরু হয়ে যায়। কনকনে তুষারজড়ে হাত-পা ফেটে রক্ত ঝরে। গ্রীষ্মের দিনে আগুনের দাবাদাহ।

তারই মাঝে হাড়ভাঙা খাটুনি। ক্লান্তিতে, পরিশ্রমে শরীর নুয়ে পড়েছে। সে তাঁর জীবনের এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তীকালে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখে গিয়েছেন তাঁর The house of the Dead (মৃত্যুপুরী) উপন্যাসে।

দীর্ঘ চার বছর (১৮৫০-১৮৫৪) সাইবেরিয়ার বন্দীনিবাসে কাটিয়ে অবশেষে লোহার বেদির বন্ধন থেকে মুক্তি পেলেন।

ওমস্কের বন্দীনিবাস থেকে দস্তয়ভস্কিকে পাঠানো হল সেমিপালতিনস্ক শহরে। কিন্তু সামরিক জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা কুচকাওয়াজ তাঁর রুগ্ন শীর্ণ অসুস্থ অনভ্যস্ত শরীরে মাঝে মাঝে অসহনীয় হয়ে উঠত। তবুও নিজের যোগ্যতার কিছুদিনের মধ্যেই সামরিক বিভাগে উঁচু পদ পেলেন।

ক্রমশই এক অপরাধ বোধ তার মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এই সময় রাসকলনিকভের সঙ্গে দেখা হল সোনিয়ার। সে পতিতা। নিজের বিপন্ন পরিবারকে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সে এই পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু রাসকলনিকভ উপলব্ধি করতে পারল পাপের মধ্যে থেকেও সোনিয়ার অন্তর জুড়ে রয়েছে শুধু পবিত্রতা। তাই নিজেকে সোনিয়ার কাছে উৎসর্গ করে রাসকলনিকভ। ক্রমশই তার মনে শুরু হল পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব।

শেষ পর্যন্ত নিজের অপরাধ স্বীকার করে সোনিয়ার কাছে। পুলিশও বুড়ির হত্যা রহস্য উদ্ধারের জন্য চারদিকে অনুসন্ধান করতে থাকে। তারা অনুমান করে রাসকলনিকভ খুনী। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাকে ধরতে পারছিল না। রাসকলনিকভের মনে হল সে যে অপরাধ করেছে তার জন্যে তাকে ধরতে পারছিল না। রাসাকলনিকভের মনে হল সে যে অপরাধ করছে তার জন্যে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। সোনিয়ার প্রেমের আলোয় সে তখন এক অন্য মানুষ। তাই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করল। সোনিয়াও তার সাথে যাত্রা করল। সে বাসা বাঁধল জেলের কাছে এক গ্রামে। ভালবাসা, ত্যাগ আর পবিত্রতার মধ্যে দুজনে প্রতীক্ষা করে নতুন জীবনের।

ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেন্ট উপন্যাস রচনার পেছনে যখন তাঁর সমস্ত মন একাগ্রতাটুকু অর্পণ করেছিলেন তখন প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তিমত তাকে নতুন উপন্যাস জমা দেবার দিন এগিয়ে আসছিল। কিন্তু একটি লাইনও তখনো তিনি লিখে উঠতে পারেননি। হাতে মাত্র দু মাস সময়। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এমন সময় তাঁর এক বন্ধু পরামর্শ দিল স্টেনোগ্রাফার রাখতে। বন্ধু তার চেনা-জানা একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে।

১৮৬৬ সালের ৪ অক্টোবর কুড়ি বছরের সাদামাটা চেহারার অ্যানা এসে দাঁড়াল দস্তয়ভস্কির দরজায়।

চব্বিশ দিনের মাথায় শেষ করলেন "এক জুয়াড়ির গল্প"-এ জুয়াড়ি আর কেউ নয়, দস্তয়ভস্কি নিজেই।

চব্বিশ দিন দস্তয়ভস্কির সংসারে যাতায়াত করতে করতে অ্যানা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর মানসিক, সাংসারিক অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলতা।

দস্তয়ভস্কির মনে হল মারিয়া, পলিনা তাঁকে যা দিতে পারেনি, সেই সংসারের সুখ হয়তো দিতে পারবে অ্যানা। তাই সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। দস্তয়ভস্কির বয়স তখন ৪৫, অ্যানার ২০। সকলের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁদের বিয়ে হল।

দেনার টাকা শোধ করবার জন্য লিখতে আরম্ভ করলেন "দি ইডিয়ট"।

ইডিয়ট উপন্যাস শেষ করে কয়েক মাস আর কিছু লেখেননি দস্তয়ভস্কি। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এক দেশ থেকে আরেক দেশ। দারিদ্র্য তাঁর নিত্যসঙ্গী। এরই মধ্যে লিখলেন "দি এটারনাল হ্যাসবেন্ড" (The eternal husband), পরে দীর্ঘ উপন্যাস "দি পজেজড" (The possesed)।

দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল। যাযাবরের মত ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন দস্তয়ভস্কি।

দেশে ফেরার জন্য মন টানছে কিন্তু কেমন করে ফিরবেন। হাত শূন্য। স্ত্রী, শিশুকন্যার জন্যে রাখা শেষ সম্বলটুকু নিয়ে গিয়ে জুয়ার টেবিলে বসলেন। কিন্তু সেটুকুও হারাতে হল।

এই বিপদের দিনে এগিয়ে এলেন তাঁর এক বন্ধু। তাঁর কাছে থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে দীর্ঘ চার বছরের প্রবাস জীবনের পর জুলাই ৪, ১৮৭১ স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে পিটার্সবার্গে ফিরলেন দস্তয়ভস্কি। আর্থিক সংকট থেকে পুরোপুরি মুক্তি না পেলেও তাঁর সমস্ত মন জুড়ে তখন চলছিল সেই মহতী সৃষ্টির প্রেরণা। দীর্ঘ চার বছর লেখার পর ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হল "দি ব্রাদার্স কারামাজোভ"। এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। ব্যাপ্তিতে, গভীরতায়, চরিত্র সৃষ্টিতে ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেন্টের পাশাপাশি এই উপন্যাসও তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

সমস্ত দেশ জুড়ে তিনি পেলেন এক অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। তাঁকে বলা হল জাতির প্রবক্তা। ক্রমশই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছিল। শেষে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যেবেলায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়লেন দস্তয়ভস্কি। ৩১ বছর আগে যে পথ দিয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় লোকের ধিক্কার কুড়োতে কুড়োতে গিয়েছিলেন সাইবেরিয়ার বন্দীনিবাসে, আজ সেই পথ দিয়ে হাজার হাজার মানুষের বেদনা আর ভালবাসার মধ্যে দিয়ে চললেন অমৃতলোকে।

১৭

আব্রাহাম লিঙ্কন

[১৮০৯—১৮৬৫]

আব্রাহাম লিঙ্কন শুধু আমেরিকার নন, পৃথিবীর ইতিহাসের যে কয়জন মানবতাবাদী গণতন্ত্রপ্রেমী মহান রাষ্ট্রনায়ক জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। লিঙ্কনের জন্ম হয় আমেরিকার কেন্টাকি প্রদেশের একটি ছোট গ্রামে। লিঙ্কনের বাবা টমাস লিঙ্কন ছিলেন ছুতোর মিস্ত্রি। লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। অতি কষ্টে দীনদরিদ্রের মত তিনি সংসার চালাতেন।

লিঙ্কনের যখন চার বছর বয়েস, তাঁর বাবা ইন্ডিয়ানা প্রদেশের অরণ্যময় অঞ্চলে গিয়ে পাকাপাকিভাবে বসবাস করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বাড়ির চারদিকে জন্তু-জানোয়ার-এর হাত থেকে বাচবার জন্য বড় বড় খুটি পোতা থাকত। কাঠের কাজ আর শিকার করেই লিঙ্কনের বাবা সংসার চালাতেন।

এই কঠিন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বসবাস করতে করতে লিঙ্কন হয়ে ওঠেন পরিশ্রমী সাহসী। লিঙ্কনের তখন ছয় বছর বয়েস। হঠাৎ তাঁর মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন সেখানে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। এক গ্রাম্য ডাক্তার থাকতেন পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই সাত দিন পর মারা গেলেন লিঙ্কনের মা।

মা মারা যাওয়ার পর একটি বছর অতিক্রান্ত হল। লিঙ্কনের বাবার পূর্বপরিচিত এই মহিলার কিছুদিন আগে স্বামী মারা গিয়েছিল। সংসারে একজন মহিলার প্রয়োজন বিবেচনা করেই তাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন টমাস। লিঙ্কন দেশের সমস্ত মানুষের কাছে আহ্বান জানালেন যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সৈন্যদলে নাম লেখাল চল্লিশ বছরের এক প্রাক্তন ক্যাপ্টেন, নাম গ্র্যান্ট। গ্র্যান্ট সৈনিক হিসাবে ছিলেন খুব বীর সাহসী। কিন্তু তার প্রধান দোষ ছিল অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করতেন আর এই দোষেই তার চাকরি গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত গ্র্যান্টের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পিছু হটতে আরম্ভ করলেন লী। দক্ষিণের একটার পর একটা শহর তার হাতছাড়া হয়ে গেল। শেষে লী আশ্রয় নিলেন রীচমন্ড শহরে। শহরের উপকণ্ঠে তখন গ্র্যান্টের কামান গর্জন করছে। এখন শুধু অপেক্ষা লীর আত্মসমর্পণের।

দেশবাসীর কাছে লিঙ্কন তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "কারোর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে সকলের প্রতি উদার মনোভাব নিয়ে...আসুন আমরা সকলে মিলে আরব্ধ কাজগুলি শেষ করি। জাতির ক্ষত আরোগ্য করা, এই যুদ্ধের গুরুভার যিনি বহন করেছেন তাকে অথবা তার বিধবা পত্নী ও পিতৃহীন সন্তানদের পালন করা, নিজেদের মধ্যে ও সকল জাতির সঙ্গে ন্যায্য এবং স্থায়ী শান্তি অর্জন ও পোষণের ব্যবস্থা—এই আমাদের কর্তব্য।" অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর যুদ্ধ শেষ হল। লী আত্মসমর্পণ করলেন।

ওয়াশিংটনে ফিরে এলেন লিঙ্কন। শত শত মানুষের অভিনন্দনের জোয়ারে ভেসে গেলেন তিনি। জনগণের ভিড় কমতেই একে একে মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা এসে ভিড় করে সেখানে। এখনো কত কাজ বাকি। রাতের বেলায় থিয়েটারে যাবার কথা। অনেকটা মেরির অনুরোধেই তিনি রাজি হলেন।

থিয়েটার হলে পৌঁছতেই সমস্ত দর্শকরা তাকে অভিনন্দন জানাল। নিজের আসনে গিয়ে বসলেন, লিঙ্কন আর মেরি। দু ঘন্টা কেটে গিয়েছে, বক্সের দরজার সামনে যে প্রহরী ছিল, তার কাছে একজন লোক এসে বলল, প্রেসিডেন্টকে একটা সংবাদ দিতে হবে। রক্ষী ভেতরে যাবার অনুমতি দিতেই আততায়ী ভেতরে ঢুকেই লিঙ্কনের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালাল। চেয়ারের উপর লুটিয়ে পড়লেন লিঙ্কন। লিঙ্কনকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল থিয়েটার হলের সামনের একটা বাড়িতে। আঘাতের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ দেহের প্রাণসত্তার দ্বন্দ্ব চলল নয় ঘন্টা ধরে। লিঙ্কন অচেতন, সেখানে উপস্থিত মেরি, লিঙ্কনের বড় ছেলে, তাঁর মন্ত্রীপরিষদের সবাই। সকাল সাতটায় অজ্ঞান অবস্থায় লিঙ্কন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মৃত্যুর সময় লিঙ্কনের বয়স হয়েছিল ছাপ্পান্ন। এই জীবনের মধ্যেই তিনি যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখবার জন্য সংগ্রাম করেছেন তাই নয়, তিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের মর্যাদার দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন। তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এক সার্বজনীন আদর্শের জন্য—জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন, যা কখনো পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে না।

২০

জন কিটস

[১৭৯৫—১৮২১]

দুশো বছর আগেকার কথা। লন্ডন শহরের প্রাণকেন্দ্রে ছিল একটি আস্তাবল। এমনি একটি আস্তাবলের পরিচালক ছিলেন টমাস কিটস্। নিচে আস্তাবল, উপরে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন টমাস। স্ত্রী আস্তাবলের মালিকের মেয়ে। কাজের প্রয়োজনে টমাসকে যেতে হত মালিকের বাড়িতে। সেখানেই দুজনের দেখা, তারপর প্রেম, একদিন বিবাহ।

বিবাহের এক বছর পর ১৭৯৫ সালের অক্টোবর মাসে টমাসের প্রথম সন্তানের জন্ম হল। যথাসময়ে শিশুর নামকরণ করা হল জন কিটস্।

কিটসের জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই জন্ম হল তাঁর দুই ভাই জর্জ আর টমের। তিন ভাইয়ের মধ্যে কিটস্ ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর।

সাত বছর বয়েসে তাঁকে এনফিল্ডের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিটসের তখন নয় বছর বয়েস। জীবনে প্রথম আঘাতের মুখোমুখি হলেন। ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেলেন টমাস কিটস্।

স্বামীর মৃত্যুর পর কিটসের মা রলিংস্ নামে একজনকে বিয়ে করলেন। কিন্তু অল্পদিনেই দুজনের সম্পর্কে ফাটল ধরল। এক বছরের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি এলেন কিটসের মা। কিটস্ তখন দশ বছরের ছেলে।

১৮১০ সালে মারা গেলেন কিটসের মা। মরবার আগে নিজের অজান্তেই রাজরোগ যক্ষার বীজ দিয়ে গেলেন সন্তানকে।

মায়ের মৃত্যুর পর পিতৃ-মাতৃহীন ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নিলেন মিস্টার এ্যাবি। স্কুলে ফিরে এলেন কিটস্। দিন-রাত পড়াশুনা নিয়ে থাকেন মাঝে মাঝে মনের খেয়ালে কবিতা লেখেন।

১৫ বছর বয়েসে স্কুলের পড়া শেষ হল। কিটসের অভিভাবকের ইচ্ছা কিটস ডাক্তারি পড়বেন।

ডাক্তারি পড়বার জন্যে ভর্তি হলে মেডিকেল কলেজে। কিন্তু যাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠেছে কবিতার নেশা, হাসপাতালের ছুরি কাঁচি ঔষধ রুগী তাঁর ভাল লাগবে কেন। সৌভাগ্য সেই সময় তাঁর স্কুলের বন্ধু কাউডেন ক্লার্ক কিটস্‌কে নিয়ে গেলেন সেই সময়কার খ্যাতিমান তরুণ কবি লে হান্টের কাছে।

হান্টের সাথে পরিচয় (১৮১৬) কিটসের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হান্ট কিটসের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হলেন, তাঁকে আরো কবিতা লেখবার জন্যে উৎসাহিত করলেন।

হান্ট একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। সেই পত্রিকাতেই কিটসের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হল। এখানে কিটসের পরিচয় হল শেলীর সাথে।

আর ডাক্তারির মোহে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারলেন না। অভিভাবকের উপদেশ অগ্রাহ্য করে মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দিয়ে স্থির করলেন সাহিত্যকেই জীবনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করবেন।

কিটস্ তাঁর দুই ভাইকে নিয়ে লন্ডন ত্যাগ করে এলেন হ্যাম্পস্টেডে। এখানে আসবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হান্টের সঙ্গ পাওয়া।

অল্পদিনের মধ্যে কিটস্ প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন। সকলের মনে আশা ছিল এই বই নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য কিটসের, পরিচিত কিছু লোকজন ছাড়া এই বই-এর একটি কপিও বিক্রি হল না।

প্রথম কাব্য সংকলনের ব্যর্থতায় সাময়িক আশাহত হলেন কিটস্ কিন্তু অল্পদিনেই নতুন উৎসাহে শুরু করলেন কাব্য সাধনা। লেখা হল প্রথম দীর্ঘ কবিতা এণ্ডিমিয়ন। (Endumion 1817)। এ এক অসাধারণ কবিতা। এই কবিতার প্রথম লাইনের মধ্যেই কিটসের জীবন দর্শন ফুটে উঠেছে।

A thing of beauty is joy forever.

ইতিপূর্বে কখনো দেশভ্রমণে যাননি কিটস্, তাই বন্ধুর সাথে বেরিয়ে পড়লেন। ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসতেই দেখলেন তাঁর ভাই টম গুরুতর অসুস্থ।

প্রকাশিত হল তাঁর এণ্ডিমিয়ন (১৮১৭)। কিটস্ আশা করেছিলেন তাঁর এই কবিতা নিশ্চয়ই

খ্যাতি পাবে। কিন্তু তৎকালীন দুটি পত্রিকা ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন এবং কোয়ার্টার্লি রিভিয়ু তীব্র ভাষায় কিটসের নামে সমালোচনা করল। জঘন্য সে আক্রমণ। এই তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা প্রকৃতপক্ষে কিটসের মানসিক শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল।

একদিকে যখন পত্রিকার সমালোচনায় ভেঙে পড়েছেন কিটস্, সেই সময় এল আরেক আঘাত। ১৮১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর মারা গেল টম।

কিটস্ স্থির করলেন যেমন করেই হোক তাঁকে অর্থ উপার্জন করতেই হবে। স্বাস্থ্য আগের মত ভাল যাচ্ছিল না। কিন্তু মনের অদম্য শক্তিতে কিটস্ লিখে চললেন একের পর এক কবিতা। প্রকৃতপক্ষে কিটসের জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিতাই এক সময়ে লেখা।

আর্থিক অবস্থাও ভাল যাচ্ছিল না কিটসের। কিটসের শরীর যতই ভেঙে পড়ছিল ততই ফ্যানি তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। তার সাজ-গোজ হাসি অন্য ছেলেদের সাথে মেলামেশা কিটস্ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর সমস্ত অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত।

তিনি ফিরে এলেন লন্ডনে। একদিন বাইরে বেড়াতে বেরোলেন কিটস। বাড়িতে ফিরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল, সেই সাথে কাশি। এক ঝলক রক্ত উঠে এল মুখ দিয়ে। কিটস্ বললেন, একটি মোমবাতি নিয়ে এস। ব্রাউন মোবাতি নিয়ে আসতেই কিটস্ কিছুক্ষণ রক্তের দিকেম চেয়ে বললেন, এই রক্তের রং আমি চিনি, এ রক্ত উঠে এসেছে ধমনী থেকে। এই রক্ত আমার মৃত্যুর শমন। ডাক্তার এল। সে যুগে যক্ষ্মার কোন চিকিৎসা ছিল না। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে শিরা কেটে কিছুটা রক্ত বার করে দেওয়া হল। কিন্তু তাতে কোন সুফল দেখা গেল না।

তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ। গলার স্বর ভেঙে গিয়েছিল, মাঝে মাঝেই জ্বর হত, গলা দিয়ে রক্ত উঠে আসত, এই সময় তাঁর সৃষ্টির উৎসও ফুরিয়ে আসছিল।

এই সময় প্রকাশিত হল কিটসের তৃতীয় ও শেষ কাব্য সংকলন (১৮২০)। এই কবিতাগুচ্ছ কিটস্‌কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের পাশে স্থান দিয়েছে।

এই সংকলনে একদিকে ছিল কিছু বড় কবিতা অন্যদিকে ছোট কিছু কবিতা, সনেট। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইসাবেলা (Isabella or the Pot of Basil 1818) । Hyperion —গ্রীক পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে লেখা দীর্ঘকাব্য।

The Eve of St, Agnes (1818)—ইভ অব সেন্ট অ্যাগানিস।

কিটসের আরেকটি বড় কবিতা The Eve of Saint Mark...এটিও অসমাপ্ত।

এই সব দীর্ঘ কবিতার পাশাপাশি রচিত তাঁর ছোট কবিতা (Ode) গুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে এক অনন্য সৌন্দর্য।

এই ছোট কবিতাগুলির মধ্যে আছে। Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian urn, Ode on Melancholy, Ode to Autumn.

Ode to Nightingale—এ মানব জীবনেরই এর রূপক। এখানে জীবন মৃত্যুর স্রোত পাশাপাশি বয়ে চলেছে।

Ode to Autumn—এ এক বিপরীত ধারণা ফুটে উঠেছে, এখানে কবি প্রকৃত সৌন্দর্য খুঁজে বেরিয়েছেন।

কবিতা ছাড়া কিটস্ কোন গদ্য লেখার চেষ্টা করেননি। তাঁর কাব্য জীবন ছিল মাত্র ছয় বছর (১৮১৪—১৮১৯)। অর্থাৎ উনিশ থেকে চব্বিশ বছর বয়স। ১৮২০ সাল। কিটসের দেহ ক্রমশই ভেঙে পড়ছিল। তাঁকে নিয়ে আসা হল ফ্যানিদের বাড়িতে। ইটালিতে যাবার আগে এক মাস তিনি ফ্যানির নিবিড় সান্নিধ্যে পেয়েছিলেন।

১৮২০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কিটস্ রওনা হলেন ইটালির দিকে। দীর্ঘ সমুদ্র পথ পার হতে ছয় সপ্তাহ লাগল। জাহাজে যেতে যেতে কিটস্ মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন। চোখে পড়ত ধ্রুবতারা। মনে হত মৃত্যুর পর তিনি ঐ ধ্রুবতারার সাথে একাত্ম হয়ে যাবেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ১৯২১ সাল। সমস্ত দিন কেমন আচ্ছন্ন ছিলেন কিটস্ রাত তখন প্রায় এগারোটা, মাথার পাশে বসেছিল বন্ধু সেভার্ন। আস্তে আস্তে কিটস্ বললেন, "আমাকে তুলে ধর, আমার মৃত্যু এগিয়ে এসেছে। আমি শান্তিতে মরতে চাই, তুমি ভয় পেও না—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অবশেষে মৃত্যু এল।" সেভার্নের কোলেই চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন চিরসুন্দরের কবি কিটস্। পরদিন রোমের এক সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

দু-বছর পরে এই সমাধিক্ষেত্রেই সমাধি দেওয়া হয় আরেক তরুণ কবি শেলীকে।

২১

ইমাম বোখারী (রঃ)

(৮১০-৮৭০ খ্রিঃ)

যারা হাদিস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, হাদিস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যারা শত শত মাইল দুর্গম পথ পদব্রজে গমন করেছিলেন, নির্ভুল হাদিস সমূহকে কষ্টিপাথরে যাচাই বাছাই করে গ্রন্থাকারে একত্র করার মত অসাধ্য কাজ সাধন করেছিলেন যারা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার বিনিময়ে মুসলিম জাতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্ভুল হাদিস সমূহ গ্রন্থকারে পেয়ে সত্যের সন্ধান লাভ করতে পেরেছে ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সাধনার কারণে তিনি হাদিস শাস্ত্রে 'বিশ্ব সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ইমাম বোখারী (রঃ) এর ডাক নাম ছিল আবু আবদুল্লাহ। তাঁর আসল এবং পূর্ণ নাম হল, আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুগীরা। তিনি ইমাম বোখারী নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল মোতাবেক ৮১০ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবার, জুমার নামাজের পর বর্তমান উজবিকিস্তানের বোখারা নামক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ইসমাঈল। তিনিও হাদিন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ইমাম বোখারীর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন অগ্নিপূজক এবং পারস্যের অধিবাসী। পূর্ব পুরুষদের মধ্যে মুগীরা'ই প্রথম ইসলাম কবুল করেন এবং পারস্য হতে বর্তমান উপবিকিস্তানের বোখারা নামক শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। এখানেই ইমাম বোখারী (রঃ) জন্ম লাভ করেন। বাল্যকালেই তাঁর পিতা মারা যান এবং মাতার নিকট লালিত পালিত হন। উল্লেখ্য যে, বাল্যাবস্থায়ই তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন; সে জন্যে মাতা নিজের এবং সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে খুব চিন্তিত থাকতেন এবং রাত দিন আল্লাহর দরবারে সন্তানের মঙ্গলের জন্যে দোয়া করতেন। একদিন মাতা আল্লাহর দরকার কান্নাকাটি করে যখন ঘুমিয়ে পড়লেন; তখন মাতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি যেন বলছেন, "হে পূণ্যবতী মহিলা, তোমার কান্নাকাটির দরুন আল্লাহ তোমার সন্তানের চক্ষু ভাল করে দিয়েছে।" নিদ্রা ভঙ্গের পর তিনি দেখলেন ইমাম বোখারী (রঃ) এর চোখের অন্ধত্ব দূর হয়ে গেছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) এর স্মরণ শক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ১০ বছর বয়স পর্যন্ত বোখারার নিকটস্থ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি হাদিস শেখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইমাম বোখারী (রঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হাদিস শিক্ষার জন্যে তিনি মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, বসরা, মিসর, কুফা, বাগদাদ, আল জামিরাত, হেজাজ, নিশাপুর, এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে হাদিসের শত শত সাক্ষাৎদাতার দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি এক হাজার ৮০ জন শায়খের নিকট হতে হাদিস সংগ্রহ করে তার সনদ ও মতনসহ মুখস্থ করেন। আল্লাহপাক তাঁকে অসাধারণ মেধা ও স্মরণ শক্তির দান করেছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই তিনি বিবিধ গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত হন এবং হাদিসের জগদ্বিখ্যাত কিতাব 'বোখারী শরীফ' সব বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

'বোখারী শরীফ' এর আসল নামে প্রসিদ্ধ না হয়ে রচনাকারীর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। 'বোখারী শরীফ' কিতাবের আসল নাম হচ্ছে, 'আল জামেউছ ছহীহুল মুসনাদু'। সংক্ষিপ্ত নাম 'ছহীহে বোখারী অর্থাৎ ইমাম বোখারীর ছহীহ। সাধারণত সবাই একে 'ছহীহ বোখারী' বা 'বোখারী শরীফ' বলে। ছিহাহ ছিত্তার অন্যান্য কিতাবগুলোও অনরূপভাবে রচনাকারীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইমাম বোখারী (রঃ) তাঁর অন্যান্য সহপাঠিদের সাথে একদিন ওস্তাদ ইমাম ইসহাক ইবনে রাওয়াই (রঃ) এর নিকট হাদিস শুনছিলেন। ওস্তাদ বললেন, "হায়! কেউ যদি কেবলমাত্র ছহীহ হাদিসগুলোকে একত্রে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করে দিত।" ইমাম বোখারী (রঃ) বর্ণনা করেন, এরপর একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপবিষ্ট। আমি হাতে পাখা নিয়ে তাঁর পবিত্র শরীর মোবারকে বাতাস করে মশা মাছি তাড়াচ্ছি। এরপর একজন স্বপ্নেও তা'বীর বর্ণনাকারীর নিকট স্বপ্নটি ব্যক্ত করলে তিনি আমাকে বললেন, "আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিস সমূহ হতে মিথ্যার জঞ্জালকে অপসারিত করবেন।" ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, এরপর ছহীহ হাদিসের একটি কিতাব লেখার জন্যে আমার মনে প্রেরণা জাগে এবং 'ছহীহ বোখারী' লিপিবদ্ধ করি।

ইমাম বোখারী (রঃ) মক্কা, মদীনা, বোখারা ও বসরায় বসে বোখারী শরীফ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে তিনি মক্কায় হেরেম শরীফে বসে এ কিতাবের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া

মদীনায় বিশ্বনবী (সাঃ) এর রওজা পাকের নিকটবর্তী স্থানে বসে অধিকাংশ হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন এবং কিতাবের পরিচ্ছেদ সমূহ এখানে বসেই সাজিয়েছেন। অতঃপর মদীনার মসজিদে নববীতে বসে উহার চূড়ান্ত রূপ দান করেন। ইমাম বোখারী (রঃ) বোখারী শরীফ লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে এত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, প্রতিটি হাদিস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত স্বীয় ক্ষমতা, এলম ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিটি হাদিসের সনদ ও মতনকে সূক্ষ্মভাবে যাচাই বাছাই করেছেন এবং আল্লাহর সাহায্যে কামনা করেছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমি এ কিতাবের প্রতিটি হাদিস এবং পরিচ্ছদ লেখার পূর্বে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করেছি এবং দোয়া করেছি, "হে আল্লাহ, তুমি মহাজ্ঞানী আর আমি মূর্খ। আমার হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জে্বলে দাও। আমি যেন হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে তিনি সুদীর্ঘ ১৬ বছরে কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর সংগ্রহীত ও কণ্ঠস্থ ছয় লক্ষের অধিক হাদিস থেকে বাছাই করে তাকরার সহ৭৩৯৩টি এবং তাকরার বাদে ২৭৬৯টি হাদিস এ কিতাবে স্থান দেন। এ সকল কারণে পবিত্র কোরআনের পরই বোখারী শরীফ নির্ভুল গ্রন্থের স্থান দখল করেছে এবং সমগ্র বিশ্বে এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে, শুধুমাত্র তাঁর নিকটই ৯০ হাজারেরও অধিক লোক এ কিতাবের হাদিস সমূহ শিক্ষা লাভ করেছেন। আজ মুসলিম বিশ্বের এমন কোন নেই যেখানে বোখারী শরীফ শিক্ষা দেয়া হয় না।

ইমাম বোখারী (রঃ) পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর ধন-সম্পদ পেয়েছেন; কিন্তু তিনি তা নিজে ভোগ করেননি। তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত ধন সম্পদই শিক্ষার্থী, দরিদ্র ও অসহায় লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। তিনি ভোগ বিলাস পছন্দ করতেন না। সাধারণ পোশাক ও সামান্য আহারেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি দৃঢ় ভাবে মনে করতেন যে, অতিরিক্ত ভোগ বিলাস মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি তাকওয়া (ভয়) কমিয়ে দেয়। তিনি যদি ভোগ বিলাস ও আরাম আয়াশে কাটাতেন তাহলে হাদিস শাস্ত্রে ও অসাধ্য সাধন করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ইমাম বোখারী (রঃ) এর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও অবদানের কারণেই মুসলিম জাতি আজ বোখারী শরীফের মত একটি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ পেয়ে সত্যের সন্ধান লাভ করেছে। কথিত আছে, তিনি একাধারে ৪০ বছর পর্যন্ত রুটির সাথে কোন তরকারি ব্যবহার করেননি। কোন কোন দিন তিনি মাত্র ৩/৪টি বাদাম বা খেজুর খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। এমন কি হাদিস চর্চায় ও গবেষণায় তিনি এতই নিবৃত্ত থাকতেন যে, কোন কোন দিন খাওয়ার কথাই ভুলে যেতেন। হাদিস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণেই তিনি হাদিস শাস্ত্রে 'বিশ্ব সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত হন। ইমাম বোখারী (রঃ) এর জনৈক ছাত্র বর্ণনা করেছেন, "আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে বললাম, ইমাম বোখারীর নিকট যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাঁকে আমার ছালাম দিও।" প্রিয় পাঠক, বিশ্বনবী (সাঃ) যার নিকট ছালাম পৌছান তাঁর মর্যাদা যে কত উর্ধ্বে হতে পারে তা সহজেই বোধগম্য।

ইমাম বোখারী (রঃ) এর বয়স যখন ৫৫ বছর তখন তিনি নিশাপুরে ছিলেন এবং সেখানে তিনি হাদিস শিক্ষা দান করতেন। ইমাম বোখারী (রঃ) এর নাম যখন সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে তখন নিশাপুরের এক শ্রেণীর লোক ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। এতে তিনি নিশাপুর ত্যাগ করে মাতৃভূমি বোখারায় চলে আসেন এবং লোকদের হাদিস শিক্ষাদানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, এ ধরা পৃষ্ঠে যুগে যুগে যত মনীষীর আগমন ঘটেছে তাঁরা প্রায় প্রত্যেকই তৎকালীন জালেম সরকার ও স্বজাতি কর্তৃক নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁরা হাজারো লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এমন কি মাতৃভূমি ও নিজ বংশের লোকেরাও তাঁদেরকে যথাযোগ্য সম্মান দেয়নি। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজ বংশ কুরাইশদের বিরোধিতা ও অত্যাচারের কারণেই নিজ মাতৃভূমি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। হাদিস শাস্ত্রের 'বিশ্ব সম্রাট' ইমাম বোখারী (রঃ) ও তৎকালীন জালেম সরকারের ষড়যন্ত্র ও রোষানলে পতিত হয়েছিলেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) নিজ মাতৃভূমি বোখারার জনগণের নিকট যথেষ্ট সম্মান পেলেও তৎকালীন জালেম সরকার তাঁকে মাতৃভূমিতে থাকতে দেয়নি। তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত হলেন। ইমাম বোখারী (রঃ) ও তাঁর রচিত 'সহী বোখারী' এর সুনাম যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন বোখারার তৎকালীন শাসনকর্তা খালেদ বিন আহমদ ইমাম বোখারী (রঃ) এর নিকট এ বলে সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি এবং তাঁর সন্তানদের 'আল জামেউছ ছহীহ' অর্থাৎ সহী

বোখারী অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁরা অন্যদের সাথে ইমাম বোখারীর নিকট তা অধ্যয়ন করতে রাজি নন। কাজেই ইমাম বোখারী যেন শাসনকর্তার এ সংবাদ শুনে ইমাম বোখারী (রঃ) পরিষ্কার ভাবে দিলে "লক্ষ লক্ষ গরীব শিক্ষার্থীদের উপেক্ষা করে আমি হাদিসে রাসূলকে বেইজ্জত করতে পারি না। এ এলম ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা সকলের জন্যেই সমান। আমি হাদিসে রাসূলকে রাজা-বাদশাদের দরওয়াজার প্রত্যাশী বানাতে পারি না। যদি কারোর এ এলম হাসিল করার প্রকৃতই ইচ্ছে থাকে তাহলে তিনি যেন এখানে এসে তা শিক্ষা লাভ করে যান। আর যদি তিনি আমার এ ব্যবস্থা অবলম্বনে অসন্তুষ্ট হন তাহলে আমার কিছুই করার নেই।"

শাসনকর্তা খালেদ বিন আহমদ ইমাম বোখারী (রঃ) এর উত্তর শুনে অসন্তুষ্ট হন এবং সম্পূর্ণ অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে তাঁকে মাতৃভূমি বোখারা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। ইমাম বোখারী (রঃ) বোখারা ছেড়ে প্রথমে 'বাইকান্দ' ও পরে 'সমরকন্দ' এর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সমরকন্দ এর নিকটবর্তী 'খরতঙ্গ' নামক গ্রামে গিয়ে জানতে পারলেন যে, 'সমরকন্দ' এর অধিবাসীগণ বিপদাশঙ্কায় ইমাম বোখারীকে সেখানে আশ্রয় দিতে রাজি নয়। এ সংবাদ শুনে ইমাম বোখারী (রঃ) অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং তাহাজ্জুদ নামাজের পর এ বলে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, এ বিশাল পৃথিবী আমার জন্যে সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে। তুমি আমাকে তোমার দরবারে উঠিয়ে নাও।" আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং এর কয়েক দিনের মধ্যেই ২৫৭ হিজরী মোতাবেক ৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ঈদুল ফিতরের রজনীতে হাদিস শাস্ত্রের এ মহান পণ্ডিত পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে চলে যান।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে মানুষ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ঈদের দিন জোহর নামাযের পর তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং হাজার হাজার লোক তাঁর জানাজায় শরীক হয়। সমরকন্দের অন্তর্গত 'খরতঙ্গ' নামক গ্রামে তাঁর সমাধি রয়েছে। 'খরতঙ্গ' গ্রামের অধিবাসী গালেব ইবনে জিব্রিল বর্ণনা করেছেন, "ইমাম বোখারী (রঃ) কে কবরের মধ্যে রাখা মাত্রই কবরের চতুষ্পার্শে এত সুঘ্রাণ ছড়াতে লাগল যে, বিভিন্ন দেশের লোকজন কবর জিয়ারতের জন্যে এসে তথাকার মাটি নিতে আরম্ভ করল। অবশেষে আমরা ঐ কবরকে বেষ্টনী দ্বারা রক্ষা করতে বাধ্য হলাম। ঐ সুঘ্রাণ দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল।"

ইমাম বোখারী (রঃ) আজ নেই; কিন্তু হাদিস শাস্ত্রে তিনি যে সুবিশাল গ্রন্থ 'সহী বোখারী শরীফ' লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তাতে মুসলিম বিশ্বে তিনি চির অমর হয়ে আছেন।

২২
ইমাম আবু হানিফা (রঃ)
(৭০২-৭৭২ খ্রিঃ)

অধঃপতনের যুগে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে যে সকল মনীষীগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, পার্থিব লোভ-লালসা ও ক্ষমতার মোহ যাদেরকে ন্যায় ও সত্যের আদর্শ থেকে বিন্দু মাত্র পদস্খলন ঘটাতে পারেনি; যারা অন্যায় ও অসত্যের নিকট কোন

দিন মাথা নত করেননি, ইসলাম ও মানুষের কল্যাণে সারাটা জীবন যারা পরিশ্রম করে গিয়েছেন, সত্যকে আঁকড়ে থাকার কারণে যারা জালেম সরকার কর্তৃক অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত; এমনকি কারাগারে নির্মমভাবে প্রহারিত হয়েছেন, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁদের অন্যতম।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) উমাইয়া খলিফাগণের দুঃশাসন, কুশাসন ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপে সমগ্র মুসলিম জাহান আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। তাদের দ্বারা এমন সব জঘন্য কাজ সম্পাদিত হয়েছিল যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। তাদের নিষ্ঠুর কার্যকলাপ কেবল মাত্র নাগরিকদের ধন-সম্পদ ও জীবনের উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়নি, নারী জাতির মান-সম্মান ও সতীত্বও ধূলায় ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল। মহানবীর আদর্শ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে শুধু মাত্র ভুলুণ্ঠিতই করা হয়নি; চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর নামে রীতিমত জুমআ'র নামাজে প্রকাশ্য মিম্বরে দাঁড়িয়ে অভিশাপ বর্ষণ করা হত।

খিলাফতের স্থান দখল করেছিল রাজতন্ত্র। অত্যাচারের মূর্ত প্রতীক, যুগের অভিশাপ ও কলঙ্ক ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিষ্ঠুর তরবারির আঘাতে সামান্য কথার জন্যে হাজার হাজার মুসলমানের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। লৌহ দণ্ডের প্রতাপে উমাইয়া বংশীয় খলিফাগণ এমন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল যেখানে কোন প্রতিবাদ তো

দূরের কথা কোন প্রকার সংশোধনের কথা মুখে উচ্চারণ করাই ছিল নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। তরবারির ভয় দেখিয়ে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

এক কথায় উমাইয়া বংশীয় শাসকগণ ও তাদের বর্বর গভর্নরগণ মুসলিম জাহানে নিষ্ঠুরতার এমন এ নজির স্থাপন করেছিল যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজও বিরল। ঠিক এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইসলামের বিবেকী কণ্ঠ ও অন্যায়ের প্রতিবাদী ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)। উল্লেখ্য যে উমাইয়া বংশীয় খলিফাগণের মধ্যে কেবল মাত্র ওয়ালিদ এবং খলিফা ওমর বিন আবদুল আজীজ (রঃ) এর শাসনকালই ছিল ইসলাম ও ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ৮০ হিজরী মোতাবেক ৭০২ খ্রিস্টাব্দে কুফা নগরীতের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম হল নু'মান। পিতার নাম ছাবিত এবং পিতামহের নাম জওতা। তাঁর বাল্যকালের ডাক নাম ছিল আবু হানিফা।

তিনি ইমাম আজম নামেও সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ইরানের অধিবাসী ছিলেন। পিতামহ জওতা জন্মভূমি পরিত্যাগ করে তৎকালীন আরবের সমৃদ্ধশালী নগর কুফায় এসে বাসস্থান নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বাল্যকালে লেখাপড়ার কোন সুযোগ পাননি। কারণ তখন কুফায় এসে মারওয়ানী খিলাখতের যুগ। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ছিলেন খিলাফতের প্রধান এবং যুগের অভিশাপ, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছিলেন ইরাকের শাসনকর্তা। দেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ১৪/১৫ বছর বয়সে একদিন যখন বাজারে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তৎকালীন বিখ্যাত ইমাম হযরত শা'বী (রঃ) তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে বালক, তুমি কি কোথাও লেখাপড়া শিখতে যাচ্ছো? উত্তরে তিনি অতি দুঃখিত স্বরে বললেন, "আমি কোথাও লেখাপড়া শিখি না।"

ইমাম শা'বী (রঃ) বললেন, "আমি যেন তোমাকে মধ্যে প্রতিভার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। ভাল আলেমের নিকট তোমার লেখাপড়া শিখা উচিত।"

ইমাম শা'বী (রঃ) এর উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইমাম হাম্মাদ (রঃ) ইমাম আতা ইবনে রবিয়া (রঃ) ও ইমাম জাফর সাদিক (রঃ) এর মত তৎকালীন বিখ্যাত আলেমগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইলমে কালাম, আদব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জ্ঞান লাভের জন্যে তিনি মক্কা, মদীনা, বসরা এবং কুফার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থানরত আলেমগণের নিকট পাগলের ন্যায় ছুটে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থান হতে হাদিসের অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করে স্বীয় জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি প্রায় চার সহস্রাধিক আলেমের নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

ইমাম মালেক (রঃ) এর নিকটও তিনি হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মালেক (রঃ) যদিও বয়সের দিক থেকে তাঁর চেয়ে ১৩ বছরের ছোট ছিলেন; তথাপি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁকে অশেষ সম্মান করতেন এবং ইমাম মালেক (রঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কে শিক্ষকের ন্যায় সম্মান দেখাতেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আদব কায়দা এমনই হয়ে থাকে।

শিক্ষকগণের প্রতি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর এত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, "আমার শিক্ষক ইমাম হাম্মাদ (রঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন আমি তাঁর বাড়ির দিকে পা মেলে বসিনি। তার কারণ, আমার ভয় হতো শিক্ষকের প্রতি আমার বেয়াদবি হয়ে যায় কিনা।" কারো কারো মতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাবেয়ী ছিলেন। সাহাবাগণের যুগ তখন প্রায় শেষ হলেও কয়েকজন সাহাবী জীবিত ছিলেন।

১০২ হিজরীতে তিনি যখন মদীনা গমন করেন তখন মদীনায় দু'জন সাহাবী হযরত সোলাইমান (রাঃ) ও হযরত সালেম ইবনে সুলাইমান (রাঃ) জীবিত ছিলেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁদের দর্শন লাভ করেন। কিন্তু অনেকের মতে তিনি কোন সাহাবীর দর্শন পাননি। তবে তাবে' তাবেয়ী হবার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই।

ইমাম আবু হানিফ (রঃ) এর শিক্ষকগণ প্রায় সবাই ছিলেন তাবেয়ী। ফলে হাদিস সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁদের মাত্র একটি মধ্যস্থতা অবলম্বন করতে হত। তাই তাঁর সংগৃহীত হাদিস সমূহ সম্পূর্ণ ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তাফসীর ও হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও পান্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও ফিকাহ শাস্ত্রেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে বিবিধ বিষয়ে ইসলামী আইনগুলোকে ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করেছেন। বর্তমান বিশ্বের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মুসলমান হানাফী মাজহাবের অনুসারী।

ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবদানের জন্যেই মুসলিম জাতি সত্যের সন্ধান অনায়াসে লাভ করতে পেরেছে। ফিকাহ শাস্ত্রের উন্নতির জন্যে তিনি ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতি গঠন করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছিলেন সমিতির প্রধান। সমিতির সদস্যদের মধ্যে ইমাম জাফর সাদিক, হাব্বান, ইমাম মুহাম্মদ, ইউসুফ, ইয়াহ ইয়া ইবনে আবি জায়েদা, হাব্বান, ইমাম মুহাম্মদ, ইউসুফ ইবনে খালেদ এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ইসলামের বিভিন্ন আইন নিয়ে সমিতিতে স্বাধীন ভাবে আলোচনা হত। প্রত্যেকই কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করতেন। অতঃপর সর্বসম্মতি ক্রমে সঠিক সিদ্ধান্ত গৃহিত হত এবং তা লিপিবদ্ধ করা হত।

সুদীর্ঘ ৩০ বছর কাল ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও অন্যান্যদের আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনার ফলে ফিকাহ শাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়। তিনি তাঁর শিক্ষকতা জীবনে পৃথিবীতে হাজার হাজার মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ তৈরি করে গিয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যারা ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম যুফার (রঃ) অন্যতম।

ইমাম আবু হানিফার (রঃ) চরিত্র ছিল বহু গুণে গুণান্বিত। তিনি ছিলেন আত্মসংযমী, মহান চরিত্রবান, পরহেজগার, উদার, দানশীল, অতিশয় বিচক্ষণ এবং মুত্তাকিন। তিনি ছিলেন, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে পবিত্র। বিনা প্রয়োজনে কোন কথা বলতেন না।

তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এশার নামাজের ওজু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করতেন। এতে এটাই বুঝা যায় যে, তিনি সারা রাত আল্লাহর ইবাদত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় মগ্ন থাকতেন।

তিনি কাপড়ের ব্যবসা করে নিজের এবং পরিবারের জীবিকা উপার্জন করতেন। কতিপয় কর্মচারীর দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ব্যবসায় যাতে হারাম অর্থ উপার্জিত না হয় সে জন্যে তিনি কর্মচারীদের সব সময় সতর্ক করতেন।

একবার তিনি দোকানে কর্মচারীদের কিছু কাপড়ের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে বললেন, "ক্রেতার নিকট যখন এগুলো বিক্রি করবে তখন কাপড়ের এ দোষগুলো দেখিয়ে দিকে এবং এর মূল্য কম রাখবে।"

কিন্তু পরবর্তীতে কর্মচারীগণ ভুল ক্রমে ক্রেতাকে কাপড়ের দোষত্রুটি না দেখিয়েই বিক্রি করে দেন। এ কথা তিনি শুনতে পেরে খুব ব্যথিত হয়ে কর্মচারীদের তিরস্কার করেন এবং বিক্রিত কাপড়ের সমুদয় অর্থ সদকা করে দেন। তাঁর সততার এ রকম শত শত ঘটনা রয়েছে।

তিনি কখনো সরকারি কোন অনুদান গ্রহণ করেননি। নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে উর্ধ্বে স্থান দিতেন তিনি।

উমাইয়া বংশীয় খলিফাদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে সারা দেশে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে মারওয়ানের শাসনামলে আব্বাসীয় খিলাফতের দাবিদারদের আন্দোলন ছিল তুংগে। এ আন্দোলন সমগ্র ইরাক ও কুফায় উমাইয়া বংশীয় খলিফা মারওয়ানের সিংহাসন কাঁপিয়ে তুলেছিল।

১২৯ হিজরী মারওয়ান তাঁর বিচক্ষণ আমলা ইয়াজিদ ইবনে ওমর ইবনে হুরায়রাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইয়াজিদ ইবনে হুরায়রা শাসন কার্যে ধর্মীয় নেতাদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তাই তিনি ক্ষমতা ও অর্থের লোভ দেখিয়ে ধর্মীয় নেতাদের শাসন কার্যে জড়িত কারার চেষ্টা চালান এবং ইতিমধ্যে কয়েকজনকে বড় বড় রাজকীয় পদও দান করেন। তখন সমগ্র ইরাক ও কুফায় ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর সুনাম, সততা ও জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক।

ইয়াজিদ ইবনে হুরায়রা ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কে প্রধান বিজারপতির (কাজী) পদ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা হল উমাইয়া খিলাফতকে দীর্ঘায়িত করার একটি গভীর ষড়যন্ত্র। তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রাদেশিক জালিম গভর্নরদের অধীনে কাজীর পদ গ্রহণ করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বিচার কার্যে উমাইয়া শাসকদের প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের অধীনে কাজীর পদ গ্রহণ করার অর্থ হবে সত্য ও ন্যায়কে জলাঞ্জলী দিয়ে ক্ষমতা ও অর্থের মোহে উমাইয়া জালিম শাসক গোষ্ঠীর গোলামী করা। আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি সরকারী কোন সাহায্য গ্রহণ করতেন না এবং অবৈধ ক্ষমতা ও অর্থের লোভ-লালসা তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি। তাই সত্যকে প্রকাশ করতে তিনি কাউকে কখনো ভয় করতেন না।

ইয়াজিদ ইবনে হুরায়রার আমন্ত্রণ পেয়ে শুধুমাত্র প্রত্যাখ্যানই করলেন না বরং সুস্পষ্ট ভাষায় বলেদিলেন, "প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতো দূরের কথা, মোটা অংকের বেতন দিয়ে ইয়াজিদ যদি মসজিদের দরজা জানালাগুলো গুণবার মত হালকা দায়িত্বও দেয়, তথাপি এ জালেম সরকারের অধীনে আমি তা গ্রহণ করব না।"

এতে ইয়াজিদ ক্ষিপ্ত হয়ে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী করেন। এরপর কারাগারে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ জানান। কিন্তু এতেও তিনি রাজি না হওয়ায় কারাগারে প্রতিদিন তাঁকে বেত্রাঘাত করা হত।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) নির্যাতনের ভয়ে জালিম সরকারের নিকট মাথা নত করেননি। অবশেষে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি মক্কায় চলে আসেন।

১৩১ হিজরীতে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটলে আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মক্কা থেকে কূফায় ফিরে আসেন। আব্বাসীয়গণ ইতিপূর্বে আহলে বাইয়াতদের পক্ষে আন্দোলন করলেও, ক্ষমতা লাভের পর আহলে বাইয়াতদের প্রতি খড়গহস্ত হয়ে উঠেন এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক নির্যাতন চালাতে শুরু করেন।

আব্বাসীয়গণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী উমাইয়া বংশীয়দের প্রায় সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এমন কি উমাইয়া খলিফাদের কবর খুঁড়ে তাঁদের অস্থি পাজর তুলে এনে জ্বালিয়ে ফেলেছিল। আব্বাসীয় বংশীয় খলিফা মনসুর সিংহাসনে বসে আহলে বাইয়াত ও আলেম সমাজের প্রতি অত্যাচারের স্টীম রোলার চালান।

১৪৫ হিজরীতে মুহাম্মদ নাফসে জাকিয়া খলিফা মনসুরের অনৈসলামিক ও অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে শহীদ হন। ইমাম মালেক (রঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সহ প্রায় সকল ধর্মীয় নেতাগণ মুহাম্মদ নাফসে জাকিয়ার পক্ষে ছিলেন। নাফসে জাকিয়া শহীদ হবার পর তাঁর ভ্রাতা ইব্রাহীম বিদ্রোহের পতাকা স্বহস্তে তুলে নেন এবং তৎকালীন দীনদার মুসলমান ও আলেম সমাজ ইব্রাহীমের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগলেন। জানা যায়, একমাত্র কূফা নগরেই বিশ লক্ষ মুসলমান মনসুরের বিরুদ্ধে মুহম্মদ ইব্রাহীমের পক্ষে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত গ্রহণ করেছিল।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মুহাম্মদ ইব্রাহীমকে গোপনে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে প্রচুর অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। যুগের নিষ্ঠুর ও জালেম মনসুর গোপনে বহু উপঢৌকন পাঠিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কে হাত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশেষে ১৪৬ হিজরীতে খলিফা মনুসুর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কে বাগদাদে খলিফার দরবারে তলব করেন। তিনি খলিফার দরবারে উপস্থিত হলে তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) জালেম সরকারের অধীনে এ পদ গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটা মনসুরের গভীর ষড়যন্ত্র।

এছাড়া এ পদ গ্রহণ করার অর্থ হবে ন্যায়, ইনসাফ ও ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে জালেমের পূজারী করা। তাই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) খলিফা মনসুরকে বললেন, "আমি প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার যোগ্য নই।"

এতে খলিফা রাগান্বিত স্বরে বললেন, আপনি মিথ্যাবাদী। প্রত্যুত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, "আপনার কথা যদি সত্যি হয় (অর্থাৎ আপনার কথানুযায়ী আমি যদি মিথ্যাবাদী হই) তাহলে আমার কথাই সঠিক। কারণ একজন মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রের 'প্রধান বিচারপতি' পদের যোগ্য নয়।"

অতঃপর খলিফা মনসুর কোন উত্তর দিতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কে

গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী করার নির্দেশ দেন। কারাগারে বসেও ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর কঠোর সাধনা চালিয়েছিলেন। কারাগারে বসেই তিনি বিভিন্ন কঠিন মাসআলার জবাব দিতেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে শত শত মানুষ এসে কারাগারেই মাসআলা শিক্ষা লাভ করে যেতেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কেবল মাত্র কারাগারে বসেই ১২ লক্ষ ৯০ হাজারের অধিক মাসআলা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

এরপর খলিফা মনসুর একদিন খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে দেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বিষ ক্রিয়া বুঝতে পেরে সিজদায় পড়ে যান এবং সিজদা অবস্থায়ই তিনি ১৫০ হিজরীতে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মৃত্যুর সংবাদ বিদ্যুতের গতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের সর্বস্তরের লোকজন মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। কথিত আছে, তাঁর জানাজায় পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোক অংশ গ্রহণ করেছিল; কিন্তু লোকজন আসতে থাকায় ৬ বার তাঁর জানাজা পড়া হয়েছিল। তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী বিজরান গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।

২৩

সক্রেটিস

[৪৬৯-৩৯৯ খৃঃ পূঃ]

দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুজন মানুষ তার চেয়েও দ্রুত এগিয়ে চলছিলেন। ঐ আঁধার নামার আগেই তাদের পৌঁছতে হবে ডেলফিতে। একজনের নাম চেরেফোন। (Chaerephon) মধ্যবয়সী গ্রীক। দুজনে এসে থামলেন ডেলফির বিরাট মন্দির প্রাঙ্গণে। সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই মন্দিরের পূজারী এগিয়ে এল। চেরেফোন তার দিকে চেয়ে বললেন, আমরা দেবতার কাছে একটি বিষয় জানবার জন্য এসেছি।

পূজারী বলল, আপনারা প্রভু অ্যাপেলের মূর্তির সামনে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিন আর বলুন আপনারা কি জানতে চান?

কুৎসিত চেহারার মানুষটি প্রথমে এগিয়ে এসে বললেন, আমি সক্রেটিস, প্রভু, আমি কিছুই জানি না। এবার চেরেফোন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে সর্বশক্তিমান দেবতা, আপনি বলুন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কে?

চেরেফোনের কথা শেষ হতেই চারদিক কাঁপিয়ে আকাশ থেকে এক দৈববাণী ভেসে এল।

যে নিজেকে জানে সেই সক্রেটিসের জন্ম (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯/৪৬৩) পিতা সফরেনিকাশ (Sopphroniscus) ছিলেন স্থপতি। পাথরের নানান মূর্তি গড়তেন। মা ফেনআরেট (Phaenarete) ছিলেন ধাত্রী।

পিতা মাতা দুজনে দুই পেশায় নিযুক্ত থাকলেও সংসারে অভাব লেগেই থাকত। তাই ছেলেবেলায় পড়াশুনার পরিবর্তে পাথর কাটার কাজ নিতে হল। কিন্তু অদম্য জ্ঞানস্পৃহা সক্রেটিসের। যখন যেখানে যেটুকু জানার সুযোগ পান সেইটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করেন। এমনি করেই বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

একদিন ঘটনাচক্রে পরিচয় হল এক ধনী ব্যক্তির সঙ্গে। তিন সক্রেটিসের ভদ্র ও মধুর আচরণে, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর পড়াশুনার দায়িত্ব নিলেন।

পাথরের কাজ ছেড়ে সেক্রেটিস ভর্তি হলে এনাক্সগোরাস (Anaxagoras) নামে এক গুরুর কাছে। কিছুদিন পর কোন কারণে এনাক্সগোরাস আদালতে অভিযুক্ত হলে সক্রেটিস আরখ এখলাস-এর শিষ্য হলেন।

এই সময় গ্রীস দেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ফলে নিজেদের মধ্যে মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। দেশের প্রতিটি তরুণ, যুবক, সক্ষম পুরুষদের যুদ্ধে যেতে হত।

সক্রেটিসকেও এথন্সের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এ্যামপিপোলিস অভিযানে যেতে হল। এই যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য সমস্ত যোগদান করে তাঁর মন ক্রমশই যুদ্ধের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল।

চিরদিনের মত সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করে ফিরে এলেন এথেন্সে। এথেন্সে তখন জ্ঞান-গরিমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শৌর্য্য, বীর্যে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির এক স্বর্ণযুগ।

এই পরিবেশে নিজেকে জ্ঞানের জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না সক্রেটিস। তিনি ঠিক করলেন জ্ঞানের চর্চায়, বিশ্ব প্রকৃতির জানবার সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন।

প্রতিদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে সামান্য প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়তেন। খালি পা, গায়ে একটা মোটা কাপড় জড়ানো থাকত। কোনদিন গিয়ে বসতেন নগরের কোন দোকানে, মন্দিরের চাতালে কিম্বা বন্ধুর বাড়িতে। নগরের যেখানেই লোকজনের ভিড় সেখানেই খুঁজে পাওয়া যেত সক্রেটিসকে। প্রাণ খুলে লোকজনের সঙ্গে গল্প করছেন। আড্ডা দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন, নিজে এমন ভাব দেখাতেন যেন কিছুই জানেন না, বোঝেন না। লোকের কাছ থেকে জানবার জন্যে প্রশ্ন করছেন।

আসলে প্রশ্ন করা, তর্ক করা ছিল সে যুগের এক শ্রেণীর লোকদের ব্যবসা। এদের বলা হত সোফিস্ট। এরা পয়সা নিয়ে বড় বড় কথা বলত।

যারা নিজেদের পান্ডিত্যের অহঙ্কার করত, বীরত্বের বড়াই করত, তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করতেন, বীরত্ব বলতে তারা কি বোঝে? পান্ডিত্যের স্বরূপ কি। তারা যখন কোন কিছু উত্তর দিত, তিনি আবার প্রশ্ন করতেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন সাজিয়ে বুঝিয়ে দিতেন তাদের ধারণা কত ভ্রান্ত। মিথ্যে অহমিকায় কতখানি ভরপুর হয়ে আছে তারা। নিজেদের স্বরূপ এইভাবে উৎঘাটিত হয়ে পড়ায় সক্রেটিসের উপর তারা সকলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু সক্রেটিস তাতে সামান্যতম বিচলিত হতেন না। নিজের আদর্শ, সত্যের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। সেই সাথে ছিল অর্থ সম্পদের প্রতি চরম উদাসীনতা।

একবার তাঁর বন্ধু এ্যালসিবিয়াদেশ তাকে বাসস্থান তৈরি করবার জন্য বিরাট একখন্ড জমি দিতে চাইলেন। সক্রেটিস বন্ধুর দান ফিরিয়ে দিয়ে সকৌতুকে বললেন, আমার প্রয়োজন একটি জুতার আর তুমি দিচ্ছ একটি বিরাট চামড়া এ–নিয়ে আমি কি করব জানি না।

পার্থিব সম্পদের প্রতি নিঃস্পৃহতা তাঁর দার্শনিক জীবনে যতখানি শান্তি নিয়ে এসেছিল, তাঁর সাংসারিক জীবনে ততখানি অশান্তি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তার প্রতিও তিনি ছিলেন সমান নিস্পৃহ।

তাঁর স্ত্রী জ্যানথিপি (Xanthiphe) ছিলেন ভয়ঙ্কর রাগী মহিলা। সাংসারিক ব্যাপারে সক্রেটিসের উদাসীনতা তিনি মেনে নিতে পারতেন না। একদিন সক্রেটিস গভীর একাগ্রতার সাথে একখানি বই পড়ছিলেন। প্রচন্ড বিরক্তিতে জ্যানথিপি গালিগালাজ শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ সক্রেটিস স্ত্রীর বাক্যবাণে কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য রক্ষা করত না পেরে বাইরে গিয়ে আবার বইটি পড়তে আরম্ভ করলেন। জ্যানথিপি আর সহ্য করতে না পেরে এক বালতি পানি এনে তাঁর মাথায় ঢেলে দিলেন। সক্রেটিস মৃদু হেসে বললেন, আমি আগেই জানতাম যখন এত মেঘগর্জন হচ্ছে তখন শেষ পর্যন্ত একপশলা বৃষ্টি হবেই।

জ্যানথিপি ছাড়াও সক্রেটিসের আরো একজন স্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম মায়ার্ত (Myrto)।

দুই স্ত্রী গর্ভে তাঁর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। দারিদ্র্যের মধ্যে হলেও তিনি তাদের ভরণ পোষণ শিক্ষার ব্যাপারে কোন উদাসীনতা দেখাননি।

তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শিক্ষার মধ্যেই মানুষের অন্তরের জ্ঞানের পূর্ণ জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই মানুষ একমাত্র সত্যকে চিনতে পারে। যখন তার কাছে সত্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সে আর কোন পাপ করে না। অজ্ঞানতা থেকেই সমস্ত পাপের জন্ম। তিনি চাইতেন মানুষের মনের সেই অজ্ঞানতাকে দূর করে তার মধ্যে বিচার বুদ্ধি বোধকে জাগ্রত করতে। যাতে তারা সঠিতভাবে নিজেদের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

তাঁর লক্ষ্য ছিল আলোচনা জিজ্ঞাসা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে মানুষকে সাহায্য করা।

কথা মধ্যে দিয়ে তর্ক বিচারের পদ্ধতিকে দার্শনিকরা আস্তি নাস্তিমূলক পদ্ধতি (Dialectic Method) নাম দিয়েছেন সক্রেটিস এই পদ্ধতির সূত্রপাত করেছিলেন। পরবর্তীকালের তাঁর শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য এ্যারিস্টটল সেই ধারাকে পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত করেছিলেন ন্যায় শাস্ত্রে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণযুগ। এই যুগেই সক্রেটিসের জন্ম। কিন্তু তাঁর যৌবনকালে থেকে এই সভ্যতার অবক্ষয় শুরু হল। পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের ফলে প্রত্যেকেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি কমতে আরম্ভ করল। গ্রীসের

সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র এথেন্সও তার প্রভাব থেকে বাদ পড়ল না। শুধু অর্থনীতি নয়, সমাজ রাজনীতিতেও নেমে এল বিপর্যয়। তর্কের মধ্যে দিয়ে আলোচনার পথ ধরে মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ ঘটানো, সত্যের পথে মানুষকে চালিত করা।

সক্রেটিসের আদর্শকে দেশের বেশ কিছু মানুষ সুনজরে দেখেনি। তারা সক্রেটিসের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করল। তাছাড়া যারা ঐশ্বর্য, বীরত্ব শিক্ষার অহঙ্কারে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত, সক্রেটিসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের এই অহঙ্কারের খোলসটা খসে পড়ত। এইভাবে নিজেদের স্বরূপ উৎঘাটিত হয়ে পড়ায় অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা সক্রেটিসের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠল। তাঁদের চক্রান্তে দেশের নাগরিক আদালতে সক্রেটিসের ঘোর বিরোধী অভিযোগ আনা হল (৩৯৯ খ্রিস্টপূর্ব) তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি এথেন্সের প্রচলিত দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নতুন দেবতার প্রবর্তন করতে চাইছেন। দ্বিতীয়ত তিনি দেশের যুব সমাজকে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছেন।তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের আরো দুটি কারণ ছিল স্পার্টার সঙ্গে ২৭ বছরের যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয়ের ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরাট আঘাত এল। অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিল। সেকালের ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মনে করল নিশ্চয়ই দেবতাদের অভিশাপেই এই পরাজয় আর এর জন্য দায়ী সক্রেটিসের ঈশ্বরদ্বেষী শিক্ষা।

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এল মেলেতুল, লাইকন, আনীতুস নামে এথেন্সের তিনজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক। এই অভিযোগের বিচার করবার জন্য আলোচোনের সভাপতিত্বে ৫০১ জনের বিচারকমন্ডলী গঠিত হল। এই বিচারকমন্ডলীর সামনে সক্রেটিস এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বিরোধীপক্ষ কি বলেছিল তা জানা যায়নি। তবে সক্রেটিসের জবানবন্দী লিখে রেখে গিয়েছিলেন প্লেটো। এক আশ্চর্য সুন্দর বর্ণনায়, বক্তব্যের গভীরতায় এই রচনা বিশ্ব সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

...হে এথেন্সের অধিবাসীগণ, আমার অভিযোগকারীদের বক্তৃতা শুনে আপনাদের কেমন লেগেছে জানি না, তবে আমি তাদের বক্তৃতার চমকে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম, যদিও তাদের বক্তৃতায় সত্য ভাষণের চিহ্নমাত্র নেই। এর উত্তরে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমি অভিযোগকারীদের মত মার্জিত ভাষার ব্যবহার জানি না। আমাকে শুধু ন্যায় বিচারের স্বার্থে সত্য প্রকাশ করতে দেওয়া হোক।

কেন আমি আমার দেশবাসীর বিরাগভাজন হলাম? অনেক দিন আগে ডেলফির মন্দিরে দৈববাণী শুনলাম তখনই আমার মনে হল এর অর্থ কি? আমি তো জ্ঞানী নই তবে দেবী কেন আমাকে দেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলব, এই দেখ আমার চেয়ে জ্ঞানী মানুষ।

আমি জ্ঞানী মানুষ খুঁজতে আরম্ভ করলাম। ঠিক একই জিনিস লক্ষ্য করলাম। সেখান থেকে গেলাম কবিদের কাছে। তাদের সাথে কথা বলে বুঝলাম তারা প্রকৃতই অজ্ঞ। তারা ঈশ্বরদত্ত শক্তি ও প্রেরণা থেকেই সব কিছু সৃষ্টি করেন, জ্ঞান থেকে নয়।

শেষ পর্যন্ত গেলাম শিল্পী, কারিগরিদের কাছে। তারা এমন অনেক বিষয় জানেন যা আমি জানি না। কিন্তু তারাও কবিদের মত সব ব্যাপারেই নিজেদের চরম জ্ঞানী বলে মনে করত আর এই ভ্রান্তিই তাদের প্রকৃত জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছিল।।

এই অনুসন্ধানের জন্য আমার অনেক শত্রু সৃষ্টি হল। লোকে আমার নামে অপবাদ দিল, আমিই নাকি একমাত্র জ্ঞানী কিন্তু ততদিনে আমি দৈববাণীর অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছি। মানুষের জ্ঞান কত অকিঞ্চিতৎকর। দেবতা আমার নামটা দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহার করে বলতে চেয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী যে সক্রেটিসের মত জানে, যে সত্য সত্যই জানে তার জ্ঞানের কোন মূল্য নেই।

তাঁর মৃত্যুর পরেই এথেন্সের মানুষ ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়ল। চারদিকে ধিক্কার ধ্বনি উঠল। বিচারকদের দল সর্বত্র একঘরে হয়ে পড়ল। অনেকে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করলেন। অভিযোগকারীদের মধ্যে মেনেতুসকে পিটিয়ে মারা হল, অন্যদেশ থেকে বিতাড়িত করা হল। দেশের লোকেরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিরাট মূর্তি প্রতিষ্ঠা করল।

প্রকৃতপক্ষে সকেটিসই পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক, চিন্তাবিদ যাঁকে তাঁর চিন্তা দর্শনের জন্য মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাঁর নশ্বর দেহের শেষ হলেও চিন্তার শেষ হয়নি। তাঁর শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটলের মধ্যে দিয়ে সেই চিন্তার এক নতুন জগৎ সৃষ্টি হল যা মানুষকে উত্তেজিত করেছে আজকের পৃথিবীতে।

২৪

প্লেটো

(খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭—খ্রীস্টপূর্ব ৩৪)

সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল—মানুষের চিন্তা আর জ্ঞানের জগতে তিন উজ্জ্বল লক্ষত্র। সক্রেটিসের মধ্যে যে চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল; প্লেটো, অ্যারিস্টটল তাকেই সুসংহত দর্শনের রূপ দিলেন। এঁরা শুধু যে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তাই নয়, সমগ্র ইউরোপের জ্ঞানের জগতে যুগপুরুষ। প্লেটো ছিলেন সেই সব সীমিত সংখ্যক মানুষদের একজন যাঁরা ঈশ্বরের অকৃপণ করুণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁর জন্ম হয়েছিল সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে।

অপরূপ ছিল তার দেহলাবণ্য, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, সক্রেটিসের মত গুরুর শিষ্যত্ব লাভ করা, সব কিছুতেই তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান।

পিতা ছিলেন এথেন্সের বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু আভিজাত্যের কৌলিন্য তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি বরাবরই ছিলেন উদাসীন। বাস্তব জীবনের জটিলতা, সমস্যার চেয়ে জ্ঞানের সীমাহীন জগৎ তাঁর মনকে আরো বেশি আকৃষ্ট করত। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ভাবুক আর কল্পনাপ্রবণ। এক সময় এথেন্স সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধ। প্লেটো যখন কিশোর সেই সময় সিসিলির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এথেন্স। এই যুদ্ধের পর থেকেই শুরু হল এথেন্সের বিপর্যয়। দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠিত হল স্বৈরাচারী শাসন। সমাজের সর্বক্ষেত্রে দেখা দিল অবক্ষয় আর দুর্নীতি।

প্লেটো বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করেছে। তাঁদের কারোর কাছে শিখেছেন সংগীত, কারোর কাছে শিল্প, কেউ শিখিয়েছেন সাহিত্য আবার কারো কাছে পাঠ নিয়েছেন বিজ্ঞানের। সক্রেটিসের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই ছিল প্লেটোর গভীর শ্রদ্ধা। সক্রেটিসের জ্ঞান, তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতির প্রতি কিশোর বয়েসেই আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। কুড়ি বছর বয়েছে তিনি সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

তরুণ প্লেটো অল্পদিনেই মধ্যেই হয়ে উঠলেন সক্রেটিসের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। গুরুর বিপদের মুহূর্তেও প্লেটো ছিলেন তাঁর নিত্য সঙ্গী।

বিচারের নামে মিথ্যা প্রহসন করে সক্রেটিসকে হত্যা করা হল। সক্রেটিসের মৃত্যু হল কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞার আলো জ্বলে উঠল শিষ্য প্লেটোর মধ্যে। প্লেটো শুধু যে সক্রেটিসের প্রিয় শিষ্য ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন গুরুর জ্ঞানের ধারক-বাহক। গুরুর প্রতি এত গভীর শ্রদ্ধা খুব কম শিষ্যের মধ্যেই দেখা যায়। প্লেটো যা কিছু লিখেছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর প্রধান নায়ক সক্রেটিস। এর ফলে উত্তর কালের মানুষদের কাছে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সক্রেটিসকে কেন্দ্র করে প্লেটো তাঁর সব সংলাপ তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন। সবসময়েই প্লেটো নিজেকে আড়ালে রেখেছেন—কখনোই প্রকাশ করেননি। সক্রেটিসের জীবনের অন্তিম পর্যায়ের যে অসাধারণ বর্ণনা করেছেন প্লেটো তাঁর "সক্রেটিসের জীবনের শেষ দিন" গ্রন্থে, জগতে তার কোন তুলনা নেই। প্লেটোর মত প্রতিভাবান পুরুষ যে শুধুমাত্র সক্রেটিসকে অন্ধ অনুসরণ করে তাঁর অভিমতকেই প্রকাশ করেছেন, এ কথা মেনে নেওয়া কষ্টকর। তাঁর কথোপকথনগুলি দীর্ঘকাল ধরে রচনা করা হয়েছে। প্লেটোর মত একজন মহান চিন্তাবিদ দার্শনিক সমস্ত জীবন ধরে শুধু সক্রেটিসের বাণী প্রচার করবেন, একথা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। তাই পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা, প্লেটো তাঁর নিজের অভিমতকেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সব অভিমতের উৎস ও প্রেরণা হচ্ছে সক্রেটিসের জীবন ও তাঁর বাণী।

গুরুর মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন প্লেটো। তার কয়েক বছরের মধ্যেই এথেন্স স্পার্টার হাতে সম্পূর্ণ হাতেবিধ্বস্ত হল। আর এথেন্সে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি যখন যে দেশেই গিয়েছেন সেখানকার জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতদের সাথে নানান বিষয়ে আলোচনা করতেন। এতে একদিন যেমন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানের প্রসার ঘটছিল, অন্যদিকে তেমনি পণ্ডিত দার্শনিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সম্মান একটু একটু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে প্রবাসে জীবন কাটিয়ে অবশেষে ফিরে এলেন এথেন্সে।

মহান গুরুর মহান শিষ্য। ভ্রমর যেমন ফুলের সুবাসে চারদিকে থেকে ছুটে আসে দলে দলে, ছাত্ররা এসে ভিড় করল প্লেটোর কাছে। সক্রেটিস শিষ্যদের নিয়ে প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে শিক্ষা

দিতেন কিন্তু প্লেটো উন্মুক্ত কল-কোলাহলে শিক্ষাদানকে মেনে নিতে পারতেন না। নগরের উপকণ্ঠে প্লেটোর একটি বাগানবাড়ি ছিল, সেখানেই তিনি শিক্ষাকেন্দ্র খুললেন, এর নাম দিলেন একাডেমি। এই একাডেমির ছাত্রদের কাছেই প্লেটো উজাড় করে দিলেন তাঁর জ্ঞান চিন্তা মনীষা। তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সিসিলি দ্বীপের শাসকদের আহ্বানে তিনি উপদেষ্টা হিসাবে সেখানে যান। তিনি চেয়েছিলেন সিসিলিকে এক আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করতে। দার্শনিকদের চিন্তাভাবনার সাথে রাষ্ট্রনেতাদের চিন্তাভাবনার কোনদিনই মিল হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন এথেন্সে। তাঁর এই অভিজ্ঞতার আলোকে লিখলেন রিপাবলিক—এক আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ ফুটে উঠেছে সেখানে। আসলে প্লেটোর আগে দর্শনশাস্ত্রের কোন শৃঙ্খলা ছিল না। তিনিই তাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করলেন। তাকে নতুন ব্যঞ্জনা দিলেন। তিনি জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষকে দিয়েছেন এক নতুন প্রজ্ঞার আলো। ইউরোপ তাঁকে বর্জন করলেও আরবরা তাঁকে গ্রহণ করল। আরব পণ্ডিতরা তাঁকে নতুনভাবে আবিষ্কার করল। আবার চারদিকে প্রচারিত হল তাঁর আদর্শবাদ। ইউরোপের মানুষের চিন্তাভাবনা মননের জগতে যে দুজন মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁদের একজন প্লেটো, অপরজন অ্যারিস্টটল।

প্লেটোর চিন্তাভাবনা তাঁর যুগকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে এক চিরকালীন সত্য। প্লেটোর চিন্তাভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে। বিশ্ব সাহিত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যদিও বইখানিতে মূলত রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনে এখানে নানান প্রসঙ্গ এসেছে। মানব জীবন এবং সমাজ জীবনে যা কিছু প্রয়োজন—শরীরচর্চা, শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, এমনকি সুপ্রজনন বিদ্যা—এছাড়াও কাব্য অলঙ্কার নন্দন তত্ত্ব এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত। প্লেটো রাষ্ট্রের নাগরিকদের তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন—(১) শাসক সম্প্রদায়, (২) সৈনিক, (৩) জনসাধারণ ও ক্রীতদাস।

রাষ্ট্র তখনই সুপরিচালিত হয় যখন তিন বিভাগের কাজের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বর্তমান থাকে এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। তিনি বলেছেন শাসক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন জ্ঞান, শাসন ক্ষমতা—সৈনিকদের চাই সাহস বীরত্ব, জনগণের প্রয়োজন সংযম ও শাসকদের প্রতি আনুগত্য। রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে শাসকদের উপর। তাই প্লেটো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন শাসক নির্বাচনের উপর।

তিনি বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্র ক্ষমতায় কোন স্বৈরাচারীর স্থান নেই। "রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু জীবন ধারণের জন্য নয়। যতদিন মানুষ জীবিত থাকবে ততদিনই সে শ্রেষ্ঠ জীবন যাপন করবে।" তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থায় উচ্চ-নীচের ভেদ থাকবে না, থাকবে পারস্পরিক সৌহার্দ ও প্রীতির সম্পর্ক। দি লস গ্রন্থে তিনি বলেছেন, নগরবাসীরা সকলে পরস্পরকে জানবে বুঝবে। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আর কিছুই হতে পারে না।

সুপ্রজনন বিজ্ঞান—প্রাচীন গ্রীসের মানুষেরা সুস্থ সবল দেহের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিত। তারা দুর্বল অসুস্থ শিশুকে জীবিত রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্লেটো এই অভিমত সমর্থন করতেন। তাই তিনি বলেছেন, যাদের শরীর ব্যাধিগ্রস্থ তাদের কোন সন্তান প্রজনন করা উচিত নয়। আপাত দৃষ্টিতে প্লেটোর অভিমত নিষ্ঠুর বলে মনে হলেও সামাজিক বিচারে তা একেবারে মূল্যহীন নয়। সংগীতের প্রতি প্লেটোর ছিল গভীর আকর্ষণ। তিনি বিশ্বাস করতেন সংগীত মানব জীবনকে পূর্ণতা দেয়, মানবিক গুণকে বিকশিত করে। নারীদের প্রতি প্লেটোর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি উদার নীতিতে বিশ্বাস করতেন। সেই যুগে অনেক মহিলাই পুরুষের যোগ্য সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে করতেন পুরুষেরা অহমিকাবশত নারীদের উপেক্ষা করে। গ্রীসের পুরুষদের এই অহমিকা প্লেটোকে স্পর্শ করেনি। তিনি দেখেছেন বিভিন্ন গ্রীক মনীষীদের প্রেরণার উৎসই হচ্ছে নারী।

একদিন তাঁর এক বন্ধুর ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার কলকোলাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বিশ্রাম নেবার জন্য পাশের ঘরে গেলেন কিন্তু আনন্দ উল্লাসের শব্দ ক্রমশই বেড়ে চলছিল। উপস্থিত সকলেই ভুলে গিয়েছিল বৃদ্ধ দার্শনিকের কথা। এক সময় বিবাহ শেষ হল। নব দম্পতি আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য প্লেটোর কক্ষে প্রবেশ করল। প্লেটো তখন গভীর ঘুমে অচেতন। পৃথিবীর কোন মানুষের ডাকেই সে ঘুম ভাঙাবে না।

চার্লস ডারউইন্

[১৮০৯—১৮৮২]

ডারউইনের জন্ম হয় ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। পিতা ছিলেন নামকরা চিকিৎসক। মাত্র আট বছর বয়েসে মাকে হারালেন ডারউইন। সেই সময় থেকে পিতা আর বড় বোনদের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। নয় বছর বয়েসে স্কুলে ভর্তি হলেন। চিরাচরিত পাঠ্যসূচীরে মধ্যে কোন আনন্দই পেতেন না। তিনি লিখেছেন, বাড়িতে তাঁর ভাই একটি ছোট ল্যাবরোটরি গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে তিনি রসায়নের নানান মজার খেলা খেলতেন।

ষোল বছর বয়েসে চার্লসকে ডাক্তারি পড়ার জন্য এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হল। যাঁর মন প্রকৃতির রূপ রস গন্ধে পূর্ণ হয়ে আছে, মরা দেহের হাড় অস্থি মজ্জা তাঁকে কেমন করে আকর্ষণ করবে! ঔষধের নাম মনে রাখতে পারতেন না। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ পড়তে বিরক্তি বোধ করতেন। আর অপরেশনের কথা শুনলেই আঁতকে উঠতেন।

চার্লসের পিতা বুঝতে পারলেন ছেলের পক্ষে ডাক্তার হওয়া সম্ভব নয়। তাকে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি করা হল। উদ্দেশ্য ধর্মযাজক করা।

সেই সময় কেমব্রিজের উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন হেনসলো (Henslow)। হেনসলোর সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়লেন চালর্স। অল্পদিনের মধ্যেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

কেমব্রিজ থেকে পাশ করে তিনি কিছুদিন ভূবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। অপ্রত্যাশিতভাবে চার্লস ডারউইনের জীবনে এক অযাচিত সৌভাগ্যের উদয় হল। অধ্যাপক হেনসলোর কাছ থেকে একখানি পত্র পেলেন ডারউইন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বিগল (H. M. S. Beagle) নামে একটি জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে বার হবে। এই অভিযানের প্রদান হলেন ক্যাপ্টেন ফিজরয়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবজন্তু, গাছপালা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা এবং বৈশিষ্ট্যকে পর্যবেক্ষণ করা। এই ধরনের কাজে বিশেষজ্ঞ এবং অনুরাগী ব্যক্তিরাই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে।

এই অভাবনীয় সৌভাগ্যের সুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইলেন না ডারউইন। ১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর "বিগল" দক্ষিণ আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল।

ক্যাপ্টেন ফিজরয়ের নেতৃত্বে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জাহাজ ভেসে চলল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। দক্ষিন আমেরিকার উপকূল ছাড়াও গালাপগোস দ্বীপপুঞ্জ, তাহিতি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মালদ্বীপ, সেন্ট হেলেনা দ্বীপে জাহাজ ঘুরে বেড়াল। এই সময়ের মধ্যে ডারউইন ৫৩৫ দিন কাটিয়েছিলেন সাগরে আর ১২০০ দিন ছিলেন মাটিতে।

ডারউইন যা কিছু প্রত্যক্ষ করতেন তার নমুনার সাথে সুনির্দিষ্ট বিবরণ, স্থান, সংগ্রহের তারিখ লিখে রাখতেন। কোন তত্ত্বের দিকে তাঁর নজর ছিল না। বাস্তব তথ্যের প্রতিটি ছিল তাঁর আর্কষণ। ২৪শে জুলাই ১৮৩৪ সাল। ডারউইন লিখেছেন "ইতিমধ্যে ৪৮০০ পাতার বিবরণ লিখেছি, এর মধ্যে অর্ধেক ভূবিদ্যা, বাকি বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর বিবরণ।"

"বিগল" জাহাজে চড়ে দেশভ্রমণের সময় মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর যখন ১৮৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন ডারউইন তখন তাঁর শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু অদম্য মনোবল, বাড়ির সকলের সেবায় অল্প দিনেই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এই সময় তিনি তাঁর কাজিন এম্মা ওয়েজউডকে বিবাহ করেন। বিবাহের সূত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি লাভ করেন ডারউইন। এম্মার গর্ভের ডারউইনের দশটি সন্তান জন্মায়। শুধু মা হিসাবে নয়, স্ত্রী হিসাবেও এম্মা ছিলেন অসাধারণ।

ডারউইনের পরবর্তী বই এক ধরনের সামুদ্রিক গুগলিদের নিয়ে। এই বইটি লিখতে ডারউইনের সময় লেগেছিল আট বছর। এই সময় তাঁর মনোজগতে এক নতুন চিন্তার জন্ম হচ্ছিল। যদিও সুদীর্ঘ দিন পর্যন্ত তা ছিল অসংলগ্ন বিশৃঙ্খল। কিন্তু নিরলস পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, বিশ্লেষণ, গবেষণার মধ্যে দিয়ে তারই মধ্যে থেকে সৃষ্টি হচ্ছিল এক নতুন মতবাদ—বিবর্তনবাদ।

ডারউইন প্রথমে তাঁর বিবর্তনবাদের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেন। ১৮৪২ সালে এরই বিস্তৃতি ঘটে ৩৫ পাতার একটি রচনার মধ্যে। দু বছর পর অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে প্রস্তুত

করলেন বিবর্তনবাদের উপর ২৩০ পাতার পাণ্ডুলিপি। এরপর শুরু হল পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজ। তাতে নতুন তথ্য সংযোজন করা প্রতিটি তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করা, তাকে আরো যুক্তিনিষ্ঠ করা। সুদীর্ঘ পনেরো বছর ধরে চলেছিল এই সংশোধন পর্ব।

এইবার ডারউইন বইলেখার কাজে হাত দিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি গবেষণার কাজ যতখানি ভালবাসতেন, লেখালেখি করতে ততখানিই বিরক্তি বোধ করতেন।

অবশেষে ২৪শে নভেম্বর ১৮৫৯ সালে ডারউইনের বই প্রকাশিত হল। বই-এর নাম The origin of species by means of Natural Selection or the preservation of Favoured Races in the struggle for life. (পরবর্তীকালে এই বই শুধু Origin of Species নামে পরিচিত হয়।

প্রকাশের সাথে সাথে ১২৫০ কপি বই বিক্রি হয়ে গেল। বিবর্তনবাদের নতুন তত্ত্ব বাইবেলের আদম ইভের কাহিনী, পৃথিবীর সৃষ্টির কাহিনীকে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত করলেন। এই বইতে তিনি লিখেছেন, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে নতুন প্রাণের জন্ম হচ্ছে। জীবের সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সেই কারণে নিয়ত জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে চলেছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিরামহীন প্রতিযোগিতা। যারা পরিবেশের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছে তারাই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু যারা পারেনি তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই ধারাকেই বলা হয়েছে যোগ্যতমের জয় "Survival of the Fittest"।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশেরও পরিবর্তন হচ্ছে। সমুদ্রের মধ্যে জন্ম হচ্ছে স্থলভাগের, কত স্থলভাগ হারিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রগর্ভে। আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে, অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবিত প্রাণেরও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে সঠিক নির্বাচন।

ডারউইনের মতবাদ এই পরিবর্তনশীলতা, বংশগতি এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে প্রাণী পরিবেশের সাথে নিজেকে সামঞ্জস্য বিধান করে। জীবের সুবিধার জন্য এই পরিবর্তন তাদের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটায়, সৃষ্টি করে নতুন প্রজাতির।

The origin of the species প্রকাশিত হওয়ার পর ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে আরো উন্নতভাবে প্রকাশ করবার জন্য ১৮৬৮ সালে প্রকাশ করলেন Variation of Animals and Plant under Domestication। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হল ডারউইনের আর একখানি বিখ্যাত রচনা The Descent of Man.

প্রাণে বিকাশ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার অস্তিত্বের সংকট দেখা দিচ্ছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্যতমের জয় হচ্ছে। এক প্রজাতি থেকে জন্ম নিচ্ছে আরেক প্রজাতি। প্রাণী প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্নত করছে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে। ডারউইনের মত অনুসারে মানুষ নিম্নতর জীব থেকে ধাপে ধাপে উন্নত জীবের স্তরে এরসে পৌছেছে। এই ক্রমবিবর্তনের চিত্রই তিনি এঁকেছেন তার The Descent of Man গ্রন্থে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গে অনেকের ধারণা মানুষের উৎপত্তি বাঁদর থেকে। কিন্তু ডারউইন কখনো এই ধরণের কথা বলেননি। তাঁর অভিমত ছিল মানুষ এবং বাঁদর উভয়েই কোন এক প্রাগঐতিহাসিক জীব থেকে বিবর্তিত হয়েছে। বাঁদররা কোনভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষ নয়, তার চেয়ে দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলা যেতে পারে।

ডারউইনের মতে মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব কারণ সমস্ত জীব জগতের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বেশি যোগ্যতম। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোন স্বর্গচ্যুত দেবদূত নয়, সে বর্বরতার স্তর থেকে উন্নত জীব। এগিয়ে চলাই তার লক্ষ্য। তিনি যখন শেষ বারের মত লণ্ডনে এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ৭৩ বছর। এক বন্ধুর বাড়ির দরজার সামনে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বন্ধু বাড়িতে ছিলেন না। বন্ধুর বাড়ির চাকর ছুটে আসতেই ডারউইন বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি একটা গাড়ি ডেকে বাড়ি চলে যেতে পারব। কাজের লোককে কোনভাবে বিব্রত না করে ধীরে ধীরে নিজের বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর বিছানা থেকে উঠতে পারেননি তিনি। ক্রমশই তাঁর অসুস্থতা বেড়ে চলল। ডারউইন বুঝতে পারছিলেন তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। তিন মাস অসুস্থ থাকার পর ১৯শে এপ্রিল ১৮৮২ সাল, পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এল। শত্রুরা উল্লসিত হয়ে উঠল, "তাঁর মত ঈশ্বর-বিদ্বেষী পাপীর স্থান হবে নরকে।"

পাবলো নেরুদা

[১৯০৪-১৯৭৩]

"আমি কোন সমালোচক বা প্রবন্ধকার নই। আমি সাধারণ কবি মাত্র। কবিতা ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর আমার কবিতা কি? তাহলে বলতে হয় আমি জানি না। কিন্তু যদি আমার কবিতাকে প্রশ্ন কর সে জবাব দেবে, আমি কে।" যথার্থ অর্থেই তাঁর কবিতার মধ্যেই তাঁর জীবনের প্রকাশ। তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর ভালবাসা, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-আবেগ, তাঁর আনন্দ, বেদনা, ক্রোধ, হতাশা আর সকলকে ছাপিয়ে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ।

এই প্রতিবাদের কবি, ভালবাসার কবির নাম পাবলো নেরুদা। নেরুদার আসল নাম নেফতালি রিকার্দো রেয়েজ বোসোয়ালতো। কিশোর বয়েসে যখন নেরুদার সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত হয়, সেই সময় চেকোশ্লোভাকিয়ায় ইয়ান নেরুদা বলে একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। তাঁর নামে ছদ্মনাম গ্রহণ করে নিজের নাম রাখেন পাবলো নেরুদা।

নেরুদার জন্ম চিলিতে (১২ই জুলাই ১৯০৪)। দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে স্বাধীন দেশ চিলি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী মানুষ আর স্থানীয় উপজাতিরাই গড়ে তুলেছে এই দেশ। এখানে মিশ্র-ভাষা গড়ে উঠলেই সাহিত্যের ভাষা স্প্যানিশ।

নেরুদার বাবা ছিলেন সামান্য কিছু জমির মালিক, মা একটি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। নেরুদার জন্মের এক মাস পরেই মা টি. বি. তে মারা যান। বাবা আবার বিয়ে করলেন। নিজের মা না হলেও সৎ মা নেরুদাকে ভালবাসতেন নিজের সন্তানের মত। নিজের সন্তানের সাথে কোনদিন বিভেদ করেননি সৎ মা।

নেরুদার বয়স তখন দু বছর। দক্ষিণ চিলির সীমান্ত অঞ্চলে জঙ্গল কেটে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। সংসারের আর্থিক অনটনের জন্য নেরুদার বাবা স্থির করলেন আরাউকো প্রদেশের সেই অরণ্য অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করবেন। সেখানে রেললাইন সংলগ্ন কাজ, রাস্তা তৈরির ঠিকাদারির কাজ নিলেন। এ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ। চারদিকে ঘন সবুজ অরণ্য। কোথাও অরণ্য নির্মূল করে গড়ে উঠেছে চাষের ক্ষেত। সর্বত্রই এক আদিম বন্য প্রকৃতি। কোন ধর্মীয়, সামজিক নিয়ম-কানুনের বেড়াজাল নেই। মুক্ত অরণ্যের মতই মানুষের বেড়ে ওঠা। অরণ্যের নিত্য সঙ্গী হয়ে সারা বছর ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। শিশু নেরুদার জীবনে এই বৃষ্টি আর অরণ্য গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সকলের অজান্তেই তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল এক কবি স্বত্তা। যখন তাঁর বয়স মাত্র দশ। তখনই শুরু হয় তাঁর কবিতা লেখা। শিশুমনের কল্পনায় যে ভাব জেগে ওঠে তাই লিখে ফেলেন। স্কুলে নিয়মিত পড়াশুনার সাথে সাথে বাইরের বই পড়ার নেশা জেগে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ছেলেবেলায় আমি ছিলাম ঠিক যেন এক উটপাখি। কোন কিছু বাজবিচার না করেই আমি যা পেতাম তাই পড়ে ফেলতাম।

তেমুকোর পরিবেশ সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুকূল ছিল না। নেরুদার পিতার ইচ্ছা ছিল ছেলে বড় হয়ে যেন সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অগ্রণী পুরুষ হয়ে ওঠে। তাই ষোল বছর বয়েসে নেরুদাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল শান্তিয়াগোতে। সেই সময় কিশোর কবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নেরুদা। তাঁর সাহিত্য জীবনে স্থানীয় মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা গ্যাব্রিয়েল মিস্ত্রালের ভূমিকা বিরাট। মিস্ত্রাল শুধু চিলির নন, বিশ্বসাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। তাঁর অসামান্য সৃষ্টির জন্য নোবেল পুরস্কার পান। মিস্ত্রাল নেরুদার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবির সম্ভাবনাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি শুধু তাঁকে উৎসাহিত করতেন তাই নয়, নিয়মিত তাঁর কবিতা সংশোধন করে দিতেন।

১৯২১ সালে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নেরুদা এলেন সান্তিয়াগোতে। চিলির অন্যতম প্রধান শহর। সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। এখানে এসে ফরাসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন। কলেজে ভর্তি হলেন কিন্তু পড়াশুনায় তেমন মন নেই। কেমন ছন্নছাড়া ভাব। অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকজন তরুণ কবির সাথে পরিচিত হলেন। তাঁর কবিতা তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছে। এই সময়েই তিনি পিতৃ নাম পরিত্যাগ করে 'পাবলো নেরুদা"-এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

কবি হিসাবে যখন সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, নেরুদার জীবনে এল এক

সুন্দরী তরুণী আলবার্তিনা। দীর্ঘ দিন তার পরিচয় গোপন রেখেছিলেন নেরুদা। প্রথম প্রেমের মুকুল বিকশিত হয়নি। অল্পদিনের মধ্যেই দুজনের সম্পর্কে ভাঙন ধরল। জীবন থেকে হারিয়ে গেলেও আলবার্তিনাকে কবি অমর করে রেখেছেন তাঁর অসাধারণ সব প্রেমের কবিতায়। এই কবিতাগুলি নিয়ে ১৯২৪ সালে কুড়ি বছর বয়েসে প্রকাশিত হল Twenty Love poems. এর আগে আর একটি কবিতার বই প্রকাশ করেছিলেন Twilight Book. সেই বইটি তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু "কুড়িটি প্রেমের কবিতা" বইটি প্রকাশিত হতেই চারদিকে আলোড়ন পড়ে গেল। প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করলেও এর আঙ্গিক, ভাব, ভাষায় নিয়ে এলেন পরিবর্তন। আনন্দ-বেদনার সুরের মূর্চ্ছনা এতে এমনভাবে পরিস্ফুট হয়েছে সহজেই পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত হল দুটি রচনা। এক বন্ধুর সাথে যৌথভাবে একটি ছোট উপন্যাস। আর একটি কবিতার বই Venture of Infinite man-এর প্রতিটি কবিতায় প্রচলিত সমস্ত প্রথা ভেঙে নিয়ে এলেন নতুন আঙ্গিক, ছন্দ। মানব চরিত্রের এক অস্থিরতা, নিঃসঙ্গতাই এখানে যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ কিন্তু এই বইটিকে গ্রহণ করতে পারল না।

এদিকে ছেলে পড়াশুনা বন্ধ করে কবিতা লিখছে এই ব্যাপারটি ভাল লাগল না নেরুদার বাবার। তিনি সমস্ত মাসোহারা বন্ধ করে দিলেন। মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন নেরুদা। তিনটি বই বার হলেও তার থেকে সামান্যই অর্থ পেয়েছেন। অর্থ ছাড়া কেমন করে নিজের খরচ মেটাবেন! পিতার কাছে হাত পাততে মন সায় দিল না। শুরু হল চাকরির চেষ্টা। কয়েক মাস চেষ্টা করেও কোথাও চাকরি পেলেন না। সেই সময় চিলির বিদেশ দপ্তর থেকে রেঙ্গুন অফিসে পাঠাবার জন্যে একজন লোকের খোঁজ করা হচ্ছিল। কোন লোকই কয়েক হাজার মাইল দূরে বার্মার রেঙ্গুন তখন ব্রিটিশ অধিনস্ত বার্মার রাজধানী। এখানে পরিচিত কোন মানুষ নেই। স্থানীয় মানুষেরা কেউ স্প্যানিশ ভাষা জানে না। অফিসের দু-চারজন যেটুকু ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ জানে তাতেই কোন রকমে কথাবার্তা চালান। অসহনীয় পরিবেশ, কথা বলবার লোক নেই, তার উপর সব মাসে ঠিক মত মাইনে পান না, তবুও রেঙ্গুনে রয়ে গেলেন। এই নির্জন প্রবাসে তাঁর একমাত্র সঙ্গী কবিতা।

চার বছর কেটে গেল। স্থানীয় ভাষা মোটামুটি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন নেরুদা। অনেক বার্মিজ পরিবারের লোকজনের সাথেই তাঁর আলাপ পরিচয় ছিল। এদের মধ্যে ছিল এক তরুণী। তার মধ্যেকার উদ্দামতা দেখে ভাল লেগে গিয়েছিল। প্রেমে পড়ে গেলেন। কিছু দিন যেতেই নেরুদা অনুভব করলেন মেয়েটির মধ্যে আছে এক আদিম বন্য উদ্দামতা। মনের মধ্যে যদি কখনো সন্দেহ দেখা দেয়, সাথে সাথে ছুরি দিয়ে হত্যা করবে নেরুদাকে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন নেরুদা। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় সিংহলে তাঁর বদলির আদেশ হল। কাউকে কিছু না জানিয়ে রওনা হলেন সিংহল। মেয়েটি নেরুদার সন্ধান পাওয়ার জন্যে সিংহল পর্যন্ত গিয়েছিল। তার এই বন্য প্রেমকে নেরুদা বহু কবিতায় অবিস্মরণীয় রূপ দিয়েছেন। বার্মার জীবনের নিঃসঙ্গতাকে ভুলতে বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। এই কবিতাগুলি সংকলন করেই পরে প্রকাশিত হয় তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ Residence on earth (পৃথিবীতে বাসা)।

সিংহলে অল্প কিছুদিন থাকার পর এলেন বাটাভিয়ায়। প্রবাস জীবনে একাধিক মেয়ের সান্নিধ্যে এলেও কাউকে বিবাহ করবার কথা ভাবেননি। বাটাভিয়াতে প্রথম ডাচ তরুণী মারিয়া এন্তোনিয়েতাকে দেখে বিবাহ করবার কথা মনে হল। একদিন সরাসরি মারিয়াকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। সম্মত হল মারিয়া। প্রথম কয়েক মাস সুখেই কেটে গেল। মারিয়া ডাচ মেয়ে, স্প্যানিশ ভাষা জানত না। নেরুদার চেষ্টা সত্ত্বেও স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তার সামান্যতম আগ্রহ ছিল না। নেরুদার কবিতার ব্যাপারেও ছিল উদাসীন। দুজনের মধ্যেকার মতাদর্শগত পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। বাটাভিয়াতে থাকতে মন চাইল না, ফিরে এলেন তেমুকোতে বাবার কাছে। ছেলেবেলাতে দেখা তেমুকোর অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সেই বনভূমি নির্জন প্রকৃতি আর নেই, সেখানে গড়ে উঠেছে শহর, কত অসংখ্য মানুষের আবাসস্থল। এখানকার মানুষের সাথে বহুদিন কোন যোগাযোগ নেই। নিজেকে যেন পরবাসী বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।

সেই বন্দী অবস্থায় ১২ দিন পর ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে মারা গেলেন কবি। সামরিক শাসনের সমস্ত নিষেধ উপেক্ষা করে পথে বার হল লক্ষ লক্ষ মানুষ কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সেই তাদের প্রথম প্রতিবাদ।

২৭

কার্ল মার্কস

[১৮১৮–১৮৮৩]

লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিশাল পাঠকক্ষের এক কোণে প্রতিদিন এসে পড়াশুনা করেন এক ভদ্রলোক। সুন্দর স্বাস্থ্য, চওড়া কপাল, সমস্ত মুখে কালো দাড়ি। দুই চোখে গভীর দীপ্তি। যতক্ষণ চেয়ারে বসে থাকেন, টেবিলে রাখা স্তূপিকৃত বইয়ের মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে থাকেন। দিন শেষ হয়ে আসে। একে একে সকলে পাঠকক্ষ থেকে বিদায় নেয়, সকলের শেষে বেরিয়ে আসেন মানুষটি।

ধীর পদক্ষেপে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেন। একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আসেন। ২৮ নম্বর ঘরের দরজায় এসে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দেন এক ভদ্রমহিলা। সাথে সাথে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে ছটি ছেলেমেয়ে।

এক মুহূর্তে গম্ভীর আত্মমগ্ন মানুষটি সম্পূর্ণ পালটে যান। হাসিখুশি আমোদ আহ্লাদে মেতে ওঠেন স্ত্রী আর শিশুদের সঙ্গে।

এক এক দিন ঘরে এসে লক্ষ্য করেন শিশুদের বিষাদক্লিষ্ট মুখ। মানুষটির বুঝতে অসুবিধা হয় না ঘরে খাবার মত একটুকরো রুটিও নেই। আবার বেড়িয়ে পড়েন মানুষটি। চেনা পরিচিতদের কাছ থেকে সামান্য কিছু ধার করে খাবার কিনে নিয়ে আসেন, যেদিন কারোর কাছে ধার পান না সেদিন কোন জিনিস বন্ধক দেন। ঘরে ফিরে আসতেই সব কিছু ভুলে যান, তখন আবার সেই হাসিখুশিভরা প্রাণোচ্ছল মানুষ। গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যের চিহ্নমাত্র নেই।

এই অদ্ভুত মানুষটির নাম কার্ল মার্কস। যিনি রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রেই যুগান্তর এনেছেন। আধুনিক পৃথিবীকে উত্তরণ করেছেন এক যুগ থেকে আরেক যুগে।

যিনি পৃথিবীর সমস্ত শোষিত বঞ্চিত দরিদ্র নিপীড়িত মানুষকে মুক্তির আলো দিয়েছেন। ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস, সেই মানুষটিকে কাটাতে হয়েছে চরম দারিদ্র্য আর অনাহারের মধ্যে।

জার্মানির রাইন নদীর তীরে ছোট্ট শহর ট্রিয়ার (Trier)। এই শহরে বাস করতেন হার্সকেল ও হেনরিয়েটা মার্কস নামে এক ইহুদি দম্পতি, হার্সকেল ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মার্জিত রুচির লোক বলে শহরে তাঁর সুনাম ছিল। প্রতিবেশী সকলেই তাঁকে সম্মান করত। প্রতিবেশী জার্মানদের সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল।

১৮১৮ সালের ৫ মে হেনরিয়েটা তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিলেন। প্রথম সন্তান ছিল মেয়ে। জন্মের পর শিশুর নাম রাখা হল কার্ল।

যখন কার্লের বয়স ৬ বছর, হার্সকেল তার পরিবারের সব সদস্যই খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নিলেন। ইহুদির উপর নির্যাতনের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছিলেন হার্সকেল। সন্তানদের রক্ষার জন্য নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত হলেন।

হার্সকেলের সব চেষ্টাই বৃথা গেল। যে সন্তানদের রক্ষার জন্য তিনি নিজের ধর্ম ছাড়লেন, তাঁর সেই সন্তানদের মধ্যে চারজন টিবিতে মারা গেল। শুধু বেঁচে রইলেন কার্ল, হয়ত মানুষের প্রয়োজনের জন্যেই ঈশ্বর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন। ছেলেবেলা থেকেই কার্ল মার্কস ছিলেন প্রতিবেশী অন্য সব শিশুদের চেয়ে আলাদা। ধীর শান্ত কিন্তু চরিত্রের মধ্যে ছিল এক অনমনীয় দৃঢ়তা। যা অন্যায় মনে করতেন, কখনোই তার সাথে আপোস করতেন না।

বারো বছর বয়েসে কার্ল স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। তিনি ছিলেন ক্লাসের সেরা ছাত্র। সাহিত্য গণিত ইতিহাস তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত। স্কুলের ছাত্র অবস্থাতেই তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে বিচলিত হয়ে পড়তেন। সহপাঠীরা যখন বড় কিছু হবার স্বপ্ন দেখত, তাঁর মনে হত এই সব দুঃখী মানুষের সেবায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করবেন।

সতেরো বছর বয়সে কৃতিত্বের সাথে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ভর্তি হলেন জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইচ্ছা ছিল দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করবেন। শুধুমাত্র বাবার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই ভর্তি হলেন আইন পড়তে। কিন্তু আইনের বই-এর চেয়ে বেশি ভাল লাগত কবিতা, সাহিত্য, দর্শন। আর যাকে ভাল লাগত তার নাম জেনি। পুরো নাম জোহান্না বার্থাজুলি জেনি ওয়েস্টফালেন। জেনির বাবা ছিলেন ট্রিয়ারের এক সম্ভ্রান্ত ব্যারন, রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা। ব্যারনের সাথে কার্লের বাবার ছিল দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। সেই সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল জেনি আর কার্লের। শৈশবে খেলার সাথী, যৌবনে নিজের অজান্তেই দুজনে প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেল। যতদিন দুজনে

ট্রিয়ারে ছিলেন, নিয়মিত দেখা হত কিন্তু বনে যেতেই কার্ল অনুভব করলেন জেনির বিরহ। পড়াশুনায় মন বসাতে পারেন না, সব সময় মনে পড়ে বেড়ান।

ছেলের এই অস্থিরতার কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন হার্সকেল। ডেকে পাঠালেন মার্কসকে, ট্রিয়ারে এসে পৌঁছতেই ফিরে পেলেন জেনিকে। আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন কার্ল। কিন্তু এখানে তো বেশিদিন থাকা সম্ভব হবে না। তাই গোপনে জেনি কার্লের বাগদত্তা হয়ে গেলেন। কিন্তু এ খবর গোপন রাখা গেল না। চিন্তায় পড়ে গেলেন হার্সকেল, সামনে গোটা ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। ঠিক করলেন এবার বন নয়, কার্লকে পাঠাবেন বার্লিনে। সেখানে রয়েছেন অনেক জ্ঞানী-গুণী অধ্যাপক। সেখানকার পরিবেশে গেলে হয়ত কার্লের পরিবর্তন হতে পারে।

বাদ সাধলেন কার্ল। বার্লিনে গেলে শুধু আইন পড়ব না। দর্শন আর ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করব। অগত্যা তাতেই মত দিলেন হার্সকেল।

বার্লিনের নতুন পরিবেশ ভাল লাগল কার্লের। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত চিঠি লেখেন জেনিকে। সেই চিঠিতেই থাকে ছোট ছোট কবিতা, দাস ক্যাপিটালের স্রষ্টা প্রেমের কবিতা লিখছেন।

বার্লিন থেকে মার্কস এলেন জেনাতে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট লাভ করলেন। তাঁর থিসিস-এর বিষয় ছিল "The difference between the narural Philosophy of demiocitus and Epicurus." এই প্রবন্ধে তার প্রতিটি যুক্তি এত তথ্যপূর্ণ সুসংহত প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন, পরীক্ষকরা বিস্মিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু এই প্রবন্ধে তাঁর স্বাধীন বস্তুবাদী মতামত কারোরই মনমত হল না। তাছাড়া জার্মানিতে তখন স্বাধীন মত প্রকাশের কোন অধিকার ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি নেবেন। কিন্তু উগ্র স্বাধীন মতামতের জন্য তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হল।

ইতিমধ্যে বাবা মারা গিয়েছেন। ট্রিয়ারে রয়েছে মা আর প্রিয়তমা জেনি। চাকরির আশা ত্যাগ করে তাদের কাছেই ফিরে চললেন মার্কস। অবশেষে দীর্ঘ প্রেমের পরিণতি ঘটল। মার্কস আর জেনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। জেনি ছিলেন ধনী পরিবারের অসাধারণ সুন্দরী তরুণী, তবু মার্কসের মত এক দরিদ্র যুবককে বিবাহ করেছিলেন। পরিণামে পেয়েছিলেন চরম দারিদ্র্য আর দুঃখ, স্থায়ী ঘর বাঁধতে পারেননি তাঁরা। যাযাবরের মত এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, তবুও জেনি ছিলেন প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী। আমৃত্যু স্বামীর সব দুঃখ যন্ত্রণাকে ভাগ করে নিয়েছিলেন।

বিয়ের পর ফিরে এলেন বনে। এই সময় হেগেল ছিলেন জার্মানির শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তাঁর দার্শনিক মতবাদ, চিন্তা যুবসমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মার্কসও হেগেলের দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাছাড়া সেই সময় জার্মানির যুবসমাজ যে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখছিল, মার্কস তা সর্বান্তকরণে সমর্থন করতেন।

বনে এসে কয়েকজন তরুণ যুবকের সাথে পরিচয় হল। তারা সকলেই ছিল হেগেলের মতবাদে বিশ্বাসী। এদের সাথেই তিনি স্থানীয় বৈপ্লবিক কাজকর্মে যুক্ত হয়ে পড়লেন। নিজের ব্যক্তিত্ব, প্রখর বাস্তব জ্ঞান, অসাধারণ প্রতিভায় স্থানীয় র‍্যাডিকাল মনোভাবাপন্ন যুবকদের নেতা হিসাবে নির্বাচিত হলেন। সেই সময়ে তাঁর সম্বন্ধে একটি চিঠিতে ঐতিহাসিক মোসেস (Moses) তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছেন, "কার্ল মার্কসের সাথে পরিচয় হলে তুমি মুগ্ধ হবে, এ যুগের শুধু শ্রেষ্ঠ নন, সম্ভবত একমাত্র প্রকৃত দার্শনিক। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই প্রগাঢ় প্রজ্ঞার সাথে মিশেছে তীক্ষ্ণ পরিহাস বোধ। যদি রুশো, ভলতেয়ার, হাইনে, হেগলকে একত্রিত কর তবে একটি মাত্র নামই পেতে পার, ডক্টর কার্ল মার্কস।

মার্কস অনুভব করলেন তাঁদের চিন্তাভাবনা, মতামত প্রকাশ করবার জন্য একটি পত্রিকার প্রয়োজন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হল রেনিস গেজেট। মার্কস হলেন তার সম্পাদক। তৎকালীন শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করবার জন্য তিনি এই পত্রিকায় একের পর এক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন।

কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হতেই সরকারি কর্মচারীরা সচেতন হয়ে উঠল, এত স্পষ্টতই বিদ্রোহের ইঙ্গিত। সরকারি আদেশবলে নিষিদ্ধ করা হল রেনিস না প্রাশিয়ান সরকার। যে মানুষটির কলমে এমন অগ্নিঝরা লেখা বার হয়, সে আবার নতুন কি বিপদ সৃষ্টি করবে কে জানে!

তাই মার্কসকেও দেশ থেকে নির্বাসিত করা হল।

মাত্র কয়েক মাসের সাংবাদিকতার জীবনে মার্কস এক নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন: চিরাচরিত নরম সুর নয়, প্রাণহীন নীরস রচনা নয়, বলিষ্ঠ দৃপ্ত নির্ভীক সত্যকে অসংকোচে প্রকাশ করেছেন। ভাষায় নিয়ে এসেছেন যুক্তি, তথ্যের সাথে সাহিত্যের মাধুর্য। সাংবাদিকতার ইতিহাসে এ এক উজ্জ্বল সংযোজন।

জার্মান ত্যাগ করে মার্কস এলেন ফ্রান্সে। সাথে স্ত্রী জেনি। শুরু হল নির্বাসিত জীবন। এখানকার পরিবেশ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, মুক্ত। পরিচয় হল সমমনোভাবাপন্ন কয়েকজন তরুণের সাথে। এদের মধ্যে ছিলেন প্রাওধন, হেনরিক হাইনে, পিয়েরি লিরক্স।

তিনি স্থির করলেন এখান থেকেই একটি পত্রিকা প্রকাশ করবেন। তাঁর কলম হয়ে উঠেছিল ক্ষুরধার তরবারী। নিজের লেখা প্রকাশ করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হত একটি জার্মান পত্রিকা Vorwart। এতে পর পর কয়েকটি জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখলেন মার্কস। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তাভাবনার প্রথম প্রকাশ ঘটল এখানে। তিনি লিখলেন, "ধর্ম পৃথিবীর মানুষের দুঃখ ভোলাবার জন্য স্বর্গের সুখের প্রতিশ্রুতি দেয়। এ আর কিছুই নয়, আফিমের মত মানুষকে ভুলিয়ে রাখবার একটা কৌশল।" দার্শনিকদের সম্বন্ধে বললেন, তারা শুধু নানাভাবে জগতের ব্যাখ্যা করা ছাড়া কিছুই করেনি। আমরা শুধু ব্যাখ্যা করতে চাই না চাই জগৎকে পালটাতে।

কিন্তু মার্কসের চাওয়ার সাথে সমাজের ওপর তলার মানুষদের চাওয়ার বিবাদ শুরু হল। কারণ তারা পৃথিবীর পরিবর্তন চায় না। বর্তমান অবস্থার মধ্যেই যে তাদের সুখ ভোগ-বিলাস ব্যসন। পরিবর্তনের অর্থই সে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়া। তাই অন্য যে বিষয়েই বিবাদ থাক না, নিজেদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সব দেশের অভিজাত ক্ষমতাবান মানুষেরাই এক।

মার্কসের তীব্র সমালোচনার মুখে বিব্রত প্রাশিয়ান সরকার ফরাসি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করল মার্কসকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবার জন্য। প্রাশিয়ার অনুরোধে সাড়া দিয়ে ফরাসি সরকার মার্কসকে অবিলম্বে দেশ ত্যাগ করবার নির্দেশ দিল।

ফ্রান্সের পনেরো মাসের অবস্থানকালে পরিচয় হয়েছিল ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর সাথে। এই পরিচয় মার্কসের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কারণ পরবর্তী জীবনে এঙ্গেলস হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধু, সহকর্মী সহযোগী। তিনি যে শুধু মার্কসকে রাজনৈতিক কাজে সাহায্য করেছিলেন তাই নয়, দুঃখের দিনে এঙ্গেলস উদার হাতে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর সাহায্যে।

এঙ্গেলস ছিলেন মার্কসের চেয়ে দু বছরের ছোট। তাঁর বাবা ছিলেন জার্মানীর এক শিল্পীপতি। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রগতিশীল। বাবার ব্যবসার কাজে ইংলন্ডে গিয়েছিলেন, সেই সময় বিখ্যাত চার্টিস্ট আন্দোলনের সাথে পরিচয় হয়। মার্কসের সাথে প্রথম পরিচয় হয় যখন তিনি রেনিস গেজেট পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্যারিসে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের পর থেকে।

মার্কস প্যারিস ত্যাগ করে এলেন ব্রাসেলসে। এর অল্প কিছুদিন পর এঙ্গেলস এসে মিলিত হলেন তাঁর সাথে। এই মিলন এক নতুন যুগের সূচনা করল।

কয়েক মাস পর মার্কসকে নিয়ে এঙ্গেলস এলেন ইংলন্ডে। এখানে মার্কসের পরিচয় হল জার্মান শ্রমিক সংঘের নেতাদের সাথে, এছাড়াও লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারের (Manchester) বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সাথে। এই পরিচয়ের মাধ্যমে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তিনি। এতদিন শুধুমাত্র যা কিছু অন্যায় ভ্রান্ত বলে মনে করতেন, তার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র লেখনির মাধ্যমে প্রতিবাদ করতেন। সমাজতান্ত্রিক সঙ্ঘগুলির সাথে তাঁর কোন যোগ ছিল না। সর্বদাই একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রে অনুভব করলেন শুধুমাত্র লেখনির মাধ্যমে উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক মতবাদ-এর চর্চা, তার প্রচার। এই সূত্রেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত শ্রমিক সংঘ ছিল, তাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করলেন মার্কস। এঙ্গেলস গেলেন প্যারিসে সেখানকার শ্রমিক সংঘগুলিকে সংগঠিত করবার জন্য।

প্রায় দু বছরের প্রচেষ্টায় তিনি বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের সাথে এক যোগসূত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। প্রত্যেকেই একমত হলেন এই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী সংঘগুলির একটি সমন্বয়কারী কেন্দ্রীয় কমিটি থাকা দরকার। গড়ে উঠল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট লীগ। এই লীগের প্রথম অধিবেশন বসল লন্ডনে ১৮৪৭ সালে। যোগ দিলেন বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, লন্ডনের

প্রতিনিধিরা। এখানে রচনা করা হল লীগের নিয়ম বিধি। স্থির করা হল ভবিষ্যৎ কর্মসূচি, এখানেই মার্কস ও এঙ্গলস যৌথভাবে রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সাধারণ সভায় পেশ করলেন।

এই ম্যানিফেস্টো আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম ধ্বনি (Birth cry)। এতে সমাজতন্ত্রের মূল নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হল তাদের সংগ্রামের কথা, কোন পথে তারা অগ্রসর হবে সেই পথের দিশা। বিপ্লবের আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠল এই ইশতেহারে। "কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণীর কাঁপুড়, শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্যে আছে সারা জগৎ।"

মার্কস এই ইশতেহারে "সমাজতন্ত্র" কথাটির পরিবর্তে "কমিউনিজম" নামটি ব্যবহার করলেন। কারণ তাঁর পূর্বেকার দার্শনিকরা "সমাজতন্ত্র" কথাটি ব্যবহার করতেন কিন্তু তাঁর মতবাদ প্রাচীন সমাজতান্ত্রিক ধারণা থেকে স্বতন্ত্র ছিল বলে তিনি কমিউনিজম কথাটি ব্যবহার করলেন।

এই ইশতেহার মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হল ১৮৪৮ সালে। সমস্ত ইউরোপের বুকে যেন বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসক শ্রেণীর বুক।

মার্কস ছিলেন ব্রাসেলসে। বেলজিয়ামের শাসক শ্রেণীর মনে হল তাঁর মত একজন মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ অনিবার্যভাবে নিজের ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করা। হুকুম দেওয়া হল অবিলম্বে বেলজিয়াম ত্যাগ কর। ইতিমধ্যেই ফ্রান্স, জার্মানি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।

১৮৪৯ সালে ইংলন্ডে এসে বাসা বাঁধলেন মার্কস, সঙ্গে স্ত্রী জেনি আর তিনটি শিশু সন্তান।

সেই সময় ইংলন্ড ছিল ইউরোপের সবচেয়ে উদার মনোভাবাপন্ন দেশ। এবং বিভিন্ন দেশের নির্বাসিতদের আশ্রয়স্থল। যখন মার্কস এখানে এসে পৌঁছলেন, তাঁর হাতে একটি কপর্দকও নেই। সর্বহারা মানুষের সপক্ষে লড়াই করতে করতে উনি নিজেই হয়ে গিয়েছিলেন সর্বহারা।

পাঁচজনের সংসার। আরো একজন জেনির গর্ভে, পৃথিবীতে আসার অপেক্ষায়।

দু কামরার একটা ছোট্ট বাড়ি। পরের দিন খাওয়া জুটবে কি জুটবে না কেউই জানে না। জামা-কাপড় জুতোর অবস্থা এমন বাইরে যাওয়াই দুষ্কর। বহুদিন গিয়েছে শুধুমাত্র একটি জামার অভাবে ঘরের বাইরে যেতে পারেননি মার্কস। অভুক্ত শিশুরা বসে আছে শূন্য হাঁড়ির সামনে। দোকানী ধারে কোন মাল দেয়নি।

এমন ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজের কর্তব্য দায়িত্ব থেকে মুহূর্তের জন্যও তিনি বিচলিত হননি। একটি মাত্র পরিবার তো নয়, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে পৃথিবীর কোটি কোটি পরিবার। তাদের শিশুদের মুখেও যে এক ফোঁটা অন্ন নেই।

তবুও মাঝে মাঝে নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না। পথে বেরিয়ে পড়েন। আনমনা উদাসীর মত লন্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়ান। লোকেরা অবাক চোখে চেয়ে দেখে মানুষটিকে। মাথায় ঘন কাল চুল, সারা মুখে দাড়ি, প্রশস্ত কপাল, পরনের কোট জীর্ণ, অর্ধেক বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছে। তাঁর হাঁটার, ভঙ্গিটা বড় অদ্ভুত কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে তাঁর দুই চোখে ফুটে উঠেছে এক আশ্চর্য প্রত্যয় আর বিশ্বাস। তাঁর কণ্ঠস্বর মিষ্ট নয় কিন্তু যখন কিছু বলেন, শ্রোতারা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর প্রতিটি কথা অনুভব করে। সেই মুহূর্তে তিনি নম্র বিনয়ী শান্ত।

কিন্তু যখনই কেউ তাঁর চিন্তার বুকে আঘাত হানে মুহূর্তে তিনি যেন এক অন্য মানুষ, ক্ষুরধার তরবারির মত তাঁর মুখে যুক্তি ঝলসে ওঠে। তখন সামান্যতম করুণা নেই, দয়া নেই, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে চলে যান। সমস্ত দিন পড়াশুনা করেন, তখন ভুলে যান সংসারের দারিদ্র্য, সন্তানের অসুখের কথা।

১৮৫২ সালের ইস্টারের দিন মার্কসের মেয়ে ফ্রানসিসকা মারা গেল। জেনি লিখেছেন "আমাদের ছোট মেয়েটা ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছিল, তিন দিন ধরে সে মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছিল, কি ভয়ঙ্কর সে কষ্ট! যখন সব কষ্টের অবসান হল, তার ছোট্ট দেহটাকে পেছনের ঘরে শান্তিতে শুইয়ে রেখে দিলাম। আমাদের প্রিয় সন্তানের মৃত্যু যখন হল তখন আমাদের ঘর শূন্য। একজন ফরাসি উদ্বাস্তু দয়া করে আমাকে দু পাউন্ড দিলেন, তাই দিয়ে একটা কফিন কিনলাম, তার মধ্যে আমার সোনামানিক নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। যখন সে পৃথিবীতে এসেছিল তখন তার জন্যে কোন দোলনা দিতে পারিনি। মৃত্যুকালেও তার জন্যে একটা শবাধারও দিতে পারিনি।"

মার্কসের ছটি সন্তানের মধ্যে তিনটি সন্তানই অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিল। কি

নির্মম যন্ত্রণাময় জীবন। পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক দার্শনিক লেখকের জীবন বোধ হয় এতখানি দুঃখময় হয়নি।

১৪ মার্চ বেলা পৌনে তিনটেয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন। মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য তাঁকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল। আমরা ফিরে এসে দেখলাম যে তিনি তাঁর আরামকেদারায় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন–কিন্তু ঘুমিয়েছেন চিরকালের জন্য। এই মানুষটির মৃত্যুতে ইউরোপ ও আমেরিকার জঙ্গী প্রলেতারিয়েত এবং ইতিহাস বিজ্ঞান উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হল। এই মহান প্রাণের তিরোভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা অচিরেই অনুভূত হবে। ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম। মতাদর্শের অতি নিচে এতদিন লুকিয়ে রাখা এই সত্য যে, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম, ইত্যাদি চর্চা করতে পারার আগে মানুষের প্রথম চাই খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছদ। সুতরাং প্রাণ ধারণের আশু বাস্তব উপকরণের উৎপাদন এবং সেই হেতু কোন নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হল সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত এবং সেই দিক থেকেই এগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে, এতদিন যা করা হয়েছে সেভাবে উল্টো দিক থেকে নয়। কিন্তু শুধু তাই নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির এবং এই পদ্ধতি যে বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি করেছে তার গতির বিশেষ নিয়মটিও মার্কস আবিষ্কার করেন। যে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এতদিন পর্যন্ত সব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী সমালোচক উভয়েরই অনুসন্ধান অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তার উপর সহসা আলোকপাত হল উদ্বৃত্ত মূল্য আবিষ্কারের ফলে।

তাই তাঁর কালের লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ও কুৎসার পাত্র হয়েছেন মার্কস। স্বেচ্ছাতন্ত্রী এবং প্রজাতন্ত্রী–দু ধরনের সরকারই নিজ নিজ এলাকা থেকে তাঁকে নির্বাসিত করেছে। রক্ষণশীল বা উগ্র গণতান্ত্রিক সব বুর্জোয়ারাই পাল্লা দিয়ে তাঁর দুর্নাম রটনা করেছে, এসব তিনি মাকড়শার ঝুলের মতই ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, উপেক্ষা করেছেন এবং যখন একান্ত প্রয়োজনবশে বাধ্য হয়েছেন, একমাত্র তখনই এর জবাব দিয়েছেন।...আমি সাহস করে বলতে পারি যে মার্কসের বহু বিরোধী থাকতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রু তাঁর মেলা ভার। যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম, অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর কাজ।

২৮

হ্যানিম্যান

[১৭৫৫-১৮৪৩]

১৭৫৫ সালের ১০ এপ্রিল (কারো কারো মতে ১১ এপ্রিল) মধ্যরাতে জার্মান দেশের অন্তর্গত মারগ্রেওয়েট প্রদেশের অন্তর্গত মিসেন শহরে এক দরিদ্র চিত্রকরের গৃহে জন্ম হল এক শিশুর। দরিদ্র পিতামাতার মনে হয়েছিল আর দশটি পরিবারে যেমন সন্তান আসে, তাদের পরিবারেও তেমনি সন্তান এসেছে। তাকে নিয়ে বড় কিছু ভাববার মানসিকতা ছিল না তাদের। তাই অবহেলা আর দারিদ্র্যের মধ্যেই বড় হয়ে উঠল সেই শিশু।

তখনো কেউ কল্পনা করতে পারেনি এই শিশুই একদিন হয়ে উঠবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন ধারার জন্মদাতা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার জনক ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিখ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান।

হ্যানিম্যানের বাবা গগফ্রিড মিসেন শহরের একটা চীনামাটির কারখানায় বাসনের উপর নানান নক্সা করতেন, ছবি আঁকতেন। এই কাজে যা পেতেন তাতে অতি কষ্টে সংসার চলত। হ্যানিম্যান ছিলেন চার ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয়। পিতামাতার প্রথম পুত্র সন্তান। গডফ্রিডের আশা ছিল হ্যানিম্যান বড় হয়ে উঠলে তারই সাথে ছবি আঁকার কাজ করবে, তাতে হয়তো সংসারে আর্থিক সমস্যা কিছুটা দূর হবে।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই হ্যানিম্যানের ছিল শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ। বাড়িতেই বাবা-মায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শুরু হল। বারো বছর বয়েসে হ্যানিম্যান ভর্তি হলেন স্থানীয় টাউন স্কুলে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন তাঁর শিক্ষকরা। বিশেষত গ্রীক ভাষায় তিনি এতখানি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তিনিই প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের গ্রীক ভাষা পড়াতেন।

টাউন স্কুলে শিক্ষা শেষ করে হ্যানিম্যান ভর্তি হলেন প্রিন্সেস স্কুলে (Prince's School)। এদিকে সংসারে ক্রমশই অভাব আর দারিদ্র্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। গডফ্রিডের পক্ষে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। নিরুপায় হ্যানিম্যানকে স্কুলে থেকে ছাড়িয়ে লিপজিক শহরে এক মুদির দোকানে মাল কেনাবেচার কাজে লাগিয়ে দিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ এ কথা জানতে পেরে হ্যানিম্যানের স্কুলের মাইনে ও অন্যসব খরচ মকুব করে দিল যাতে আবার হ্যানিম্যান পড়াশুনা আরম্ভ করতে পারেন। যথাসময়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হলেন হ্যানিম্যান। তিনি একাধিক ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

ক্রমশই তাঁর মধ্যে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠছিল। পিতার অমতেই লিপজিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। হাতে সম্বল মাত্র ২০ থেরল (আমাদের দেশের ১৪ টাকার মত)। তিনি ভর্তি হলেন লিপজিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিজের খরচ মেটাবার জন্য এক ধনী গ্রীক যুবককে জার্মান এবং ফরাসি ভাষা শেখাতেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রকাশকের তরফে অনুবাদের কাজ করতেন।

হ্যানিম্যানের ইচ্ছা ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন। তখন কোন ডাক্তারের অধীনে থেকে কাজ শিখতে হত। লিপজিক কোন ভাল কোয়ারিনের কাছে কাজ করার সুযোগ পেলেন। তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। ইতিমধ্যেই তিনি গ্রীক, লাটিন, ইংরাজি, ইতালিয়ান, হিব্রু, আরবি, স্প্যানিশ এবং জার্মান ভাষায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। এবার ভাষাতত্ত্ব ছেড়ে শুরু হল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁর সামান্য গচ্ছিত অর্থ একদিন চুরি হয়ে গেল। নিদারুণ অর্থসংকটে পড়লেন হ্যানিম্যান। এই বিপদের দিনে তাঁকে সাহায্য করলেন স্থানীয় গভর্নর। তাঁর লাইব্রেরী দেখাশুনার ভার দিলেন হ্যানিম্যানকে। এই সুযোগটিকে পুরোপুরি সদব্যবহার করেছিলেন তিনি। এক বছর নয় মাসে লাইব্রেরীর প্রায় সমস্ত বই পড়ে শেষ করে ফেলেছিলেন।

হাতে কিছু অর্থ সঞ্চয় হতেই তিনি ভর্তি হলেন আরল্যানজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকেই তিনি চব্বিশ বছর বয়েসে "ডক্টর অব মেডিসিন" উপাধি পেলেন।

ডাক্তারি পাস করে এক বছর তিনি প্র্যাকটিস করার পর জার্মানির এক হাসপাতালে চাকরি পেলেন।

এই সময় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। এই প্রবন্ধে নতুন কিছু বক্তব্য না থাকলেও রচনার মৌলিকত্ব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

অন্য সব বিষয়ের মধ্যে রসায়নের প্রতি হ্যানিম্যানের ছিল সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। সেই সূত্রেই হেসলার নামে এক ঔষধের কারবারীর সাথে পরিচয় হল। নিয়মিত তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতে হত। হেসলারের সাথে থাকতেন তাঁর পালিতা কন্যা হেনরিয়েটা। হেনরিয়েটা ছিলেন সুন্দরী বুদ্ধিমতী। অল্পদিনেই দুই তরুণ-তরুণী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১৭৮২ সালের ১৭ নভেম্বর দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। হ্যানিম্যানের বয়স তখন ২৭ এবং হেনরিয়েটার ১৮। বিয়ের পরের বছরেই তাঁদের প্রথম সন্তান জন্ম নিল।

এই সময় হ্যানিম্যান রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, "কিভাবে ক্ষত এবং ঘা সারানো যায় সে বিষয়ে নির্দেশনামা।"

এই বই পড়লেই বোঝা যায় তরুণ চিকিৎসক হ্যানিম্যান নিজের অধিগত বিষয়ে কতখানি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এই সময় থেকেই আরো গভীরভাবে পড়াশুনা এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা ও অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অন্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না। কিন্তু হ্যানিম্যানের আগ্রহ ছিল বিভিন্ন বিষয়ে। বিশেষভাবে তিনি রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফরাসি ভাষা থেকে জার্মান ভাষায় একাধিক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই খণ্ডে Art of Manufacturing chemical products. এছাড়া দুই খণ্ডে Art of distilling liquors. রসায়নের ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা সেই যুগে যথেষ্ট সাড়া জগিয়েছিল।

তাঁর লেখা On Arsenic poisoning ফরেনসিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এই সময় তিনি ডাক্তার ওয়াগলার-এর সাথে টাউন হাসপাতালে ডাক্তারি করতেন। হঠাৎ

ডাক্তার ওয়াগনার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সমস্ত হাসপাতালের দায়িত্ব এসে পড়ল হ্যানিম্যানের উপর। পরের কয়েক বছর তিনি অজস্র বই অনুবাদ করেন এবং Mercurius Solubilis আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত হয়ে গেলেন। চিকিৎসক হিসাবে তখন তাঁর নাম যশ চারদিকে এতখানি ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। মনের মধ্যে তখন নতুন কিছু উদ্ভাবনের স্বপ্ন ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন সমস্ত দিন হাসপাতালে কাটিয়ে মনের ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব হবে না। তাই হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য পুরোপুরি অনুবাদের কাজে হাত দিলেন।

১৭৯১ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার কালেনের একটি বই এ্যালোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার ইংরাজি থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদের কাজ হাতে নেন। এই বইয়ের একটি অধ্যায়ের Cinchona Bark পাদটীকায় লেখা ছিল ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ কুইনাইন যদি কোন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রয়োগ করা যায় তবে অল্পদিনের মধ্যেই তার শরীরে ম্যালেরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

কালেনের এই অভিমত হ্যানিম্যানের চিন্তাজগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করল। তিনি এর সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য নিজেই প্রতিদিন ৪ ড্রাম করে দুবার সিঙ্কোনার রস খেতে আরম্ভ করলেন। এর তিন-চারদিন পর সত্যি সত্যিই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। এরপর পরিবারের প্রত্যেকের উপর এই পরীক্ষা করলেন এবং প্রতিবারই একই ফলাফল পেলেন। এর থেকে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগে উঠল, কুইনাইনের মধ্যে কি রোগের লক্ষণ এবং ঔষধের লক্ষণের সাদৃশ্য সৃষ্টিকারী কোন ক্ষমতা আছে? অথবা অন্য সমস্ত ঔষধের মধ্যেই কি এই ক্ষমতা আছে? অর্থাৎ যে ওষুধ খেলে মানুষের কোন রোগ নিরাময় হয়, সুস্থ দেহে সেই ওষুধ খেলে সেই রোগ সৃষ্টি হয়। এতদিন চিকিৎসকদের ধারণা ছিল বিরুদ্ধভাবাপন্নতাই বিরুদ্ধভাবাপন্নকে আরোগ্য করে। অর্থাৎ মানুষের দেহে অসুস্থ অবস্থায় যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তার বিপরীত ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন ঔষধেই রোগ আরোগ্য হয়। এই প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে শুরু হল তাঁর গবেষণা।

এই সময় তিনি যাযাবরের মত এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। স্থায়ী কোন আস্তানা গড়ে তুলতে পারেননি। গোথার ডিউক মানসিক রোগের চিকিৎসালয় খোলার জন্য তাঁর বাগানবাড়িটি হ্যানিম্যানকে ছেড়ে দিলেন। ১৭৯৩ সালে হ্যানিম্যান এখানে হাসপাতাল গড়ে তুললেন এবং একাধিক মানসিক রোগগ্রস্ত রুগীকে সুস্থ করে তোলেন। সেকালে মানসিক রুগীদের উপর কঠোর নির্যাতন করা হত। শারীরিক নির্যাতনকে চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ বলে মনে করা হত। হ্যানিম্যান কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেন।

কিছুদিন মানসিক হাসপাতালে থাকার পর তিনি আবার অন্য শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আটটি সন্তানের জন্ম হয়েছে। সংসারে আর্থিক অনটন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর গবেষণার কাজে সামান্যতম বিঘ্ন ঘটেনি। একদিকে যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতেন, তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে নিজেই বিভিন্ন ঔষুধ খেতেন। এতে বহুবার তিনি অসুস্থ পড়েন, তা সত্ত্বেও কখনো গবেষণার কাজ থেকে বিরত থাকেননি। দীর্ঘ ছয় বছরের অক্লান্ত গবেষণার পর তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যথার্থই সাদৃশ্যকে সদৃশ আরোগ্য করে। (similia similiabus curantur অর্থাৎ like cures likes)—এই ধারণা কোন অনুমান বা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য।

তাঁর এই আবিষ্কার ১৭৯৬ সালে সে যুগের একটি বিখ্যাত পত্রিকায় (Hufeland's Journal) প্রকাশিত হল। প্রবন্ধটির নাম দেওয়া হল "An essay on a new Principle for Ascertaining the curative Powers of Drugs and some Examination of the previous principal."

এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন Every Powerful medicinal substance produces in the human body a peculiar kind of discase the more Powerful the medicine, the more peculiar, marked and violent the disease.

We should imitate nature which sometimes cures a chronic disease by super adding another and employ in the (especially shronic) disease we wish to cure, that medicine which is able to Produce another very similar artificial disease and the former will be cured. Similia-Similibus.

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আধুনিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ভিত্তি পত্তন করলেন

হ্যানিম্যান—সেই কারণে ১৭৯৬ সালকে বলা হয় হোমিওপ্যাথিক জন্মবর্ষ। হোমিওপ্যাথিক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ হোমস (Homoeos) এবং প্যাথস (Pathos) থেকে। সদৃশ এবং এর অর্থ রোগ লক্ষণের সম লক্ষণ বিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা।

হ্যানিম্যানের এই যুগান্তকারী প্রবন্ধ প্রকাশের সাথে সাথে চিকিৎসা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হল। চিকিৎসা জগতের প্রায় সকলেই এই মতের ঘোরতর বিরোধী হয়ে উঠলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তীব্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল। তাঁকে বলা হল অশিক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসক। নিজের আবিষ্কৃত সত্যের প্রতি তাঁর এতখানি অবিচল আস্থা ছিল, কোন সমালোচনাতেই তিনি সামান্যতম বিচলিত হলেন না।

হ্যানিম্যান নিজেই শুরু করলেন বিভিন্ন ঔষধের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাঁর মনে হয়েছিল সুস্থ মানবদেহের উপর ঔষধ পরীক্ষা করেই তার ফল উপলব্ধি করা সম্ভব। ঔষধের মধ্যে যে আরোগ্যকারী শক্তি আছে সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার অন্য কোন উপায় নেই। সাধারণ পরীক্ষায় বা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে কোন ঔষধের সাধারণ বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় কিন্তু মানুষের উপর কিভাবে তা প্রতিক্রিয়া করে তা জানবার জন্যে মানুষের উপরেই পরীক্ষা করা প্রয়োজন। পরীক্ষার প্রয়োজনের নিজেই সমস্ত ঔষধ খেতেন। তারপর পরিবারের লোকেদের উপর তা পরীক্ষা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন চিকিৎসক হিসাবে রোগীর কোন ক্ষতি করবার তাঁর অধিকার নেই। এইভাবে একের পর এক ঔষধ পরীক্ষা করে যে জ্ঞান অর্জন করলেন তার ভিত্তিতে ১৮০৫ সালে লাটিন ভাষায় প্রকাশ করলেন Fragment-de-viribus নামে ২৭টি ঔষধের বিবরণ সংক্রান্ত বই। এই বইটি প্রথম হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা বা ভেষজ লক্ষণ সংগ্রহ। চিকিৎসা জগতে মেটিরিয়া মেডিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

তারপর এককাপ গরম দুধ আর রাতের খাওয়া খেয়ে চলে যেতেন পড়ার ঘরে। মধ্যরাত, কোন কোন সময় শেষরাত অবধি চলত তাঁর রোগের বিবরণ লেখা, চিঠিপত্র লেখা, বই লেখা।

অবশেষে ১৮১০ সালে প্রকাশিত হল অর্গানন অব মেডিসিন (Organon of Medicine)। এই অর্গাননকে বলা হয় হোমিওপ্যাথির বাইবেল। এতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির নীতি ও বিধান সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আর অকাট্য যুক্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন তাঁর প্রতিটি অভিমত। এতে হোমিওপ্যাথিক মূল নীতির আলোচনা ছাড়াও অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালীর সাথে আলোচনা করে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এছাড়াও সে যুগে চিকিৎসার নামে যে ধরনের অমানুষিক কার্যকলাপ প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন।

অর্গাননের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১০ সালে। এই বই প্রকাশের সাথে সাথে সমালোচনা আর বিতর্কের ঝড় বইতে থাকে। তাঁর উপর শুরু হল নির্যাতন। হ্যানিম্যান জানতেন যাঁরাই নতুন কিছুর আবিষ্কারক তাঁদের সকলকেই এই ধরনের অত্যাচার সইতে হয়। এই ব্যাপারে তিনি প্রথম ব্যক্তি নন, শেষ ব্যক্তিও নন। নিজের উপর তাঁর এতখানি আত্মবিশ্বাস ছিল তাই ১৮১৯ সালে যখন অর্গাননের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, বইয়ের প্রথমে তিনি লিখলেন Aude sapere_এর অর্থ আমি নিজেকে বুদ্ধিমান বলে ঘোষণা করছি। এইভাবে তিনি তৎকালীন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ ফেটে পড়লেন। হ্যানিম্যানের জীবনকালে এর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংস্করণেই তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো উন্নত থেকে উন্নততর রূপে বর্ণনা করেছেন।

১৮১০ সালে অর্গানন প্রকাশের সাথে সাথে হ্যানিম্যানের বিরুদ্ধে একাধিক রচনা প্রকাশিত হল। হ্যানিম্যানের ছয়জন ছাত্রের বিরুদ্ধে বেআইনি ঔষধ তৈরি ও বিতরণের অভিযোগ আনা হল। একজন ছাত্রকে জেলে পোরা হল, তাঁর সমস্ত ঔষধ আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হল।

লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক হ্যানিম্যানের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগের একাংশ এই কাজে প্রবল বাধা সৃষ্টি করল। কিন্তু তাদের বাধাদান সত্ত্বেও হ্যানিম্যানকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুমতি দেওয়া হল।

তাঁর এই বক্তৃতা শোনবার জন্য দলে দলে ছাত্ররা এসে ভিড় করল। সকলেই হ্যানিম্যানের নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে উৎসাহী, কৌতূহলী। তখন হ্যানিম্যান প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছে গিয়েছেন, তবুও তরুণ অধ্যাপকদের মত তেজদীপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বের বর্ণনা করতেন। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে কেউই তাঁর অভিমতকে গ্রহণ করতে পারল না। কারণ

তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে নতুন কিছুকে গ্রহণ করবার মত মানসিকতা সৃষ্টি হয়নি। তা সত্ত্বেও সামান্য কয়েকজন ছাত্রকে শিষ্য হিসাবে পেলেন যারা উত্তরকালে তাঁর নব চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারক-বাহক হয়ে উঠেছিল। এই সময় ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক সৈন্য টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কোন চিকিৎসাতেই তাদের রোগের প্রকোপ হ্রাস না পাওয়ায় হ্যানিম্যানকে চিকিৎসার জন্যে ডাকা হয়। তিনি বিরাট সংখক সৈন্যকে অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ করে তোলেন। এতে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ Schwarzenberg পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ্যালোপাথি চিকিৎসায় কোন উপকার না পেয়ে হ্যানিম্যানের চিকিৎসা জগতে সুনামের কথা শুনে তাঁকে চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ করলেন। হ্যানিম্যানের চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ করলেন। হ্যানিম্যানের চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। সামান্য সুস্থ হতেই হ্যানিম্যানের নির্দেশ অমান্য করে মদ্যপান করতে আরম্ভ করলেন। এতে হ্যানিম্যান ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর চিকিৎসা বন্ধ করে দিলেন এবং যুবরাজের চিকিৎসার জন্য আর তাঁর প্রাসাদে গেলেন না। এর কয়েক সপ্তাহ পরেই যুবরাজ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

এই ঘটনায় অষ্ট্রিয়ানদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হল। এ্যালোপাথিক চিকিৎসকরা এই সুযোগে হ্যানিম্যানের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শুরু করল এবং যুবরাজের মৃত্যুর জন্য সরাসরি হ্যানিম্যানকে দায়ী করল। জার্মান সরকার হ্যানিম্যানের ঔষধ তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। ১৮২০ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি হ্যানিম্যানকে আদালতে উপস্থিত হতে হল। আদালত তাঁর সমস্ত ঔষধ তৈরি এবং বিতরণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। কারণ হিসাবে বলা হল এই ঔষধ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর।

হ্যানিম্যান এর জবাবে শুধু বললেন, ভবিষ্যৎই এর সঠিক বিচার করবে।

সম্মিলিতভাবে চিকিৎসকরা তাঁর বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। তাঁকে লিপজিগ থেকে বহিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। হ্যানিম্যান বুঝতে পারলেন আর তাঁর পক্ষে লিপজিগে থাকা সম্ভব নয়। তিনি নিরুপায় হয়ে ১৮২১ সালের জুন মাসে লিপজিগ ত্যাগ করে কিথেন শহরে এসে বাসা করলেন।

হ্যানিম্যানের জীবনের এই পর্যায়ে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পালভাঙা নৌকার মত। সংসারে চরম অভাব। চারদিকে বিদ্বেষ আর ঘৃণা। প্রতি পদক্ষেপে মানুষের অসহযোগিতা আর বিরুদ্ধাচারণ।

এই প্রতিকূলতার মধ্যেও হ্যানিম্যান ছিলেন অটল, নিজের সংকল্পে পর্বতের মত দৃঢ়। অসাধারণ ছিল তাঁর মহত্ত্বতা। যে চিকিৎসকরা নিয়ত তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করত তাদের বিরুদ্ধেও কখনো কোন ঘৃণা প্রকাশ করেননি। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন "চিকিৎসকরা আমার ভাই, তাদের কারোর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।" আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন "সত্যের বিরুদ্ধে এই নির্লজ্জ প্রচার মানুষের অজ্ঞাতারই প্রকাশ। এর দ্বারা হোমিওপ্যাথিক অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব নয়।

হোমিওপ্যাথির এই দুর্দিনে হ্যানিম্যানের পাশে এসে দাঁড়ালেন কিথেন শহরের ডিউক ফার্দিনান্দ। তিনি কিথেন শহরে শুধু বাস করবার অনুমতি নয়, চিকিৎসা করবারও অনুমতি দিলেন। হ্যানিম্যান তাঁর ঔষধ প্রস্তুত ও চিকিৎসা করবার অনুমতির জন্য যখন ডিউকের কাছে আবেদন করলেন, সেই আবেদন পরীক্ষার ভার পড়ল আদম মূলারের উপর। হ্যানিম্যানের সাথে সাক্ষাতের অসাধারণ বিবরণ দিয়েছেন মূলার। "এই লাঞ্ছিত অপমানিত মানুষটিকে দেখে চোখে জল এসে গেল। এই মানুষটির দুঃখে আমার হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠল। উপলব্ধি করতে পারছিলাম আমার সামনে বসে আছে এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎক, ভবিষ্যৎ কালই যার আবিষ্কারের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারবে।"

১৮২২ সালে হ্যানিম্যান প্রকাশ করলেন প্রথম হোমিওপ্যাথিক পত্রিকা। এর কয়েক বছর পর হ্যানিম্যান প্রকাশ করলেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা Chronic disease: Their nature and Homoeopathic treatment অর্থাৎ পুরাতন রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক। চিকিৎসা জগতে এ এক যুগান্তকারী সংযোজন। পুরনো রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে এমন বই ইতিপূর্বে কোথাও রচিত হয়নি। তিনি বললেন, সোরা (Psory), সিফিলিশ (Syphislis) ও সাইকোসিস (Sycosis) মানবদেহের সর্ব রোগের কারণ। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক শক্তি হল সোরা। তাঁর

অভিমতের বিরুদ্ধে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হল। এমনকি হ্যানিম্যানের কিছু ছাত্র অনুগামীও তাঁর মতের বিরুদ্ধাচারণ করে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কে ছিন্ন করল। তা সত্ত্বেও বহু চিকিৎসক অনুভব করতে পারলেন হ্যানিম্যানের রচনার গুরুত্ব। কয়েকজন বিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসক হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার জন্য হ্যানিম্যানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। আমেরিকা থেকে এলেন ডাঃ কন্সটেন্টাইন হেরিং, ইংলন্ড থেকে এলেন ডাক্তার কুইন। এঁরা সকলেই নিজের দেশে হোমিওপ্যাথির প্রচার-প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৮৩০ সাল হ্যানিম্যানের স্ত্রী হেনরিয়েটা ৬৭ বছর বয়েসে মারা গেলেন। তিনি ১১টি সন্তানের জননী। সমস্ত জীবন হ্যানিম্যানের পাশে ছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী। বাইবেল প্রতিকূলতার মাঝে হ্যানিম্যান যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন সংসার জীবনে তখন অফুরন্ত শক্তি সাহস ভালবাসায় পূর্ণ করে দিয়েছিলেন হেনরিয়েটা। হ্যানিম্যানের জীবনের অন্ধকারময় দিনগুলিতে হেনরিয়েটা ছিলেন তাঁর চলার সঙ্গী। হ্যানিম্যানের জীবনে যখন অন্ধকার দূর হয়ে আলোর আভা ফুটে উঠছিল, হেনরিয়েটা তখন চির অন্ধকারের জগতে হারিয়ে গেলেন। স্ত্রী অভাব, কন্যাদের ভালবাসা আর যত্নে ভুলে গেলেন হ্যানিম্যান। হ্যানিম্যানের খ্যাতি প্রতিপত্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। রোগী দেখে প্রচুর অর্থও উপার্জন করতেন। এই সময় হ্যানিম্যানের জীবনে এল নতুন বসন্ত। তিনি তখন ৮০ বছরের বৃদ্ধ।

১৮৩৪ সালের ৮ অক্টোবর এক সুন্দরী যুবতী মাদাম মেলানি চর্মরোগের চিকিৎসার জন্য হ্যানিম্যানের কাছে এলেন। মেলালি ছিলেন ফ্রান্সের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও তৎকালীন আইনমন্ত্রীর পালিতা কন্যা। হ্যানিম্যানের সাথে সাক্ষাতের সময় তাঁর বয়স ৩৫ বছর। মেলালি ছিলেন শিল্পী কবি। বয়েসের বিরাট ব্যবধান থাকা হয়ে গেল। মেলানি হ্যানিম্যানকে ফ্যান্সে নিয়ে গেলেন। সরকারিভাবে তাঁকে ডাক্তারি করবার অনুমতি দেওয়া হল।

যথার্থই তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ সফলতা আর পূর্ণতার। সেই কারণেই তাঁর শিষ্য ব্রেডফোর্ড গুরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে লিখেছিলেন, তিনি ছিলেন এমন একজন বিদ্বান যাঁকে বিদগ্ধ জগৎ সমাদৃত করেছে। এমন একজন রসায়বিদ যিনি রসায়ন বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা দিতেন। বহু ভাষায় এমন এক পণ্ডিত যাঁর অভিমতকে ভাষাতত্ত্ববিদরা খণ্ডন করতে সাহস পেত না। একজন দার্শনিক যাঁর দৃঢ় মতবাদ থেকে কেউ বিচ্যুত করতে পারেনি।

২৯

ইবনুন নাফিস

(১২০৮–১২৮৮ খ্রিঃ)

জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিল্প, সাহিত্য ও বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের যে শ্রেষ্ঠ অবদান রয়েছে তা আমরা অনেকেই জানি না। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক ও বাহক এবং তাদের অনুসারীগণ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মুসলিম মনীষীদের নামকে মুসলমানদের স্মৃতিপট থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্যে ইসলামের ইতিহাস এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের নামকে বিকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। ফলে সঠিক ইতিহাস না জানার কারণে অনেকে অকপটে এ কথা বলতেও দ্বিধা করেন না যে, সভ্যতার উন্নয়নে মুসলমানদের তেমন কোন অবদান নেই। বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানেও মুসলমানগণ অমুসলিদের নিকট ঋণী।

কিন্তু এ উক্তি সঠিক নয়; বরং মিথ্যারও নীচে। এমন এক যুগ ছিল যখন মুসলিম জাতির মধ্যে আল্লাহ পাকের করুণায় ধন্য মানুষের জন্ম হয়েছিল। তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রায় সকল ধারা বা শাখা প্রশাখা আবিষ্কার করে গিয়েছেন। তাঁদের মৌলিক আবিষ্কারের উপরই বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান।

মানবদেহ রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা কে আবিষ্কার করেছিলেন? শ্বাসনালীর আভ্যান্তরীণ অবস্থা কি? মানবদেহে বায়ু ও রক্ত প্রবাহের মধ্যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাপারটা কি? ফুসফুসের নির্মাণ কৌশল কে সভ্যতাকে সর্ব প্রথম অবগত করিয়েছিলেন? রক্ত চলাচল সম্বন্ধে তৎকালীন প্রচলিত গ্যালেনের মতবাদকে ভুল প্রমাণীত করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ১৩'শ শতাব্দীর বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন কে? এসব জিজ্ঞাসার জবাবে যে মুসলিম মনীষীর নাম উচ্চারিত হতে তিনি হলেন আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবুল হাজম ইবনুন নাফিস আল কোরায়েশী আল মিসরী। তিনি ইবনুন নাফিস নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

তিনি ৬০৭ হিজরী মোতাবেক ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান দামেস্ক,

মিসর না সিরিয়া এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে তাঁর নামের শেষে 'মিসরী' সংযুক্ত থাকায় তিনি মিসরেই জন্মগ্রহণ করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। ইবনুন নাফিস তাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত করেন দামেস্কে এবং মহাজজিব উদ্দীন আদ দাখওয়ারের নিকট তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এত ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, তৎকালীন সময়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না।

তথ্য অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। খলিল আসসাকিদি তাঁর 'ওয়াদি বিল ওয়াকায়াত' গ্রন্থে লিখেছেন, "ইবনুন নাফিস ছিলেন অতি বিশিষ্ট দক্ষ ইমাম এবং অতি উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞ হাকিম।" মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবদান সর্বাধিক। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আইন শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য লাভের পর তিনি কায়রো গমন করেন এবং সেখানে মাসরুরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকাহ (আইন) শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইবনুন নাফিস মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি, ফুসফুসের সঠিক গঠন পদ্ধতি, শ্বাসনালী, হৃৎপিন্ড, শরীর শিরা উপশিরায় বায়ু ও রক্তের প্রবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারকে অবহিত করেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান জগতে তিনি যে কারণে অমর হয়ে আছেন তা হলো মানবদেহে রক্ত চলাচল সম্পর্কে গ্যালেনের মতবাদের ভুল ধরিয়ে ছিলেন তিনি এবং এ সম্বন্ধে নিজের মতবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। ইবনুন নাফিস তাঁর ইবনে সিনার কানুনের এনাটমি অংশের ভাষ্য 'শরহে তসরিহে ইবনে সিনা' গ্রন্থে এ মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ৫ জায়গায় হৃৎপিন্ড (Heart) এবং ফুসফুসের (Lungs) ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচল সম্বন্ধে ইবনে সিনার মত উদ্ধৃত করেছেন এবং ইবনে সিনার এ মতবাদ যে গ্যালেনের মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি তাও দেখিয়ে দিয়ে এ মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, শিরার রক্ত এর দৃশ্য বা অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে ডান দিক থেকে বাম দিকের হৃদপ্রকোষ্টে চলাচল করে না; বরং শিরার রক্ত সব সময়েই ধমনী শিরার ভিতর দিয়ে ফুসফুসে যেয়ে পৌছায়; সেখানে বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে শিরার ধমনীর মধ্য দিয়ে বাম দিকের হৃৎপ্রকোষ্ঠে যায় এবং সেখানে এ জীবনতেজ গঠন করে।

তিনি ফুসফুস এবং হৃৎপিন্ডের এনাটমি নিয়ে আলোচনা করেন। ইবনে সিনা এ্যারিস্টটলের মতবাদের সাথে একমত হয়ে হৃৎপিন্ডে ৩টি হৃৎপ্রকোষ্ঠ রয়েছে বলে যে মত প্রকাশ করেছেন তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এ্যারিস্টটল মনে করতেন যে, দেহের পরিমাপ অনুসারেই হৃৎপ্রকোষ্ট সংখ্যার কম বেশী হয়। তিনি এই মতকে ভুল বলে প্রমাণ করেন। তাঁর মতে হৃৎপিন্ডে মাত্র দু'টো হৃৎপ্রকোষ্ট আছে। একটা থাকে রক্তে পরিপূর্ণ এবং এটা থাকে ডান দিকে আর অন্যটিতে থাকে জীবনতেজ, এটা রয়েঝে বাম দিকে। এ দু'য়ের মধ্যে চলাচলের কোন পথই নেই। যদি তা থাকত তাহলে রক্ত জীবনতেজের জায়গায় বয়ে গিয়ে সেটাকে নষ্ট করে ফেলতে। হৃৎপিন্ডের এনাটমি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনুন নাফিস যুক্তি দেখান যে, ডান দিকের হৃৎপ্রকোষ্ঠে কোন কার্যকরী চলন নেই এবং হৃৎপিন্ডকে মাংসপেশীই বলা হউক বা অন্য কিছুই বলা হউক তাতে কিছু আসে যায় না। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ মতবাদটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত বলে গৃহীত হলেও ইবনুন নাফিসকে বিজ্ঞান জগতে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি।

ইবনুন নাফিস কেবল মাত্র একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীই ছিলেন না; বরং তিনি সাহিত্য, আইন, ধর্ম ও লজিক শাস্ত্রেও অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ২০ খন্ডে ইবনে সিনার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানুন ' এর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এতে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিভিন্ন রোগের ঔষধ সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'কিতাবুশ শামিল ফিল সিনায়াত তিব্বিয়া'। গ্রন্থটি প্রায় ৩০০ খন্ডে সমাপ্ত হবার কথা ছিল কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে তা সম্ভব হয়নি। এ গ্রন্থটির হস্তলিপি দামেস্কে রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি হিপোক্রেটস, গ্যালেন, হুনায়েন ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সিনার গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

তিনি হাদীসশাস্ত্রের উপরও কয়েকখানা ভাষ্য লেখেন। এছাড়া তিনি আরো বহু গ্রন্থ রচনা করেন যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–'আল্ মুখতার মিনাল আগজিয়া (মানবদেহে খাদ্যের প্রভাব সম্পর্কে)', 'রিসালাতু ফি মানাফিয়েল আদাল ইনসানিয়াত (মানবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য সম্বন্ধে)', 'আল কিতাবুল মুহাজ ফিল কুহল (চক্ষু রোগ সম্বন্ধে)', 'শারহে মাসায়েলে ফিত তিব্ব', 'তারিকুল ফাসাহ,' 'মুখতাসারুল মানতেক' প্রভৃতি।

তিনি ৬৮৭ হিজরী মোতাবেক ১২৮৮ খ্রীঃ কায়রোতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে সুস্থ

করে তোলার প্রায় সকল চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশেষে মৃত্যু শয্যায় তাঁর মিসর ও কায়রোর চিকিৎসক বন্ধুরা তাঁর রোগের প্রতিষেধক হিসেবে তাঁকে মদ পান করতে অনুরোধ করেন। মদ পান করলেই তাঁর রোগ সেরে যাবে বলে তাঁরা পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি এক ফোঁটা মদ পান করতেও রাজি হলেন না। তিনি বন্ধুদেরকে উত্তর দিলেন, "আমি আল্লাহ পাকের দরবারে চলে যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি চিরদিন এ নশ্বর পৃথিবীতে থাকতে আসিনি। আল্লাহ আমাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন আমি চেষ্টা করেছি মানুষের কল্যাণে কিছু করে যেতে। বিদায়ের এ লগ্নে শরীরে মদ নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হতে আমি চাই না।"

অতঃপর ৬৮৭ হিজরীর ২১শে জিলকদ মোতাবেক ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার সকালে এ মহামনীষী ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর একমাত্র বাড়ীটি এবং তাঁর সমস্ত বইপত্র মনসুরী হাসপাতালে দান করে যান।

৩০

ত্যাগরাজ

[১৭৬৭-১৮৪৭]

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইতিহাসে যেমন বিঠোফেন মোৎসার্টের নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়, ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে তেমনি এক মহান পুরুষ ত্যাগরাজ। ভারতীয় সঙ্গীতের অতলান্ত সৌন্দর্যকে তিনি তুলে ধরেছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁর জীবনে সঙ্গীত আর ধর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই সাধক সঙ্গীতশিল্পীর জন্ম দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলার তিরুভারুর নগরে। জন্ম তারিখ ৪ঠা মে ১৭৬৭ সাল। যদিও জন্ম তারেখ নিয়ে বির্তক আছে।

শোনা যায় ত্যাগরাজের পিতা রাম ব্রহ্মণকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, তিনি খুবই শ্রীঘ্রই একটি পুত্র সন্তানের পিতা হবেন, এই পুত্র সঙ্গীত সাহিত্য ক্ষেত্রে মহাকীর্তিমান হবে।

ত্যাগরাজের পিতা রাম ব্রাহ্মণ ছিলেন বিদ্বান ধার্মিক সৎ মানুষ। ছেলেবেলায় রামনবমী উৎসবের সময় ত্যাগরাজ বাবার সাথে গিয়ে রামায়ণ পড়তেন। তাঞ্জোরের রাজা রাম ব্রহ্মণকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কিছু জমি আর একটি বাড়ি দিয়ে যান। এইটুকুই ছিল তাঁর সম্পত্তি।

ত্যাগরাজের মা সীতামামার কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব। ত্যাগরাজের সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয় তাঁর মায়ের কাছে। সীতামমার ছিলেন সৎ উদার স্নেহশীলা। মায়ের এই সব চারিত্রিক গুণগুলি ত্যাগরাজের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ত্যাগরাজের শিক্ষা শুরু হয় তাঁর পিতার কাছে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হলেন তিরুভাইয়ের সংস্কৃত স্কুলে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল কবি প্রতিভা। যখন তিনি ছয় বছরের বালক, ঘরের দেওয়ালে প্রথম কবিতা লেখেন। তারপর থেকে নিয়মিতভাবেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। এই সব কবিতাগুলির মধ্যে শিশুসুলভ সরলতা থাকলেও তাঁর প্রতিভার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় কয়েকজন পণ্ডিত ত্যাগরাজের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

বাবা যখন ভজন গাইতেন তিনিও তাঁর সাথে যোগ দিতেন। অন্য সব গানের চেয়ে ভজন তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করত। এই সময় তিনি দুটি ভজন রচনা করেন "নমো নমো রাঘবায়" ও "তব দাসোহম"–এই দুটি ভজন পরবর্তীকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

ত্যাগরাজের বাবা প্রতিদিন সকালে পূজা করতেন। তাঁর পূজার ফুল আনবার জন্য ত্যাগরাজ কিছুদূরে একটি বাগানে যেতেন। পথের ধারে সেন্টি বেঙ্কটরমানাইয়ারের বাড়ি। বেঙ্কটরমনাইয়ার ছিলেন নামকরা সঙ্গীত গুরু। বাড়িতে নিয়মিত ছাত্রদের সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। ত্যাগরাজ বেঙ্কটরমনাইয়ার বাড়ির সামনে এলেই দাঁড়িয়ে পড়তেন। গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর গান শুনতেন। একদিন রাম ব্রহ্মণের ব্যাপারটি নজরে পড়ল। তিনি বেঙ্কটরমনাইয়ের উপর ছেলের সঙ্গীতশিক্ষার ভার দিলেন।

ত্যাগরাজের শৈশব কৈশোর কেটেছিল সঙ্গীত ও সাহিত্য শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে বাবা-মায়ের কাছে একদিকে তেমনি সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা করতেন বাবার সাথে। মহাকাব্য পুরাণ সঙ্গীত বিষয়ক বিভিন্ন রচনার সাথে অল্প বয়সেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। উত্তরকালে সঙ্গীত বিষয়ে যে সব রচনা প্রকাশ করেছিলেন, প্রথম জীবনেই তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

সে যুগের সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। তাই তাদের গানের

মধ্যে নানান ব্যাকরণগত ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করা যেত। ত্যাগরাজ প্রথম রাগসঙ্গীতকে সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে চালিত করে সঠিক পথে নিয়ে আসেন।

ত্যাগরাজের পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই উত্তাধিকারসূত্রে বাড়ির অংশ ছাড়া আর কিছুই পাননি। কিন্তু তার জন্যে ত্যাগরাজের জীবনে কোন ক্ষোভ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবন ছিল সহজ সরল মহৎ আদর্শের সেবায় উৎসর্গীকৃত। নিজের, সংসারের ও শিষ্যদের ভরণপোষণের জন্য সামান্য কিছু জমি আর ভিক্ষাবৃত্তির উপরেই প্রধানত নির্ভরশীল ছিলেন।

১৮ বছর বয়সে ত্যাগরাজের বিবাহ হয়। স্ত্রী ছিলেন ত্যাগরাজের যোগ্য সহধর্মিণী। ত্যাগরাজের খ্যাতির কথা শুনে তাঞ্জোরের মহারাজা তাঁকে নিজের সভাগায়ক হিসাবে আমন্ত্রণ জানান। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর সঙ্গীতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান। বহু মহান সঙ্গীত শিল্পী এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রায় তিনশো বছর (১৬০০–১৯০০) ধরে তাঞ্জোর ছিল সঙ্গীতের পীঠস্থান। এখানকার রাজারা ছিলেন সঙ্গীতের প্রধান পৃষ্ঠস্থান। কিন্তু রাজপরিবারের কোন সম্মানের প্রতি তাঁর সামান্যতম আকর্ষণ ছিল না তাই এই লোভনীয় প্রস্তাব তিনি হেলায় প্রত্যাখ্যান করেন। অর্থের লালসাকে তিনি ঘৃণা করতেন।

তাঁর বাড়িতে সব সময়েই শিষ্য, গায়ক, পণ্ডিতদের ভিড় লেগেই থাকত। এদের কেউ থাকত কয়েকদিন, কেউ কয়েক সপ্তাহ আর কেউ কয়েক মাস। এদের ভরণপোষণের জন্য সপ্তাহে একদিন ভিক্ষায় বার হবেন ত্যাগরাজ। তাঞ্জোরের মানুষ তাঁকে এত সম্মান করত, একদিনের ভিক্ষায় যা পেতেন তাতেই ভালভাবে সমস্ত সপ্তাহের ব্যয় মেটাতে পারতেন।

তাঁর এই ভিক্ষাবৃত্তি ছিল বড় অদ্ভুত। কোন গৃহের দ্বারে যেতেন না। পথ দিয়ে ভজন গাইতে গাইতে হাঁটতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল যেমন উদাত্ত তেমনি মধুর। চারদিকে এক স্বর্গীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি হত। পথের দুপাশের গৃহস্থরা যার যা সামর্থ্য ছিল, ভক্তিভরে এসে দিত ত্যাগরাজকে।

ত্যাগরাজ তখন সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছেন। একদিন কাঞ্চিপুরম থেকে হরিদাস নামে এক ব্যক্তি তাঁকে ৯৬ কোটি বার রামনাম জপ করতে বলেন। ত্যাগরাজের মনে হল এ ঈশ্বরের আদেশ–একে কোনভাবেই লঙ্ঘন করা যাবে না। তারপর থেকে দীর্ঘ ২১ বছর তিনি প্রতিদিন ১,২৫, ০০০ বার করে রামনাম জপ করতেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁর সাথে এইভাবে জপ করতেন। শোনা যায় মাঝে মাঝে জপ করতে করতে একসময় এত আত্মমগ্ন হয়ে যেতেন, তখন তাঁর মনে হত স্বয়ং রাম যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি দু চোখ মেলে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতেন। মনের এই অনুভূতিতে তিনি রচনা করেছিলেন একটি বিখ্যাত গান "কানু গোন্টিনি" (আমি দেখা পেয়েছি)। মাঝে মাঝে যখন শ্রীরামের দর্শন পেতেন না, তাঁর সমস্ত মন বেদনায় ভরে উঠত। এমনি এক সময়ে লিখেছিলেন "এলা নি দাইয়া রাহু"–তুমি কেন আমার প্রতি সদয় নও।

ক্রমশই ত্যাগরাজের খ্যাতি তাঞ্জোরের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছিল। তাঁর রচিত গান বিভিন্ন অঞ্চলের গায়কেরা গাইতে আরম্ভ করল। শিক্ষার ব্যাপারে প্রাচীন কালের সঙ্গীত শিক্ষকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যেত সংকীর্ণ গোঁড়ামি। তারা নিজেদের সঙ্গীতকলাকে শুধুমাত্র সন্তান আর শিষ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখত। কিন্তু ত্যাগরাজ ছিলেন সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে।

যখন তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, দূর-দূরান্ত থেকে সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁর কাছে আসত তাঁকে দর্শন করতে তিনি তাদের নিজের গৃহে আমন্ত্রণ করতেন, সেবা করতেন, নতুন গান যা তিনি রচনা করতেন তা শেখাতেন।

ত্যাগরাজ গানের সঙ্গে বীণা বাজাতেন। এই বীণাটিকে তিনি প্রত্যহ পূজা করতেন, গান শেষ হলে বীণাটি থাকত তাঁর পূজার ঘরে।

ত্যাগরাজের জীবন কাহিনী অবলম্বন করে বহু অলৌকিক প্রচলিত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল স্বরার্ণব (ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত)। এই গ্রন্থে শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীত বিষয়ে নানান আলোচনা করা হয়েছে। এই স্বরার্ণব গ্রন্থটি নাকি স্বয়ং নারদ ত্যাগরাজকে উপহার দিয়েছিলেন।

একটি কাহিনী প্রচলিত যে এক সন্ন্যাসী ত্যাগরাজের বাড়িতে এসে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কিছু পুঁথি দিয়ে যান। রাওতে ত্যাগরাজ স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং দেবর্ষি তাঁর সামনে এসে বলছেন, তোমার গানে আমি তৃপ্ত হয়েছি, তাই পুঁথিগুলি রেখে গেলাম। এর থেকে তুমি নতুন পুঁথি রচনা কর। সেই সব পুঁথি থেকে রচিত হয় 'স্বরার্ণব'।

ত্যাগরাজের জীবনে এই ধরনের ঘটনা আরো কয়েকবার ঘটেছে। যখনই তিনি গভীর কোন সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন, কোন অলৌকিক শক্তির কৃপায় রক্ষা পেয়েছেন। যখন তিনি মাত্র পাঁচ বছরের বালক, গুরুতর অসুখে পড়েন. সকলেই তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিল, এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে ত্যাগরাজের বাবাকে বললেন, কোন চিন্তা করো না, তোমার পুত্র কয়েকদিনেই সুস্থ হয়ে উঠবে। পরদিনই একেবারে সুস্থ হয়ে গেলেন ত্যাগরাজ।

জীবনে শুধু ঈশ্বর অনুগ্রহ পাননি ত্যাগরাজ। তাঁর জীবনও ঈশ্বরের মতই পবিত্র। তাঁকে দেখে মনে হত সাক্ষাৎ যেন পুরাকালের কোন ঋষি-স্থির শান্ত নম্র। চোখে-মুখে সর্বদাই ফুটে উঠত এক পবিত্র আভা। যে মানুষই তাঁর সান্নিধ্যে আসত তারাই মুগ্ধ হয়ে যেত ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহারে। কেউ যদি কখনো তাঁর সাথে রূঢ় আচরণ করত, তাঁর প্রতিও তিনি ছিলেন উদার। কখনো তাঁর মুখ দিয়ে একটিও কটু বাক্য বার হত না। তিনি বলতেন, যাই হোক না কেন সর্বদাই সত্যের পথ আঁকড়ে ধরে থাক। ঈশ্বরের করুণা একদিন না একদিন তোমার উপর বর্ষিত হবেই।

এই প্রসঙ্গে ত্যাগরাজ নিজেই বলেছেন, "ঈশ্বরের নামগান গুণকীর্তনের সাথে যদি শুদ্ধ শ্রুতি, শুদ্ধ স্বর, শুদ্ধ লয়ের সংমিশ্রণ ঘটে তবেই দিব্য আনন্দের উপলব্ধি হয়।"

ত্যাগরাজের স্ত্রী মারা যায় ১৮৪৫ সালে। তারপর থেকেই ত্যাগরাজের জীবনে পরিবর্তন শুরু হল। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়েই তিনি ঈশ্বরের ধ্যানে আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেন।

মৃত্যুর দশ দিন আগে তিনি স্বপ্ন দেখলেন তাঁর প্রভু যেন তাঁকে ডাকছেন। আর দশ দিনের মধ্যেই তাঁর জীবন শেষ হবে। তাঁর স্বপ্নকে গিরিপাইনেলা (কেন তুমি গিরি-চূড়া শীর্ষে) এই গানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তাঁর সব শিষ্যদের বললেন, তোমরা নামগান কর, আগামীকাল আমি মহাসমাধিতে বসব।

চারদিক থেকে শিষ্য ভক্তের দল জমায়েত হতে থাকে। ভজন গানে চারদিকে মুখরিত হয়ে উঠল। নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যানে বসলেন ত্যাগরাজ। কিছুক্ষণ পর তাঁর দেহ থেকে এক অপূর্ব আলোকচ্ছটা বেরিয়ে এল। সেই সাথে মহাপ্রয়াণ ঘটল এই সাধক সঙ্গীত শিল্পীর।

তাঁকে কাবেরী নদীর তীরে গুরু সেঁন্টি বেঙ্কটরমানাইয়ার সমাধির পাশে সমাহিত করা হল। (১৮৪৭ সালের ৬ই জানুয়ারি)।

প্রায় দেড়শো বছর আগে ত্যাগরাজ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর সঙ্গীত বেঁচে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে। তিনি তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ভারতের সনাতন আত্মাকে তুলে ধরেছেন সাধারণ মানুষের কাছে। তাই আজও তাঁর সঙ্গীত মানুষকে আপ্লুত করে। উত্তীর্ণ করে অন্য এক জগতে।

৩১
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
[১৭৬৯-১৮২১]

ইতালির অন্তর্গত কর্সিয়া দ্বীপের আজাশিও নামে একটি ছোট শহরে বাস করতেন এক আইনজীবী, নাম চার্লস। তিনটি সন্তান তাঁর। চতুর্থ সন্তানের জন্মের সময় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্ত্রীর শরীরের অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে যথাসময়েই চার্লসের স্ত্রী চতুর্থ পুত্র সন্তনের জন্ম দিলেন। দাই এসে সংবাদ দিতেই ঘরে ঢুকবেন চার্লস। নতুন কেনা গদির উপর শুয়ে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী আর নবজাত শিশুসন্তান। সমস্ত গদির উপর যুদ্ধের ছবি আঁকা। সেই দিন চার্লস কল্পনাও করতে পারেননি যুদ্ধের ছবির উপর জন্ম নিল যে শিশু, যুদ্ধ হবে তাঁর জীবনসঙ্গী। যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে হবে তাঁর প্রতিষ্ঠা। যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই একদিন তিনি ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করবেন। আবার যুদ্ধই তাঁর ধ্বংসের কারণ চার্লসের সেই নবজাত শিশু সন্তান (জন্ম ১৫ই আগস্ট ১৭৬৯) ভবিষ্যতের বীর নায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। যে সমস্ত মানুষ তাঁদের ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব,কর্মপন্থা, অপরিসীম সাহস ও শক্তি দিয়ে ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, নেপোলিয়ন তাঁদের অন্যতম।

চার্লস বোনাপার্ট ছিলেন সুদর্শন, প্রতিভাবান, আইনজীবী। বক্তা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। পুত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার সব ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন।

শিশু নেপোলিয়ন দাদাদের সাথে পড়াশুনার অবসরে দ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন। ভবিষ্যৎ জীবনে নেপোলিয়নের চরিত্রে কর্সিয়ার প্রাকৃতিক প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

সেখানকার পাহাড়-পর্বতের মতই অনমনীয় দৃঢ়তা, শান্ত অটল প্রকৃতি নেপোলিয়নের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

নেপোলিয়নের মা ছিলেন উদার শান্ত প্রকৃতির মহিলা। বাবা-মার চারিত্রিক প্রভাবও নেপোলিয়নের জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

নেপোলিয়নের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় তাঁর বাড়িতে পিতার কাছে। দশ বছর বয়সে একটি ফরাসী স্কুলে ভর্তি হলেন। প্রথমে কর্সিয়া ছিল জেনোয়ার অধিকারে। পরে এই দেশ ফরাসীরা দখল করে নেওয়ার ফলে কর্সিয়া ফরাসী অধিকারভুক্ত হয়। নেপোলিয়ন ফরাসী নাগরিক হিসাবে জন্মগ্রহণ করলেও ফরাসীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না। কারণ তাঁর মনে হত ফরাসীরা তাঁদের স্বাধীনতা হরণ করেছে।

ছেলেবেলা থেকেই নেপোলিয়নের ইচ্ছা ছিল সৈনিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি ভর্তি হলেন একটি সামরিক কলেজে। সামরিক শিক্ষায় নিজেকে গড়ে তুললেও ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। তিনি প্লেটো, ভলতেয়ার, রুশো প্রভৃতি দার্শনিকদের রচনা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তেন, আলোচনা করতেন। তবে তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, সেই সব দেশের সম্রাট রাজাদের বীরত্ব সাহস কীর্তি তাঁকে মুগ্ধ করত।

তাঁর যৌবনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল কর্সিয়ার স্বাধীনতা অর্জন। তিনি বিশ্বাস করতনে একমাত্র সামরিক শক্তিতেই এই স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব। মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি ফরাসী সামরিক বাহিনীতে ক্যাপ্টেন হিসাবে ভর্তি হলেন।

এই সময় ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই-এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে বিপ্লব। রাজাকে পদচ্যুত করে দেশের ক্ষমতা দখল করল বিপ্লবী পরিষদ। তৈরি হল কনভেনশন বা প্রজাতান্ত্রিক ফরাসী সরকার। সমস্ত দেশ জুড়ে আরম্ভ হল হানাহানি মারামারি আর সন্ত্রাসের রাজত্ব। নিহত হল রাজা ষোড়শ লুই। ফ্রান্সের এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই সব দেশের সৈন্যদের একত্রিত করে তৈরি হল শক্তি সঙ্ঘ।

ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার পর যখন নতুন শক্তি দেশের ক্ষমতা দখল করল, তারা ফরাসী অধিকারভুক্ত বিভিন্ন দেশকে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করে অভ্যন্তরীণ শাসনের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করল। এই ঘোষণার ফলে নেপোলিয়নের মনে ফ্রান্সের প্রতি যে ঘৃণা ছিল তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল।

১৭৯৩ সালে ইউরোপের শক্তি সঙ্ঘের তরফে ইংরেজ নৌবাহিনী ফরাসী সামরিক বন্দর টুঁলো অবরোধ করল। সেখানকার স্থানীয় নাগরিকরাও রাজার সমর্থনে ইংরেজদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তখন ফরাসী বাহিনীর এক ক্যাপ্টেন, ইংরেজ বাহিনীর অবরোধ মুক্ত করবার ভার পড়ল তাঁর উপর। সসৈন্যে এগিয়ে গেলেন নেপোলিয়ন। দুপক্ষে শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। ইংরেজ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ফরাসীদের তুলনায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও নেপোলিয়নের সুদক্ষ রণনীতির সামনে তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে ফ্রান্স পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল। এই জয়ে নেপোলিয়নের খ্যাতি সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তাঁকে ফরাসী সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসাবে ঘোষণা করা হল। এর অল্প কিছুদিন পর মিথ্যা সন্দেহবশত নেপোলিয়নকে বন্দী করে কারারুদ্ধ করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তিনি বিপ্লব বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনুসন্ধানে এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল।

এই সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে শক্তি সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল, একে একে অনেক দেশ সেই সঙ্ঘ থেকে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন ফরাসী সরকারকে অস্বীকৃতি করে যুদ্ধ ঘোষণা করল। একদিকে বিদেশী শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা, অন্যদিকে দেশের মধ্যে নানান বিশৃঙ্খলা গণ্ডগোল। এই অবস্থায় জনগণও বিপ্লবকে রক্ষা করবার জন্য ১৭৯৫ সালে কনভেনশন ডাইরেক্টরী নামে নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, এই কনভেনশন দেশের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। ফ্রান্সের সর্বময় কর্তা হিসাবে আইনসংগতভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নেপোলিয়ন ঘোষণা করলেন, (১৭৯৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর) "বিপ্লবের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, এইবার বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটল।"

ফ্রান্সের সাময়িক বিপর্যয়ের সুযোগ ইউরোপে গড়ে উঠল দ্বিতীয় শক্তি সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিল ইংলন্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া। তাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সে নব গঠিত শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ইউরোপের প্রতিটি দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা যেভাবে সে দেশের মানুষ ক্ষমতা অর্জন করেছে, তার প্রতিক্রিয়া তাদের দেশেও পড়তে পারে। একদিকে যেমন এই আশঙ্কা ছিল অন্যদিকে নেপোলিয়নের রণকুশলতায় সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তাকে ধ্বংস করবার জন্য সম্মিলিতভাবে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলল।

নেপোলিয়ন অনুভব করতে পেরেছিলেন এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এই মুহূর্তে অসুবিধাজনক। তাই তিনি ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট ও অস্ট্রিয়ার রাজার কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। এর পেছনে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সাময়িকভাবে যুদ্ধ ও রক্তপাত থেকে নিবৃত হতে চাইছিলেন। দ্বিতীয়ত যদি সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, সেক্ষেত্রেও তিনি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করবার সময় পাবেন।

নেপোলিয়নের সন্ধির প্রস্তাব দুই তরফেই অগ্রাহ্য করা হল। মাত্র এক বছরের মধ্যে নেপোলিয়ন নিজের সৈন্যবাহিনীকে নতুন করে সুসংহত করে ইতালি আক্রমণ করলেন। অন্যদিকে তাঁর সেনাপতি অস্ট্রিয়া আক্রমণ করল। এই যুদ্ধের ফলে বিশাল অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হল। তারা ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হল। এইভাবে দ্বিতীয় শক্তি সঙ্ঘের অবসান ঘটল।

নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে প্রকৃতপক্ষে একনায়কতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। যে প্রজাতন্ত্রের জন্য ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। এই ক্ষমতা দখল প্রসঙ্গে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, "ফ্রান্সের রাজমুকুট মাটিতে পড়েছিল, আমি সেই মুকুট তরবারি দিয়ে মাথায় তুলে নিয়েছি।"

নেপোলিয়নের বাস্তব বুদ্ধিবোধ এত প্রখর ছিল, তিনি গণভোটের আয়োজন করলেন, যাতে সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হয়ে যায় তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়েই সম্রাট পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। তখন ফ্রান্সের জনগণের কাছে নেপোলিয়ন এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সকলের ধারণা ছিল তিনিই ফ্রান্সের রক্ষাকর্তা। তাই নির্বাচনে সমগ্র জনগণের জনসমর্থন লাভ করে হয়ে উঠলেন ফ্রান্সের একচ্ছত্র অধিপতি।

এইবার দেশের উন্নয়নের কাজে হাত দিলেন। দীর্ঘদিন বিপ্লবের উন্মাদনায়, যুদ্ধবিগ্রহের তাণ্ডবে প্রকৃতপক্ষে দেশের সমস্ত উন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভেঙে পড়েছিল।

নেপোলিয়ন দেশকে ৮৩টি প্রদেশে ভাগ করে প্রতিটি প্রদেশ দেখাশুনার জন্যে একজন করে শাসক নির্বাচিত করলেন। সেই শাসকের উপর তার প্রদেশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আরোপ করা হল। বিচার বিভাগের সংস্কার করলেন, নতুন বিচারক নিয়োগ করলেন। যাতে কোন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হতে না পারেন সেই জন্যে বিচারক নির্বাচনের ভার নিজের হাতে নিলেন।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তৈরি করা হল 'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স' নামে জাতীয় ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল যাতে জনগণ, ব্যবসায়ীরা তাদের সঞ্চিত অর্থ এখানে জমা রাখতে পারে, এবং শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থ ঋণ হিসাবে পেতে পারে।

তিনি কর ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করলেন। এতদিন সরকারের তরফে কর আরোপ করা হত। লোকেরা সেই কর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমা দিত না। কর আদায়ের ক্ষেত্রেও কোন সুষ্ঠু নীতি ছিল না। নেপোলিয়ন শুধু পুরনো নীতিকে নতুনভাবে বলবৎ করলেন না, জনগণ যাতে প্রবর্তিত কর ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় কর দেয় তার জন্যে তাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। কর আদায়ের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙে পড়া অর্থনীতি সজীব হয়ে উঠল।

আইন বিচার অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে নগর উন্নয়নের দিকে নজর দিলেন নেপোলিয়ন। তৈরি হল নতুন রাস্তাঘাট শিক্ষাকেন্দ্র।

তবে নেপোলিয়নের গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত কাজ হল নতুন আইন বিধি যা নেপোলিয়ন কোড (Code Nepoleon) নামে পরিচিত, তাকে প্রচলন করা। নেপোলিয়ন অনুভব করেছিলেন

দেশের প্রচলিত আইন সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। সেই কারণেই দেশের বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের পরামর্শে নতুন আইন বিধি গড়ে উঠল।

এই সময় কাজের জন্য দেশের মানুষের গভীর আস্থা অর্জন করলেন নেপোলিয়ন।

নেপোলিয়ন যতই তাঁর ক্ষমতা প্রভুত্ব বিস্তার করছিলেন, ততই বিপ্লবের মূল আদর্শ থেকে ফ্রান্স দূরে সরে আসছিল। নেপোলিয়ন নিজেও বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাই তিনি বলেছিলেন, আমিই বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি।

সেই মুহূর্ত ফ্রান্সে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হল, সেই সময় ইংরেজদের সাথে আবার নেপোলিয়নের বিবাদ শুরু হল। ১৮০৫ সালে ইংরেজ নৌবাহিনী ফরাসী নৌবহরকে পরাজিত করল। নৌযুদ্ধ ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে নেপোলিয়ন তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ শুরু করলেন। তিনি ইংরেজদের বলতেন 'দোকানদারের জাত'। ইউরোপের কোন বন্দরে যাতে ইংলন্ডের কোন পণ্য প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এর ফলে শুধু ইংলন্ড নয়, অন্য দেশের উপর অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ল। ফলে ইউরোপের প্রতিটি দেশই নেপোলিয়নের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রী সম্পর্ক ছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের আচার-আচরণ মেনে নিতে পারছিলেন না রাশিয়ার জার। তিনি নিজের দেশের সমস্ত বন্দর ইংলন্ডের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করলেন।

রাশিয়ার এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন নেপোলিয়ন। তিনি স্থির করলেন রাশিয়া আক্রমণ করবেন। ছয় লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা হল। এই বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন নেপোলিন। এই রাশিয়া আক্রমণ নেপোলিয়নের জীবনের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি।

রাশিয়ার জার জানতেন নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই রুশ বাহিনী ফরাসী সৈন্যদের আক্রমণ না করে পিছু হটতে আরম্ভ করল। শহর নগর গ্রাম যা কিছু ছিল সব নিজেরাই ধ্বংস করে দিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এই কাজকে বলে পোড়ামাটির নীতি। ফরাসী সৈন্যবাহিনী বিনা বাধায় মস্কোয় প্রবেশ করে শহর দখল করে নিল। জার তখন মস্কো ত্যাগ করে পিটসবার্গ দুর্গে অবস্থান করেছিলেন। নেপোলিয়ন মস্কো জয় করার অল্পদিনের মধ্যেই শীত এসে গেল। রাশিয়ার ভয়াবহ ঠাণ্ডা সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না ফরাসী সৈন্যদের। তারা ফিরে চলল ফ্রান্সের দিকে। তখন বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে। নিজেদের সঞ্চিত খাবার ফুরিয়ে গিয়েছে। পথের কষ্টে শত শত সৈনিক মারা পড়তে আরম্ভ করল। তাদের দুর্বলতার সুযোগে রুশ সৈন্যবাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ফরাসীদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করল। তার সাথে রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর প্রায় সমস্ত সৈন্যই মারা পড়ল। ছয় লক্ষ সৈন্যের মধ্যে মাত্র বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ফ্রান্সে এসে পৌঁছেলেন নেপোলিয়ন।

তাঁর এই পরাজয়ে ইউরোপের সমস্ত দেশ একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই বিশাল শক্তির সাথে লড়াই করবার ক্ষমতা ছিল না নেপোলিনের। রাশিয়া আক্রমণের ফলে তাঁর সৈন্য সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। বিরোধী পক্ষের আক্রমণের মুখে পিছু হটতে আরম্ভ করলেন। বিরোধী পক্ষ চারদিক থেকে প্যারিস অবরুদ্ধ করে ফেলল। নেপোলিয়নের সৈন্যরাও তাঁকে ত্যাগ করল। নিরুপায় নেপোলিয়ন ১৮১৪ সালের ১১ই এপ্রিল সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তাঁকে এলবা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হল।

নেপোলিয়নের অবর্তমানে সিংহাসনে বসলেন ফ্রান্সের বুরবোঁ পরিবারের অষ্টাদশ লুই। সাথে সাথে অভিজাত সম্প্রদায় দেশে ফিরে এল। দেশে নতুন করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। ফরাসী জনগণ কিছুতেই এই নতুন শাসনব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারছিল না। ফরাসী সৈন্যবাহিনীও নেপোলিয়নকে আদর্শ বীর হিসাবে মনে করত। দেশের মধ্যে গোলযোগ শুরু হল।

এলবা দ্বীপে অবস্থানকালে ফ্রান্সের এই অবস্থার কথা শুনে গোপনে দেড় হাজার সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ন প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন। এই সংবাদ পেয়ে রাজা লুই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পাঠালেন নেপোলিয়নকে বন্দী করবার জন্য। সৈন্যবাহিনী এসে যখন চতুর্দিকে তাদের সামনে এসে বললেন, তোমরা যদি আমাকে হত্যা করতে চাও, তবে স্বচ্ছন্দ মনে তা করতে পার। আমি তোমাদের সম্রাট, তাই তোমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তাঁর এই ব্যক্তিত্ব, সাহস, আকর্ষণীয় শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে সৈনিকরা লুই এর পক্ষ ত্যাগ করে তাঁকে সমর্থন করল। ফরাসী সেনাপতি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে নেপোলিয়নের পক্ষে যোগ দিলেন।

অবশেষে ২২শে জুন নেপোলিয়ন পদত্যাগ করে প্যারিস ত্যাগ করলেন। কারণ সম্মিলিত বাহিনী প্যারিসের দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছে। তিনি জানতেন ধরা পড়লে সাথে সাথে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

তিনি তাঁর প্রথম রানী জোসেফাইনের প্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে ছিল তাঁর পালিত কন্যা। দুজনে আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়া স্থির করলেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য কোন জাহাজই এল না। সম্মিলিত বাহিনীর নেতারা তাঁকে সুদূর আফ্রিকার এক দ্বীপ সেন্ট হেলেনায় নির্বাসন দিল। সেখানে ব্রিটিশ গভর্নরের অধীনে জীবনের অবশিষ্ট ছটি বছর কাটাতে হল।

১৮২১ সালের ৫ই মে মাত্র বায়ান্ন বছর বয়সে ক্যানসার রোগে তাঁর মৃত্যু হল।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর খাঁচার পোষা পাখির মত বন্দী জীবনে প্রাণত্যাগ করলেও তিনি ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পুরুষ।

৩২
ভাস্করাচার্য
[১১১৪-১১৮৫]

প্রায় ৮৫০ বছর আগেকার কথা। দক্ষিণ ভারতের বিজ্জবিড় নামে এক নগরে বসে করতেন এক ব্রাহ্মণ। নাম ভাস্করাচার্য। অঙ্ক এবং জ্যোতিষ দুটি বিষয়েই ছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। নগরের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দূর দেশে।

দেশের রাজা মহারাজা থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। এত সম্মান খ্যাতি তবুও মনে সুখ ছিল না। ভাস্করাচার্যের। তাঁর একমাত্র সন্তান লীলাবতী রূপে সরস্বতী গুণে লক্ষ্মী। শান্ত ধীর, অসাধারণ মেধাবী। মুখে মুখে পিতার কাছ থেকে শাস্ত্রের নানান পাঠ নিয়েছে।

এমন গুণবতী, রূপবতী কন্যা তবুও ভাস্করাচার্য নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পান। জন্ম সময়ে তিনি কন্যার ভাগ্য গণনা করে কোষ্ঠী প্রস্তুত করেছেন। তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে কন্যার বৈধব্যযোগ। এ কথা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। এতদিন ভুলেই ছিলেন। কিন্তু এখন যে কন্যা বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশীরা মেয়ের বিবাহের কথা বলছে। অনেকেই লীলাবতীকে বিবাহ করতে চায়। দিবারাত্র ভাবতে থাকেন ভাস্করাচার্য। কার সাথে তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন? জেনেশুনে একটি ছেলের জীবন নষ্ট করবেন!

এক সময় তাঁর মনে হল গণনায় কোন ভুল হয়নি তো? আরো কয়েকজন গণৎকারকে দিয়ে নতুন করে গণনা করালেন। সকলেই একমত, এই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। বিবাহের অল্প দিনের মধ্যেই এর স্বামীর মৃত্যু হবে। কিন্তু এর কি কোন প্রতিকার নেই? ভাবতে থাকেন ভাস্করাচার্য। সমস্ত পুঁথিপত্র নিয়ে বসলেন। কয়েক দিন ধরে অবিশ্রান্ত গণনা করার পর একটি মাত্র শুভক্ষণ পেলেন। ঐ শুভক্ষণে বিবাহ হলেই একমাত্র কন্যার বৈধব্যযোগ রোধ করা সম্ভব। কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেতে দেরি হল না। বিবাহের প্রস্তুতি আরম্ভ হল।

বিবাহের শুভদিন এসে গেল। সকাল থেকে ভাস্করাচার্য উদ্বিগ্ন, সেই শুভক্ষণ যেন পার না হয়ে যায়। সময় নির্ধারণ করবার জন্য বালু ঘড়ি বসানো হয়েছে কক্ষের একদিকে। বারংবার ভাস্করাচার্য নিজে এসে সময় দেখছেন।

সেই যুগে সময় নির্ধারণের জন্য বালু ঘড়ি ব্যবহার হত। বালু ঘড়িতে দুটি কাঁচের পাত্র উপর-নিচ করে বসান হত। দুটি পাত্রেই একটি করে ছোট ফুটো ছিল। একটি পাত্রে বালি ভর্তি থাকত। তার থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে বালি ঝরে পড়ত। নির্দিষ্ট সময়ে পাত্রটি খালি হলে তা আবার উলটো করে দেওয়া হত। আর তার থেকে সময় নির্ধারণ করা হত।

বালু ঘড়ি। লীলাবতী প্রকৃত ব্যাপারটি জানত না। বারংবার কৌতূহলী হয়ে বালু ঘড়ির দিকে গিয়ে দেখছিল। এদিকে পুরোহিত অপেক্ষা করে থাকেন। সময় পার হয়ে যায়। লগ্ন যে আর হয় না। অধৈর্য হয়ে বালু ঘড়ি ভাল করে দেখতেই আর্তনাদ করে উঠলেন ভাস্করাচার্য। লীলাবতী যখন বালু ঘড়ির উপর ঝুঁকে পড়ে সময় দেখছিল তখন তার অজান্তে গলার হার থেকে একটি মুক্তো খসে পড়ে বালি পড়ার ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই কখন যে বিয়ের লগ্ন পার হয়ে গিয়েছিল কেউ জানতে পারেনি।

দুঃখে ভেঙে পড়লেন ভাস্করাচার্য। কন্যার বিবাহ হল। বিধির বিধান খণ্ডন করে মানুষের সাধ্য কি! অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীকে হারিয়ে পিতার কাছে ফিরে এলেন লীলাবতী। কন্যার

জীবনের সব আনন্দ সুখ চিরদিনের জন্য মুছে গেল। তাঁর জীবনের দুঃখ ভোলবার জন্য ভাস্করচার্য কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। আর সেই জন্য রচনা করলেন গণিত শাস্ত্রের বিশাল এক গ্রন্থ সিদ্ধান্ত শিরোমণি–এই গ্রন্থের মোট চারটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডের নাম লীলাবতী–এতে সাধারণ গণিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লীলাবতী পৃথিবীর আদিমতম গণিতের গ্রন্থ। প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

আনুমানিক ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে সিদ্ধান্ত শিরোমণি রচিত হয়েছিল। তখন ভাস্করাচার্যের বয়স মাত্র ৩৬। ইউরোপে প্রথম গণিতের বই প্রকাশিত হয়েছিল ১২০২ খ্রিস্টাব্দে। লিওনার্দ দ্য পিসা নামে এক পণ্ডিত এই বই রচনা করেছিলেন।

আনুমানিক ১১১৪ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের বিজ্জবিড় গ্রামে ভাস্করাচার্যের জন্ম হয়। তাঁর জীবন কাহিনী সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তার কতটুকু সত্য কতটুকু কল্পনা তা বিচার করা কঠিন। তবে সাম্প্রতিক কালে বোম্বাই-এর অন্তগর্ত চালিসগাও নামে একটি স্থান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি পুরনো মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায় ভাস্করাচার্যের পিতার নাম ছিল মহেশ দৈবজ্ঞ; তাঁর পিতার নাম মনোরথ; তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষদের নাম যথাক্রমে প্রভাকর, গোবিন্দ, ভাস্করভট্ট এবং ত্রিবিক্রম। ভাস্করাচার্যের দুই পুত্রের নাম জানা যায়–লক্ষীধর ও চঙ্গদেব। এঁরা সকলেই ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁরা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয়। শিলালিপিতে প্রত্যেকের সম্বন্ধেই রয়েছে প্রশস্তি। তবে ভাস্করাচার্যের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠেছে লিপিকার। তাঁকে বলা হয়েছে ভট্ট পারদর্শী তিনি সাংখ্য, তন্ত্র, বেদে মহাপণ্ডিত। তাঁর তুল্য জ্ঞান আর কারো নেই। কাব্যে, কবিতায়, ছন্দে, অতুলনীয়। গণিতে শিবের মতই তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর চরণে প্রণাম জানাই।

এই লিপিতে কোথাও লীলাবতীর উল্লেখ নেই। তাহলে লীলাবতীর অস্তিত্ব কি শুধুই কাল্পনিক! এই বিষয়ে নানা রকম মত আছে। অনেকের ধারণা লীলাবতী ছিলেন ভাস্করাচার্যের কন্যা। তিনি অত্যন্ত বিদূষী ছিলেন। লীলাবতী অংশটি তাঁরই রচিত। ভাস্করাচার্য সমগ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থটি কন্যাকে উৎসর্গ করেছিলেন। কেউ বলেন লীলাবতী নামে কোন নারীরই অস্তিত্ব নেই। কারণ এই বইটির বিভিন্ন শ্লোকে কোথাও সখে, কোথাও প্রিয়ে, চঞ্চলা ইত্যাদি সম্বোধন করেছেন। কন্যাকে কেউই প্রিয়ে বা সখে বলে সম্বোধন করে না। সম্ভবত ভাস্করাচার্য জ্ঞানের দেবী সরস্বতীকেই বিভিন্ন সম্বোধনে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন।

লীলাবতী প্রসঙ্গে যতই বিতর্ক থাক, মূল পুস্তকখানি নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। এর প্রথম খণ্ড লীলাবতীতে সাধারণ গণিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রথমে রয়েছে গণেশ বন্দনা আর মঙ্গলাচারণ। লীলাবতীতে মোট ২৭৮টি শ্লোক আছে। এতে সরল গণিতের বিভিন্ন পদ্ধতি সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণ যোগ, ঘনমূল, অনুপাত, সমানুপাত, বিপরীত ক্রিয়া, সুদকষা, ভগ্নাংশ, লাভক্ষতি।

গণিত ছাড়াও লীলাবতীতে জ্যামিতি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এতে আছে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ ট্রাপিজিয়ম বৃত্ত। প্রতিটি বিষয়েই তাঁর আলোচনা মোটামুটি নির্ভুল। লীলাবতী থেকে একটি অঙ্কের উল্লেখ করা হল। "একজন ব্যক্তি কিছু অর্থ নিয়ে তীর্থযাত্রা করেছিল। তাঁর মোট সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক প্রয়োগে ব্যয় করল। অবশিষ্ট অর্থের দুই নবমাংশ কাশীতে ব্যয় করল। পথখরচ বাবদ তার ব্যয় হল অবশিষ্টের এক চতুর্থাংশ। অবশিষ্টের ছয় দশমাংশ ব্যয় হল গাঁজাতে। তীর্থযাত্রীর হাতে অবশিষ্ট রইল মাত্র ৬৩টি মুদ্রা।" ভাস্করাচার্য প্রশ্ন রেখেছেন তীর্থযাত্রীটি কত মুদ্রা নিয়ে পথে বার হয়েছিল।

প্রায় ৯৫০ বছর আগে রচিত অঙ্কটির সমরূপ অঙ্ক বর্তমান কালের স্কুলের ছাত্ররাও করে থাকে সিদ্ধান্ত শিরোমণির অন্তর্ভুক্ত হলেও লীলাবতী গ্রন্থটি স্বতন্ত্র পুস্তকের মর্যাদা পেয়েছিল। এবং এটি বহুল প্রচলিত ছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড বীজগণিত। এতে মূলত সমীকরণ ও দ্বিঘাত সমীকরণের তত্ত্বগুলি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে তবে ভাস্করাচার্য এই তত্ত্বগুলির উদ্ভাবক নন। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীধরাচার্য প্রথম দ্বি সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম ছিল গণিতাসার। এতে বীজগণিত পাটিগণিতের বহু নিয়ম আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য–ভগ্নাংশ, সুদ নির্ণয়, দ্বিঘাত সমীকরণ, বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি।

ভাস্করাচার্য ছিলেন সাহসী, সংস্কারমুক্ত, উদার মনের মানুষ। মধ্যযুগে যখন ভারতবর্ষের মানুষ ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার জগতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল, সেই যুগের বুকের উপর

দাঁড়িয়ে তিনি সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাকে ছিন্নভিন্ন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি যখন অন্যের মতকে খণ্ডন করেছেন তখন প্রতিপক্ষের কাছে মার্জনা চেয়ে নিতে দ্বিধা করেননি। ভাস্করাচার্যের মধ্যে ছিল সাহস, সত্যকে প্রকাশ করবার দৃঢ়তা, সেই সাথে উদারতা।

ভাস্করাচার্য প্রায় ৭১ বছর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি করণকুতূল নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সমৃদ্ধ।

৩৩

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

[১৮৮১-১৯৫৫]

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর জন্ম হয় ১৮৮১ সালের ৬ই আগস্ট স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত লকফিল্ড বলে এক পাহাড়ি গ্রামে। বাবা ছিলেন চাষী। আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। দারিদ্র্যের মধ্যেই ছেলেবেলা কাটে ফ্লেমিংয়ের। যখন তাঁর সাত বছর বয়স, তখন বাবাকে হারান। অভাবের জন্য প্রাইমারী স্কুলের গণ্ডিটুকুও শেষ করতে পারেননি।

যখন ফ্লেমিংয়ের বয়স চৌদ্দ, তাঁর ভাইরা সকলে এসে বাসা বাঁধল লণ্ডন শহরে। তাদের দেখাশুনার ভার ছিল এক বোনের উপর। কিছুদিন কাজের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করবার পর ষোল বছর বয়স এক জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি পেলেন ফ্লেমিং। অফিসে ফাইফরমাশ খাটার কাজ। কিছুদিন চাকরি করেই কেটে গেল। ফ্লেমিংয়ের এক চাচা ছিলেন নিঃসন্তান। হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। তাঁর সব সম্পত্তি পেয়ে গেলেন ফ্লেমিংয়ের ভাইরা। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংয়ের বড় ভাই টমের পরামর্শ মত ফ্লেমিং জাহাজ কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন। অন্য সকলের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও অসাধারণ মেধায় অল্পদিনেই সকলকে পেছনে ফেলে মেডিক্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রথম হলেন ফ্লেমিং। তিনি সেন্ট মেরিজ হাসপাতালে ডাক্তার হিসাবে যোগ দিলেন।

১৯০৮ সালে ডাক্তারির শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন কারণ সেনাবাহিনীতে খেলাধুলোর সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। কয়েক বছর সামরিক বাহিনীতে কাজ করবার পর ইউরোপ জুড়ে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সে সময় ফ্লেমিং ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর ডাক্তার হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি ব্যাকটেরিয়া নিয়ে যে গবেষণা করেছিলেন, এখানেই প্রথম তার পরীক্ষা করবার সুযোগ পেলেন।

হাসপাতালে প্রতিদিন অসংখ্য সৈনিক এসে ভর্তি হচ্ছিল। তাঁদের অনেকেরই ক্ষত ব্যাকটেরিয়ার দূষিত হয়ে উঠেছিল। ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন। যে সব অ্যান্টিসেপটিক ঔষধ চালু আছে তা কোনভাবেই কার্যকরী হচ্ছে না—ক্ষত বেড়েই চলেছে। যদি খুব বেশি পরিমাণে অ্যান্টিসেপটিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়, সে ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া কিছু পরিমাণে ধ্বংস হলেও দেহকোষগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফ্লেমিং উপলব্ধি করলেন দেহের স্বাভাবিক শক্তি একমাত্র এসব ব্যাকটেরিয়াগুলি প্রতিরোধ করতে পারে কিন্তু তাঁর ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ।

১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হল। দু মাস পর ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন ফ্লেমিং। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করবার মত কোন কিছুই খুঁজে পেলেন না।

ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে তিনি সেন্ট মেরিজ মেডিক্যাল স্কুলে ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসার হিসাবে যোগ দিলেন। এখানে পুরোপুরিভাবে ব্যাকটেরিওলজি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করলেন মানবদেহে কিছু নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে যা এই বহিরাগত জীবাণুদের প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পেলেন না।

১৯২১ সাল একদিন ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ করছিলেন ফ্লেমিং। কয়েকদিন ধরেই তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। সর্দি-কাশিতে ভুগছিলেন। তিনি তখন প্লেটে জীবাণু কালচার নিয়ে কাজ করছিলেন হঠাৎ প্রচণ্ড হাঁচি এল। নিজেকে সামলাতে পারলেন না ফ্লেমিং। প্লেটটা সরাবার আগেই নাক থেকে খানিকটা সর্দি এসে পড়ল প্লেটের উপর। পুরো জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল দেখে প্লেটটা একপাশে সরিয়ে রেখে নতুন একটা প্লেট নিয়ে কাজ শুরু করলেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে গেলেন ফ্লেমিং। পরদিন ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখা প্লেটটার দিকে নজর পড়ল। ভাবলেন প্লেটটা ধুয়ে কাজ শুরু করবেন। কিন্তু প্লেটটা তুলে

ধরতেই চমকে উঠলেন। গতকাল প্লেট ভর্তি ছিল জীবাণু সেগুলো আর নেই। ভাল করে পরীক্ষা করতেই দেখলেন সব জীবাণুগুলো মারা গিয়েছে। চমকে উঠলেন ফ্লেমিং। কিসের শক্তিতে নষ্ট হল এতগুলো জীবাণু। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল গতকাল খানিকটা সর্দি পড়েছিল প্লেটের উপর। তবে কি সর্দির মধ্যে এমন কোন উপাদান আছে যা এই জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করতে পারে! পর পর কয়েকটা জীবাণু কালচার করা প্লেট টেনে নিয়ে তার উপর নাক ঝাড়লেন। দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই জীবাণুগুলো নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। এই আবিষ্কারের উত্তেজনায় নানাভাবে পরীক্ষা শুরু করলেন ফ্লেমিং। দেখা গেল চোখের পানি, থুতুতেও জীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে। দেহনির্গত এই প্রতিষেধক উপাদানটির নাম দিলেন লাইসোজাইম। লাইস অর্থ ধ্বংস করা, বিনষ্ট করা। জীবাণুকে ধ্বংস করে তাই এর মান লাইসোজাইম।

একজন পুলিশ কর্মচারী মুখে সামান্য আঘাত পেয়েছিল, তাতে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তা দূষিত হয়ে রক্তের মধ্যে জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাক্তাররা তার জীবনের সব আশা ত্যাগ করেছিল। ১৯৪১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রফেসর ফ্লোরি স্থির করলেন এই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির উপরেই পরীক্ষা করবেন পেনিসিলিন। তাকে তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর চারবার পেনিসিলিন দেওয়া হল। ২৪ ঘণ্টা পর দেখা গেল যার আরোগ্যলাভের কোন আশাই ছিল না। সে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। এই ঘটনায় সকলেই উপলব্ধি করতে পারল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে পেনিসিলিন।

ডাঃ চেইন বিশেষ পদ্ধতিতে পেনিসিলিনকে পাউডারে পরিণত করলেন। এবং ডাঃ ফ্লোরি তা বিভিন্ন রোগীর উপর প্রয়োগ করতেন। কিন্তু যুদ্ধে হাজার হাজার আহত মানুষের চিকিৎসায় ল্যাবরোটারিতে প্রস্তুত পেনিসিলিন প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্তই কম।

আমেরিকার Norhern Regional Research ল্যাবরেটরি এই ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। মানব কল্যাণে নিজের এই আবিষ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে উঠেছিলেন ফ্লেমিং। মানুষের কলকোলাহলের চেয়ে প্রকৃতির নিঃসঙ্গতাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত। মাঝে মাঝে প্রিয়তমা পত্নী সারিনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। সারিন শুধু যে তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাই নয়, ছিলেন তাঁর যোগ্য সঙ্গিনী।

১৯৪৪ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজদরবারের তরফ থেকে তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হল। ১৯৪৫ সাল তিনি আমেরিকায় গেলেন।

১৯৪৫ সালের শেষ দিকে তিনি ফরাসী গভর্নমেন্টের আমন্ত্রণে ফ্রান্সে গেলেন। সর্বত্র তিনি বিপুল সম্বর্ধনা পেলেন। প্যারিসে থাকাকালীন সময়েই তিনি জানতে পারলেন এ বৎসরে মানব কল্যাণে পেনিসিলিন আবিষ্কারের এবং তার সার্থক প্রয়োগের জন্য নোবেল প্রাইজ কমিটি চিকিৎসাবিদ্যালয় ফ্লেমিং, ফ্লোরি ও ডঃ চেইনকে একই সাথে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এই পুরস্কার পাওয়ার পর ফ্লেমিং কৌতুক করে বলেছিলেন, এই পুরস্কারটি ঈশ্বরের পাওয়া উচিত কারণ তিনিই সব কিছু আকস্মিক যোগাযোগ ঘটিয়েছেন।

ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে তিনি আবার সেন্ট মেরি হাসপাতালে ব্যাকটেরিওলজির গবেষণায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। চার বছর পর তাঁর স্ত্রী সারিন মারা যান। এই মৃত্যুতে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন ফ্লেমিং।

তাঁর জীবনের এই বেদনার্ত মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়ালেন গ্রীক তরুণী আমালিয়া তরুকা। আমালিয়া ফ্লেমিংয়ের সাথে ব্যাকটেরিওলজি নিয়ে গবেষণা করতেন। ১৯৫৩ সালে দুজনে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হল না। দুই বছর পর ১৯৫৫ সালে ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ফ্লেমিং।

৩৪

ইবনে খালদুন

(১৩২২-১৪০৬ খ্রীঃ)

মানব জাতির কল্যাণে আল্লাহ রাব্বুর আ'লামীন যুগে যুগে এ ধরাতে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসূল ও মনীষীদেরকে। যে ক'জন মুসলিম মনীষী মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের অমূল্য অবদানের জন্যে আজও সমগ্র বিশ্বে অমর হয়ে আছেন, ব্যক্তি স্বার্থের জন্যে যারা কখনো অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করেননি, যারা জ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্যে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন,

ভোগ বিলাসকে উপেক্ষা করে যারা সারাটা জীবন কাটিয়েছেন মানুষের কল্যাণে, যারা জালেম শাসকদের স্বৈরশাসনকে সমর্থন না দিয়া কারাগারে কাটিয়েছেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তাঁদের মধ্যে ইবনে খালদুন অন্যতম।

১৩২২ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মে আফ্রিকার তিউনিসিয়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে খালদুনের পুরো নাম আবু জায়েদ ওয়ালী উদ্দিন ইবনে খালদুন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ইবনে খালদুন। 'খালদুন' হচ্ছে বংশের উপাধি। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ইয়েমেন থেকে এসে তিউনিসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতামহ তিউনিসের সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন। পিতা ছিলেন খুব জ্ঞান পিপাসু। বাল্যকাল থেকেই ইবনে খালদুন জ্ঞান সাধনায় মশগুল হন। তাঁর মেধা ও স্মরণশক্তি ছিল বিস্ময়কর। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসীর শিক্ষা শেষ করেন। দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান সাধনার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। যে কোন বিষয়ে কোন বই পেলেই তা তিনি পড়ে শেষ করে ফেলতেন। ফলে অল্প বয়সেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

জ্ঞান সাধনায় মত্ত এ মনীষীর জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নেমে আসে এক ভয়ানক দুর্যোগ। ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসে দেখা দেয় 'প্লেগ' নামক মহামারী। এ মহামারীতে তাঁর পিতামাতা, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন ও অনেক বন্ধুবান্ধব মারা যান। এ সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ১৭/ ১৮ বছর। পিতামাতাকে হারিয়ে তিনি শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং সংসারে নেমে আসে অভাব অনটন। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন তিউনিসের সুলতান আবু মুহাম্মদ এর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে তিনি চাকুরিতে যোগদান করেন। যেহেতু সংসারে মা বোন কেউ ছিল না, তাই ২২ বছর বয়সে ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হন। জ্ঞান পিপাসু এ মনীষী বিবাহের পর আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসে ডুবে যাননি বরং গভীর আগ্রহে জ্ঞান চর্চা শুরু করেন। আস্তে আস্তে সারা দেশে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে তিনি রাজনীতিতে জাড়িয়ে পড়েন। চলে আসেন আন্দালুসিয়ায়। সেখানে গ্রানাডার সুলতানের অনুরোধে তিনি কেস্টিল রাজ্যে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন দায়িত্ব পালন করার পর ১৩৬৬ খ্রিস্টাব্দে আবার চলে আসেন স্বদেশভূমি তিউনিসে এবং এখানে তৎকালীন সুলতান আবু আবদুল্লাহর অনুরোধে 'বগী' নামক রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক মনীষীই নিজ মাতৃভূমিতে মর্যাদা পাননি বরং নির্যাতিত, বিতাড়িত এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। ইবনে খালদুন ও তাঁদের থেকে আলাদা নন। তিউনিসিয়ার 'বগী' রাজ্যে তিনি বেশি দিন অবস্থান করতে পারেননি। সেখানে তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হন। সুলতান আবু আবদুল্লাহকে তাঁর ভাই আবুল আব্বাস হত্যা করে রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং ইবনে খালদুনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেন। তিনি কোন উপায়ে বগী রাজ্য ত্যাগ করে চলে যান তেলেমচীন রাজ্যে যা মরক্কোর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। মরক্কোর সুলতান আবদুল আজীজ ইবনে আল হাসান এ ক্ষুদ্র রাজ্যটি দখল করে নিলে তিনি সুলতানের হাতে বন্দী হন। সুলতান ইবনে খালদুনের জ্ঞান প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মুক্তি দানের আদেশ দেন। তখন প্রায় অধিকাংশ দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। আন্দলুসিয়ার সুলতান কর্তৃক মরক্কো দখল হলে ইবনে খালদুন পুনরায় গ্রেফতার হন এবং আনুমানিক ১৩৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

মুক্তি পেয়ে রাজনৈতিক আশ্রয়ে তিনি চলে আসনে আন্দলুসিয়ায় এবং জ্ঞান সাধনা ও ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এখানেও তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা পেলেন না। জালেম, নিষ্ঠুর ও ক্ষমতা লিপ্সু শাসকদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে, পোহাতে হয়েছে অনেক দুর্ভোগ। এ সময় আন্দালুসিয়ার সুলতান ছিলেন আল আহমার। তিনি ইবনে খালদুনকে খুব সম্মান দিয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় মরক্কোর নতুন আমীর ইবনে খালদুনকে গ্রেফতার করার জন্যে লোক পাঠালে ইবনে খালদুন আন্দালুসিয়া ত্যাগ করে চলে যান উত্তর আফ্রিকায়। সে সময় উত্তর আফ্রিকায় ইবনে খালদুনের খুব প্রভাব ও সুখ্যাতি ছিল।

তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব; যিনি দুঃখ কষ্টকে বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু সত্য ও ন্যায়কে প্রকাশ করতে কাউকে ভয় করতেন না। তখন তেলেমচীনের আমীর আবু হামুর এর মন্ত্রী

ছিলেন তাঁর ভাই ইয়াহিয়া। তিনি এখানে সর্ব সাধারণ বিশেষ করে গরীব ও সমাজের নির্যাতীত ও নিপীড়িত মানুষের সাথে মেলামেশা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে ইবনে খালদুনের মানব সেবা, প্রতিভা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে জনগণ তাঁর ভক্ত হতে লাগল এবং তাঁর নিকট তাদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা প্রকাশ করতে শুরু করল। আমীর আবু হামু ভাবলেন, জনগণ যেভাবে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তাতে দেশে যে কোন সময় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। তাই আমীর আবু হামু ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ইবনে খালদুনের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহের অভিযোগ উত্থাপন করেন। এতে ইবনে খালদুন তেলেমচীন ত্যাগ করে বানু আরিফ প্রদেশে চলে যান এবং শান্তিতে বসবাস শুরু করেন। এখানেই তিনি আমীর মুহাম্মদ ইবনে আরিফের দেয়া নিরাপত্তা ও সহযোগিতায় বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'আল্ মোকাদ্দিমা' রচনা করেন। এ কিতাবের মাধ্যমে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। 'আল মুকাদ্দিমায়' তিনি যে মৌলিক চিন্তা ধারায় পরিচয় দিয়েছেন তা পৃথিবীতে আজও বিরল। তিনি সুস্পষ্ট ভাষাই বলেছেন যে, ঐতিহাসিক বিবরণ ও ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করাই ঐতিহাসিকের কাজ নয় বরং জাতির উত্থান পতনের কারণগুলোকেও বিশ্লেষণ করতে হবে। তিনি 'আল্ মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে জাতিসমূহের উত্থান পতনের কারণগুলো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাতৃভূমি তিউনিসে পুনরায় ফিরে আসেন কিন্তু মাতৃভূমির জনগণ তাঁকে সম্মান দেয়নি। অবশেষে ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে চলে যান মিসরে। সেখানে তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে মিসরের সুলতান তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন। মিসরের কায়রোতে তিনি প্রায় ২৪ বছর কাটিয়েছিলেন। এখানেই তিনি 'আত তারিক' নামক আত্মচরিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি সমাজ বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদ সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। বিবর্তনবাদের নতুন তথ্য ইবনে খালদুনই সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর লেখা 'কিতাব আল ইবর' বিশ্বের প্রথম এবং সর্ববৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। ইবনে খালদুনের বিভিন্ন রচনাবলী ইউরোপে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হবার পর সমগ্র বিশ্বে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, এমন এক সময় ছিল যখন মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীতে ইউরোপের লোকের মুসলিম মনীষীদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যকে চর্চা করে ক্রমান্বয়ে আজ উন্নতির শিখরে উঠেছে। কিন্তু মুসলিম জাতি তাদের পূর্ব পুরুষদের সুবিশাল জ্ঞান ভান্ডারকে উপেক্ষা করায় আজ বিশ্বের বুকে অশিক্ষা, দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী জাতি হিসেবে পরিণত হয়েছে।

১৪০০ খ্রিস্টাব্দে দিগ্বিজয়ী বাদশা তৈমুর সিরিয়া আক্রমণ করেন এবং মিসর অভিযানের প্রস্তুতি নেন। ঠিক এ সময় ইবনে খালদুন মিসরের সুলতানের অনুরোধে একটি শান্তি চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে বাদশা তৈমুরের দরবারে উপস্থিত। দীর্ঘ আলোচনার পর বাদশা তৈমুর ইবনে খালদুনের জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর শান্তি প্রস্তাব মেনে নেন। তৈমুর তাঁর মিসর অভিযান স্থগিত ঘোষণা করেন। এভাবে ইবনে খালদুন তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভা দিয়ে একটি অনিবার্য সংঘাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করলেন। বাদশা তৈমুরের বিশেষ অনুরোধে ইবনে খালদুন দামেস্কে কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর ফিরে আসেন মিসরে। মিসরেই এ বিখ্যাত মনীষী ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। এ মনীষী মুসলিম জাতির জন্যে যে জ্ঞান রেখে গেছেন তা ইতিহাস চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

"একজন বিদ্যাহীনের বিনয়ী স্বভাব, অহঙ্কারী বিদ্যানের চাইতেও প্রশংসনীয়।"

...ইবনে খালদুন

৩৫

ওয়াল্ট হুইটম্যান

[১৮১৯-১৮৯২]

আজন্ম দারিদ্র্য পীড়িত কবি হুইটম্যানের জন্ম ১৮১৯ সালের ৩১ মে লং আইল্যাণ্ডের ওয়েস্ট হিলে। বাবা ছিলেন ছুতোর। নয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

লিভস অব গ্রাসের কবি ওয়াল্ট হুটম্যান ছিলেন আমেরিকার নব যুগের নতুন চিন্তার প্রবক্তা। উনবিংশ শতকের আমেরিকান সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ। শুধু আমেরিকার নন, আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

বাবা ওয়ালটার হুইটম্যান ছিলেন ইংরেজ। সামান্য লেখাপড়া জানতেন। অবসর পেলেই চার্চে গিয়ে ধর্ম-উপদেশ শুনতেন।

দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চলল তাঁর সাধনা। শিল্পীর হাতে যেমন একটু একটু করে জন্ম নেয় তার মানস প্রতিমা, হুইটম্যান তেমনি রচনা করে চলেন একের পর এক কবিতা।

১৮৫৫ সাল, হুইটম্যান শেষ করলেন তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন; নাম দিলেন লিভস অব গ্রাস (Leaves of grass)। হাতে সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। সেই অর্থে এক বন্ধুর ছাপাখানায় ছাপা হল Leaves of grass। এই প্রথম বইতে নিজের নাম লিখলেন ওয়াল্ট হুইটম্যান। প্রথমে ছাপা হল ১০০০ কপি। কবিতা পড়ে কোন প্রকাশকই বই প্রকাশ করবার দায়িত্ব দিল না।

হুইটম্যান তাঁর কবিতার বই আমেরিকার প্রায় সব খ্যাতনামা লোকেদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কেউ মতামত দেওয়া তো দূরের কথা, বই প্রাপ্তির সংবাদটুকু অবধি জানালেন না।

শুধু মাত্র এমার্সন মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনে হল আমেরিকার সাহিত্য জগতে এক নতুন ধ্রুবতারার আবির্ভাব হল।

কয়েক মাস পর যখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন, বইয়ের সাথে এই চিঠি ছেপে দিলেন। এমার্সনের এই প্রশংসা বহু জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু বইয়ের বিক্রি তেমন বাড়ল না। এত অপবাদ বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও Leaves of grass কালজয়ী গ্রন্থ। এতে ফুটে উঠেছে তাঁর মানব প্রেম।

তাঁর এই মনোভাবের মধ্যে ফুটে উঠেছে আমেরিকান গণতন্ত্রের প্রতিচ্ছায়া। যদিও এই গণতন্ত্র কোন রাজনৈতিক বা সামাজিকতা গণতন্ত্র নয়। এক ধর্মীয় বিশ্বাস-মানুষ এক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে যার পরিণতিতে এক পূর্ণতা-এই পূর্ণতা কি কবি নিজেও তা জানেন না-তিনি বিশ্বাস করতেন এই পূর্ণতা ব্যর্থ হবার নয়।

"It cannot fail the young man who died and was buried,

Nor the young woman who died and was put by his side,

Nor the little child that pecped in at the door and then drew back and was never seen again. Nor the old man who has lived without purpose and feels it with bitterness worse than gall."

১৮৫৭ সালে তিনি "ব্রুকলিন ডেইলি টাইমস" পত্রিকার সম্পাদক হলেন।

কয়েক বছর পত্রিকার চাকরি করলেন, ইতিমধ্যে আমেরিকার ভাগ্যাকাশে নেমে এল এক বিপর্যয়। দাসপ্রথা বিরোধের প্রশ্নে উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে প্রথমে দেখা দিল বিরোধ তারপর শুরু হল গৃহযুদ্ধ।

প্রাচ্যের এক মনীষী একবার বলেছিলেন, ঈশ্বর শহরের মানুষের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যান। কিন্তু মানুষ এত অন্ধ যে তাঁকে দেখতে পায় না।

যথার্থই হুইটম্যানের মহত্ত্বতাকে উপলব্ধি করবার মত তখন কেউ ছিল না। শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিরা তাঁকে উপেক্ষা করেছিল, কারণ তিনি তাদের ভণ্ডামি নোংরামিকে তীব্র ভাষায় কষাঘাত করেছিলেন আর সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ক্ষমতা ছিল না তাঁর কবিতার মর্মকে উপলব্ধি করবার।

১৮৬৫ সালে যখন লিঙ্কনকে হত্যা করা হল, বেদনায় ভেঙে পড়েছিলেন কবি। লিঙ্কন তাঁর কাছে ছিলেন স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক। এই মর্মান্তিক বেদনায় তিনি চারটি মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেন। এমন শোকাবহ কবিতা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। এর মধ্যে একটি কবিতা "O Captain my Captain." যাত্রার শেষ লগ্ন সমাহৃত, তীরভূমি অদূরে, কিন্তু কাণ্ডারীর দেহ প্রাণহীন। হোয়েন লাইল্যাকস লাস্ট কবিতাটির ফুটে উঠেছে মৃত্যুর বর্ণনা।

All over bouquets of roses

O death! I cover you over with roses and early lilies;

১৮৭৩ সালে কবি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই সময়ে তিনি থাকতেন ওয়াশিংটনে তাঁর ছোট ভাই জর্জের বাড়িতে।

১৮৯২ সালে বাহাত্তর বছর বয়সে মানুষের প্রিয় কবি হারিয়ে গেলেন তাঁর প্রিয় সূর্যের দেশে।

আলেকজান্ডার দি গ্রেট

[৩৫৬ খ্রিস্ট পূর্ব-৩২৩ খ্রিস্ট পূর্ব]

খ্রিস্ট পূর্ব চারশো বছর আগেকার কথা। গ্রীসদেশ তখন অসংখ্য ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এমন একটি রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন ফিলিপ। ফিলিপ ছিলেন বীর, সাহসী, রণকুশলী। সিংহাসন অধিকার করবার অল্প দিনের মধ্যেই গড়ে তুললেন সুদক্ষ এক সৈন্যবাহিনী। ফিলিপের পুত্রই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে বীর আলেকজান্ডার। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৬ সালে আলেকজান্ডারের জন্ম। আলেকজান্ডারের মা ছিলেন কিছুটা অস্বাভাবিক প্রকৃতির। সম্রাট ফিলিপকে কোন দিনই প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারেননি।

ছেলেবেলা থেকেই আলেকজান্ডারের দেহ ছিল সুগঠিত। বাদামী চুল, হালকা রং। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল-আলেকজান্ডারের শরীর থেকে সব সময় একটা অপূর্ব সুগন্ধ বার হত। সমকালীন অনেকেই এই সুগন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন।

যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকলেও পুত্রের শিক্ষার দিকে ফিলিপের ছিল তীক্ষ্ণ নজর। আলেকজান্ডারের প্রথম শিক্ষক ছিলেন লিওনিদোস নামে অলিম্পিয়াসের এক আত্মীয়। আলেকজান্ডার ছিলেন যেমন অশান্ত তেমনি জেদী আর একরোখা। শিশু আলেকজান্ডারকে পড়াশুনায় মনোযোগী করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হত লিওনিদোসকে। কিন্তু তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন আলেকজান্ডার। লিওনিদোসের কাছে শিখতেন অঙ্ক, ইতিহাসের বিভিন্ন কাহিনী, অশ্বরোহণ, তীরন্দাজী।

কিশোর বয়েস থেকেই তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল বীরোচিত সাহস। এই সাহসের সাথে সংমিশ্রণ ঘটেছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির। একদিন একজন ব্যবসায়ী একটি ঘোড়া বিক্রি করেছিল ফিলিপের কাছে। এমন সুন্দর ঘোড়া সচরাচর দেখা যায় না। ফিলিপের লোকজন ঘোড়াটিকে মাঠে নিয়ে যেতেই হিংস্র হয়ে উঠল। যতবারই লোকেরা তার পিঠের উপরে উঠতে চেষ্টা করে, ততবারই তাদের আঘাত করে দূরে ছিটকে ফেলে দেয়। শেষ আর কেউই ঘোড়ার পিঠে উঠতে সাহস পেল না। কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন ফিলিপ আর আলেকজান্ডার। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন নিজের ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছে ঘোড়াটি। তাই ঘোড়ার পাশে গিয়ে আস্তে আস্তে তার মুখটা সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তারপর ঘোড়াটিকে আদর করতে করতে একলাফে পিঠের উপর উঠে পড়লেন। উপস্থিত সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। যদি ঐ ঘোড়া আলেকজান্ডারকে আহত করে! কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এলেন আলেকজান্ডার। ঘোড়া থেকে নেমে ফিলিপের সামনে আসতেই পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ফিলিপ। বললেন, তোমাকে এইভাবে নতুন রাজ্য জয় করতে হবে। তোমার তুলনায় ম্যাসিডন খুবই ছোট।

ফিলিপ অনুভব করতে পারলেন তাঁর ছেলে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। এখন শুধু প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার এবং সে ভার আলেকজান্ডারের জন্মের সময়েই সমর্পণ করেছেন মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের উপর। অ্যারিস্টটল ফিলিপের আমন্ত্রেণে ম্যাসিডনে এলেন।

দীর্ঘ তিন বছর ধরে অ্যারিস্টটলের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন আলেকজান্ডার। পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিকের অভিমত, নিজেকে বিশ্ববিজয়ী হিসাবে গড়ে তোলার শিক্ষা আলেকজান্ডার পেয়েছিলেন অ্যারিস্টটলের কাছে।

আমৃত্যু গুরুকে গভীর সম্মান করতেন আলেকডান্ডার। তাঁর গবেষণার সমস্ত দায়িত্বভার নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। নিজের গুরুর প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে আলেকজান্ডার বললেন, এই জীবন পেয়েছি পিতার কাছে। কিন্তু সেই জীবনকে কি করে আরো সুন্দর করে তোলা যায়, সেই শিক্ষা পেয়েছি গুরুর কাছে।

আলেকজান্ডারের বয়স যখন ষোল, ফিলিপ বাইজানটাইন অভিযানে বার হলেন। পুত্রের উপর রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পণ করলেন। ফিলিপের অনুপস্থিতিতে কিছু অধিনস্থ অঞ্চলের নেতারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিশোর আলেকজান্ডার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। বীরদর্পে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধু বিদ্রোহীদের পরাজিত করলেন না, তাদের বন্দী করে নিয়ে এলেন ম্যাসিডনে।

এই যুদ্ধজয়ে অনুপ্রাণিত আলেকজান্ডার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন। প্রথম যে দেশ জয় করলেন, নিজের নামে সেই দেশের নাম রাখলেন আলেকজান্ডা পোলিস।

পিতা-পুত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। এর পেছনে মায়ের প্ররোচনাও ছিল যথেষ্ট। আলেকজান্ডারের যখন কুড়ি বছর বয়স, ফিলিপ আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। এর পেছনে রানী অলিম্পিয়াসেরও হাত ছিল। ফিলিপ নিহত হতেই সিংহাসন অধিকার করলেন আলেকজান্ডার। প্রথমেই হত্যা করা হল নতুন রানীর কন্যাকে, নতুন রানীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করলেন রানী অলিম্পিয়াস। যাতে ভবিষ্যতে কেউ তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। আলেকজান্ডার পারস্যের রাজধানী পার্সেপোলিশ দখল করলেন। সেই সময় পার্সেপোলিশ ছিল পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ নগর। যুগ যুগ ধরে পারস্য সম্রাটেরা বিভিন্ন দেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে এখানে সঞ্চিত করে রেখেছিল। সব সম্পদ অধিকার করলেন আলেকজান্ডার। রাজপ্রাসাদের সকলকে বন্দী করা হল। দারিয়ুসের মা, স্ত্রী, দুই কন্যাকে বন্দী করে আনা হল আলেকজান্ডারের সামনে। তাঁরা সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আলেকজান্ডার তাদের সসম্মানে মুক্তি দিয়ে প্রাসাদে ফিরিয়ে দিলেন।

পারস্য অভিযানের পর তিনি সিরিয়া অভিযান শুরু করলেন। সমুদ্র-বেষ্টিত শহর দখল করবার সময় অসাধারণ সামরিক কৌশলের পরিচয় দেন। সৈন্য পারাপার করবার জন্য সমুদ্রের উপর তিনি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করলেন। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী। এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী মরণপণ সংগ্রামের পর জয়ী হলেন আলেকজান্ডার। সিরিয়া দখল করবার পর দখল করলেন প্যালেস্টাইন, তারপর মিশর। মিশরে নিজের নামে স্থাপন করলেন নতুন নগর আলেকজান্দ্রিয়া।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৮ সালের মধ্যে সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য তাঁর অধিকারে এল।

৩২৭ খ্রিস্টপূর্বে আলেকজান্ডার সৈন্যবাহিনী নিয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। সেই সময় ভারতবর্ষে ছিল অসংখ্য ছোট বড় রাষ্ট্র। কারোর সাথেই কারোর সদ্ভাব ছিল না। প্রত্যেকেই পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হত।

তক্ষশীলার রাজা অম্ভি প্রতিবেশী রাজা পুরু শক্তি খর্ব করবার জন্য আলেকজান্ডারের বন্ধুত্ব চেয়ে তাঁর কাছে দূত পাঠালেন।

দীর্ঘ এক মাস চলবার পর নিহত হলেন রাজা অষ্টক। গ্রীক সৈন্যরা পুষ্কলাবতী নগর দখল করে নিল। প্রতিবেশী সমস্ত রাজাই আলেকজান্ডারে বশ্যতা স্বীকার করে নিল। শুধু একজন আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন, তিনি রাজা পুরু।

আলেকজান্ডার সরাসরি শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি হতে চাইলেন না। তিনি গোপনে অন্য পথ দিয়ে নদী পা হয়ে পুরুকে আক্রমণ করলেন। পুরু ও তাঁর সৈন্যবাহিনী অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করলেও আলেকজান্ডারের রণনিপুণ বাহিনীর কাছে পরাজয় বরণ করতে হল। আহত পুরু বন্দী হলেন। তাঁকে নিয়ে আসা হল আলেকজান্ডারের কাছে। তিনি শৃঙ্খলিত পুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার কাছে কি রকম ব্যবহার আশা করেন? পুরু জবাব দিলেন, একজন রাজা অন্য রাজার সঙ্গে যে ব্যবহার আশা করেন, আমিও সেই ব্যবহার আশা করি। পুরুর বীরত্ব, তাঁর নির্ভীক উত্তর শুনে এতখানি মুগ্ধ হলেন আলেকজান্ডার, তাঁকে মুক্তিদিয়ে শুধু তাঁর রাজ্যই ফিরিয়ে দিলেন না, বন্ধুত্ব স্থাপন করে আরো কিছু অঞ্চল উপহার দিলেন। আলেকজান্ডারের ইচ্ছা ছিল আরো পূর্বে মগধ আক্রমণ করবেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যবাহিনী আর অগ্রসর হতে চাইল না। দীর্ঘ কয়েক বছর তারা মাতৃভূমি ত্যাগ করে এসেছিল। আত্মীয় বন্ধু পরিজনের বিরহ তাদের মনকে উদাসী করে তুলেছিল। এছাড়া দীর্ঘ পথশ্রমে যুদ্ধের পর যুদ্ধে সকলেই ক্লান্ত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বদেশের পথে প্রত্যাবর্তন করলেন আলেকজান্ডার। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আলেকজান্ডার এসে পৌঁছলেন ব্যাবিলনে। ব্যাবিলনে এসে কয়েক মাস বিশ্রাম নিয়ে স্থির করলেন আরবের কিছু অঞ্চল জয় করে উত্তর আফ্রিকা জয় করবেন। কিন্তু ২রা জুন খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন আলেকডান্ডার। এগারো দিন পর মারা গেলেন আলেকজান্ডার। তখন দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা নেমেছিল।

আলেকজান্ডার মাত্র ৩৩ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং সেই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হতে। তাঁর মনের অতিমানবীয় এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার জন্য তিনি তাঁর স্বল্পকালীন জীবনের অর্ধেককেই প্রায় অতিবাহিত করেছেন যুদ্ধেক্ষেত্রে। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য ঐতিহাসিকরা তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতির আসনে বসিয়েছেন। তাঁকে 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট' এই নামে অভিহিত করা হয়েছে।

নিরপেক্ষ বিচারে কি আলেকজান্ডারকে শ্রেষ্ঠ মহৎ নৃপতি হিসাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? এই প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত জীবনীকার লিখেছেন, অনেকে তাঁকে মানব জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ গুণ-মহত্ত্বতা, বীরত্বের এক প্রতিভূ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নগর স্থাপন করেছেন, অসভ্য জাতিকে সভ্য করেছেন, পথঘাট নির্মাণ করেছেন, দেশে দেশে সুম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আলেকজান্ডার সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন না। নিজের খ্যাতি গৌরব প্রভুত্ব ছাড়া কোন বিষয়েই তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। এক পৈশাচিক উন্মাদনায় তিনি শুধু চেয়েছিলেন পৃথিবীকে পদানত করতে। তিনি যা কিছু করেছিলেন, সব কিছুই শুধুমাত্র নিজের গৌরবের জন্য, মানব কল্যাণের জন্য নয়। তিনি যে ক'টি নগর স্থাপন করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি নগর গ্রাম জনপদকে ধ্বংস করেছিলেন। হাজার হাজার মানুষকে শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছা চরিতার্থতার জন্য হত্যা করেছিলেন।

সুপ্রাচীন মহান গ্রীক সভ্যতার একটি মাত্র বাণীকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দেশে দেশে। সে বাণী ধ্বংসের আর মৃত্যুর। শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচারের ব্যাপারে তাঁর সামান্যতম আগ্রহ ছিল না। তাঁর তৈরি করা পথে পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল বলে অনেকে তাঁর দূরদর্শিতার প্রশংসা করেন। কিন্তু এই পথ তিনি তৈরি করেছিলেন সভ্যতাকে ধ্বংসের কাজ তরান্বিত করতে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নাম চিরদিন ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে সভ্যতার অগ্রদূত হিসাবে নয়-ধ্বংস, ঝঞ্ঝা, হত্যা, মৃত্যুর পথপ্রদর্শক হিসাবে।

৩৭

লেনিন

[১৮৭০-১৯২৪]

পুরো নাম ভ্লদিমির ইলিচ উলিয়ানফ। যদিও তিনি বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে পরিচিত ভিন্ন নামে। রুশ বিপ্লবের প্রাণ পুরুষ ভি, গাই লেনিন। জারের পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্য তিনি ছদ্মনাম নেন লেনিন। লেনিনের জন্ম রাশিয়ার এক শিক্ষিত পরিবারে ১৮৭০ সালের ২২শে এপ্রিল (রাশিয়ার পুরনো ক্যালেন্ডার অনুসারে ১০ই এপ্রিল)। লেনিনের পিতা-মাতা থাকতেন ভল্গা নদীর তীরে সিমবিস্ক শহরে। ছয় ভাইবোনের মধ্যে লেনিন ছিলেন তৃতীয়। লেনিনের বাবা ইলিয়া অস্ত্রাকান ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান।

ছটি সন্তানের উপরেই ছিল বাবা-মায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব। তবে লেনিনের জীবনে যার প্রভাব পড়েছিল বাবা-মায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব। তবে লেনিনের জীবনে যার প্রভাব পড়েছিল সবচেয়ে বেশি তিনি লেনিনের বড় ভাই আলেকজান্ডার। আলেকজান্ডার ছিলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি "নারোদনায়া ভোলিয়ার" নামে এক বিপ্লবী সংগঠনের সভ্য হিসাবে গোপনে রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

"নারোদনায়া ভোলিয়া" বিপ্লবী দলের সদস্যরা স্থির করলেন যার তৃতীয় আলেকজান্ডারকেও হত্যা করা হবে। লেনিনের ভাই আলেকডান্ডারও এই পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হলেন। এই সময় (১৮৮৬ সাল) লেনিনের বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। যখন পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন জারের গুপ্তচর বিভাগের লোকজন সব কিছু জানতে পেরে গেল। অন্য সকলের সাথে আলেকজান্ডারও ধরা পড়লেন। বিচারে অন্য চারজনের সাথে তার ফাঁসি হল।

বড় ভাইয়ের মৃত্যু লেনিনের জীবনে একটি বড় আঘাত হয়ে এসেছিল। এই সময়ে লেনিনের বয়স মাত্র সতেরো। তিনি স্থির করলেন তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হবেন।

ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনায় ছিল তার গভীর আগ্রহ আর মেধা। প্রতিটি পরীক্ষায় ভাল ফল করে ভর্তি হলেন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। সেই সময় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি বিপ্লবী কেন্দ্র।

১৮৮৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ছাত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্রদের এক বিরাট সভা হল। সেই সভার নেতৃত্বের ভার ছিল লেনিনের উপর। এই কাজের জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হল। শুধু তাই নয়, পাছে তিনি নতুন কোন আন্দোলন শুরু করেন সেই জন্য ৭ই ডিসেম্বর তাকে কাজানের গভর্নরের নির্দেশে কোফুশনিকো নামে এক গ্রামে নির্বাসন দেওয়া হল।

এক বছরের নির্বাসন শেষ হল। লেনিন ফিরে এলেন কাজান শহরে। তার ইচ্ছা ছিল আবার পড়াশুনা শুরু করবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির অনুমতি দেওয়া হল না।

কাজানে ছিল একটি বিপ্লবী পাঠক্রম। তার সকল সদস্যরাই মার্কসবাদের চর্চা করত, পড়াশুনা করত, লেনিন এই পাঠচক্রের সদস্য হলেন। এখানেই তিনি প্রথম মার্কসীয় দর্শনের সাথে গভীরভাবে পরিচিত হলেন।

এদিকে তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছিল। বাধ্য হয়ে উলিয়ানফ পরিবারের সদস্যরা এলেন সামারার মফঃস্বল অঞ্চলে। সামারায় এসে লেনিন স্থির করলেন তিনি আইনের পরীক্ষা দেবেন। পড়াশুনা বছরের পাঠক্রম মাত্র দেড় বছরে শেষ করে তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গে পরীক্ষা দিতে গেলেন। এ পরীক্ষার ফল বার হওয়ার পর দেখা গের লেনিন প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

১৮৯২ সাল নাগাদ তিনি সামারা কোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগ দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন সামারা বা কাজান তার কাজের উপযুক্ত জায়গা নয়। আইনের ব্যবসাতেও মনোযোগী হতে পারছিলেন না। সামারা ছেড়ে এলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে।

লেনিন লিখলেন তার প্রথম প্রবন্ধ "জনসাধারণের বন্ধুরা কিরকম এবং কিভাবে তারা সোসাল ডেমক্রেটদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।" এই প্রবন্ধ তিনি প্রথম বললেন, কৃষক শ্রমিক মৈত্রীর কথা। একমাত্র এই মৈত্রী পারে স্বৈরতন্ত্র, জমিদার ও বুর্জোয়াদের ক্ষমতার উচ্ছেদ, শ্রমিকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজ গঠন করতে।

এই সব লেখালেখি প্রচারের সাথে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করবার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। ১৮৯৬ সালে তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদী চক্রগুলিকে নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য "সংগ্রামের সঙ্ঘ" নামে একটিমাত্র রাজনৈতিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল, এই সঙ্ঘ তারই ভ্রূণাবস্থা।

এই কাজের মধ্যেই লেনিনের সাথে পরিচয় হল নাদেজ্দা ক্রুপস্কাইয়ার সাথে। নাদেজ্দা ছিলেন একটি নৈশ বিদ্যালয় শিক্ষিকা। এখানে প্রচার করতে আসতেন লেনিন। সেই সূত্রে দুজনের মধ্যে আলাপ হল। দুজনে দুজনের মতাদর্শ, আদর্শের সাথে পরিচিত হলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল মধুর সম্পর্ক। নাদেজ্দাও লেনিনের সাথে সংঘ পরিচালনার কাজে যুক্ত হলেন। তার কাজকর্ম ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সময় থোর্নটোন কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। এই ধর্মঘটের নেতৃত্বের ভার ছিল "সংগ্রাম সঙ্ঘের" উপর। এই ধর্মঘটের সাফল্যের প্রতিক্রিয়া অন্য অঞ্চলের শ্রমিকদের উপর গিয়ে পড়ল।

জারের পুলিশবাহিনী তৎপর হয়ে উঠল। লেনিনের সাথে সংগঠনের প্রায় সমস্ত নেতাকে গ্রেফতার করা হল। নিষিদ্ধ করা হল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্ঘ।

লেনিনকে সেন্ট পিটার্সবুর্গের জেলখানার এক নির্জন কক্ষে বন্দী করে রেখে দেওয়া হল। জেলে বসে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

চোদ্দ মাস বন্দী থাকবার পর তিন বছরের জন্য লেনিনকে নির্বাসন দেওয়া হল সাইবেরিয়ায়।

এক বছর পর নির্বাসিত হয়ে এলেন লেনিনের প্রিয়তমা ক্রুপস্কাইয়া। প্রথমে তাকে অন্য জায়গায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু লেনিনের বাগদত্তা বলে তাকে শুশেনস্কোয়েতে থাকবার অনুমতি দেওয়া হল। দু মাস পর তাদের বিয়ে হল। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন তার প্রকৃত বন্ধু, সঙ্গী এবং বিশ্বস্ত সহকারী।

আন্তরিক প্রচেষ্টায় বেশ কিছু বই আনিয়ে নিলেন লেনিন। তার মধ্যে ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলী। এখানেই তিনি তাদের রচনা জার্মান থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ শুরু করলেন। এছাড়া একের পর এক গ্রন্থ রচনা করতে আরম্ভ করলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল "রাশিয়ায় সোসাল ডেমোক্রোটদের কর্তব্য"। এছাড়া "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ"-এই দুটি বইয়ের মধ্যে লেনিনের চিন্তা-মনীষা, ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনার স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় বইটি রচনার সময় তিনি প্রথম ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন লেনিন।

চিন্তা-ভাবনা পরিশ্রমের ফলে নির্বাসন শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু ক্রুপস্কাইয়ার সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে উঠলেন। অবশেষে নির্বাসন দণ্ডের মেয়াদ শেষ হলে ১৯০০ সালের ২৯ জানুয়ারি রওনা হলেন।

লেনিন ফিরে এলেন। তাকে সেন্ট পিটার্সবুর্গে থাকবার অনুমতি দেওয়া হল না। এমনকি কোন শিল্পনগরীতে বসবাস নিষিদ্ধ করা হল। বাধ্য হয়ে সেন্ট পিটার্সবুর্গের কাছেই পসকফ বলে এক শহরে বাসা করলেন। এতে রাজধানীর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে।

ঘুরে ঘুরে অল্পদিনের মধ্যেই নিজের কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করে ফেললেন। তার এই গোপন কাজকর্মের কথা জারের পুলিশবাহিনী কাছে গোপন ছিল না। একটি রিপোর্ট তার বিরুদ্ধে লেখা হল, "বিপ্লবীদের দলে উলিয়ানফের উপরে কেউ নেই। মহামান্য জারকে রক্ষা করতে গেলে তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে।" লেনিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হল।

সম্পূর্ণ ছদ্মবেশে কখনো পায়ে হেটে কখনো ঘোড়ার গাড়িতে চেপে সীমান্ত পার হয়ে এলেন জার্মানি।

জার্মানিতে এসে প্রথমেই স্থির করলেন একটি পত্রিকা প্রকাশ করবেন। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে জার্মানির লিপজিগ শহর থেকে প্রকাশিত হল নতুন পত্রিকা ইসক্রা। যার অর্থ স্ফুলিঙ্গ। সেইদিন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি এই স্ফুলিঙ্গই একদিন দাবানলে মত জ্বলে উঠবে।

সম্পূর্ণ গোপনে এই পত্রিকা পাঠিয়ে দেওয়া হল রাশিয়ায়। সেখান থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হল দিকে দিকে। অল্পদিনের মধ্যেই ইসক্রা হয়ে উঠল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র। আর জার্মানিতে থাকা সম্ভব হল না। গোয়েন্দা পুলিশের লোকজন এই সব বিপ্লবী কাজকর্ম বন্ধ করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। বিপদ আসন্ন বুঝতে পেরে লেনিন ও তার সঙ্গীরা জার্মানি ছেড়ে পালিয়ে এলেন ইংল্যান্ডে।

কিছুদিন পর সংবাদ পেলেন তার মা আর বোন ফ্রান্সের একটি ছোট শহরে এসে রয়েছেন। মায়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্যারিসে গেলেন।

প্যারিস ত্যাগ করে আবার লন্ডনে ফিরে এলেন। কিন্তু এখান থেকে পত্রিকা প্রকাশ করার কাজ অসুবিধাজনক বিবেচনা করেই সুইজারল্যান্ডের জেনিভায় চলে এলেন। তার সঙ্গে ছিলেন ক্রুপস্কাইয়া। একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করলেন দুজনে। অল্পদিনের মধ্যে এই বাড়িটি হয়ে উঠল বিপ্লবীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। ১৯০৩ সালে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস শহরে পার্টির অধিবেশন বসল। পুলিশের ভয়ে একটি ময়দান গুদামে সকলে জমায়েত হল।—এখানেই জন্ম নিল বলশেভিক পার্টি। পার্টি কংগ্রেসগুলির প্রস্তুতি ও অধিবেশনে তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। ১৯০৫ সালের তৃতীয়, ১৯০৬ সালের চতুর্থ, ১৯০৭ সালের পঞ্চম কংগ্রেসে তিনিই প্রধান রিপোর্টগুলি পেশ করেন। কংগ্রেসে বলশেভিক (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আর মেনশেভিকদের মধ্যে যে লড়াই চলে তার কথা তিনি শ্রমিক সাধারণের সামনে তুলে ধরেন।

একটু একটু করে যখন গড়ে উঠছে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দল, ঠিক সেই সময় ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বুকে ঘটল এক রক্তাক্ত অধ্যায়। সেন্ট পিটার্সবুর্গে ছিল জারের শীতের প্রাসাদ। বন্ধ কারখানার হাজার হাজার শ্রমিক তাদের ছেলে মেয়ে বৌ নিয়ে সেখান এসে ধর্না দিল। জারের প্রহরীরা নির্মমভাবে তাদের উপর গুলি চালাল। দিনটা ছিল ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি। এক হাজারেরও বেশি মানুষ মারা পড়ল। রক্তের নদী বয়ে গেল সমস্ত প্রান্তর জুড়ে। এই পৈশাচিক ঘটনায় বিক্ষোভ আর ক্রোধে ফেটে পড়ল সমস্ত দেশ। গণ আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল দেশের প্রান্তে প্রান্তে।

বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা সরাসরি পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। দেশ জুড়ে ধর্মঘট শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে আর দেশের বাইরে থাকা সম্ভব নয়, বিবেচনা করেই দীর্ঘ দিন পর রাশিয়ায় ফিরে এলেন লেনিন।

৫ই ডিসেম্বর মস্কো শহরে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হল। দুদিন পর এই ধর্মঘট প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের রূপ নিল। রাস্তায় রাস্তায় গড়ে উঠল ব্যারিকেড। রেললাইন তুলে ফেলা হল। শ্রমিকরা যে যা অস্ত্র পেল তাই নিয়ে লড়াই শুরু করল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না, জারের সৈনিকরা নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করল। শত শত মানুষকে হত্যা করা হল। হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে নির্বাসন দেওয়া হল। চরম অত্যাচারের মধ্যে জার চাইলেন বিপ্লবের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠা আগুনকে কি নেবানো যায়।

১৯০৭ সাল নাগাদ ফিনল্যান্ডের এক গ্রামের গিয়ে আশ্রয় নিলেন লেনিন। এখানে থাকতেন চাষীর ছদ্মবেশে। নেতারা নিয়মিত তার সাথে যোগাযোগ করতেন। এই সংবাদ জারের গুপ্তচরদের কানে গিয়ে পৌছাল, জারের তরফ থেকে ফিনল্যান্ডের সরকারের কাছে অনুরোধ করা হল লেনিনকে বন্দী করে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য। গোপনে এই সংবাদ পেয়ে দেশ ছাড়লেন লেনিন।

ফিনল্যান্ড পার হয়ে এলেন স্টকহোমে। সেখানে তারই প্রতীক্ষায় ছিলেন ক্রুপস্কাইয়া। দুজনে এলেন জেনিভায়। দেশের বাইরে গেলেও দেশের সঙ্গে যোগাযোগ এক মুহূর্তের জন্য বিচ্ছিন্ন হল না।

একদিকে যেমন দেশের সমস্ত সংবাদ তিনি সংগ্রহ করতেন, অন্যদিকে তার বিশ্বাসী অনুগামীদের মাধ্যমে বলশেভিক পার্টিকর্মীদের কাছে নির্দেশ উপদেশ দিতেন।

বলশেভিক পার্টির মুখপাত্র প্রলেতারি প্রত্রিকা হত জেনিভা থেকে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই পত্রিকার অফিস সরিয়ে নিয়ে আসা হল প্যারিসে। এখানে আরো অনেক পলাতক রুশ বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছিল। সেই সময় প্যারিস ছিল বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। রাশিয়া থেকে বিপ্লবী সংগঠনের নেতারা এসে তার সাথে দেখা করত।

এদিকে রাশিয়ায় আন্দোলন ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। বলশেভিক পার্টির তরফে যে সমস্ত পত্রিকা বার হত তার চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলছিল। পার্টির সদস্যদের কাছ থেকে আবেদন আসতে থাকে, সাপ্তাহিক পত্রিকা নয়, চাই দৈনিক পত্রিকা।

লেনিন নিজেও একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করবার কথা ভাবছিলেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হল শ্রমিক শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকা প্রাভদা। এর অর্থ সত্য। লেনিন ও স্তালিন যুগ্মভাবে এর সম্পাদক হলেন। এই পত্রিকা রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই পত্রিকায় লেনিন অসংখ্য রচনা প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনামে।

এরই মধ্যে দেখা দিল বিশ্বযুদ্ধ। হিংস্র উন্মাদনায় মেতে উঠল বিভিন্ন দেশ। লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন এই যুদ্ধের সুদূর প্রসারী ফলাফল। জারের লোহার শেকল আলগা হতে আরম্ভ করেছে। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।

১৯১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল দীর্ঘ দশ বছর পর দেশে ফিরলেন। তিনি এসে উঠলেন তার বোন আনার বাড়িতে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে লেনিনের ডান হাত-পা অসাড় হয়ে আসে। চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হতেই আবার কাজ শুরু করলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবশেষে ২১শে জানুয়ারি ১৯২৪ সালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সর্বহারার নেতা লেনিন।

তাই পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যেখানেই শোষিত বঞ্চিত মানুষের সংগ্রাম, সেখানেই উচ্চারিত হয় একটি নাম-মহামতি লেনিন।

৩৮

জাবির ইবনে হাইয়ান

(৭২২-৮০৩ খ্রিঃ)

জাবির ইবনে হাইয়ন এর পূর্ণ নাম হল আবু আবদুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান। তিনি আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান নামেও পরিচিত। কেউ কেউ তাঁকে 'আল হাররানী' এবং 'আস্ সুফী' নামেও অভিহিত করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁর নামকে বিকৃত করে জিবার (Geber) লিপিবদ্ধ করেছে। তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না। যতদূর জানা যায়, তিনি ৭২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতার নাম হচ্ছে হাইয়ান। আরবের দক্ষিণ অংশে জাবিরের পূর্ব পুরুষগণ বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন আজাদ বংশীয়। স্থানীয় রাজনীতিতে আজাদ বংশীয়রা বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে জাবিরের পিতা হাইয়ান পূর্ব বাসস্থান ত্যাগ করে কুফায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন চিকিৎসক ও ঔষধ বিক্রেতা। জানা যায়, উমাইয়া বংশের খলিফাগণের নিষ্ঠুর ও অমানবিক কার্যকলাপের দরুন হাইয়ান উমাইয়া বংশের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করতেন। সেহেতু তিনি পারস্যের কয়েকটি প্রভাবশালী বংশের সঙ্গে পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করাবার জন্যে আব্বাসীয়দের দূত হিসেবে কুফা ত্যাগ করে তুস নগরে গমন করেন। এ তুস নগরেই জাবিরের জন্ম হয়। হাইয়ানের ষড়যন্ত্রের কথা অতি শীঘ্রই তৎকালীন খলিফার দৃষ্টিগোচর হয়।

খলিফা তাঁকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং হাইয়ানের পরিবার পরিজনদের পুনরায় দক্ষিণ আরবে প্রেরণ করেন। দক্ষিণ আরবেই জাবির ইবনে হাইয়ান শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা লাভের প্রতি ছিল পরম আগ্রহ। যে কোন বিষয়ের বই পেলেই তিনি তা পড়ে শেষ করে ফেলতেন এবং এর উপর গবেষণা চালাতেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এখানে গণিতের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ পারদর্শী বলে খ্যাত হয় ওঠেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর জাবির ইবনে হাইয়ান পিতার কর্মস্থান কুফা নগরীতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি প্রথমে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং এ সূত্রেই তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম জাফর সাদিকের অনুপ্রেরণায় তিনি

রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেন। কারো কারো মতে জাবির ইবনে হাইয়ান খলিফা খালিদ বিন ইয়াজিদের নিকট রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এ কথার কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ জাবির ইবনে হাইয়ানের কার্যাবলীর সময় কাল ছিল খলিফা হারুণ অর রশীদের রাজত্বকালে। অথচ খলিফা খালিদ বিন ইয়াজিদ হারুণ অর রশীদের বহু পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। যতদূর জানা যায়, জাবির ছিলেন ইমাম জাফর সাদিকেরই শিষ্য। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ছিল আব্বাসীয় খলিফা হারুণ অর রশীদের রাজত্বকাল। কিন্তু খলিফা হারুণ অর রশীদের সাথে তাঁর তেমন কোন পরিচয় ও সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু খলিফার বারমাক বংশীয় কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইমাম জাফর সাদিকই জাবিরকে বারমাক বংশীয় কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

একবার ইয়াহিয়া বিন খালিদ নামক জনৈক বারমাক মন্ত্রীর এক প্রিয় সুন্দরী দাসী মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তৎকালীন দেশের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ তার চিকিৎসা করে ব্যর্থ হন। এ সময় মন্ত্রী প্রাসাদে চিকিৎসার জন্যে ডাক পড়ে জাবির ইবনে হাইয়ানের। জাবির মাত্র কয়েক দিনের চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলেন। এতে ইয়াহিয়া বিন খালিদ খুব সন্তুষ্ট হন এবং জাবিরের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বারমাক বংশীয় কয়েকজন মন্ত্রীর মধ্যস্থতায় তিনি রাষ্ট্রীয় কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। এর ফলে তিনি রসায়ন বিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করার সুযোগ পান। মন্ত্রী ইয়াহিয়া এবং তাঁর পুত্র জাবিরের নিকট রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য ও বিভিন্ন পদার্থ আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেন। খুব অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হন। জাবির ইবনে হাইয়ান প্রতিটি বিষয়ই যুক্তির সাহায্যে বুঝবার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে তিনি কোন কাজে অগ্রসর হননি। তিনি সর্বদা হাতে কলমে কাজ করতেন। প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্যবেক্ষণ করে তার ফলাফল লিখে রাখতেন। তিনি তাঁর 'কিতাবুত তাজে' পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, "রাসায়নিকের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজ হলো হাতে কলমে পরীক্ষা চালানো। যে হাতে কলমে কিংবা পরীক্ষামূলক কাজ করে না, তার পক্ষে সামান্যতম পারদর্শিতা লাভ করাও সম্ভবপর নয়।"

জাবির তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই বাগদাদে কাটিয়েছেন। কিতাবুল খাওয়াসের ঘটনাবলী থেকে বুঝা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে বাগদাদেই তিনি রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা চালিয়ে ছিলেন। বাগদাদেই তাঁর রসায়নাগার স্থাপিত ছিল। উল্লেখ্য যে, জাবিরের মৃত্যুর ১০০ বছর পরে কুফায় অবস্থিত দামাস্কাস গেটের নিকট রাস্তা নতুন করে তৈরি করতে কতকগুলো ঘর ভেঙ্গে ফেলার সময় একটি ঘরে ২০০ পাউন্ডের একটি সোনার থাল ও একটি খল পাওয়া যায়। ফিহরিস্তের মতে এটি ছিল জাবিরের বাসস্থান ও ল্যাবরেটরী। ঐতিহাসিক হিট্টিও ও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

জাবির ইবনে হাইয়ানের অবদান মৌলিক। তিনি বস্তুজগতকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগে স্পিরিট, দ্বিতীয় ভাগে ধাতু এবং তৃতীয় ভাগে যৌগিক পদার্থ। তাঁর এ আবিষ্কারের উপর নির্ভর করেই পরবর্তী বিজ্ঞানীরা বস্তুজগৎকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। যথা–বাষ্পীয়, পদার্থ ও পদার্থ বহির্ভূত। জাবির এমন সব বস্তু বিশ্ব সভ্যতার সামনে তুলে ধরেন, যেগুলোকে তাপ দিলে বাষ্পায়িত হয়। এ পর্যায়ে রয়েছে কর্পূর, আর্সেনিক ও এমোনিয়া ক্লোরাইড। তিনি দেখান কিছু মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ; যেগুলোকে অনায়াসে চূর্ণে পরিণত করা যায়। নির্ভেজাল বস্তুর পর্যায়ে তিনি তুলে ধরেন সোনা, রূপা, তামা, লোহা, দস্তা প্রভৃতি। জাবির ইবনে হাইয়ানই সর্ব প্রথম নাইট্রিক এসিড আবিষ্কার করেন। সালফিউরিক এসিড ও তাঁরই আবিষ্কার। তিনি 'কিতাবুল ইসতিতমাস' এ নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত করার ফর্মুলা বর্ণনা করেন। নাইট্রিক এসিডে স্বর্ণ গলানোর ফর্মুলা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। নাইট্রিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডে স্বর্ণ গলানোর পদার্থটির নাম যে 'একোয়া রিজিয়া' এ নামটিও তাঁর প্রদত্ত। জাবির ইবনে হাইয়ান নানাভাবেই তাঁর রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণের নামকরণ বা সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, পরিস্রাবণ, দ্রবণ, কেলাসন, ভস্মীকরণ, গলন, বাষ্পীভবন ইত্যাদি রাসায়নিক সংশ্লেষণ বা অনুশীলন গবেষণার কি কি রূপান্তর হয় এবং তার ফল কি তিনি তাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি চামড়া ও কাপড়ে রং করার প্রণালী,

ইস্পাত প্রস্তুত করার পদ্ধতি, লোহা, ওয়ার্টার প্রুফ কাপড়ে বার্নিশ করার উপায়, সোনার জলে পুস্তকে নাম লেখার জন্যে লৌহের ব্যবহার ইত্যাদি আবিষ্কার করেন।

জাবির ইবনে হাইয়ান স্বর্ণ ও পরশ পাথর তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি স্বর্ণ কিংবা পরশ পাথরের লোভী ছিলেন না। ধন সম্পদের লোভ লালসা তাঁকে সভ্যতা উন্নয়নে ও গবেষণার আদর্শ থেকে বিন্দু মাত্রও পদস্খলন ঘটাতে পারেনি। দুর্দান্ত সাহসী জাবির ইবনে হাইয়ান স্বর্ণ ও পরশ পাথর তৈরি করতে গিয়ে আজীব যেখানেই গিয়েছেন দুর্যোগ, দুশ্চিন্তা ও মৃত্যুর সাথে লড়াই ছাড়া সুখ শান্তির মুখ দেখতে পারেননি। জাবিরের মতে সোনা, রূপা, লোহা প্রভৃতি যত প্রকার ধাতু আছে কোন ধাতুরই মৌলিকতা নেই। এসব ধাতুই পারদ আর গন্ধকের সমন্বয়ে গঠিত। খনিজ ধাতু খনিতে যে নিয়মে গঠিত হয় সে নিয়মে মানুষও ঐসব ধাতু তৈরি করতে পারে। অন্য ধাতুর সংগে মিশ্র স্বর্ণকে Cupellation পদ্ধতিতে অর্থাৎ মীগারের সংগে মিশিয়ে স্বর্ণ বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি তিনিই আবিষ্কার করেন।

জাবির এপোলিয়ানের আধ্যাত্মিকবাদ, প্লেটো, সক্রেটিস, এরিস্টটল, পিথাগোরাস, ডিমোক্রিটাস প্রমুখের গ্রন্থের সংগে পরিচিত এবং গ্রীক ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র, ইউক্লিড ও আল মাজেস্টের ভাষ্য, দর্শন, যুদ্ধবিদ্যা, রসায়ন, জ্যামিতি, জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও কাব্য সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি দুই হাজারেরও বেশী গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যা পেয়েছেন, তার ফলাফলই ছিল গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রসায়ন ২৬৭টি, যুদ্ধাস্ত্রাদি ৩০০টি, চিকিৎসা ৫০০টি, দর্শনে ৩০০টি, কিতাবুত তাগদির ৩০০টি, জ্যোতিবিজ্ঞান ৩০০ পৃষ্ঠার ১টি, দার্শনিক যুক্তি খণ্ড ৫০০টি উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থ সংখ্যায় অধিক হলেও পৃষ্ঠা সংখ্যায় ছিল কম।

বিশ্ব বিখ্যাত এ মনীষীর মৃত্যুর তারিখ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। যতদূর জানা যায়, তিনি ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন বটে, কিন্তু বিজানে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা চির স্বরণীয়। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই তাঁর নাম জানে না; অথচ বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক আবিষ্কারের উপরই বর্তমান বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান।

৩৯

মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক পাশা

[১৮৮১-১৯৩৮]

মুস্তাফা কামাল ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে স্যালেনিকার এক চাষী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। যে পরিবারে তাদের জন্ম, তাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ম্যাসিডনের অধিবাসী। তার বাবার নাম ছিল আলি রেজা, মা জুবেইদা। ছেলেবেলা থেকেই মুস্তফা ছিলেন সকলের চেয়ে আলাদা। যখন তার সাত বছর বয়স তখন বাবা মারা গেলেন। চাচা এসে তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। চাচার ভেড়ার পাল চরাতে হত। জুবেইদা চাচাকে বলে তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

সহপাঠীদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি মারামারি লেগেই থাকত। কোন বিষয়ে অন্যায় দেখলে মেনে নিতে পারতেন না। জন্ম থেকে তার মধ্যে ছিল বিদ্রোহী সত্তা। একদিন কোন এক শিক্ষকের অন্যায় দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। তার সাথে মারামারি করে স্কুল ছাড়লেন।

ইউরোপে বিভিন্ন দেশ দেখে তার মনে হয়েছিল শিক্ষার উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য স্কুল খোলা হল। সাত থেকে ষোল বৎসরের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হল। ১৯২২ সালে নিরক্ষরতার হাত ছিল শতকরা ৮২ জন। মাত্র দশ বছরের মধ্যে সেই হারকে কমিয়ে ৪২ জনে নামিয়ে আনা হল।

তিনি ধর্মশিক্ষাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব দিলেন। আরবি লিপির পরিবর্তে রোমান লিপির ব্যবহার শুরু হল। পৃথিবীর অন্য দেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বর্ষপঞ্জী সংস্কার করা হল। দশমিক মুদ্রা চালু হল।

শুধুমাত্র দেশের শিক্ষার উন্নতি নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সমগ্র দেশ জুড়ে রেলপথ তৈরির কাজে হাত দেওয়া হল। তৈরি হল নতুন নতুন পথঘাট। শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরিণ সংস্কার নয়, বৈদেশিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করা হল। ১৯৩২ সালে তুরস্ক লীগ অব নেশনস-এর সদস্য হল।

সামরিক দিক থেকে যাকে কোন বিপদ না আসে তার জন্যে প্রতিবেশী প্রতিটি দেশের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করা হল।

ইতিমধ্যে কামাল পাশা পর পর চারবার সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯২৩ সালে প্রথম তিনি নির্বাচিত হন, তারপর ১৯২৭, ১৯৩১, ১৯৩৫।

তুরস্কের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙে পড়ছিল। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে তিনি মারা গেলেন।

যদিও কামাল পাশার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় তিনি একনায়কতান্ত্রিক শাসন চালু করেছিলেন, সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দেশ পরিচালনা করেছেন, তবুও তিনি তুরস্কের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে পরিস্থিতিতে তিনি দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তখন কঠোরতা ছাড়া উন্নতির কোন পথই খোলা ছিল না।

৪০

মাও সে তুং

[১৮৯৩-১৯৭৬]

১৮৯৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর চীনের হুনান প্রদেশের এক গ্রামে মাও জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন। চাষবাসই ছিল তার প্রধান পেশা।

শৈশবে গ্রামের স্কুলেই পড়াশুনা করতেন। পড়াশুনার প্রতি তার ছিল গভীর আগ্রহ। পাঠ্যসূচির বাইরে যখন যে বই পেতেন তাই পড়তেন। তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত চীনের ইতিহাস, বীর গাথা।

তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে মাও ছিলেন সবচেয়ে বড়। পরে তার দুই ভাই কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে নিহত হয়। গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ করে কিছুদিন গ্রামেই পড়াশুনা করলেন। প্রায় জোর করেই বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হুনানের প্রাদেশিক শহরে এলেন। ভর্তি হলেন এখানকার হাই স্কুলে। এই সময় নিয়মিত স্থানীয় লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা করতেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি লাইব্রেরীর অর্ধেকের বেশি বই পড়ে শেষ করে ফেলেছিলেন।

১৯১৮ সালে ২৫ বছর বয়সে তিনি এলেন পিকিং শহরে। এই প্রথম তিনি প্রদেশ ছেড়ে বার হলেন। জীবনের এই পর্যায়ে দুবেলা দুমুঠো খাবার সংগ্রহের জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। এক বছর পর মাও ফিরে এলেন তার গ্রামে। স্থানীয় একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সমতাদর্শী কয়েকজন তরুণকে সাথে নিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন।

১৯২১ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠল। এর ৫০ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে মাও-ও ছিলেন।

ইতিপূর্বে মাও বেশ কিছু রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় চীনে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বের কুয়োমিংতাং দল অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। চীনা কমিউনিস্ট দল (CCP) এবং কুয়োমিংতাং (K.M.T) এর মধ্যে সংযুক্ত ঐক্য গড়ে উঠল।

রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির তরফে এই ঐক্যকে সমর্থন জানানো হল। চিয়াং কাইশেক গেলেন মস্কোতে। সেখানে তাকে সান ইয়াৎ সেনের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করা হল। ইতিমধ্যে মাও বিবাহ করেছেন তার এক শিক্ষকের কন্যাকে-ইয়াং কাই হুই। হুই পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অবস্থাতেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। সেই সূত্রেই দুজনে নিকট সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৩০ সালে আন্দোলনের কাজে জড়িত থাকার সময়েই নিহত হন হুই। CCP এবং KMT দুই রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রভেদ প্রকট হয়ে উঠল। মাও-এর উপর ভার ছিল এই দুটি দলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা।

চীন ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক দেশ। দেশের শতকরা আশি জন মানুষই ছিল কৃষিনির্ভর। তৈরি হল জাতীয় কৃষক আন্দোলন সংগঠন। এই সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল মাও-এর উপর।

অল্পদিনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি এবং মাও-এর সামনে এক সংকট দেখা দিল।

মাও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলেন গতানুগতিক পথে নয়, কৃষকদের মধ্যে থেকেই

বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ১৯২৭ সালে তিনি হুনানের কৃষক আন্দোলনের উপর এক বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে পার্টি নেতৃত্বের কাছে আবেদন জানালেন, অবিলম্বে দেশ জুড়ে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা হোক। দলের অধিকাংশেরই এ ব্যাপারে সম্মতি ছিল না। তারা কৌতুক করে বলত 'গেঁয়োদের আন্দোলন'। মাওয়ের প্রস্তাব সমর্থিত হল না। তা সত্ত্বেও দলের মধ্যে বেশ কিছু সদস্য এর সমর্থনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এল।

১৯২৮ সাল নাগাদ তার সাহায্যে কৃষক নেতা চু তে বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। চু মাও-এর নীতিতে বিশ্বাস করতেন। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ সদস্যই আত্মগোপন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যদারা এতখানি সীমিত হয়ে পড়েছিল, মাও হয়ে উঠলেন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পুরোধা।

মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির আন্তজার্তিক সম্মেলনে স্টালিন মাও-এর বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানালেন। তাকে আবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করা হল। চিয়াং কাইশেক তার বাহিনীকে আদেশ দিলেন কমিউনিস্টদের সমূলে বিনাশ করতে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে চারবার বিশাল বাহিনী পাঠনো হল বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য। এই বাহিনী ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তবুও তারা জয়লাভ করতে পারেনি। এ পাহাড় অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল সৈন্যদের অগম্য কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ মাও-এর লাল ফৌজের অদম্য মনোবল এবং শৃঙ্খলাবোধ। লাল ফৌজের সাফল্যের পেছনে আরো একটি বড় কারণ ছিল স্থানীয় মানুষের সহায়তা।

চিয়াং অনুভব করতে পারছিলেন এর সুদূর প্রসারিত প্রতিক্রিয়া। তাই জার্মান সামরিক উপদেষ্টাদের পরামর্শ মত পঞ্চমবার প্রায় এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন।

সামরিক বাহিনী বীরদর্পে এগিয়ে চলল। এই সুসজ্জিত বাহিনীর প্রতিরোধ করা সম্ভবপর ছিল না মাও-এর লাল ফৌজের। তারা ক্রমশই পিছু হটতে আরম্ভ করল। একের পর এক মুক্ত অঞ্চল অধিকৃত হতে থাকে চিয়াং কাইশেকের বাহিনীর।

লাল ফৌজ পিছু হটতে হটতে এসে কিয়াংসাই পার্বত্য প্রদেশে। এই স্থান প্রশিক্ষণের উপযুক্ত বিবেচনা করে মাও উত্তর-পশ্চিমে বিখ্যাত চীনের প্রাচীরের কাছে এসে আশ্রয় নিলেন।

১৯৩৪ সালের অক্টোবরে লাল ফৌজের শুরু হল ঐতিহাসিক অভিযান। এই অভিযান সহজসাধ্য ছিল না। পথের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টেও লাল ফৌজের মনোবল এতটুকু ভেঙে পড়েনি। প্রত্যেকেই ছিল মা-এর বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। অবশেষে অক্টোবর ১৯৩৫ সালে তারা এসে পৌছল উত্তরের সেনসি প্রদেশে। এখানেই শিবির স্থাপন করলেন মাও। ইতিমধ্যে আরো বহু তরুণ কৃষক শ্রমিক এসে যোগ দিয়েছে লাল ফৌজে। সেখানে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হল। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আবার গড়ে উঠল মুক্ত স্বাধীন শাসনব্যবস্থা।

এই সময় একজন আমেরিকান সাংবাদিক এডগার স্নো বহু কষ্টে চীনা কমিউনিস্ট ঘাঁটিতে গিয়ে পৌছান। তার এই অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তীকালে বিবরণ দিয়েছেন তার বিখ্যাত "চীনের আকাশে লাল তারা" (Red star over China) বইতে। মাও সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন "যেমন মজার তেমনি গম্ভীর দুর্বোধ্য প্রকৃতির মানুষ। তার মধ্যে জ্ঞান আর কৌতুকের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। নিজের অভ্যেস পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যতখানি উদাসীন, নিজের দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে ততখানিই সজাগ। কি অফুরন্ত প্রাণশক্তি, রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভাধর।"

মাও অনুভব করতে পেরেছিলেন জাপানী আক্রমণের বিপদ। তাই কুয়োমিংতাং-এর সাথে ইতিপূর্বে তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে জাপানীদের প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে পৃথিবী জুড়ে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা। পরাজিত হল জাপানের সৈন্যবাহিনী। কিন্তু বিপ্লবের আগুন নিভল না। লাল ফৌজ তখন ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রান্তে প্রান্তে। চিয়াং কাইশেক উপলব্ধি করতে পারছিলেন মাও-এর নেতৃত্বে যে বিপ্লব শুরু হয়েছে তাকে ধ্বংস করবার মত তার ক্ষমতা নেই। তাই আমেরিকার সাহায্য প্রার্থী হলেন। কিন্তু আমেরিকান মদতপুষ্ট হয়েও নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না চিয়াং কাইশেক। লাল ফৌজের সৈন্যবাহিনী চারদিক থেকে পিকিং শহর ঘিরে ফেলল। আমেরিকান সেনাবাহিনীর সাহায্যে চিয়াং পালিয়ে গেলেন ফরমোসা দ্বীপে। ১লা অক্টোম্বর ১৯৪৯ সালে লাল ফৌজ পিকিং দখল করে নিল। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। তার চেয়ারম্যান হিসাবে

নির্বাচিত হলেন পঞ্চান্ন বছরের মাও সে তুং। সমাপ্ত হল তার দীর্ঘ সংগ্রাম। কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল মানুষের মন থেকে বিপ্লবের উন্মাদনা ক্রমশই ফিকে হয়ে আসছে। হ্রাস পাচ্ছে মাও-এর জনপ্রিয়তা।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলেছিল ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। এর পরবর্তীকালে চীনের রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা গেল। প্রকৃতপক্ষে এতদিন পর্যন্ত চীন নিজেকে বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই বার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলল। ইউরোপে পাঠানো হল বাণিজ্য প্রতিনিধি দল। বিদেশীদের দেশে আসবার অনুমতি দেওয়া হল। যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অস্তিত্বকে চীন অস্বীকার করেছিল দীর্ঘদিন, ১৯৭১ সালে তার সদস্য পদ গ্রহণ করল।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে চীন অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। সর্বক্ষেত্রেই ছিল মাও-এর অবদান। কয়েক শো বছরের শোষিত বঞ্চিত দরিদ্র অবক্ষয়ের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া একটি জাতিকে তিনি দেখিয়েছিলেন আধুনিকতার আলো।

মাওয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় তিনি স্টালিনের মতই সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। কমিউনিস্ট বিরোধীদের নির্মমভাবে ধ্বংস করেছিলেন। বিপ্লব উত্তরকালে দেশে যখন শান্তি শৃঙ্খলা সুস্থিরতার প্রয়োজন, মাও অনাবশ্যকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ, তিব্বত দখল, ফরমোসা সংক্রান্ত বিবাদ, ভারত আক্রমণ, রাশিয়ার সাথে বিবাদ। মাও ভেবেছিলেন বিপ্লবের সময় যেবাবে গণজাগরণ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন, উত্তরকালেও তা বর্তমান থাকবে। মাও বিশ্বাস করতেন এক অন্তহীন বৈপ্লবিক সংগ্রাম। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি প্রত্যেক বিপ্লবী উত্তরকালে হয়ে ওঠে সংশোধনবাদী নয়তো ক্ষমতালিপ্সু। তাই তার অজান্তেই দেশে গড়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধ শক্তি। যারা মাও-এর বার্ধক্যের সুযোগ নিয়ে প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা চালিত করত। তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সালে মাও মারা গেলেন। 'গ্যাং অব ফোর' নামে চারজনের একটি দলকে বন্দী করা হল। এদের মধ্যে ছিলেন মাও-এর বিধবা পত্নী। প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল।

ব্যক্তি জীবনের দোষত্রুটি বাদ দিলে মাও ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি আজন্ম বিপ্লবী। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র পূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর এর বিশ্বাসের শক্তিতেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন পৃথিবীর বৃহত্তম জনসংখ্যাবহুল রাষ্ট্রের।

৪১

পাবলো পিকাসো

[১৮৮১-১৯৭৩]

২৫শে অক্টোবর ১৮৮১ স্পেনের ভূমধ্যসাগরীয় দক্ষিণ উপকূলে কাতালান প্রদেশের মালাগা শহরে পিকাসোর জন্ম। বাবা ডন জোস রুইজ ব্লাসকো ছিলেন আর্ট স্কুলের শিক্ষক এবং শহরের একটি মিউজিয়ামের কিউরেটর। বিয়ের এক বছর পরেই পিকাসোর জন্ম হয়। ডন জোস ছেলেন নাম রাখলেন পাবলো নেপোমুসেনো ক্রিসপিনায়ানো দ্য লা সান্তিমাসসিমা ত্রিনিদাদ রুইজ পিকাসো।

এই বিশাল নাম ধরে ডাকা কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তাই সংক্ষেপে ডাকা হত পাবলো রুইজ। রুইজ ছিল তার পিতার পদবি, পিকাসো মাতৃকুলের পদবি। বড় হয়ে পিতৃকুলের পদবি বর্জন করে শিল্পী নিজের নাম রাখলেন পাবলো পিকাসো। এই নামেই আজ তিনি জগৎবিখ্যাত। ছবি আঁকার হাতেখড়ি তার বাবার কাছে। শিশু বেলা থেকেই পিকাসোর মধ্যে ছিল ছবির প্রতি গভীর অনুরাগ। শোনা যায় যখন তিনি তিন বছরের শিশু, একটা পেনসিল কিম্বা কাঠকয়লা পেলে কাগজ কিম্বা মেঝের উপরেই ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিতেন। ছাত্র অবস্থাতেই তার মধ্যে শিল্প চেতনায় বিকাশ ঘটতে থাকে। পিকাসোর যখন চৌদ্দ বছর বয়স, কাবা মালাগা ছেড়ে এলেন বার্সিলোনাতে। স্থানীয় আর্ট স্কুলে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিলেন ডন জোস। বাবার স্কুলেই ভর্তি হলেন পিকাসো। অল্পদিনের মধ্যেই তার প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করা গেল। বার্সিলোনায় ছাত্র অবস্থায় তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন শিল্প জগতে নতুন ধারার প্রবক্তা ভ্যান গক, তুলুস লোত্রেক, পল গ্যগা, সেজান প্রভৃতির একসপ্রেশনিজম বা প্রকাশবাদকে। লক্ষ্য করতেন তাদের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য।

তিন বছর বার্সিলোনার আর্ট স্কুল ছাত্র হিসাবে থাকার পর ১৮৯৭ সালে তিনি মাদ্রিদের রয়াল এ্যাকাডেমিতে ভর্তি হলেন। এই সময় কিছু তরুণ শিল্পী ছবির প্রদর্শনীতে আয়োজন করেছিল। এতে বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীও যোগ দিলেন। সকলকে বিস্মিত করে এখানে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পুরস্কার পেলেন পিকাসো। তার জীবনের এটাই প্রথম সাফল্য।

১৯০০ সালে তিনি স্থির করলেন লন্ডন যাবেন। স্পেনের পরিমণ্ডল শিল্পের অনুকূল ছিল না। পথে কয়েকদিনের জন্যে নামলেন প্যারিসে। উদ্দেশ্য ছিল শিল্পের তীর্থক্ষেত্র প্যারিসের শিল্পকলার সাথে পরিচিত হওয়া।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন পিকাসো। তার মনে হল স্পেন নয়, ইংল্যান্ড নয়, প্যারিসই হবে তার শিল্প সাধনার কেন্দ্রভূমি। প্রধানত আর্থিক কারণেই প্যারিসে স্থানীয়ভাবে ঘর রাখতে পারলেন না। এর পরবর্তী চার বছর তিনি কখনো প্যারিস কখনো বার্সিলোনায় কাটিয়েছেন।

১৯০০ সালে তার প্রথম ছবি প্যারিস প্রদর্শিত হল "The moulin de la Galettle" একটি কফি হাউসের দৃশ্য। এতে পিকাসোর প্রতিভা বিকশিত না হলেও ছবির বলিষ্ঠতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই প্রদর্শনীতে কোন ছবি বিক্রি হল না।

পিকাসোর শিল্পী জীবনের প্রথম পর্যায়ে যেতে পারে ১৯০১ থেকে ১৯০৪। এই সময়টিকে নাম দেওয়া হয়েছে ব্লু পিরিয়ড (Blue Period)। সমস্ত ছবি জুড়ে থাকত নীল রং। তার কাছে নীল রং ছিল জীবনের বিষণ্ণতা আর বেদনার প্রতীক।

এরই মধ্যে কিছুদিনের জন্য মাদ্রিদে এসে কয়েক জন তরুণ বন্ধুর সহযোগিতায় প্রকাশ করলেন একটি পত্রিকা ছবির "Young Art"। পিকাসো হলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। মাদ্রিদে তার একটি ছবির প্রদর্শনীও হল। এই সব ছবিগুলিই ছিল প্যাস্টেলে আঁকা। কিছুদিন পর ফিরে এলেন প্যারিসে। ছবিতে নীল রঙের ব্যবহারের পরিবর্তে এবার দেখা গেল গোলাপী রং। যাকে বলা হয়েছে Pink Period। ১৯০৩ সাল থেকেই তার ছবির মধ্যে এল গাঢ় কালো সীমারেখা।

সৌভাগ্যক্রমে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার ছবি শিল্পরসিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাই দেখা যায় সে সময়ে শিল্পীরা নিদারুণ যন্ত্রনা আর আর্থিক কষ্টের মধ্যে সংগ্রাম করে চলেছেন, তখনই তিনি ছবির ক্রেতা পেতে আরম্ভ করেছেন। তার বেশ কিছু ছবি বিক্রি হতেই তিনি স্থায়ীভাবে এসে প্যারিসে বাসা বাধলেন (১৯০৪)। কিন্তু ফরাসী সরকারের তরফে বহুবার তাকে নাগরিকত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি ফরাসী নাগরিক হননি। স্পেনের সন্তান হিসাবে নিজের পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন।

তার প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্বের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা গেল ১৯০৭ সালে আঁকা লে ডিময়সেলস দ্য এভিগনন ছবিতে (Leo Demoiselles d Avignon)। তার কিউবিজম ধারার প্রথম সূত্রপাত হয় এই ছবিতে।

পিকাসোর এভিগনন ছবিটি ১৯০৭ সালে আঁকা হলেও তা জনসাধারণের সামনে প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯৩৭ সালে। কারণ এই ছবির আঙ্গিককে সাধারণ মানুষ কতখানি গ্রহণ করতে পারবে সে বিষয়ে পিকাসো ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত।

কিন্তু পিকাসো নিজের পথ থেকে সামান্যতম সরে আসেননি। ১৯০৭ থেকে ১৯১১ তিনি ধারাবাহিকভাবে তার ছবির মধ্যে একটু একটু করে পরিবর্তন নিয়ে আসতে থাকেন। ছবির ভাষা হয়ে উঠতে থাকে জটিল থেকে আরো জটিল। ছবির মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ একদম মুছে গেল, জন্ম নিল আধুনিক চিত্রশিল্পকলার। এই সময় কিছু বিখ্যাত ছবি ফ্লের ডিশ (১৯০৯)। গীটার হাতে মহিলা (Ma Jolic)।

পিকাসো এবং ব্রাক-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে প্রচারিত হতে আরম্ভ করল কিউবিক চিত্রকলা। একে বলা হত কিউবিস্ট কলেজ (Cubist College) এই সময় পিকাসো সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি হল (Still life with chair Caning (1911-1912)। ১৯১২ সালে তার কিছু কিউবিস্ট ছবির লন্ডনে এক প্রদর্শনী হয়। তখন ছবিগুলির মূল্য ছিল ২ থেকে ২০ পাউন্ড। বর্তমানে সেই সব ছবিগুলির মূল্য এক লক্ষ পাউন্ডের চেয়ে বেশি।

পিকাসোর জীবনের প্রথম নারী ফেরানডে অলিভিয়ের। ১৯০৪ সালে পিকাসো যখন আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছেন, সেই সময় অলিভিয়ের সাথে পরিচয়। অলিভিয়ের সৌন্দর্য ব্যক্তিত্ব তাকে মুগ্ধ করেছিল। দীর্ঘ ৯ বছর দুজনের মধ্যে ছিল গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ না হলেও দুজনে থাকতেন স্বামী-স্ত্রীর মত।

১৯১৭ সালে একটি রাশিয়ান ব্যালে দল নৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য প্যারিসে এসেছিল। পিকাসোর খ্যাতির কথা শুনে তাকে শিল্পী দলের পোশাকের পরিকল্পনা এবং মঞ্চের দৃশ্যপট আঁকবার দায়িত্ব দেওয়া হল। এই দলের প্রধান শিল্পী ছিলেন ওলগা কোকোলভা। দুজনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। প্যারিসের অনুষ্ঠান শেষ করে দলটি গেল মাদ্রিদ এবং বার্সিলোনায়। পিকাসোও এই দলের সঙ্গী হলেন। স্পেনে থাকার সময়েই ওলগাকে বিবাহ করেন পিকাসো। বিবাহের এক বছর পরেই পিকাসোর প্রথম পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল।

বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই সস্ত্রীক প্যারিসে ফিরে এলেন পিকাসো। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়েছে, পিকাসোর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু কবি এ্যাপোনিয়ার আহত হয়ে মারা গিয়েছেন। এই সংবাদ যখন পিকাসোর কাছে এসে পৌঁছাল, তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রতিকৃতি আঁকছিলেন। এইভাবে পিকাসো নিজের বহু ছবি এঁকেছেন। বন্ধুর মৃত্যুতে এতখানি বিহ্বল হয়ে পড়লেন, সেই ছবি আর সমাপ্ত করেননি এবং এর পর জীবনে আর কোন দিনই নিজের ছবি আঁকেননি।

বন্ধুর স্মৃতিতে তিনি আঁকলেন তার একটি বিখ্যাত ছবি The Three Dancers বা তিন নর্তকী। এতে ফুটে উঠেছে মানুষের যন্ত্রণার এক তীব্র বিলাপ।

মানবিক যন্ত্রণার এই রূপ পরবর্তীকালে বারবার নানাভাবে দেখা দিয়েছে তার ছবিতে। এক একটি ছবিতে ফুটে উঠেছে খণ্ড-বিখণ্ডিত দেহ, ছিন্ন মুখ, উৎপাটিত চোখ দাঁত। তিনি দেখেছিলেন মানুষের উপরে শক্তিমানের অত্যাচার–অত্যাচারিত পীড়িত মানুষের যন্ত্রণার করুণ প্রতিচ্ছবি। এরই মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে 'গোয়ের্নিকা ছবিতে'।

১৯৩৭ সালে স্পেনের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। দেশে শুরু হল গৃহযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালে শাসকদের বোমারু বিমান স্পেনের ছোট্ট শহর গোয়ের্নিকার উপর বোমা বর্ষন করল। এই ঘটনায় ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়লেন পিকাসো। স্পেনের সরকারের তরফে তাকে বহু সম্মান খেতাব দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন মাদ্রিদ আর্ট কলেজের ডিরেকটার। সব কিছুকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে তিনি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে তুলি ধরলেন। তার ছবি গোয়ের্নিকা হয়ে উঠল এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ছবিটি ১১ ফুট চওড়া, লম্বায় ২৬ ফুট। এই বিশাল ছবিটি আঁকতে তার সময় লেগেছিল মাত্র সাত সপ্তাহ। কালো সাদা ধূসর রঙে আঁকা এই ছবি আধুনিক চিত্রশিল্পের জগতে এক অনন্য সৃষ্টি।

১৯২৭ সালে পিকাসোর জীবনে এল আরেক নারী। নাম মারি থেরেসা ওয়ালটার। মারি ছিল পিকাসোর ছবির মডেল। অল্পদিনের মধ্যেই দুজনের সম্পর্ক গড়ে উঠল। এই সম্পর্কের পরিণতিতেই ভাঙন ধরল ওলগার সম্পর্কে। ক্রমশই দুজনের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠল। চরম ঘৃণার মধ্যেই ১৯৩৫ সালে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটে গেল। পরের বছর মারির একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মারি ছিল অসাধারণ সুন্দরী। পিকাসোর ছবিতে বার বার কামময়ী নারীমূর্তি হিসাবে দেখা গিয়েছে মারিকে কন্যা সন্তান জন্মবার পরেই দুজনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাছাড়া পিকাসোর জীবনের তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। কারণ সেই সময় তর সঙ্গী হয়েছে যুগোশ্লাভ ফটোগ্রাফার ডোরা মা। ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছিল। তিনি ফরাসী কমিউনিস্ট মাটিতে যোগ দিলেন।

মস্কোর সাথে কোন সম্পর্ক গড়ে না উঠলেও ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির তরফে যে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন বসেছিল তাতে তিনি পর পর তিন বছর যোগদান করেছিলেন। প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শান্তি সম্মেলনে পিকাসো লিথোগ্রাফে শান্তির প্রতীক হিসাবে সাদা পায়রার ছবি আঁকেন। উত্তরকালে এই ছবিকেই শান্তি প্রতীক হিসাবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ গ্রহণ করেছে।

শিল্পের ইতিহাসে ছবি বিক্রি করে পিকাসো যে পরিমাণ অর্থ পেয়েছেন তার এক শতাংশও কেউ পায় নি। তার ছবির বাজার ছিল সমস্ত পৃথিবীর জুড়ে। ইউরোপ আমেরিকার ধনী মানুষেরা তার একটি ছবির জন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করতে সামান্যতম দ্বিধা করত না। ছবির বিক্রির সময় পিকাসো পাকা ব্যবসাদারদেরও লজ্জা দিতেন।

১৯৬৮ সালে ৮৭ বছর বয়েসে তিনি করলেন এক বিস্ময়কর কাজ "Tour de Force"। দীর্ঘ সাত মাস ধরে তিনি ৩৪৭টি এনগ্রেভিং-এর মধ্যে দিয়ে মানুষের জৈব কামনাকে চিত্রিত করেছেন। এর অনেক ছবির মধ্যেই ফুটে উঠেছে এক জটিল দুর্বোধ্যতা।

নিজের জীবিতকালেই পিকাসো হয়ে উঠেছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা প্যারিসের লুভার মিউজিয়াম। ১৯৫৫ সালে এই মিউজিয়ামে পিকাসোর সমস্ত শিল্পকীর্তির এক বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প অনুরাগীরা এই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন। শুধু তার সৃষ্টির উৎকর্ষতা নয়, সৃষ্টির পরিমাণ দেখলেও বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। প্রায় ১৫০০ ক্যানভাস, ১০০০০ লিথো প্রিন্ট, ৩০০ ভাস্কর্য সিরামিক মাটির কাজ-এছাড়াও প্রায় ৩৫০০০ ছোট ছোট ছবি।

১৯৭০ সালে তার সমস্ত জীবনব্যাপী শিল্পকর্ম বার্সিলোনার মিউজিয়ামকে দান করে যান। মাতৃভূমির প্রতি এই ছিল তার শেষ শ্রদ্ধার্ঘ।

১৯৭৩ সালের ৮ই এপ্রিল। ফ্রান্সের মুগা শহরে পিকাসোর শিল্পজীবনের পির সমাপ্তি ঘটল। প্রকৃত পক্ষে পিকাসোর জীবনটাই ছিল এক বিরাট শিল্প। মৃত্যুতেও যে শিল্পের লয় হয় না।

৪২

হেলেন কেলার

[১৮৮০-১৯৬৮]

হেলেনের জন্ম ১৮৮০ সালের ২৭শে জুন উত্তর আমেরিকার টুসকুমবিয়া নামে এক ছোট শহরে। বাবার নাম আর্থার কেলার, মায়ের নাম ক্যাথরিন। আর্থার ছিলেন সামরিক বিভাগের একজন অফিসার। জন্ম সূত্রে সুইডিশ। তার পূর্বপুরুষরা ভাগ্য অন্বেষণে আমেরিকায় এসেছিল। জন্মের সময় হেলেন ছিলেন সুস্থ সবল স্বাভাবিক আর দশটি শিশুর মত। এক বছর বয়সে তার কলকাকলি আর চঞ্চল পদশব্দে সমস্ত ঘর ভরে উঠত। দেখতে দেখতে এক বছর সাত মাসে পা দিলেন হেলেন। একদিন মা তাকে গোসল করিয়ে ঘর থেকে বার হচ্ছিলেন। মায়ের কোল থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন হেলেন। সাথে সাথে জ্ঞান হারালেন হেলেন। যখন জ্ঞান ফিরল তখন প্রবল জ্বর। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখলেন আর জ্বর নেই হেলেনের। হঠাৎ যেমন জ্বর এসেছিল তেমনিভাবেই জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন মা-বাবা। তখন তারা কল্পনাও করতে পারেননি ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগ নেমে এসেছে তাদের একমাত্র সন্তানের জীবনে।

অল্প কিছুদিন যেতেই অনুভব করলেন, আকস্মিক আসা সেই জ্বর কেড়ে নিয়েছে হেলেনের দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন, পাকস্থলী আর মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ার জন্যই হেলেনের জীবনের এই বিপর্যয়। মেয়ের এই অসহায়তা দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন কেলার দম্পতি। তারা ধরেই নিয়েছিলেন এই মেয়ের জীবনে আর কোন আশা নেই, আলো নেই। একমাত্র যদি কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটে।

হেলেন তখন পাঁচ বছর বয়স। চিকিৎসকদের উপর সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন আর্থার। এমন সময় সংবাদ পেলেন গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী এক ব্যক্তি নাকি দুরারোগ্য যে কোন ব্যাধি সারাতে পারেন। হেলেনকে তার কাছে নিয়ে গেলেন আর্থার। গুপ্তবিদ্যার প্রভাব হেলেনের জীবনে কোন পরিবর্তন হল না, কিন্তু সেই ভদ্রলোক হেলেনকে লেখাপড়া শেখাবার পরামর্শ দিলেন। তাহলে হয়ত হেলেনের জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে।

আর্থার ভেবে পেলেন না তার এই বোবা অন্ধ মেয়েকে কিভাবে লেখাপড়া শেখাবেন।

ভাগ্যক্রমে সেই সময় ওয়াশিংটনের বিখ্যাত ডাক্তার আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের সাথে পরিচয় হল। ডাক্তার বেল তাকে পরামর্শ দিলেন বোস্টনের পার্কিনস ইনস্টিটিউশনের সাথে যোগাযোগ করতে। এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেছিলেন ডাক্তার হো। এখানে অন্ধদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তাই শিক্ষা দেওয়া হত। ডাক্তার হো হেলেনের মত একটি অন্ধ বোবা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। স্বামীর সাথে ক্যাথারিনও এই প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

সেই সময়ে হো মারা গিয়েছিলেন। পার্কিনস ইনস্টিটিউশনের নতুন ডিরেক্টর হয়ে এসেছিলেন মাইকেল এ্যাগানোস। তিনি কেলার দম্পতির মুখে হেলেনের সমস্ত কথা শুনে একজন শিক্ষয়িত্রীর উপর তার শিক্ষার ভার দেবার পরামর্শ দিলেন।

একদিন সকালে আলবামা শহরে কেলার পরিবারের বাড়িতে এসে হাজির হলেন একুশ বছরের এক তরুণী মিস অ্যানি সুলিভ্যান ম্যানসফিল্ড। হেলেন কেলারের অন্ধকার জীবনে তিনি নিয়ে এলেন প্রথম আলো। অ্যানির ছেলেবেলা থেকেই দৃষ্টিশক্তি কম ছিল, তাই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ম্যাসচুসেট প্রতিবন্ধী আশ্রমে। এই সময় অ্যানি পার্কিনস ইনস্টিটিউটের কথা শুনতে পান।

পার্কিনস ইনস্টিটিউটে ছয় বছর ছিলেন অ্যানি। কয়েকজন বিখ্যাত ডাক্তার এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাদের চিকিৎসায় এবং দুবার অপারেশনের পর চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পেলেন অ্যানি। অন্ধত্বের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা ভেবে অ্যানি স্থির করলেন তিনি অন্ধদের শিক্ষা দেওয়ার কাজেই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করবেন। সেদিন ছিল ৩রা মার্চ ১৮৮৭।

প্রতিটি বস্তুর সাথে প্রথমে পরিচয় করাতেন অ্যানি। হেলেন তার স্পর্শ অনুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতেন তার উপর লিখতেন সেই বস্তুর নাম। কখনো আবার হেলেনকে দিয়ে বার বার লেখাতেন সেই নাম।

অল্পদিনেই প্রকাশ পেল হেলেনের অসামান্য প্রতিভা। অ্যানি যা কিছু শেখাতেন অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তা শিখে নিতেন হেলেন। লুই ব্রেলা আবিষ্কৃত ব্রেল পদ্ধতিতে (এই পদ্ধতিতে অন্ধরা পড়াশুনা করে) হেলেন কয়েক বছরের মধ্যে শিখলেন ইংরাজি, লাটিন, গ্রীক, ফরাসী এবং জার্মান ভাষা। আঙুলের স্পর্শের মাধ্যমে তিনি খুব সহজেই নিজের মনোভাব প্রকাশ পারতেন।

হেলেনের একজন অনুরাগী ছিলেন বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোকাল ফিজিওলজির অধ্যাপক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (ডাক্তার বেলই প্রথম হেলেনের বাবাকে পার্কিনস ইনস্টিটিউটের সন্ধান দেন)। ডাক্তার বেলই টেলিফোনের আবিষ্কারক। হেলেনকে নিজের কন্যার মত স্নেহ করতেন, তাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন।

ডাক্তার বেলের নেশা ছিল দেশভ্রমণের। হেলেন এবং অ্যানিকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপে। দেশ ভ্রমণ সমাজ কল্যাণকর কাজের মধ্যেও তিনি নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তার লেখা কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই, আমার জীবন কাহিনী, ১৯০৩ (The story of my life) আমার জগৎ ১৯০৮ (The world I live in), বিশ্বাস রাখ, ১৯০৪, (Let us have faith) শিক্ষিকা মিস অ্যানি স্যুলিভান, ১৯৫৫, (Teacher Annie Sullivan); খোলা দরজা, ১৯৫৭ (The open door)।

১৯৫০ সালে সত্তর বছর বয়সে পা দিলেন হেলেন কেলার। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। প্যারিসে সেই উপলক্ষে এক বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করা হল। দেশ-বিদেশ থেকে সাংবাদিকের দল এসে ভিড় করল প্যারিসে। সকলেই ভেবেছিল তিনি বোধ হয় এই কর্মময় জীবন থেকে ছুটি নেবেন। কিন্তু হেলেন কেলার ছিলেন এক অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। সেবা আর কর্মের মাঝেই একাত্ম হয়েছিল তার জীবন। তাই ১লা জুলাই ১৯৬৮ সালে যখন তিনি মারা গেলেন তখনও তিনি ছিলেন কর্মরত।

পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও হেলেন কেলার আজও পৃথিবীর সমস্ত অন্ধ বিকলাঙ্গ পঙ্গু প্রতিবন্ধী মানুষের কাছে এক প্রেরণা আর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন জীবনের দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

৪৩

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

[১৭০৬-১৭৯০]

আমেরিকার ইতিহাসে যদি বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোন পুরুষের নাম করতে হয় যিনি একাধারে ছিলেন মুদ্রাকর, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রের সংবিধানে রচয়িতা, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, যাঁর সম্বন্ধে দেশবাসী শ্রদ্ধা- অবনত চিত্তে বলেছিল আমাদের হিতৈষী মহাজ্ঞানী পিতা-সেই মানুষটির নাম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। শুধু আমেরিকার নন, সমগ্র মানব জাতির তিনি হিতৈষী বন্ধু।

এই মহাজ্ঞানী কর্মযোগীর জন্ম আমেরিকার বোস্টন শহরে। ১৭০৬ সালের জানুয়ারি মাসে। তাঁর বাবা ধর্মীয় কারণে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে আমেরিকায় গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। বেঞ্জামিন জন্মের আগে তাঁর মা চোদ্দটি সন্তানের জন্ম দেন। তাঁর বাবা অতিকষ্টে এই বিরাট সংসার প্রতিপালন করতেন। ছেলেবেলায় বেঞ্জামিন কোনদিনই আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখেননি।

যখন তাঁর আট বছর বয়স, বাবা তাঁকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কয়েক বছর স্কুলের খরচ মেটালেও শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না। বেঞ্জামিনকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের সাবান তৈরির কারখানায় ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু এই কাজে কিছুতেই মন বসল না বেঞ্জামিনের। ব্যবসার প্রতি কোনদিন তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর আগ্রহ ছিল সমুদ্রে ভেসে বেড়াবার।

১৭৭৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত মিসেস রীড ছিলেন বেঞ্জামিনের সুযোগ্য স্ত্রী।

১৭৩৩ সাল নাগাদ পুওর রিচার্ডস আলমানাক নামে একটি ধারাবাহিক প্রকাশ করলেন। এই রচনা অল্পদিনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

ধনী ও খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসাবে বেঞ্জামিন ক্রমশই ফিলডেলফিয়া শহরে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। অর্থ উপার্জনের সাথে সাথে সমাজসংস্কারমূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বেঞ্জামিন। ইতিমধ্যে তিনি ফিলাডেলফিয়া শহরে একটি সংস্থা স্থাপন করেছিলেন।, নাম "জুন্টো"। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজের উন্নতিতে পারস্পরিক সহায়তা।

এই সংস্থায় তিনি যেসব প্রবন্ধ পাঠ করতেন সেই অনুসারে নানান সমাজসংস্কার মূলক কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। সমাজের প্রতি সমস্যার প্রতি তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

তিনি দেখেছিলেন দেশে উপযুক্ত গ্রন্থাগারের অভাব। অধিকাংশ মানুষই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে বই কিনতে পারে না। সর্বত্র লাইব্রেরী স্থাপন করাও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তাই ১৭৩০ সালে তিনি স্থাপন করলেন ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী। আমেরিকায় এই ধরনের লাইব্রেরী এই প্রথম। এর জনপ্রিয়তা দেখে অল্পদিনেই আরো অনেক ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী গড়ে ওঠে।

১৭৩৭ সালে তিনি আমেরিকাতে প্রথম স্থাপন করলেন বীমা কোম্পানি। এই কোম্পানির কাজ ছিল আগুনে পুড়ে যাওয়া সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

১৭৪৯ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন ফিলাডেলফিয়া এ্যাকাডেমি। এই এ্যাকাডেমি তাঁর জীবন কালেই পরিণত হয়েছিল ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বেঞ্জামিনের দৃষ্টিভঙ্গি যে কতখানি ব্যাপ্ত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় হাসপাতাল নির্মাণের কাজে। ডাক্তার না হয়েও তিনি অনুভব করেছিলেন হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা। তাঁর বন্ধু ডাক্তার বন্ডকে পরামর্শ দিলেন হাসপাতাল তৈরির কাজে হাত দিতে।

বেঞ্জামিনের আন্তরিক সহযোগিতায়, ডাক্তার বন্ডের প্রচেষ্টায় ১৭৫১ সালে আমেরিকায় গড়ে উঠল প্রথম হাসপাতাল।

এইসব বহুমুখী কাজের মাধ্যমে বেঞ্জামিন হয়ে উঠেছিলেন আমেরিকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ।

১৭৪০/৪১ সাল নাগাদ তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজকর্ম শুরু করেন। আবিষ্কারক হিসাবে তার প্রথম উদ্ভাবন খোলা উনুন (Open stove)। এই উনুন অল্পদিনেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তির প্রতি আগ্রহ ছিল সব চেয়ে বেশি। একদিন আকাশে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে আকাশের বিদ্যুৎ চমক দেখে প্রথম অনুভব করলেন আকাশের বিদ্যুৎ আর কিছুই নয়, বিদ্যুৎ এক ধরনের ইলেকট্রিসিটি। ইতিপূর্বে মানুষের ধারণা ছিল আকাশে যে বিদ্যুৎ জমকায় তা দেবরাজ জিউসের হাতের অস্ত্র। যখন তিনি মানুষকে ধ্বংস করতে চান তখনই তার এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন। তাই আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে মানুষ ভীত স্বন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত, পূজা-অর্চনা করত। ফ্রাঙ্কলিন সেই ভ্রান্ত ধারণাকে চিরদিনের জন্যে মুছে দিলেন। তখন লিডেন জার উদ্ভাবিত হয়েছে। এই যন্ত্রের সহায্যে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পর তিনি প্রমাণ করলেন বৈদ্যুতিক শক্তি দু ধরনের। একটিকে বলে নেগেটিভ, অন্যটিকে বলে পজেটিভ। তাঁর আবিষ্কৃত এই নতুন তত্ত্ব বৈদ্যুতিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সংযোজন।

আধুনিক কালে আমরা যে টিউব লাইট দেখি তা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈদ্যুতিক শক্তি সংক্রান্ত এইসব আবিষ্কার এই সব আবিষ্কারের গবেষণাপত্র তিনি প্রথম পেশ করেন লন্ডনের রয়াল সোসাইটিতে। তার পর থেকেই তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সময়ে সমুদ্রস্রোতে, তার গতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি গবেষণাপত্র রয়াল সোসাইটিতে জমা দেন। এছাড়া তিনিই প্রথম বাইফোকাল লেন্সের ব্যবহার শুরু করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং এই সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনা অল্পদিনেই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিজ্ঞানী মহলে সাড়া জাগাল। এই সমস্ত দেশের বিজ্ঞানীরা তাকে বিপুলভাবে সম্মান জানাল। ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটি তাঁকে তাদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করল।

ইতিমধ্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন পেনসিলভেনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি। জনগণের তরফ থেকে তাঁকে সংসদ নির্বাচিত করা হল (১৭৫০)। এই সময় থেকে তিনি ক্রমশই রাজনৈতিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়লেন। তিনি চেয়েছিলেন আমেরিকার সমৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি।

তাঁর এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বিচক্ষণতার জন্য তিনি আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের তরফ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে একাধিকবার ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড গিয়েছেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই পেয়েছেন অভূতপূর্ব সম্মান আর সম্বর্ধনা।

এদিকে সমস্ত দেশ জুড়ে ইংল্যন্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার অধিবাসীদের মনে ক্ষোভ জমে উঠতে থাকে। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৭৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হল।

পরের মাসেই ফিলাডেলফিয়া শহরে আমেরিকান কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। এখানেই জর্জ ওয়াশিংটনকে আমেরিকান বাহিনীর প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করা হল। দেশের এই স্বাধীনতা যুদ্ধে অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বেঞ্জামিন। তাঁকে আমেরিকার প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হল ফ্রান্সে। তিনি অল্পদিনেই ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করলেন।

১৭৮৩ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তিনি দেশের উন্নয়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁকে পেনসিলভেনিয়ার শাসন পরিষদের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হল।

নতুন আমেরিকা গড়ে উঠবার পর নতুন শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়োজন দেখা দিল। ডাক পড়ল বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের। তিনি আরো কয়েকজনের সহযোগিতায় রচনা করলেন আমেরিকা সংবিধান। এই সংবিধানের মধ্যে দিয়ে তিনি আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল একাশি। এই বয়সেও তিনি ছিলেন তরুণদের মতই উদ্যমী কর্মঠ।

সকল মানুষের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক ভালবাসা। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে নিগ্রো দাসদের দুরবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই দাসপ্রথা বিলোপের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি যে কাজের সূত্রপাত করেন, উত্তরকালে লিঙ্কন তা সমাপ্ত করেন।

১৭৯০ সালে সামান্য রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞান, দর্শন রাজনীতি, অর্থনীতি-সর্বক্ষেত্রেই অসংখ্য রচনার মধ্যে দিয়ে নিজের অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সমস্ত জীবন সেই লক্ষ্যপথেই অগ্রসর হয়েছেন-তাই তাঁর সম্বন্ধে এমার্সন বলেছেন, তিনি ছিলেন মানবজাতির সবচেয়ে হিতৈষী বন্ধু।

৪৪

যোহান উলফগ্যাঙ ভন গ্যেটে

[১৭৪৯-১৮৩২]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানিতে প্রকাশিত হল একখানি উপন্যাস, নাম "The sorrows of Werther" (তরুণ ভের্টেরের শোক)। উপন্যাস প্রকাশিত হবার সাথে সাথে সমস্ত জার্মানিতে আলোড়ন পড়ে গেল। ক্রমশই তার ঢেউ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আছড়ে পড়ল সমস্ত ইউরোপে, এমনকি সুদূর চীনেও। কাহিনীর নায়ক ভের্টের এক ছন্নছাড়া যুবক। তার কবি মন স্বপ্নের জগতে বাস করে।

মাঝে মাঝেই আঘাত পায়, বেদনায় ভেঙে পড়ে। আবার সব ভুলে নতুন করে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে স্বপ্নও ভেঙে যায়। নতুন জীবনের আশায় শহরের কাছে এক গ্রামে এল। গ্রামের মুক্ত প্রকৃতি গাছা ফুল পাখি মানুষ মুগ্ধ করে ভের্টেরকে, প্রিয়তম বন্ধু হেলমকে চিঠি লেখে ভের্টের। এই চিঠির মালা সাজিয়েই সৃষ্টি হয়েছে উপন্যাস। জীবনে আঘাত ব্যর্থতা হতাশায় শেষ পর্যন্ত সব আশা হারিয়ে আত্মহত্যা করে ভের্টের।

ভের্টেরের আশা নিরাশা তার কল্পনা রোমান্স সমস্ত মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। যুবক-যুবতীদের কাছে ভের্টের হয়ে উঠল আদর্শ। উপন্যাসের পাতা ছাড়িয়ে ভের্টের হয়ে উঠল এক জীবন্ত মানব। তার অনুকরণে ছেলেরা পরতে আরম্ভ করল নীল কোট, হলদে ওয়েস্ট কোট। মেয়েরা নায়িকার মত সাদা পোশাক আর পিঙ্ক বো-তে নিজেদের সাজাতে থাকে। সকলেই যেন ভের্টেরের জীবনের সাথে জীবন মেলাতে দলে দলে যুবক-যুবতীরা আত্মহত্যা করতে আরম্ভ করল।

শুধু একটি মানুষ নির্বিকার। ভের্টেরের জীবনের সেই বিষাদ, বিষণ্ণতা, অন্ধকার তাঁর জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি কারণ তিনি যে চির আলোর পথিক, ভের্টেরের স্রষ্টা, জার্মান সাহিত্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ যোহান উলফগ্যাঙ ভন গ্যেটে।

গ্যেটের জন্ম জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহরে। তারিখটি ছিল ১৭৪৯ সালের ২৮ শে আগস্ট। গ্যেটের প্রপিতামহ ছিলেন কামার, পিতামহ দর্জি। পিতামহ চেয়েছিলেন সম্ভ্রান্ত নাগরিক হিসাবে

ছেলেকে গড়ে তুলতে। গ্যেটের পিতা যোহান ক্যাসপার পড়াশুনা শেষ করে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যোহান ছিলেন যেমন শৃঙ্খলাপরায়ণ তেমনি সুপণ্ডিত। অন্যদিকে গ্যেটের মা ছিলেন সহজ সরল উদার হৃদয়ের মানুষ। গ্যেটের জীবনে পিতা এবং মাতা দুজনেরই ছিল ব্যাপক প্রভাব। গ্যেটে লিখেছেন, আমার জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল পিতার কাছ থেকে, মায়ের কাছে পেয়েছিলাম সৃষ্টির প্রেরণা।

ছেলেবেলা থেকেই গ্যেটে ছিলেন এক ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। পিতা যোহান ক্যাসপার চেয়েছিলেন ছেলে তাঁর মতই একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হবে। চার বছর বয়েসে গ্যেটেকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু স্কুলের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে অল্পদিনেই গ্যেটের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। মাস্টারদের শাসন, অন্য ছেলেদের দুষ্টামি, কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার বেড়াজালে কিছুতেই নিজেকে মানিতে নিতে পারলেন না। অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে পিতা তাঁকে বাড়িতে এনে গৃহশিক্ষক রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করলেন। একদিকে চলতে লাগল ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালিয়ান, ইংরাজি ভাষা শিক্ষা, অন্যদিকে ছবি আঁকা, গান শেখা। এরই মধ্যে শৈশব কালেরই গ্যেটের মনে গড়ে উঠেছিল এক ভিন্ন জগৎ। যা প্রচলিত জীবন পথ থেকে স্বতন্ত্র, মাত্র ছ বছর বয়েসে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন গ্যেটে। দুচোখ ভরে দেখতেন প্রকৃতির অপরূপ শোভা। মানুষজন বাড়িঘর জীবনের নানা রূপ। যা কিছু একবার দেখতেন জীবনের স্মৃতিপটে তা অক্ষয় হয়ে থাকত। কৈশোরের এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর নানান রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কৈশোরেই শুরু হয়েছিল তাঁর সাহিত্য জীবনের হাতেখড়ি। তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, "যখন আমার দশ বছর বয়েস তখন আমি কবিতা লিখতে শুরু করি যদিও জানতাম না সেই লেখা ভাল কিম্বা মন্দ। কিন্তু উপলব্ধি করতে পারতাম অসাধারণ কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আমার মধ্যে রয়েছে।" প্রকৃতপক্ষে জন্ম থেকেই তিনি কবি। কবিতা ছিল তাঁর সত্তায় আর সেই সত্তার সাথে মিশে ছিল তাঁর প্রেম। যে প্রেমের শুরু মাত্র পনেরো বছর বয়েসে। শেষ প্রেম চুয়াত্তর বছর বয়েসে।

একদিন গ্যেটে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে সরাইখানায় গিয়েছেন, সেখানে দেখলেন সরাইখানার মালিকের কিশোরী কন্যা মাগুরিতকে। তাঁর চেয়ে কয়েক বছরের বড়। কিন্তু প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলেন গ্যেটে। অল্প দিনেই দুজনে পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেমে আকৃষ্ট হলেন। গ্যেটে লিখেছেন তার প্রতি আমার দুর্নিবার আকর্ষণ আমার মনের মধ্যে সৃষ্টি করল এক নতুন সৌন্দর্যের জগৎ আর আমাকে উত্তোরিত করল পবিত্রতম মহত্ত্বে।

গ্যেটের কৈশোর জীবনের প্রথম প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাগুরিত ফ্রাঙ্কফুর্ট ছেড়ে পিতার সঙ্গে গ্রামে চলে গেলেন।

বিচ্ছেদ বেদনায় সাময়িক ভেঙে পড়লেও ধীরে ধীরে আবার নিজেকে আনন্দ জগতে ভাসিয়ে দিলেন গ্যেটে। সমস্ত দিন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদেই কেটে যায়। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন পিতা। স্থির করলেন আইন পড়বার জন্য গ্যেটেকে লিপজিগে পাঠাবেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধুমাত্র পিতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য গ্যেটে লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। আইনের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ ছিল না তাঁর। ক্লাস কামাই করে অধিকাংশ সময় তিনি ঘুরে বেড়াতেন পথে প্রান্তরে, বাজারে মানুষের ভিড়ে। "আমি মনে করি এই পৃথিবী আর ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কলেজের শিক্ষকদের চেয়ে বেশি। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চার-দেওয়ালের ক্লাসঘরের মধ্যে থেকে আমি যা জানতে পারব, বাইরের উন্মুক্ত পৃথিবীর মানুষদের কাছ থেকে তার থেকে অনেক বেশি জানতে পারবে।"

তাঁর এই জীবনবোধের অনুপ্রেরণায় মাত্র সতেরো বছর বয়সে রচনা করলেন নাটক Lover's Quarrels এবং The fellow Sinners। শেষ নাটকটির বিষয়বস্তু হচ্ছে বিবাহিত জীবনের ব্যভিচার। এক বৃদ্ধ যিনি যৌবনের পাপের জন্য নিয়ত অনুশোচনায় যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, এক নৈতিক প্রশ্ন তাঁর জীবনে বড় হয়ে উঠেছে। তরুণ গ্যেটের মনে হয়েছে। আমরা সকলেই অপরাধী। অপরাধবোধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ পথ অন্যকে ক্ষমা করা, অতীতকে বিস্মৃত হওয়া।

গ্যেটে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা দিয়েছেন। তাঁর স্বপ্নালু চোখ সুদর্শন চেহারা,

প্রাণের উচ্ছলতা সকলকে আকৃষ্ট করে। এক অজানা আকর্ষণে যে তাঁর সংস্পর্শে আসে, সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। উচ্ছ্বাসের রঙিন ফেনায় লিপজিগের দিনগুলি কাটতে থাকে। এই সময় গ্যেটের পরিচয় হল বাড়িওলার মেয়ে এনেৎ-এর সাথে কয়েকদিনের মধ্যেই তার প্রেমে পড়ে গেলেন গ্যেটে। কিন্তু অল্প দিনেই প্রেমের জোয়ারে ভাঁটা পড়ল গ্যেটের। এনেৎ-এর আচরণে তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়লেন। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভেঙে পড়লেন গ্যেটে। উপরন্তু বেহিসেবী উদ্দাম জীবনযাত্রার কারণে তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছিল। গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বন্ধুরা তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করল। কিন্তু অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর গ্যেটে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। আর লিপজিগ ভাল লাগছিল না। ফিরে এলেন ফ্রাঙ্কফুর্টে। যোহান ক্যাসপার চেয়েছিলেন ছেলে আইনজ্ঞ হয়ে ফিরে আসবে। গ্যেটে পিতার কাছে ফিরে এলেন তবে আইনজ্ঞ হয়ে নয়, কবি হয়ে।

ছেলের পরিবর্তন পিতা-মাতার চোখ এড়াল না। তবুও তাঁরা আশা হারালেন না। এই সময় গ্যেটে মায়ের এক বন্ধু তাঁকে এ্যালকেমির (মধ্যযুগের রসায়ন শাস্ত্র) ভর্তি করে দিলেন। শুরু হয় গ্যেটের এ্যালকেমি শিক্ষা। এই এ্যালকেমি বিদ্যাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর ফাউস্টে।

ফাউস্টের জ্ঞান ফিরে আসতেই সে বলল, হেলেনকে ছাড়া জীবনে সে কোন কিছুই চায় না। শয়তান নিয়ে এল হেলেনকে। ফাউস্ট তখন আর্কেডিয়া রাজ্যের রাজা। মিলন হল দুজনের। একটি সন্তান জন্মাল কিন্তু তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল। পুত্রের মৃত্যুর বেদনায় মারা গেল হেলেন। স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুতে ফাউস্টের মনোলোকে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। সকল তুচ্ছতা সংকীর্ণতার উর্ধ্বের উঠে যায় তার মন। সে এক মহত্তর পরিপূর্ণতার ধ্যানে আত্মমগ্ন হতে চায়। সমুদ্রের তীরে এক নির্জন অনুর্বর প্রান্তরে গড়ে তুলতে চায় শস্যক্ষেত্র, নতুন জনবসতি।

ফাউস্টের চিন্তা-ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে শয়তান। এ ফাউস্ট যেন তার ইচ্ছাশক্তির দাস নয়। শয়তানের সাহায্যে গড়ে ওঠে নতুন জনপদ। সেখানে তৈরি হয়েছে প্রাসাদ, বাগান, বাড়ি, ঘর। তৈরি হয়েছে জলাশয়, খাল।

ফাউস্টএখন বৃদ্ধ, ধীর শান্ত। নিজের মধ্যেই আত্মমগ্ন হয়ে থাকে। সেই প্রাসাদের কাছেই থাকত এক বুড়ো-বুড়ি। তাদের কুটিরে বসে উপাসনা করত। তাদের উপসনার ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠত। মাঝে মাঝে এত তন্ময়তার গভীরে ডুব দিত ফাউস্ট, যে সেই মৃদু ঘণ্টাধ্বনিও তার তন্ময়তা ভঙ্গ করত। ফাউস্ট আদেশ দিল ঐ বুড়ো-বুড়িকে সরিয়ে দিতে।

সাথে সাথে শয়তান গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল কুটিরে। এই দৃশ্য দেখে রাগে ফেটে পড়ল ফাউস্ট। সে তো দুই বুড়ো-বুড়িকে হত্যা করতে চায়নি চেয়েছিল অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে।

বয়েসের ভারে ক্রমশই স্থবির আসে ফাউস্ট। চোখের দৃষ্টি কমে আসে। কিন্তু তবুও কাজ করে চলে ফাউস্ট। তার অপর কোন কামনা নেই, স্বর্গের কোন ভাবনা নেই তার, যা কিছু কাজ এই পৃথিবীতে শেষ করে যেতে হবে।

শ্রমিকেরা কাজ করে। তাদের বিচিত্র শব্দ ভেসে আসে। ফাউস্টের মনে হয় কর্মের মধ্যে যেন সঙ্গীতের সুর। এক অপার্থিব আনন্দে তার সমস্ত অন্তর ভরে ওঠে।

গড়ে উঠেছে নতুন জনপদ, কৃষিক্ষেত্র, জীবনের প্রবাহ। ফাউস্টের মন আনন্দে ভরে ওঠে। মনে তার সব কাজ শেষ হয়েছে। পরম শান্তিতে মৃত্যুবরণ করে।

শয়তান আসে ফাউস্টের আত্মাকে দখল করতে। কিন্তু তার আগে এসে দাঁড়াল দেবদূতের দল। শয়তান চেয়েছিল সুখ আর ভোগের বিলাসে ফাউস্টকে ভাসিয়ে দিতে। কিন্তু সেই সুখ আর ভোগবিলাসকে অতিক্রম করে ফাউস্ট খুঁজে পেয়েছিল এক মহত্তর জীবন। তাই শয়তানের কোন অধিকার নেই তার উপর। দেবদূতের দল তার আত্মাকে নিয়ে গেল ঈশ্বরের কাছে।

সংক্ষেপে এই ফাউস্টের কাহিনী। মহাকবি গ্যেটে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে গড়ে তুলেছেন এই ফাউস্টের। ফাউস্ট যেন তাঁরই আত্মার প্রতিরূপ। সে সমস্ত জীবন কর্মের সাধনায়, জ্ঞানের সাধনায় নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছিল। ফাউস্টের মধ্যে ফুটে উঠেছে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি। মানুষ জীবনের সব আশা-নিরাশা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পাপ-পুণ্য নিয়ে আত্মিক-আধ্যাত্মিক সংকটের বিচিত্র রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। এই কাব্য পৃথিবীর সাহিত্য জগতের এক অনন্য সম্পদ। ফাউস্টের রচনাপর্বেই গ্যেটে রচনা করেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা "কাব্য এবং সত্য"। যদিও এতে তিনি সঠিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি তবুও তাঁর জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

জীবনের শেষ পর্বে এসে প্রাচ্যের কবি হাফিজের কাব্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁরই প্রভাবে রচনা করেন বেশ কিছু কবিতা।

বৃদ্ধ হয়েও যৌবনের মত তারুণ্যের দীপ্তিতে ভরপুর হয়ে থাকতেন গ্যেটে। শোনা যায় ভাইমারের যুদ্ধের পর যখন নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী জার্মানি দখল করে, নেপোলিয়ন আদেশ দিয়েছিলেন গ্যেটের প্রতি সামান্যতম অমর্যাদা যেন না করা হয়। তিনি গ্যেটেকে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর প্রাসাদে।

১৮৩২ সালের ২২শে মার্চ। কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন গ্যেটে। অনুরাগীরা তাঁকে এনে বসিয়ে দিল তাঁর পাঠকক্ষের চেয়ারে। সকলেই অনুভব করছিল কবির জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে আসছে। এক বিষণ্ন বেদনায় আচ্ছন্ন হয়েছিল তাদের মন। দিন শেষ হয়ে এসেছিল। বাইরে অন্ধকারের ছায়া নেমে এসেছিল।

গ্যেটে চোখ মেলে তাকালেন। অস্ফুটে বলে উঠলেন, "আরো আলো।"

তারপরই স্তব্ধ হয়ে গেল চির আলোর পথিক গ্যেটের মহাজীবন।

৪৫

চার্লি চ্যাপলিন

[১৮৮৯-১৯৭৭]

শিল্প-সংস্কৃতির এক বিশেষ ধারা হাস্যকৌতুক- দর্শক এবং শ্রোতাকে নির্মল আনন্দদানই যার লক্ষ্য। বিষয়টি হালকা মনে হলেও কিন্তু সহজ নয়। অনেক হাসির খোরাক হয় বটে, কিন্তু মানুষ হাসিয়ে আনন্দদানের ব্যাপারটি আয়ত্ত করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু এই অসাধ্য কাজটি যিনি অনায়াসে সাধন করতে পেরেছিলেন তিনি ছিলেন হাসির রাজা স্যার চার্লি চ্যাপলিন–যাঁর নাম শুনলেই বিশ্বজুড়ে সবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি হাস্যকৌতুকপূর্ণ মুখের ছবি।

যাঁকে দেখামাত্রই শিশু-কিশোর যুবা-বৃদ্ধ সবাই এমনিতেই হাসিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রে কৌতুকাভিনয় বলে একটি বিশেষ ধারা গড়ে উঠেছে। কৌতুক, হাসি, তামাশা, ঠাট্টা, ইয়ার্কি ইত্যাদির একটি বিশেষ ধরনই আধুনিক কৌতুক। আর এই বিশেষ ধারাটি যাঁর দক্ষ হাতের স্পর্শে পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে তিনি হলেন কৌতুকাভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন।

চার্লি চ্যাপলিনের আসল নাম ছিলো চার্লস স্পেনসার। চ্যাপলিনের পিতার নামও ছিলো চার্লস চ্যাপলিন। মায়ের নাম ছিল লিলি হার্নি।

পিতামাতা দু'জনেই ছিলেন অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান। ভবঘুরে যাত্রাদলের নর্তক-নর্তকী। মা লিলি হার্নি গান গাইতেন আর নাচতেন। আর চার্লস বাদ্য বাজাতেন আর মাঝে মধ্যে অভিনয় করতেন।

লিলি হার্নির একবার বিয়ে হয়েছিল জনৈক বড়লোকের সাথে। কিন্তু এ বিয়ে টেকেনি। যাত্রাদল থেকেই এক বড়লোকের সাথে ভাব করে বিয়ে বসেছিলেন লিলি। তিন বছর পর এই বিয়ে ভেঙে গেলে লিলি আবার এসে জুটেছিলেন আগের দলে। তখনো চার্লস সে দলেই কাজ করতেন। দু'জনের সাথে আগেই পরিচয় ছিলো। এবার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হলো। তারপর বিয়ে। আর তাঁদের সংসারেই জন্ম হলো বিশ্বখ্যাত কৌতুকাভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যাত্রাদলে নেচে আর গান গেয়ে সামান্য আয় করতেন। তা দিয়ে তাদের সংসার চলতো না ঠিকমতো। সবসময় অভাব-অনটন লেগেই থাকতো। এ ছাড়া চ্যাপলিনের বাবা চার্লসের স্বভাবও খুব ভালো ছিলো না। ছিলো নেশা করার অভ্যাস। সামান্য যা আয় করতেন তার বেশিরভাগই খরচ করতেন নেশা করে।

অতঃপর লিলি হার্নির দ্বিতীয় বিয়েও টিকলো না। নেশাখোর স্বামীর ঘর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। চার্লির জন্মের কয়েক বছর পরেই তাঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। মা লিলি ছেলে চ্যাপলিনকে নিয়েই রয়ে গেলেন যাত্রাদলে। বাবা চলে গেলেন অন্যত্র।

মায়ের দেখাদেখি ছোটবেলা থেকেই গানের এবং অভিনয়ের চর্চা করতেন চ্যাপলিন। তাঁর গলার সুর ছিলো ভারি চমৎকার।

মা যেখানেই যেতেন ছেলে তাঁর সাথে থাকতেন। মা যতক্ষণ স্টেজে গান গাইতেন বা নাচতেন, চ্যাপলিন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতেন। সর্বক্ষণ নজর থাকতো মায়ের উপর। হঠাৎ একদিন তাঁর মায়ের অনুষ্ঠানে ঘটলো এক অঘটন। সেটা ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। মা স্টেজে গান

গাইতে উঠেছেন। তাঁর শরীরটা দুদিন থেকেই খারাপ ছিলো। পয়সার অভাবে অসুস্থ শরীর নিয়েও গান গাইতে এসেছিলেন। ফলে যা হবার তাই হলো। স্টেজে গান গাইতে গাইতেই মায়ের গলার আওয়াজ বের হলো না। ওদিকে দর্শকের গ্যালারি থেকে শুরু হলো হই হল্লোড়-চিৎকার। মা নিজের অবস্থা এবং স্টেজের হইচই দেখে আরো ঘাবড়ে গেলেন। পরে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় তিনি পালিয়ে এলেন স্টেজ থেকে।

পাশে দাঁড়িয়ে সব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছিলেন বালক চ্যাপলিন। যখন মা স্টেজ থেকে বের হয়ে এলেন তখনই চ্যাপলিন এক অবাক কান্ড করে বসলেন।

তিনি গিয়ে সোজা দাঁড়ালেন স্টেজে দর্শকের সামনে। তারপর ধরলেন গানঃ

Jack Jones well and
Known to everybody.

তাঁর চমৎকার গলা শুনে দর্শকরা তো থ বনে গেলো। মুহূর্তে থেমে গেলো গোলমাল। এবার দর্শকরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো এবং সেই সাথে টাকা আধুলি সমানে এসে ছিটকে পড়তে লাগলো স্টেজে। বৃষ্টির মতো। সবাই তাঁর গানে খুশি।

তবে এরই মধ্যে আরেক মজার কাণ্ড করে বসলেন চ্যাপলিন। যখন দেখলেন বৃষ্টির মতো তাঁর চারপাশে টাকাপয়সা এসে ছিটকে পড়ছে অমনি গান থামিয়ে দর্শকদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন–আমি এখন আর গান গাইব না। আগে পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিই, তারপর আবার গাইবো।

চ্যাপলিন এমন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে কথাগুলো বললেন যে দর্শকরা একটুও রাগ না করে বরং আরো মজা করে হাসতে লাগলো। এবং আরো পয়সা পড়তে লাগলো। চ্যাপলিনও নানা অঙ্গভঙ্গি করে করে স্টেজের পয়সা কুড়াতে লাগলেন।

সব পয়সা সংগ্রহ শেষ হলে স্টেজের বাইরে দাঁড়ানো মায়ের হাতে তুলে দিয়ে এসে আবার নতুন করে গান ধরলেন চ্যাপলিন।

শুধু দর্শকবৃন্দ নয়, সেদিন মা নিজেও ছেলের প্রতিভা দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন, হয়তো-বা ভবিষ্যতে তাঁর ছেলে বিস্ময়কর কিছু একটা হবে।

মায়ের আশা পূর্ণ হয়েছিলো চ্যাপলিনের জীবন প্রতিষ্ঠায়।

চার্লি চ্যাপলিন প্রথম জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন। তাঁর কিশোর-জীবন কাটে মুদি দোকানে, ছাপাখানায়, রাস্তায় কাগজ বেঁচে, ওষুধের দোকানে এবং লোকের বাড়িতে কাজ করে।

চার্লি চ্যাপলিন ছিলেন তাঁর সময়কার সবচেয়ে আলোচিত ও প্রশংসিত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের একজন। বিশ্বের কোটি কোটি দর্শক আজো তাঁর অপূর্ব অভিনয়দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হন–প্রশংসায় হন পঞ্চমুখ।

চিত্রসমালোচকদের মতে চার্লি চ্যাপলিন তাঁর সময়কার নির্বাক চলচ্চিত্রকে একটি উন্নত শিল্পে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই কৌশলী অভিনেতার জন্ম হয়েছিলো ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল ইংল্যান্ডে। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি জন্মভূমি ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে আসেন আমেরিকায়।

এখানে এসে তিনি জড়িয়ে পড়েন চলচ্চিত্র জগতের সাথে। প্রবেশ করেন হলিউডে।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কিস্টোন স্টুডিওতে চ্যাপরিন একটি কমেডি ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ লাভ করেন। তবে এখানে তিনি ছিলেন অন্যান্য সাধারণ অভিনেতাদের মধ্যে একজন। তাঁর ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অনিশ্চিত। কিন্তু দ্বিতীয় ছবি 'কিড আটোরেসেস অ্যাট ভেনিস' ছবিতে অভিনয় করেই চার্লি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি প্রদর্শন করতে সক্ষম হন।

এই ছবিতে অভিনয় করার সময় তিনি প্রযোজকের পোশাক-পরিচ্ছদেও কৌতুক আনার চেষ্টা করেন এবং সেজন্য বিশেষ অদ্ভুত ধরনের ব্যাগের মতো প্যান্ট, বিরাট জুতো পরিধান করেছিলেন। আর সেই সাথে লাগিয়েছিলেন একটি নকল গোঁফ–এভাবেই তৈরি হয় 'লিটল ট্রাম্প'। চলচ্চিত্র জগতে চ্যাপলিন নিজেই নিজের ভাগ্যকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষমও হয়েছিলেন। তাঁর দক্ষতা, বিপুল জনপ্রিয়তা একদিকে সৃজনশীল প্রতিভা এবং অন্যদিকে অর্থের দ্বার–দুটোই খুলে দিয়েছিলো।

চ্যাপলিনের জীবনের প্রথম প্রযোজক ম্যাকসিনট ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দেই যুবক চ্যাপলিনকে

দিয়েছিলেন ছবি পরিচালনার গুরু দায়িত্ব আর পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন সপ্তাহে ১৫০ ডলার করে। এক বছর সময়ের মধ্যে তিনি ৩৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণ করেন।

এক পরের বছর এখানে ছবি তৈরি করার জন্য তাঁকে সপ্তাহে ১২০০ ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তারও বছর দেড়েক পর, 'মিউচ্যুয়াল ফিল্ম করপোরেশন' তাঁকে সপ্তাহে ১২,৮৪৪ ডলার করে দেয় এবং বোনাস হিসেবে দেয় দেড় লাখ ডলার। এরপর আরো উন্নতি হয় তাঁর। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রদর্শক সার্কিটের সাথে ১০,০০,০০০ ডলারের এক চুক্তি করেন।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নীতিগর্হিত কাজের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য এ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। এরপর তিনি সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়েও একটি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।

এ ছাড়া যুদ্ধোত্তর আমেরিকায় কম্যুনিস্টবিরোধী পরিবেশে কম্যুনিস্টদের প্রতি তাঁর কথিত সহানুভূতি ও তাদের সাথে গোপন যোগাযোগ সম্পর্কে একটি কংগ্রেসীয় কিমিটি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপ ভ্রমণকালে তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পারমিট বাতিল করা হয়। অবশ্য তিনি কখনো যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেননি।

তাঁর এই মর্মবেদনা নিয়ে তিনি সুইজারল্যান্ডে চলে যান। সেখানেই তাঁর বাদবাকি জীবন কাটে সর্বশেষ স্ত্রী উনা ও' নীলের সাথে। উনা ছিলেন নোবেল বিজয়ী নাট্যকার ইউজীন ও' নীলের মেয়ে।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লি চ্যাপলিনের আত্মকথা 'My Autobiography' প্রকাশিত হয়। সে সময় তাঁর এই বই সর্বকালের বেস্টসেলার হিসেবে বিক্রি হয়। তবে চ্যাপলিনের বইতে তাঁর কাজ করার ভঙ্গি বা কায়দা সম্পর্কে কোনো বর্ণনা ছিলো না।

সুইজারল্যান্ডেই অবশেষে বিশ্বের কোটি কোটি দর্শকের প্রিয় অভিনেতা হাসির সম্রাট'চার্লি চ্যাপলিন প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। চার্লি চ্যাপলিন আমাদের মধ্যে না থাকলেও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মনে এক বিশাল শিল্পীর ক্যানভাস হিসেবেই বেঁচে আছেন।

৪৬

স্বামী বিবেকানন্দ

[১৮৬৩-১৯০২]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিবেকানন্দ এক যুগপুরুষ। ভারত আত্মার মূর্ত রূপ। তাঁরই মধ্যে একই সাথে মিশেছে ঈশ্বর প্রেম, মানব প্রেম আর স্বদেশ প্রেম। তাঁর জীবন ছিল মুক্তির সাধনা-সে মুক্তি জাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তির। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই মানুষ যেন নিজেকে সকল বন্ধনের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে। সন্ন্যাসী হয়েও ঈশ্বর নয়, মানুষই ছিল তাঁর আরাধ্য দেবতা। তাই মানুষের কল্যাণ, তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলই ছিল তাঁর সাধনা।

তিনি বলতেন, "যে সন্ন্যাসীর মনে অপরের কল্যাণ করার ইচ্ছা নেই সে সন্ন্যাসীই নয়। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, সকলের ঐহিক ও পরমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সর্ব মানবের কাছেই এক আদর্শ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনিই প্রথম উচ্চারণ করলেন, ঈশ্বর নয় মানুষ। মানুষের মধ্যেই ঘটবে ঈশ্বরের পূর্ণ বিকাশ। তিনি যুগ যুগান্তরের প্রথা ধর্ম সংস্কার ভেঙে ফেলে বলে উঠলেন আমরা অমৃতের সন্তান। শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরলেন সেই অমৃতময় বাণী। পরাধীন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, I have a message to the west. তাঁর সেই Message-প্রাসঙ্গিকতা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছে বর্তমান বিশ্ব।

বিবেকানন্দের আবির্ভাবকাল এমন একটা সময়ে যখন বাংলার বুকে শিক্ষা সাহিত্য ধর্ম সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই শুরু হয়েছে নবজাগরণের যুগ। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ধনী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন উত্তর কলকাতার নামকরা আইনজীবী। তাঁর মধ্যে গোঁড়া হিন্দুয়ানী ছির না। বহু মুসলমান পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উদার বন্ধুবৎসল দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি।

বিশ্বনাথ দত্তের কন্যাসন্দান থাকলেও কোন পুত্র ছিল না। স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবী শিবের কাছে নিত্য প্রার্থনা করতেন। অবশেষে ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী জন্ম হল তাঁর প্রথম পুত্রের। ডাক নাম বিলো, ভাল নাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। যদিও তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ নামে।

ছেলেবেলায় নরেন্দ্রনাথ ছিলেন যেমন চঞ্চল তেমনি সাহসী। সকল বিষয়ে ছিল তাঁর অদম্য কৌতূহল। বাড়িতে গুরুমহাশয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হলেন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। তিনি সর্ব বিষয়ে ছিলেন ক্লাসের সেরা ছাত্র। কৈশোরেই তাঁর মধ্যে দয়া-মায়া, মমতা, পরোপকার, সাহসিকতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি নানা গুণের প্রকাশ ঘটেছিল।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। ছেলেবেলা থেকেই নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন, কুস্তি বক্সিং দুটিতেই ছিল তাঁর সমান দখল নিয়মিত ক্রিকেট খেলতেন। কর্মক্ষেত্রে সবল নিরোগ দেহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই তিনি চির রুগ্ন বাঙালীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, গীতা পাঠ করার চেয়ে ফুটবল খেলা বেশি উপকারী।

১৮৭৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্রনাথ জেনারেল এসেম্বলী ইনস্টিটিউশনে এফ, এ পড়ার জন্য ভর্তি হলেন, এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিম হেস্টি। তিনি ছিলেন কবি দার্শনিক উদার হৃদয়ের মানুষ। তাঁর সান্নিধ্যে এসে দেশ বিদেশের দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। পরবর্তীকালে যিনি এই দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে এতখানি বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেস্টি তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "দর্শনশাস্ত্রে নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ দখল, আমার মনে হয় জার্মানী ও ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই তার মত মেধাবী ছাত্র নেই।"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুশীলনে নরেন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে এক ঝড় সৃষ্টি করল। একদিকে প্রচলিত বিশ্বাস ধ্যান ধারণা সংস্কার, অন্যদিকে নবচেতনা—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত সত্যকে জানার আশায় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন।

ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, নারীদের প্রতি মর্যাদা তাঁকে আকৃষ্ট করলেও ব্রাহ্মদের অতিরিক্ত ভাবাবেগ, কেশবচন্দ্রকে প্রেরিত পুরুষ হিসেবে পূজা করা তাঁর ভাল লাগেনি। কিন্তু এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশে তিনি নিয়মিত ধ্যান করতে আরম্ভ করলেন। আচার-ব্যবহারে, আহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি প্রায় ব্রহ্মচারীদের মতই জীবন যাপন করতেন।

যতই দিন যায় সত্যকে জানার জন্যে ব্যাকুলতা ততই বাড়তে থাকে। পরিচিত অপরিচিত জ্ঞানী মূর্খ সাধুসন্ত যাদেরই সাথে সাক্ষাৎ হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঈশ্বর আছেন, কি নেই? যদি ঈশ্বর থাকেন তবে তাঁর স্বরূপ কি?—কারোর কাছেই এই প্রশ্নের উত্তর পান না। ক্রমশই মনের জিজ্ঞাসা বেড়ে চলে। বার বার মনে এমন কি কেউ নেই যিনি এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন!

১৮৮০ সালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সিমলাপল্লীতে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে এসেছিলেন। সেখানেই প্রথম রামকৃষ্ণের সাথে পরিচয় হল নরেন্দ্রনাথের। নরেন্দ্রনাথের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

প্রথম পরিচয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মনে কোন রেখাপাত করতে পারেননি। পরীক্ষার ব্যস্ততার জন্য অল্পদিনেই নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের কথা ভুলে যান। এফ এ পরীক্ষার পর বিশ্বনাথ দত্ত পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বিবাহ করে সংসার জীবনে আবদ্ধ হবার কোন ইচ্ছাই ছিল না নরেন্দ্রনাথের। তিনি সরাসরি বিবাহের বিরুদ্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ করলেন।

১৯০১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠের ট্রাস্ট ডীড রেজিস্ট্রী হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারি মঠের ট্রাস্টীদের সর্বসম্মতিক্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ এবং স্বামী সারদানন্দ সাধারণ সম্পাদক হন। স্বামীজী মঠের সমস্ত কাজকর্ম থেকে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান। কেউ কোন পরামর্শ চাইলে তিনি তাদের বুদ্ধিমত কাজ করার পরামর্শ দিতেন। অত্যধিক পরিশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। বেশির ভাগ সময় ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে জাপানী পণ্ডিত ডাঃ ওকাবুর সাথে বুদ্ধগয়ায় গেলেন। সেখানে থেকে কাশী। কিছুদিন পর আবার বেলুড়ে ফিরে এলেন। শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। ১৯০২ সালের ৩রা জুলাই স্বামীজী তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের খাওয়ার পর নিজে হাত ধুইয়ে দিলেন। একজন

জিজ্ঞাসা করল আমরা কি আপনার সেবা গ্রহণ করতে পারি? স্বামীজী বললেন, যীশুও তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

পরদিন ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজী সকাল থেকেই উৎফুল্ল ছিলেন। সকলের সঙ্গে একসাথে খেয়ে সন্ধ্যায় পর নিজের ঘরে ধ্যানে বসলেন রাত ৯টা ৫০ মিনিটে সেই ধ্যানের মধ্যেই মহাসমাধিতে ডুবে গেলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর ৬ মাস।

৪৭

জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

[১৮৩১—১৮৭৯]

চুম্বক, তড়িৎ ও তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গতত্ত্বের উপর যাঁর গবেষণা এককালে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, সেই বিজ্ঞানীর নাম জেমস ক্লার্ক মাক্সওয়েল। তড়িৎ বিজ্ঞানে তিনি যে সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন সেই সূত্রটি "ম্যাক্সওয়েলের কর্ক স্ক্রু সূত্র" নামে প্রসিদ্ধ। এই সূত্রের সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহের ফলে চুম্বক শলাকার দিক নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন, পরিবাহী তারের মধ্যদিয়ে যে দিকে তড়িপ্রবাহ চালনা করা হয়—উদাহরণস্বরূপ একটি ডানপাকের কর্ক স্ক্রুকে পরিবাহী তার বরাবর সেই দিকে ঘোরান হলে হাতের বুড়ো আঙুলটি যে দিকে ঘুরে চুম্বক শলাকার উত্তর মেরু সেই দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। ম্যাক্সওয়েলের এই আবিষ্কারটি তড়িৎ বিজ্ঞানে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ম্যাক্সওয়েলের যে আবিষ্কারটিকে যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে সেটি তড়িৎচুম্বক তরঙ্গতত্ত্ব। প্রকৃতপক্ষে উক্ত তরঙ্গতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম সঠিক ধারণা দিয়েছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে অথবা চুম্বক ক্ষেত্রে সামান্যতম বিশৃঙ্খলা ঘটলেই আলোর গতির সমান একটি তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ বেরিয়ে আসে। ঐ তরঙ্গের ধর্মও সাধারণ আলোর ধর্মের মতই অর্থাৎ আলোকের মত ওদেরও হয় প্রতিফলন, প্রতিসরণ, পোলারাইজেশন প্রভৃতি।

জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর এনিবরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী। তবুও বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর অনুরাগ। তাই চেয়েছিলেন, পুত্রকে তিনি বিজ্ঞান পড়াবেন।

মাক্সওয়েলের লেখাপড়ার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর পিতা। এমন কি অবসর সময়ে নিজেই বসতেন ছেলেকে পড়াতে। একমাত্র পুত্র ছিলেন বলে হয়ত পিতার স্নেহের মাত্রা একটু বেশিই ছিল। তথাপি পুত্রের উন্নতির জন্য শাসন করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

মাত্র ষোল বছর বয়সে ম্যাক্সওয়েলের উদ্ভাবনী শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন পিতা। যে কয়েকটি যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল, সেগুলি পিতা একদিন দেখতে দিলেন তৎকালীন একজন নামকরা বিজ্ঞানী "ফোরবীজ"কে। ফোরবীজ সেগুলি দেখে বালকের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রেরণ করেন লন্ডনের রয়েল সোসাইটিতে। শোনা যায়, রয়েল সোসাইটিও ম্যাক্সওয়েলের প্রশংসা করে সার্টিফিকেট প্রদান করেছিল।

সতের বছর বয়সের সময় ম্যাক্সওয়েল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পাশ করার পর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বেশ কিছুদিন চুম্বক ও তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। অতঃপর উন্নততর গবেষণার জন্য তিনি যোগদান করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এইখানে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর প্রসিদ্ধ "কর্ক স্ক্রু সূত্রটি।" কথিত আছে, কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে ম্যাক্সওয়েল তৎকালীন ইংল্যান্ডের সেরা বিজ্ঞানী ফ্যারাডের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় তড়িৎচুম্বক সম্বন্ধে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ম্যাক্সওয়েল কেবলমাত্র পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন না, অঙ্কশাস্ত্রে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানেও ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কিংস কলেজ তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় এবং ম্যাক্সওয়েলও গ্রহণ করেন এখানকার পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ।

কিংস কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল আবিষ্কার করেন আলোকের তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গতত্ত্ব।

ম্যাক্সওয়েল বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন বলে উক্ত তরঙ্গতত্ত্বের ধারণা করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর। অবশ্য তৎকালীন বিজ্ঞানীদের ইথার ও আলোক তরঙ্গের ধারণা, বিদ্যুৎ কারেন্ট ও চৌম্বক ক্ষেত্র প্রভৃতি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তিনি। পরে আলোক তরঙ্গকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সহজ গণিতের পরিবর্তে উচ্চ গণিতের দুটি শাখা 'ভেক্টর' ও 'ক্যালকুলাস' প্রয়োগ করেছিলেন।

ম্যাক্সওয়েলের মতবাদকে সেদিন বিজ্ঞানীরা সোজাসুজি মেনে নিতে পারেন নি। চারদিক থেকে উঠেছিল খর তর্কের ঝড়। শেষে সব তর্কের হয় অবসান। ম্যাক্সওয়েলের নাম ছড়িয়ে পড়ে বিজ্ঞানজগতে। এবার আমন্ত্রণ এল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনিও কিংস কলেজ পরিত্যাগ করে যোগদান করেন কেম্ব্রিজে।

ম্যাক্সওয়েল কিছুকাল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন। একদা শনিগ্রহের বলয় সম্বন্ধে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ চারিদিকে আলোড়ন তুলেছিল এবং উক্ত প্রবন্ধটির জন্য তিনি লাভ করছিলেন "এডমস্ পুরস্কার"।

কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থেরও রচয়িতা ম্যাক্সওয়েল। গ্রন্থগুলি মধ্যে "তাপতত্ত্ব"এবং "পদার্থ গতি" নামক দুখানি গ্রন্থ বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ পরিচিত। তাছাড়া ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত "ট্রিটিজ অন ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম" নামক গ্রন্থটি তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

ম্যাক্সওয়েলের জীবনের একটি বড় কীর্তি লন্ডনে "ক্যাভেন্ডিস ল্যাবোরেটরি" নামক বিখ্যাত গবেষণাগারটির প্রতিষ্ঠা। সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাধানেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন উক্ত গবেষণাগারটি এখনও গবেষণাগারটির সুনাম বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে ম্যাক্সওয়েলের। চল্লিশ বছর বয়স অতিক্রমের পরই তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তবুও গবেষণা এবং পুস্তক রচনায় ভাটা পড়েনি। অবশেষে সুদীর্ঘকাল রোগভোগের পর ৪৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনটি ছিল ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর।

ম্যাক্সওয়েল দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারলে বিজ্ঞানে হয়ত আরও বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজিত হতো। তবুও যা তিনি দান করেন গেছেন তার পরিমাণও বড় কম নয়।

৪৮

চার্লস ডিকেন্স্

[১৮১২—১৮৭০]

ইংল্যাণ্ডের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের জীবন তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর মতই বড় বিচিত্র। ১৮২২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি পোর্টস মাইথ শহরে তাঁর জন্ম। আট ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। বার জন ডিকেন্স নৌ বিভাগের সামান্য কেরানি ছিলেন। ডিকেন্সের যখন চার বছর বয়েস তার বাবা এলেন চ্যাথামে। এখানেই তাঁর শৈশবের আনন্দভরা দিনগুলি কেটেছিল।

ডিকেন্সের মা ছিলেন শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। নিজেও প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শেষ করেছিলেন। ডিকেন্সের শিক্ষা প্রথম পাঠ শুরু হয় তাঁর মায়ের কাছে। কিছুদিন পর স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হলেন।

ছেলেবেলা থেকেই ডিকেন্স দেখতেন দোতালায় বাবার ঘরে বিরাট একটা আলমারী ভর্তি সারি সারি বই। বইগুলো তাঁকে আকর্ষণ করত কিন্তু তাতে হাত দেওয়া নিষেধ ছিল।

ছেলের আগ্রহ দেখে বাবা তাকে ইচ্ছামত আলমারি থেকে বই নিয়ে পড়ার অনুমতি দিলেন। ডিকেন্সের সামনে যেন এক নতুন জগতের দ্বার খুলে গেল। মাত্র নয় বছরের মধ্যেই ইংরাজী সাহিত্যের অধিকাংশ দিকপাল লেখকদের লেখা বই পড়ে শেষ করে ফেললেন।

কিন্তু ডিকেন্সের বাবার আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছিল। বিরাট সংসারের ব্যয় মেটাতে প্রতি মাসেই ধার করতে হত। ধার শোধ হত না, শুধু সুদ বেড়েই চলছিল। নিরুপায় হয়ে ক্যামডেনের এক বস্তি বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ডিকেন্সের স্কুল বন্ধ হয়ে গেল।

পাওনাদাররা কোর্টে নালিশ জানাল। দেনার দায়ে ডিকেন্সের বাবাকে জেলে যেতে হল। কোর্টের আদেশে তাঁদের বাড়ির প্রায় সব কিছুই নিয়ে যাওয়া হল, তার মধ্যে ডিকেন্সের প্রিয় বইগুলো ছিল। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হল হার্ড টাইমস। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই উপন্যাস লেখা হয়েছিল। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় তৎকালীন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল মতবাদের বাস্তব ফল। একদিকে যখন অবিশ্রান্ত লিখে চলছিলেন, তখন হাউস, হোল্ড ওয়ার্ডস নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ল (১৮৫০) তাঁর উপর। প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পর "অল দি ইয়ার রাউণ্ড" (All the Year round) নামে আর একটি পত্রিকার সগল।

বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তীকালে ডিকেন্স যে সব উপন্যাস রচনা করলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— এ টেল অফ টু সিরিজ। (A tale of two cities) এ গ্রেট এক্সপেকটেশন (Great expectations)। A tale of two cities ফরাসী বিপ্লবের উপর লেখা রোমান্টিক উপন্যাস। দুটি শহর লণ্ডন ও প্যারিস। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে এই দুটি শহরের মানুষের জীবনকথা জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে।

১৮৬০ সালে প্রকাশিত হল Great expectations। এখানে নায়ক তার কাহিনী নিজেই বর্ণনা করেছেন। এ কাহিনীর নায়ক পিপ গ্রামের দরিদ্র বালক। সে স্বপ্ন দেখে একদিন সে বড় হবে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র কাহিনী ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসের মধ্যে।

ডিকেন্সের শেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেণ্ড (Our Mutural Friend)। এই পর্যায়ে ডিকেন্সের প্রতিভা অনেক অংশে স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

গত কয়েক বছর ধরে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে একক পাঠ করতে করতে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সামান্য সুস্থ হতেই নূতন উপন্যাস শুরু করলেন, Edwin drood। রহস্য কাহিনী, কিন্তু এই কাহিনী শেষ করে যেতে পারেননি ডিকেন্স।

১৮৭০ সালের ৪ঠা জুন বিশেষ অনুরোধে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে উপন্যাসের একটি অংশ পড়তে পড়তে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। পাঁচ দিন পর ৯ই জুন তাঁর মৃত্যু হল। তখন তাঁর বয়েস মাত্র আটান্ন। তাঁর দেহ ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবিতে কবিদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে সমাহিত করা হল।

মৃত্যুর সময়ে তিনি বারোটি সম্পূর্ণ, একটি অসমাপ্ত উপন্যাস, ছোটদের জন্যে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, বাইবেলের গল্প, বেশ কিছু ছোট গল্প, কৌতুক নক্সা ও কয়েকটি নাটক রেখে যান।

ডিকেন্স তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার মধ্যে দিয়ে সমগ্র ভিক্টোরিয়া যুগকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র সৃষ্টির আনন্দের জন্য তিনি কলম ধরেননি। তিনি দেখেছিলেন সমাজের সব অবক্ষয় কদর্যতা অভিজাত সমাজের ক্ষয়ে আসা কুৎসিত জীবন, শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত গ্লানি—সব কিছুর বিরুদ্ধে তাঁর লেখনি নির্মম হয়ে উঠেছিল।

তিনি বিপ্লবী না হলেও সমাজে এক বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারের ঢেউ উঠেছিল।

এই ঢেউতে দূর হয়ে গিয়েছিল অনেক পাপ, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার। সম্ভবত সেই কারণেই বার্ণার্ড শ যথার্থই বলেছিলেন, "Of all English writers... only Charles Dickens who did much to cure the evils of his time."

৪১

এ্যাডলফ হিটলার

[১৮৮৯-১৯৪৫]

হিটলারের জন্ম ১৮৮৯ সালের ২০এপ্রিল অস্ট্রিয়া ব্যাভেরিয়ার মাঝামাঝি ব্রনাউ নামে এক আধা গ্রাম আধা শহর। বাবা একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে সামান্য চাকরি করত। যা আয় করত তার তিন পত্নী আর তাদের ছেলেমেয়েদের দু বেলা খাবার সংকুলানই হত না। হিটলার ছিলেন তার বাবার তৃতীয় স্ত্রীর তৃতীয় সন্তান। ছয় বছর বয়সে স্থানীয় অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি হলেন।

ছেলেবেলা থেকেই হিটলার ছিলেন একগুয়ে, জেদী আর রগচটা। সামান্য ব্যাপারেই রেগে উঠতেন। অকারণে শিক্ষকদের সঙ্গে তর্ক করতেন। পড়াশুনাতে যে তার মেধা ছিল না এমন নয়। কিন্তু পড়াশুনার চেয়ে তাকে বেশি আকৃষ্ট করত ছবি আঁকা। যখনই সময় পেতেন কাগজ পেন্সিল নিয়ে ছবি আঁকতেন।

এগারো বছর বয়সে ঠিক করলেন, আর পড়াশুনা নয়, এবার পুরোপুরি ছবি আঁকতেই মনোযোগী হবেন। বাবার ইচ্ছা ছিল স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে কোন কাজকর্ম জুটিয়ে নেবে। বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধেরই স্কুল ছেড়ে দিলেন হিটলার। স্থানীয় এক আর্ট স্কুলে ভর্তির চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। একটা বেসরকারী স্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু কয়েক মাস পর অর্থের অভাবে স্কুল ছেড়ে দিলেন।

মা মারা গেলে সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন হিটলার। ভিয়েনাতে চলে এলেন। ভিয়েনাতে এসে তিনি প্রথমে মজুরের কাজ করতেন। কখনো মাল বইতেন। এর পর রং বিক্রি করতে আরম্ভ করলেন। ভিয়েনাতে থাকার সময়েই তার মনের

মধ্যে প্রথম জেগে ওঠে ইহুদী বিদ্বেষ। তখন জার্মানির অধিকাংশ কলকারখানা, সংবাদপত্রের মালিক ছিল ইহুদীরা। দেশের অর্থনীতির অনেকখানিই তারা নিয়ন্ত্রণ করত। হিটলার কিছুতেই মানতে পারছিলেন না, জার্মান দেশে বসে ইহুদীরা জার্মানদের উপরে প্রভুত্ব করবে।

১৯১২ সালে তিনি ভিয়েনা ছেড়ে এলেন মিউনিখে। সেই দুঃখ-কষ্ট আর বেচে থাকবার সংগ্রামে আরো দুটো বছর কেটে গেল। ১৯১৪ সালে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। হিটলার সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে যোগ দিলেন। এই যুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিলেও কোন পদোন্নতি হয়নি।

যুদ্ধ শেষ হল। দেশ জুড়ে দেখা দিল হাহাকার আর বিশৃঙ্খলা। তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বিভিন্ন বিপ্লবী দল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এদের উপর গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য হিটলারকে নিয়োগ করলেন কর্তৃপক্ষ।

সেই সময় প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল লেবার পার্টি। তিনি সেই পার্টির সদস্য হলেন। অল্পদিনেই পাকাপাকিভাবে পার্টিতে নিজের স্থান করে নিলেন হিটলার। এক বছরের মধ্যেই তিনি হলেন পার্টি প্রধান। দলের নতুন নাম রাখা হল ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স পার্টি। পরবর্তীকালে এই দলকেই বলা হত ন্যাৎসী পার্টি।

১৯২০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রথম ন্যাৎসী দলের সভা ডাকা হল। এতেই হিটলার প্রকাশ করলেন তার পঁচিশ দফা দাবি।

এর পর হিটলার প্রকাশ করলেন স্বস্তিকা চিহ্নযুক্ত দলের পতাকা। ক্রমশই ন্যাৎসী দলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। তিন বছরের মধ্যেই দলের সদস্য হল প্রায় ৫৬০০০। এবং এই জার্মান রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল।

হিটলার চেয়েছিলেন মিউনিখে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব যেন না থাকে। এই সময় তার পরিকল্পিত এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। তাকে এক বছরের জন্য ল্যান্ডসবার্গের পুরনো দুর্গে বন্দী করে রাখা হল।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার রাজনৈতিক কাজে ঝাপিয়ে পড়লেন। তার উগ্র স্পষ্ট মতবাদ, বলিষ্ঠ বক্তব্য জার্মানদের আকৃষ্ট করল। দলে দলে যুবকরা তার দলের সদস্য হতে আরম্ভ করল। সমস্ত দেশে জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠলেন হিটলার।

১৯৩৩ সালের নির্বাচন বিপুল ভোট পেলেন কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেন না। পার্লামেন্টের ৬৪৭টির মধ্যে তার দলের আসন ছিল ২৮৮। বুঝতে পারলেন ক্ষমতা অর্জন করতে গেলে অন্য পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে।

কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়ায় হিটলার পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন। এইবার ক্ষমতা দখলের জন্য শুরু হল তার ঘৃণ্য রাজনৈতিক চক্রান্ত। বিরোধীদের অনেকেই খুন হলেন। অনেকে মিথ্যা অভিযোগে জেলে গেল। বিরোধী দলের মধ্যে নিজের দলের লোক প্রবেশ করিয়ে দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিরোধী পক্ষকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে হিটলার হয়ে উঠলেম শুধু ন্যাৎসী দলের নয়, সমস্ত জার্মানির ভাগ্যবিধাতা।

হিটলারের এই উত্থানের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ইহুদীদের বিরুদ্ধে তার প্রচার। তিনিই জার্মানদের মধ্যে ইহুদী বিদ্বেষের বীজকে রোপণ করেছিলেন। দেশ থেকে ইহুদী বিতাড়নই ছিল তার ন্যাৎসী বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য।

দেশে প্রান্তে প্রান্তে ইহুদী বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। শুরু হল তাদের উপর লুঠতরাজ হত্যা। হিটলার চেয়েছিলেন এইভাবে ইহুদীদের দেশ থেকে বিতাড়ন করবেন। কিন্তু কোন মানুষই সহজে নিজের আশ্রয়স্থল ত্যাগ করতে চায় না।

১৯৩৫ সালে নতুন আইন চালু করলেন হিটলার। তাতে দেশের নাগরিকদের দুটি ভাগে ভাগ করা হল, জেন্টিল আর জু। জেন্টিল অর্থাৎ জার্মান, তারাই খাটি আর্য, জু হল ইহুদীরা। তারা শুধুমাত্র জার্মান দেশের বসবাসকারী, এদেশের নাগরিক নয়। প্রয়োজনে তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। দেশ জুড়ে জার্মানদের মধ্যে গড়ে তোলা হল তীব্র ইহুদী বিদ্বেষী মনোভাব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর ইউরোপের মিত্রপক্ষ ও জার্মানদের মধ্যে যে ভার্সাই চুক্তি হয়েছিল তাতে প্রকৃতপক্ষে জার্মানির সমস্ত ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসবাব পর থেকেই জার্মানির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবার সংকল্প গ্রহণ করেন। এবং তিনি একে একে ভার্সাই চুক্তি শর্তগুলি মানতে অস্বীকার করে নিজের শক্তি ক্ষমতা বিস্তারে মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

১৯৩৪ সালে হিটলার রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে নিজেকে জার্মানির ফুয়েরার হিসাবে ঘোষণা করেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে নিজেকে দেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তার এই সাফল্যের মূলে ছিল জনগণকে উদ্দীপিত করবার ক্ষমতা। তিনি দেশের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে ঘুরে জনগণের কাছে বলতেন ভয়াবহ বেকারত্বের কথা, দারিদ্র্যের কথা, নানান অভাব-অভিযোগের কথা।

হিটলার তার সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করলেন দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে। তার সহযোগী হলেন কয়েকজন সুদক্ষ সেনানায়ক এবং প্রচারবিদ। দেশের বিভিন্ন সীমান্ত প্রদেশে বিশাল সৈন্য সমাবেশ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে রাইনল্যান্ড অধিকার করলেন। অস্ট্রিয়া ও ইতালি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হল জার্মানির সাথে।

ইতালির সর্বাধিনায়ক ছিলেন মুসোলিনী। একদিকে ইতালির ফ্যাসীবাদী শক্তি অন্যদিকে ন্যাৎসী জার্মানি। বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ইতালি প্রথমে আলবেনিয়া ও পরে ইথিওপিয়ার বেশ কিছু অংশ দখল করে নেয়।

ইউরোপ জুড়ে যখন যুদ্ধ, চলছে, এশিয়ার জাপান জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল। তারা ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ সালে আমেরিকার পার্ল হারবার বন্দরের উপর বোমা বর্ষণ করে বিধ্বস্ত করে ফেলল। এই ঘটনায় আমেরিকাও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

প্রথম দিকে জার্মান বাহিনী সর্বত্র জয়লাভ করলেও মিত্রশক্তি যখন সম্মিলিতবাবে যুদ্ধ আরম্ভ করল, হিটলারের বাহিনী পিছু হটতে আরম্ভ করল। আফ্রিকায় ইংরেজ সেনাপতি মন্ট গোমারি রোমেলকে পরাজিত করলেন। এক বছরের মধ্যেই আফ্রিকা থেকে জার্মান বাহিনীকে বিতাড়িত করা হল। ইতালিতে মুসোলিনীকে বন্দী করা হল। ফ্যাসিবিরোধী জনগণ তাকে প্রকাশ্য রাস্তায় হত্যা করল।

জার্মান বাহিনীর সবচেয়ে বড় পরাজয় হল রাশিয়ার স্টালিনগ্রাদে। দীর্ঘ ছয় মাস যুদ্ধের পর লাল ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্যহল জার্মান বাহিনী।

১৯৪৪ সালে লাল ফৌজ স্বদেশভূমি থেকে জার্মান বাহিনীকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে একের পর এক অধিকৃত পোলান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া মুক্ত করতে করতে জার্মান ভূখণ্ডে এসে প্রবেশ করে। অন্যদিকে ইংরেজ আর আমেরিকান সৈন্যরাও জার্মানীর অভিমুখে এগিয়ে চলে।

যতই চারদিক থেকে পরাজয়ের সংবাদ আসতে থাকে, হিটলার উন্মত্তের মত হয়ে ওঠেন। ১৯৪৫ সালের ২৯শে এপ্রিল হিটলারের শেষ ভরসা তার স্টেইনের সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তার অধিকাংশ সঙ্গীই তাকে পরিত্যাগ করে মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। হিটলার বুঝতে পারেন তার সব স্বপ্ন চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে। বার্লিনের প্রান্তে রুশ বাহিনীর কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে। হিটলার তার বারো বছরের সঙ্গিনী ইভাকে বার্লিন ছেড়ে পালিয়ে যাবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ইভা তাকে পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। দুজনে সেই দিনই বিয়ে করেন।

বিয়ের পর হিটলার উপস্থিত সঙ্গীদের সাথে একসঙ্গে শ্যাম্পেন পান করলেন। তারপর দুটি চিঠি লিখলেন। একটি চিঠিতে সব কিছুর জন্য ইহুদীদের অভিযুক্ত করলেন। অন্য চিঠিতে নিজের সব সম্পত্তি পার্টিকে দান করে গেলেন।

৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫। চারদিকে থেকে বার্লিন অবরোধ করে ফেলে লাল ফৌজ। হিটলার বুঝতে পারেন আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। যে কোন মুহূর্তে লাল ফৌজ এসে তাকে বন্ধী করতে পারে। তিনি তার ড্রাইভার ও আরো একজনকে বললেন, মৃত্যুর পর যেন তাদের এমনভাবে পোড়ানো হয়, দেহের কোন অংশ যেন অবশিষ্ট না থাকে।

বিকেল সাড়ে তিনটের সময় তিনি নিজের ঘর থেকে বার হয়ে তার পার্শ্বচরদের সাথে করমর্দন করে নিজের ঘরে ঢুকলেন। তারপরই গুলির শব্দ শোনা গেল। হিটলার নিজের মুখের মধ্যে গুলি করে আত্মহত্যা করলেন। আর ইভা আগেই বিষ খেয়েছেন।

দুজন সৈন্য তাদের কম্বল দিয়ে মুড়ে বাগানে নিয়ে এল। চারদিকে থেকে কামানোর গোলা এসে পড়ছে। সেই অবস্থাতেই মৃতদেহের উপর পেট্রল ঢেকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। যিনি সমস্ত মানবজাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, নিজের অপরিণাম-দর্শিতায় শেষ পর্যন্ত নিজেই ধ্বংস হয়ে গেলেন।

৫০

আল বাত্তানী

(৮৫৮-৯২৯ খ্রিঃ)

যে মুসলিম মনীষী সর্ব প্রথম নির্ভুল পরিমাপ করে দেখিয়ে ছিলেন যে, এক সৌর বৎসরে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড হয়, তার আসল নাম হলো আবু আবদল্লাহ ইবনে জাবীর ইবনে সিনান আল বাত্তানী। তিনি আল্ বাত্তানী নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায়নি। যতদূর জানা যায় ৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত 'বাত্তান' নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

জন্ম স্থানের নামেই তিনি বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম জাবীর ইবনে সানান। তাঁর পিতাও ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী। আল বাত্তানী পিতার নিকটই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। শৈশব কাল থেকেই শিক্ষা লাভের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তিনি যে শিল্প কর্মেই হাত দিতেন তা নিখুঁত ভাবে শুরু করতেন এবং এর ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর উচ্চ শিক্ষার জন্যে তিনি ইউফ্রেটিস নদীর নিকটবর্তী রাক্কা নামক শহরে গমন করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সেই তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন।

আল বাত্তানীর বয়স যখন মাত্র ৫ বছর খলিফা মুতাওয়াক্কিলের ইন্তেকাল হয়। পরবর্তীতে দেশের রাজনৈতিক উত্থান পতনের কারণে তরুণ বয়সেই তাঁকে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে হয় এবং সিরিয়ার গর্ভনর পদে অধিষ্ঠিত হন। রাষ্ট্রীয় কাজের চরম ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁর জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনার কোন ক্ষতি করেননি। রাজধানী রাক্কা ও এন্টিয়োক থেকে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে গবেষণা চালাতেন। তিনি ছিলেন একজন অংক শাস্ত্রবিদ ও শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির প্রকৃতি, গতি ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে তাঁর সঠিক তথ্য শুধুমাত্র অভিনবই নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমী সহ পূর্বতন বহু বৈজ্ঞানিকের ভুলও তিনি সংশোধন করে দেন। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কিত টলেমী যে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন, আল বাত্তানী তা সম্পূর্ণ ভুল বলে বাতিল করে দিতে সক্ষম হন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, সূর্যের আপাত কৌণিক ব্যাসার্ধ বাড়ে ও কমে। নতুন চন্দ্র দেখার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নতুন ও নির্ভুল বক্তব্য পেশ করেন। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে ও তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। আল বাত্তানী তাঁর নতুন উদ্ভাসিত যন্ত্র দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, সূর্য স্থির বলে এতদিনের প্রচলিত টলেমীর মতবাদটি সত্য নয়। সূর্য তার নিজস্ব কক্ষে গতিশীল। আল বাত্তানী আরো প্রমাণ করেন যে, টলেমীর সময় থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত সূর্যের ১৬.৪৭ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সূর্য স্থির নিশ্চল নয় এবং তার নিজস্ব কক্ষে গতিশীল। আল বাত্তানী টলেমীর প্রচারিত আরো বহু মতবাদকে ভুল বলে প্রমাণ করেন। তিনি অক্ষর মালাকে সংখ্যার প্রতীক হিসেবে ব্যবহারমূলক একটি 'জিজ' তালিকা তৈরি করেন। এটি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা অনূদিত হয়ে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

আল বাত্তানীই সর্ব প্রথম আবিষ্কার করেন যে, ত্রিকোণমিতি হচ্ছে একটি স্বয়ং স্বাধীন বিজ্ঞান। তিনি গোলাকার ত্রিকোণমিতির কিছু কিছু সমস্যার অত্যন্ত বিস্ময়কর সমাধান দিয়েছেন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ ত্রিকোণমিতির প্রতি এতদিন অমনোযোগী ছিলেন। আল বাত্তানীর অসাধারণ প্রতিভার সংস্পর্শে নির্জীব ত্রিকোণমিতি সজীব হয়ে উঠে। সাইন, কোসাইনের সঙ্গে ট্যানজেন্টের সম্পর্ক আল বাত্তানীই প্রথম আবিষ্কার করেন। ত্রিভুজের বাহুর সঙ্গে কোণের ত্রিকোণমিতি সম্পর্কও তাঁরই আবিষ্কার। বাত্তানীই সর্ব প্রথম অংক শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রীক স্বর গ্রামের পরিবর্তে লম্বের ব্যবহার করেন। এক কথায় আল বাত্তানীর জীবন ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি ও অংকশাস্ত্রে বহু মূল্যবান গ্রন্থ ইউরোপে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মুসলিম মনীষীগণের জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়েই অমুসলিমগণ আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে মুসলিম জাতি তাদের পূর্ব পুরুষদের জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনাকে উপেক্ষা করে আজ অমুসলিমদের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। এ মহা মনীষী ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৭২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৫১

মাক্সিম গোর্কি

[১৮৬৮—১৯৩৬]

বাবার নাম ছিল মাক্সিম পেশকভ। মা ভারিয়া। তাঁদের প্রথম সন্তান আলেক্সেই পেশকভের জন্ম হয় ১৮৬৮ সালের ২৮শে মার্চ। পিতৃদত্ত এই নাম মুছে গিয়ে গোর্কি নামেই উত্তরকালে তিনি জগৎবিখ্যাত হন। বাবা মারা যাবার পর মার সাথে এসে আশ্রয় নিলেন মামার বাড়ি নিজনি নভগরোদ শহরে। কিছুদিন পর স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হলেন। ইতিমধ্যে মা আরেকজনকে বিয়ে করেছেন। হঠাৎ করে মা মারা গেলেন। দাদামশাই আর গোর্কির দায়িত্বভার নিতে চাইলেন না।

মায়ের শেষকৃত্যের কয়েকদিন পরেই তাঁকে ডেকে বললেন, "তোমাকে এভাবে মেডেলের মত গলায় ঝুলিয়ে রাখব তা তো চলতে পারে না। এখানে আর তোমার জায়গা হবে না। এবার তোমার দুনিয়ার ঘাটে বেরুবার সময় হয়েছে।"

শুরু হল গোর্কির নতুন জীবন। শহরের সদর রাস্তার উপর এক শৌখিন জুতোর দোকানের বয়। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম। একদিন দোকানের চাকরি ছেড়ে দিলেন। কিছুদিন পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন। একটা কয়েদি জাহাজে চাকরি পেলেন। যাদের নির্বাসন দেওয়া হত তাদের সেই জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হত। জাহাজের কর্মচারীদের বাসন ধোয়ার কাজ ছিল গোর্কির। ভোর ছটা থেকে মাঝ রাত অবধি কাজ। তারই ফাঁকে ফাঁকে দু চোখ ভরে দেখতেন নদীর অপরূপ রূপ। দু পারের গ্রামের দৃশ্য।

হিসেবপত্র মিটিয়ে হাতে আট রুবল নিয়ে ফিরে এলেন নিজের শহর নিজনি নভগরোদে।

জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাতে এক পেশা থেকে আরেক পেশায় ঘুরতে ঘুরতে বড় হয়ে উঠতে থাকেন গোর্কি। সব কিছুর মধ্যেও বই পড়ার নেশা বেড়ে চলে। বইয়ের কোন বাদবিচার ছিল না। সর্বভুকের মত যা পেতেন তাই পড়তেন। একদিন হাতে এল মহান রুশ কবি পুশকিনের একটি কবিতার বই। পড়তে পড়তে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।

তখন রাশিয়ার জারের রাজত্বকাল। দেশ জুড়ে চলছিল শাসনের নামে শোষণ অত্যাচার।

বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত হয়েই গোর্কি পরিচিত হলে মার্ক্সের রচনাবলীর সাথে। অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজনীতি, দর্শন, আরো নানান বিষয়ের বই পড়তে আরম্ভ করলেন।

দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। কিছুদিন পর একটি রুটি কারখানায় কাজ পেলেন। সন্ধ্যে থেকে পরদিন দুপুর অবধি একটানা কাজ করতে হত। তারই ফাঁকে যেটুকু সময় পেতেন বই পড়তেন। তাঁর এই সময়কার জীবনে অভিজ্ঞতার কাহিনী অবলম্বনে পরবর্তীকালে লিখেছিলেন বিখ্যাত গল্প "ছব্বিশজন লোক আর একটি মেয়ে।"

রুটির কারখানায় কাজ করবার সময় পুলিশের সন্দেহ পড়েছিল তাঁর উপর। সুকৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতেন গোর্কি। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে করতে মনের সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার উপর যখন সন্দেহ অবিশ্বাস; নিজের উপরেই সব বিশ্বাসটুকু হারিয়ে ফেলতেন। মনে হত এই জীবন মূল্যহীন, বেঁচে থাকবার কোন অর্থ নেই।

বাজার থেকে একটি পিস্তল কিনলেন। ১৮৮৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর নদীর তীরে গিয়ে নিজের বুকে গুলি করলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

ডাক্তাররা জীবনের আশা ত্যাগ করলেও অদম্য প্রাণশক্তির জোরে বেঁচে গেলেন গোর্কি।

এক বৃদ্ধ বিপ্লবী মাঝে মাঝে রুটির কারখানায় আসতেন। সুস্থ হয়ে উঠতেই গোর্কিকে নিয়ে গেলেন নিজের গ্রামের বাড়িতে।

গল্পটি প্রকাশিত হল ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই গল্পে বাস্তবতার চেয়ে রোমান্টিকতার প্রভাবই বেশি।

নিজনি শহরে থাকতেন তরুণ লেখক ভ্লাদিমির করোলেঙ্কো। একদিন গোর্কির সাথে পরিচয় হল। করোলেঙ্কোর কথায় চেতনা ফিরে পেলেন গোর্কি। প্রথাগত রচনার ধারাকে বাদ দিয়ে শুরু হল তাঁর নতুন পথে যাত্রা। সমাজের নিচুতলার মানুষেরা—চোর, লম্পট, ভবঘুরে তামাল, গণিকা, চাষী, মজুর, জেলে, সারিবদ্ধভাবে মিছিল করে প্রকাশ পেতে থাকে তাঁর রচনায়। এই পর্বের কয়েকটি বিখ্যাত গল্প হল মালভা, বুড়ো ইজেরগিল, চেলকাশ, একটি মানুষের জন্ম। গল্পগুলির মধ্যে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে নিচুতলার মানুষের প্রতি গভীর মমতা অন্যদিকে অসাধারণ বর্ণনা, কল্পনা আর তাঁর সৃজনশক্তি।

এই সব লেখাগুলি বেশির ভাগ ছাপা হয়েছিল ভলগা তীরের মফস্বলী পত্রিকায় স্থানীয় মানুষ, কিছু লেখক সমালোচক তাঁর রচনা পড়ে মুগ্ধ হলেন। তখনো যশ খ্যাতি পাননি গোর্কি। ১৮৯৮ সালে তাঁর প্রবন্ধ ও গল্প নিয়ে একটি ছোট সংকলন প্রকাশিত হল। সংকলনের নাম দেওয়া হল "রেখাচিত্র ও কাহিনী"। এই বই প্রকাশের সাথে সাথে গোর্কির খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সময় রাশিয়ার প্রধান সাহিত্যিক ছিলেন চেখভ, তলস্তয়। তাঁদের সাথে গোর্কির নামও উচ্চারিত হতে থাকে।

এক বছর পর প্রকাশিত হল গোর্কির প্রথম সার্থক উপন্যাস "ফোমা গর্দেয়ভ" (১৯০০)। একই সময়ে প্রকাশিত হল তলস্তয়ের উপন্যাস "রেজারেকসন"। দুটি উপন্যাসই রাশিয়ার মানুষের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। গোর্কির রচনার বাস্তবতা, তার জীবনধর্মীতা, নিপীড়িত অবহেলিত মানুষের প্রতি সমবেদনা মমতা; স্বভাবতই রুশ শাসকদের বিচলিত করে তুলল। তাঁর আগে সমাজ জীবনকে এমন নির্মমভাবে কেউ প্রকাশ করেনি।

গোর্কিকে বন্দী করা হল। কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল কোন মিথ্যা অজুহাতে তাঁতে শাস্তি দিতে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

দেশ জুড়ে বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছিল। ১৯০১ সাল, গোর্কি তখন ছিলেন সেন্ট পিটসবার্গ শহরে। একদিন ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। পুলিশ তাদের উপর গুলি চালাল। অনেক নিহত হল। অসংখ্য ছাত্র আহত হল। এর প্রতিবাদে গোর্কি লিখলেন কবিতা "ঝোড়ো পাখির গান"।

ঝড়ের গান ছড়িয়ে পড়ল হাজার হাজার মানুষের মুখে। গোর্কির কবিতা যেন বিপ্লবের মন্ত্র। গোর্কিকে আটক করা হল। এখন আর তিনি নিজনি নভগোরদ শহরের এক সামান্য কারিগর নন, রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁকে গ্রেফতারে প্রতিবাদে দেশ জুড়ে ঝড় উঠল। তাদের মুখপাত্র হলেন স্বয়ং তলস্তয়। জারের কর্মচারীরা তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

ক্রমশই গোর্কি পরিচিত হয়ে উঠছিলেন লেনিনের আদর্শ, তাঁর মতবাদে। তিনি হয়ে উঠলেন মানবিকতার সমস্যায় গভীর আলোড়িত এক শিল্পী। বহু বিপ্লবী নেতাই তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসত। গোর্কি নিয়মিত তাদের সাথে যোগাযোগ করতেন। তিনি হলেন জার কর্তৃপক্ষের চোখে এক বিপদজনক ব্যক্তি। তাঁকে নির্বাসিত করা হল আরজামাস নামে একটা ছোট শহরে। গোর্কি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তলস্তয় ও দেশের বুদ্ধিজীবীরা সম্মিলিতভাবে আবেদন জানালেন। তাঁদের চেষ্টায় গোর্কিকে পাঠানো হল ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

চেখভের উৎসাহে নাটক লেখা কাজ শুরু করলেন। প্রথম নাটক কূপমণ্ডুক (১৯০১)। এর পর লিখলেন নীচু তলা (লোয়ার ডেপথ) যা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকের বাণী সেদিন শুধু রাশিয়া নয়, ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ইউরোপে। গোর্কির নাম ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে।

১৯০৫ সালে দেশ জুড়ে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ আর খরা। হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ জারের প্রসাদ অভিমুখে যাত্রা করল। জারের দেহরক্ষীরা নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করল।

এর বিরুদ্ধে কলম ধরলেন গোর্কি। তিনি সরাসরি দেশের মানুষের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী করলেন জারকে। ক্ষুব্ধ জারের আদেশে তাঁকে বন্দী করে রাখা হল কারাদুর্গে। এবার শুধু রাশিয়া নয়, প্রতিবাদের ঝড় উঠল সমগ্র ইউরোপে। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা প্রতিবাদ জানালেন। তাঁদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে গোর্কিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল জার সরকার।

শ্রমিকদের আন্দোলন বেড়ে চলছিল। দেশ জুড়ে বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হল।

আবার গোর্কিকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করা হল। গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে বিদেশে পাড়ি দিলেন। জার্মানী ফ্রান্স হয়ে আমেরিকায়। এখানেই শুরু তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস "মা"। জারের অত্যাচারের ভয়ে এই বই প্রথমে প্রকাশিত হয় ইংরেজি অনুবাদে (১৯০৬)। এ যাবৎ কমবেশি প্রায় ৩০০ সংস্করণ বার হয়েছে, এর থেকেই বোঝা যায় 'মা' উপন্যাসখানি পৃথিবী জুড়ে কি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

মা ছাড়াও গোর্কি আরো অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন। দুঃখী পাভেল, গ্রীষ্ম, ত্রয়ী। তাঁর আত্মজীবনীমূলক তিনটি উপন্যাস আমার ছেলেবেলা (১৯১৩), পৃথিবীর পথে (১৯১৫), পৃথিবীর পাঠশালায় (১৯২৩)। নিজের জীবনের শৈশব কৈশোর কালের প্রতিটি ঘটনাকে নিপুণ শিল্পীর

মত যেন রঙের তুলিতে ছবি এঁকেছেন। বাস্তবতার সাথে মানবতার এখন সংমিশ্রণ বিশ্বসাহিত্যে বিরল। জীবনের শেষ পর্যায়ে লেখেন 'ক্লিম সামগিনের জীবন'।

জীবন শেষ হয়ে আসছিল। কিন্তু জীবন থেকে একটি মুহূর্তের জন্যেও তিনি দূরে সরে যাননি ইউরোপের বুকে একদিকে কমিউনিউজম বিরোধী আন্দোলন, অন্যদিকে জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব—নিজের গভীর দূরদৃষ্টি দিয়ে গোর্কি অনুভব করেছিলেন এর আসন্ন বিপদ, শয্যাশায়ী অবস্থাতেও তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে (১৮ জুন ১৯৩৬)। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে "যুদ্ধ আসছে...তোমরা তৈরি থেক।"

কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

৫২

অরভিল রাইট ও উইলবার রাইট

[১৮৭১—১৯৪৮] [১৮৬৭—১৯১২]

উইলবারের জন্ম ১৮৬৭ সালে আমেরিকার ইণ্ডয়ানা প্রদেশে। অরভিলের জন্ম ১৮৭১ সালে। ছেলেবেলা থেকেই দুই ভাই-এর মধ্যে ছিল যেমনই কল্পনাশক্তি তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। পড়াশুনা শেষ করে দুই ভাই হাতে কলমে কাজ করবার জন্য ছোট কারখানা তৈরি করলেন, প্রথমে তাঁরা কিছুদিন বাজারে প্রচলিত ছাপার যন্ত্র নিয়ে কাজ শুরু করলেন যাতে তার ব্যবহার আরো সহজ সরল ও উন্নত হয়।

এর পর বাইসাইকেলের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেন। দুটি ক্ষেত্রেই তাঁরা অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। এবং তাঁদের প্রবর্তিত আধুনিক যন্ত্র ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল।

তবে যে উড়োজাহাজ আবিষ্কারের জন্য দুই ভাই-এর খ্যাতি, তার চিন্তাভাবনা শুরু হয় ১৮৯৬ সাল থেকে।

একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার অটো লিলিয়েনথাল কয়েক বছর যাবৎ উড়ন্ত যান নিয়ে গবেষণা করছিলেন। লিলিয়েনথালের তৈরি যান আকাশে উড়লেও তাতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হত। ১৮৯৬ সালে লিলিয়েনথালের আকস্মিক মৃত্যুতে গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

লিলিয়েনথালের তৈরি উড়ন্ত যানের (Gliding Machine) নক্সা ভালভাবে পরীক্ষা করে রাইট ভাইরা দেখলেন যেমন তা অসম্পূর্ণ অন্যদিকে তেমনি নানা ভুলত্রুটিতে ভরা।

অল্প কিছুদিন পর তাঁরা বুঝতে পারলেন এই ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন আরো জ্ঞানের। পরিপূর্ণ জ্ঞান না হলে সাফল্য অনিশ্চিত।

ইতিমধ্যে এই বিষয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে সমস্তই তাঁরা সংগ্রহ করলেন। নিরলস অধ্যাবসায় নিয়ে শুরু হল তাঁদের অধ্যায়ন।

শুধু যে পূর্বসূরীদের প্রচেষ্টা, তাদের সাফল্য ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত অধ্যায়ন করলেন তাই নয়, তাঁরা বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন রচনা থেকে জানলেন বাতাসের গতিবেগ, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে তার চাপ, ভারসাম্য নির্ণয়ের পদ্ধতি। তাছাড়া কিভাবে এতদিন বিভিন্ন উড়ন্ত যান নির্মাণ করা হত তার নির্মাণ কৌশল, আরো অসংখ্য বিষয়।

এল গ্লাইডার বা ছোট ছোট খেলনার আকৃতির যন্ত্র। যা নানান প্রক্রিয়ায় বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু তাতে তো মানুষের উড়া সম্ভব হত না।

দুই ভাই ছোট একটা কারখানা তৈরি করলেন। দীর্ঘ এক বছরে প্রচেষ্টায় সেই কারখানায় তৈরি হল এক বিশাল গ্লাইডার বা উড়ন্ত যান। এতদিন যে ধরনের গ্লাইডার তৈরি হত এই গ্লাইডার তার চেয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। এই গ্লাইডার বাতাসে ভারসাম্য রেখে সহজেই উড়ে যেতে পারে। গ্লাইডার-এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাইট ভাইয়েরা তৈরি করলেন দুই পাখাবিশিষ্ট ছোট বিমান। এই বিমানের সামনে ও পেছনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটা ছোট যন্ত্র জুড়ে দেওয়া হল। এর নাম এলিভেটর। এই এলিভেটরের সাহায্যেই পাইলট কোন বিমানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সমস্ত নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর শহরে থেকে দূরে এক নির্জনে এই দুই পাখাওলা বিমানকে শূন্যে ভাসিয়ে দেওয়া হল। বেশ কয়েকবার বিমানকে আকাশে ওড়বার পর দুই ভাই বুঝতে পারলেন এখনো তাঁদের উদ্ভাবিত বিমানের কলাকৌশলের কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলেও তাঁরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছেন।

আবার শুরু হল তাঁদের কর্মযজ্ঞ। এইবার লক্ষ্য কিভাবে গ্লাইডারকে শক্তিচালিত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন নিয়ে পরীক্ষা করবার পর দেখা গেল একমাত্র পেট্রল চালিত ছোট ইঞ্জিনই

বিমান চালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এবং প্রতি তিন পাউন্ড ওজনের জন্য এক অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিনের আবশ্যক। বাজারে যে সমস্ত ইঞ্জিন পাওয়া যায় তার প্রতিটিই গাড়ির ব্যবহারের জন্য, বিমানে ব্যবহারের অনুপযুক্ত দুই ভাই ইঞ্জিন তৈরির কাজে হাত দিলেন। কয়েক মাসের চেষ্টায় তৈরি হল বিমানে ব্যবহারের উপযুক্ত ইঞ্জিন।

অবশেষে এল সেই দিন, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৩। উইলবার ও অরভিল তাঁদের তৈরি বিমান নিয়ে এলেন Kitty Hawk শহরের প্রান্তে। মানুষ বিমানে চেপে মহাশূন্যে পাখির মত ভেসে বেড়াবে। এই সংবাদ আগেই শহরময় প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু কেউই একথা বিশ্বাস করল না। উপরন্তু দিনটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডার দিন।

প্রথমে দুই ভাই তাঁদের বিমানের সাথে ইঞ্জিন যুক্ত করলেন। সমস্ত যন্ত্রপাতি শেষবারের মত পরীক্ষা করলেন। শেষ পর্যন্ত দুই ভাইই নিশ্চিত হলেন তাঁদের তৈরি প্রথম এলোপ্লেন ওড়বার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছে। যদিও সেই সময় এরোপ্লেন (Aeroplene) নাম দেওয়া হয়নি। নাম দেওয়া হয়েছে রাইট ফ্লাইয়ার (Wright Flyer)।

ঘড়িতে দেখা গেল বারো সেকেণ্ড বাতাসে ভেসেছিল রাইট ভাইদের প্রথম এরোপ্লেন। মাত্র বারো সেকেণ্ড। কিন্তু উপস্থিত পাঁচজন এমনকি রাইট ভাইরাও সেদিন কল্পনা করতে পারেননি, ঐ স্বল্পক্ষণের বিমানযাত্রাই নতুন যুগের সূচনা করল, যে যুগ গতির যুগ, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটার যুগ। নিরাপদে অবতরণ করে অরভিল বিমান থেকে বেরিয়ে এলেন। এইবার উইলবারের পালা। ভাই-এর সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে উইলবার আকাশে ভেসে রইলেন উনষাট সেকেণ্ড। এবং প্রায় ৮২০ ফিট দূরত্ব অতিক্রম করলেন। তারপর ধীরে ধীরে অবতরণ করলেন। সেই দিন আর আকাশে ওড়া সম্ভব হয়নি। ঝড়ো বাতাসের বেগ বাড়ছিল।

সাফল্যের আনন্দে দুজনেই আত্মহারা। কয়েকদিন কেটে গেল। প্রাথমিক উত্তেজনার রেশটুকু স্তিমিত হয়ে আসতেই নতুন উদ্যমে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুই ভাই। এইবার তৈরি হল আগের চেয়ে বড় আর শক্তিশালী বিমান।

দুই ভাই ঠিক করলেন তাঁদের এই সাফল্যের কথা সমস্ত মানুষকে জানাতে হবে। এতদিন যা ছিল শুধুমাত্র তাঁদের, আজ থেকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। আমেরিকার প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের আকাশে ওড়ার দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করতে।

সেদিন সকাল থেকে ঝোড়ো বাতাস বইছিল। নতুন ইঞ্জিনটাও ঠিকমত কাজ করছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে হল।

রাইট ভাইরা শুধু সাংবাদিক নয়, বিশিষ্ট কিছু মানুষকেও নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের আকাশে ওড়বার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্য। এই বার আর বিফলতা নয়। সকলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাইট ভাইরা কেমন করে একে একে পাখির মত স্বচ্ছন্দে আকাশপথে বিমানে চড়ে উড়ে চলেছে। বাতাসের মত এই সংবাদ শুধু আমেরিকা নয়, ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দিক থেকে প্রশংসা আর অভিনন্দনবার্তা আসতে থাকে। তবুও নিজেদের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না রাইট ভাইয়েরা। আরো উন্নত ধরনের বিমান তৈরি করবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। এগিয়ে আসে এক সিণ্ডিকেট। তারাই প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের সব ভার গ্রহণ করে। নতুন সিণ্ডিকেট আমেরিকান গভর্নমেন্টের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল। অরভিল চুক্তির শর্ত অনুসারে আমেরিকায় রয়ে গেলেন, উদ্দেশ্য আরো উন্নত ধরনের বিমান তৈরি করা।

উইলবার ফ্রান্সে গেলেন। সেখানে দেখালেন বিমানে ওড়বার কলাকৌশল। ফ্রান্সের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রতিদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত।

একদিন আমেরিকায় অরভিল রাইট সামরিক বাহিনীর এক অফিসারকে সাথে নিয়ে যখন বিমানে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় আকস্মিক ভাবে একটা প্রপেলার ভেঙে প্লেন মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে গুরুতর আহত অরভিলের প্রাণ রক্ষা হলেও সঙ্গী অফিসার দুর্ঘটনাস্থলেই মারা যান। কিছুদিনের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেন অরভিল। ততদিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এরোপ্লেন কেনবার জন্য আবেদন জানাতে থাকে। রাইট ভাইরা বুঝতে পারেন তাঁদের সুদীর্ঘ পরিশ্রম নিষ্ঠা অধ্যবসায় এতদিনে সফল হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর সামনে তাঁরা এনে দিয়েছেন এক নতুন গতি। যে গতির কথা মানুষ কল্পনা করতে পারেনি।

অবশেষে ১৯১২ সালে উইলবার মারা গেলে। অরভিল তারপরেও বহু বছর বেঁচে ছিলেন। আমৃত্যু তিনিও বিমানে উন্নয়ন ও উৎপাদনের কাজে জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন।

৫৩

আল বেরুনী

(৯৭৩-১০৪৮ খ্রিঃ)

দশম শতাব্দীর শেষ এবং একাদশ শতাব্দীর যে সকল মনীষীর অবদানে পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতা কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল, আল বেরুনী তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। জ্যোতিবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, গণিত, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, দিনপঞ্জির তালিকা ও ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন অগাধ পান্ডিত্বের অধিকারী।

তিনিই সর্ব প্রথম প্রাচ্যের জ্ঞান বিজ্ঞান বিশেষ করে ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অধ্যাপক মাপা বলেন, "আল বেরুনী শুধু মুসলিম বিশ্বেরই নয় বরং তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি।" তিনি পৃথিবীর ইতিহাস জগৎবাসীর সামনে রেখে গেছেন; কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আত্মপরিচয় অনুপস্থিত। তাঁর বাল্য জীবন, শিক্ষা জীবন, দাম্পত্য জীবন ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত ঐতিহাসিকগণ ও মহাজ্ঞানী ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

ইতিহাসের পাতা থেকে যতদূর জানা যায়, ৩৬২ হিজরীর ৩ জিলহজ্জ মোতাবেক ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার খাওয়ারিজমের শহরতলীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বেরুনী। তিনি নিজের নাম আবু রায়হান লিখতেন কিন্তু ইতিহাসে তিনি আল বেরুনী নামে অধিক পরিচয় হন। তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল আল্ ইরাক বংশীয় রাজপতি বিশেষ করে আবু মনসুর বিন আলী বিন ইরাকের তত্ত্বাবধানে। এখানে তিনি সুদীর্ঘ ২২ বছর রাজকীয় অনুগ্রহে কাটিয়েছিলেন। এখানে অবস্থানকালেই আস্তে আস্তে তাঁর বিচিত্র প্রতিভা ছড়িয়ে পড়ে। আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। এ সময় খাওয়ারিজম প্রদেশে ও দু'টি রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রদেশের দক্ষিণাংশে রাজত্ব করতেন আল বেরুনীর প্রতিপালক আল ইরাক বংশীয় আবু আবদুল্লাহ এবং উত্তরাংশে রাজত্ব করতেন মামুন বিন মাহমুদ। ৯৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে মামুন বিন মাহমুদ আবু আবদুল্লাহকে হত্যা করে রাজ্য দখল করে নিলে আল বেরুনীর জীবনে নেমে আসে দুঃখ দুর্দশা। যাদের তত্ত্বাবধানে তিনি সুদীর্ঘ ২২টি বছর কাটিয়েছেন তাঁদেরকে হারিয়ে তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়েন। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ত্যাগ করেন খাওয়াজরিজম এবং চলতে থাকেন আশ্রয়হীন ও লক্ষহীন পথ ধরে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত তিনি কাটিয়েছেন অনাহারে অর্ধাহারে। এ সময় জুরজানের রাজা কাবুসের সুনজের পড়েন তিনি। রাজা কাবুস ছিলেন বিদ্যুসাহী। জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিনি খুব ভালবাসতেন। তিনি ইতিপূর্বে আল বেরুনীর সুনাম শুনেছিলেন। রাজা আল বেরুনীর উন্নত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানের দিনগুলো আল বেরুনী সুখেই কাটিয়ে ছিলেন কিন্তু যাদের আদর স্নেহ তিনি ২২টি বছর কাটিয়েছিলেন সেই আল ইরাক বংশীয় অভিভাবকদের কথা ক্ষণিকের জন্যেও ভুলতে পারেননি। এখানে অবস্থানকালে ১০০১-১০০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'আসারুল বাকিয়া' এবং 'তাজরী দুশ শুয়াত' নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি 'আসারুল বাকিয়া' গ্রন্থটি রাজা কাবুসের নামে উৎস্বর্গ করেন।

খাওয়ারিজমের রাজা সুলতান মামুন বিন মাহমুদ ছিলেন বিদ্যুৎসাহী এবং তিনি আল বেরুনীর জ্ঞানে ও গুণে মুগ্ধ ছিলেন। সুলতান মামুন এক পত্রে আর বেরুনীকে দেশে ফিরে আসার অনুরোধ জানান। তিনিও সুলতানের অনুরোধে ১০১১ খ্রিস্টাব্দে মাতৃভূমি খাওয়ারিজমে ফিরে আসেন এবং সুলতানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার সাথে সাথে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার কাজও চালিয়ে যেতেন। মানমন্দির নির্মাণ করে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ কার্য চালান। এখানে তিনি ৫/৬ বছর অবস্থান করেছিলেন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

গজনীর দিগ্বিজয়ী সুলতান মাহমুদ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের খুব সম্মান করতেন এবং তাঁর শাহী দরবারে প্রায় প্রতিদিন দেশ বিদেশের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা নিয়ে আলোচনা হত। সুলতান মামুনের শাহী দরবারের জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে গজনীতে পাঠানোর জন্যে সুলতান মাহমুদ একটি সম্মানজনক পত্রে পরোক্ষ নির্দেশ দিয়ে পাঠান। পত্র

পাবার পর আল বেরুনী কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ১০১৬ খ্রিঃ গজনীতে সুলতান মাহমুদের শাহী দরবারে উপস্থিত হন। মামুনের দরবারের অন্যতম বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ইবনে সিনা এ প্রস্তাবকে অপমান ও আত্মমর্যাদাকে বিকিয়ে দেয়ার সামিল আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেন এবং কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে খাওয়ারিজম ত্যাগ করেন। সুলতান মাহমুদ ইবনে সিনাকে না পেয়ে এবং ইবনে সিনার বিদ্রোহের অজুহাতে খাওয়ারিজম রাজ্য দখল করে নেন। আল বেরুনী সুলতান মাহমুদের একান্ত সঙ্গী হিসেবে ১০১৬ হতে ১০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত গজনীতে অবস্থান করেন। উল্লেখ্য যে, সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং আল্ বেরুনী কয়েকবার সুলতানের সাথে ভারত এসেছিলেন। তিনি তৎকালীন ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি দেখে বিস্মিত হন। পরবর্তীতে রাজসর্মন নিয়ে ১০১৯–১০২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতে অবস্থান করে সেখানকার জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে ভূগোল, গণিত ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে মতের আদান প্রদান করেন এবং সেখানকার জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল হিন্দ'। তৎকালীন সময়ের ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মীয় অনুশাসন জানার জন্যে এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। অধ্যাপক হামারনেহের লিখেছেন,

"As a result of his profound and intimate knowledge of the country andits people, the author left us in his writing the wealth of information of undying interest on civilization in the sub-continent during the first half at the eleventh century."

আল বেরুনী ভারত থেকে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করার কিছুদিন পরেই সুলতান মাহমুদ ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর পুত্র সুলতান মাসউদ ১০৩১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। সুলতান মাসউদও আল বেরুনীকে খুব সম্মান করতেন। এ সময়ে আল বেরুনী রচনা করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কানুনে মাসউদী'। এ সুবিশাল গ্রন্থখানা সর্বমোট ১১ খণ্ডে সমাপ্ত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গ্রন্থটিতে আলোচনা করা হয়। ১ম ও ২য় খণ্ডে আলোজনা করা হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে; ৩য় খণ্ডে–ত্রিকোণমিতি; ৪র্থ খণ্ডে–Spherical Astronomy; ৫ম খণ্ডে–গ্রহ, দ্রাঘিমা, চন্দ্র সূর্যের মাপ; ৬ষ্ঠ খণ্ডে–সূর্যের গতি; ৭ম খণ্ডে–চন্দ্রের গতি; ৮ম খণ্ডে–চন্দ্রের দৃশ্যমান ও গ্রহণ; ৯ম খণ্ডে–স্থির নক্ষত্র; ১০ম খণ্ডে–৫টি গ্রহ নিয়ে এবং একাদশ খণ্ডে–আলোচনা করা হয়েছে জ্যোতিষ বিজ্ঞান সম্পর্কে। এ অমূল্য গ্রন্থটি সুলতানের নামে নামকরণ করায় সুলতান মাসউদ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আল বেরুনীকে বহু মূল্যবান রৌপ্য সামগ্রী উপহার দেন। কিন্তু আল বেরুনী অর্থের লোভী ছিলেন না। তাই তিনি এ মূল্যবান উপহার সামগ্রী রাজকোষে জমা দিয়ে দেন।

আল বেরুনী বহু জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতার ইতিহাস, মৃত্তিকা তত্ত্ব, সাগর তত্ত্ব এবং আকাশ তত্ত্ব মানবজাতির জন্যে অবদান হিসেবে রেখে গেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে বেরুনী নিজেই বিশ্বকোষ। একজন ভাষাবিদ হিসেবেও তিনি ছিলেন বিখ্যাত। আরবী, ফারসী, সিরিয়া গ্রীক, সংস্কৃতি, হিব্রু প্রভৃতি ভাষার উপর ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য। ত্রিকোণমিতিতে তিনি বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন। কোর্পানিকাস বলেছিলেন, পৃথিবী সহ গ্রহগুলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অথচ কোর্পানিকাসের জন্মের ৪২৫ বছর পূর্বেই আল বেরুনী বলেছেন, "বৃত্তিক গতিতে পৃথিবী ঘুরে।" তিনি টলেমি ও ইয়াকুবের দশমিক অংকের গণনায় ভুল ধরে দিয়ে তাঁর সঠিক ধারণা দেন। তিনিই সর্ব প্রথম প্রাকৃতিক ঝর্ণা এবং আর্টেসীয় কূপ এর রহস্য উদঘাটন করেছিলেন। জ্যোতিষ হিসেবেও তার প্রসিদ্ধি ছিল অত্যাধিক। তিনি যে সব ভবিষ্যৎ বাণী করতেন সেগুলো সঠিক হত। তিনি শব্দের গতির সাথে আলোর গতির পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন। তিনি এরিস্টটলের 'হেভেন' গ্রন্থের ১০টি ভুল আবিষ্কার করেছিলেন। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্কেও তিনি আবিষ্কার করেন।

সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ গণনায় আল বেরুনী একটি বিস্ময়কর পন্থা আবিষ্কার করেন যার বর্তমান নাম The Formula of Intarpolation. পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এটিকে নিউটনের আবিষ্কার বলে প্রচার করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অথচ নিউটনের জন্মের ৫৯২ বছর পূর্বেই আল বেরুনী এটি আবিষ্কার করেন এবং একে ব্যবহার করেন বিশুদ্ধ সাইন তালিকা প্রস্তুত করেন। এরপর এ ফর্মূলা পূর্ণতা দান করে তিনি একটি ট্যানজেন্ট তালিকাও তৈরি করেন। তিনিই বিভিন্ন প্রকার ফুলের পাপড়ি সংখ্যা হয়, ৩, ৪, ৫, ৬ এবং ১৮ হবে কিন্তু কখনো ৭ বা ৯ হবে না; এ সত্য আবিষ্কার করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি একটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থে তিনি বহু রোগের ঔষধ তৈরির কলাকৌশল বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক হামারনেহ

বলেছেন, "শুধু মুসলিম জগতেই নয় পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জগতের মধ্যে আল বেরুনীই সর্ব প্রথম ব্যক্তি, যিনি খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত ঔষধ তৈরি করার পদ্ধতি ও তার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বিজ্ঞানী আল বেরুনী বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। মৃত্যুর ১৩ বছর পূর্বে তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থের যে তালিকা দিয়েছেন সে অনুযায়ী তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ১১৪টি। পরবর্তী ১৩ বছরে তিনি আরো বহু গ্রন্থ রচনা করেন। উপরে উল্লেখিত গ্রন্থগুলো ছাড়া উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে–'কিতাবুত তাফহিম'। এটি ৫৩০ অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে অংক, জ্যামিতি ও বিশ্বের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'ইফরাদুল ফাল ফিল আমরিল আযলাল'–এটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছায়াপথ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'আল আছারুল বাকিয়া আলাল কুবানিল কালিয়া'–এটিতে পৃথিবীর প্রাচীন কালের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। 'যিজে আবকন্দ (নভোমণ্ডল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত)। 'আলাল ফি যিজে খাওয়ারিজমি (যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিশাল আকৃতির শতাধিক গ্রন্থ এক ব্যক্তির পক্ষে রচনা করা কত যে দুঃসাধ্য ব্যাপার তা ভাবতেও অবাক লাগে।

আল বেরুনী ছিলেন সর্বকালের জ্ঞানী শ্রেষ্ঠদের শীর্ষ স্থানীয় এক মহাপুরুষ। তাঁর ও অন্যান্য মুসলিম বিজ্ঞানীদের মৌলিক আবিষ্কারের উপরই গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞান। আল বেরুনী আজ বেঁচে নেই; কিন্তু তাঁর নাম জেগে থাকবে উজ্জ্বল তারকার ন্যায়। দশম শতাব্দীর শেষ এবং একাদশ শতাব্দীতে যার একান্ত সাধনায় জ্ঞান বিজ্ঞানের দিগন্ত এক নব সূর্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছিল তিনি হলেন আল বেরুনী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহই সকল জ্ঞানের অধিকারী। এ মনীষী ৬৩ বছর বয়সে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। আস্তে আস্তে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। কোন চিকিৎসাই তাঁকে আর সুস্থ করে তোলা যায়নি। অবশেষে ৪৪০ হিজরীর ২ রজব মোতাবেক ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার ৭৫ বছর বয়সে আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বেরুনী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৫৪
মেরী কুরী
[১৮৬৭—১৯৩৪]

১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর ওয়রশতে মেরীর জন্ম। বাবা ক্রোদোভস্কা ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান। কিন্তু নিজের চেষ্টায় তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করে ওয়ারশ হাইস্কুলে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। মেরির মা ছিলেন একটি মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। এছাড়া খুব ভাল পিয়ানো বাজাতেন। চার বোনের মধ্যে মেরীই ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। অকস্মাৎ তাঁর পরিবারের উপর নেমে এল দুর্যোগের ঝড়। যক্ষ্মারোগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মা। বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। ঈশ্বর বোধহয় খুশি হলেন মাকে তার শিশুদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে। মেরীর বয়স তখন মাত্র দশ। পোল্যাণ্ড তখন জার শাসিত রাশিয়ার অধিকারে। পোল্যাণ্ড জুড়ে শুরু হয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলন। গোপনে এই আন্দোলনে সহায়তা করবার জন্য স্কুলের চাকরি হারাতে হল মেরীর বাবাকে। অনেক চেষ্টা করেও অন্য কোথাও চাকরি পেলেন না। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজেদের মনোবল হারাননি ক্রোদোভস্কা পরিবার।

মেরী কিন্তু তাঁর পড়াশুনায় ছিলেন অসম্ভব মনোযোগী। শুধু নিজের ক্লাস নয়, সমগ্র স্কুলের তিনি ছিলেন সেরা ছাত্রী। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য স্বর্ণপদক পেলেন।

কিন্তু অত্যধিক পড়াশুনার চাপে শরীর ভেঙে গিয়েছিল মেরীর। বাবা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মেরীকে পাঠিয়ে দেয়া হল গ্রামের বাড়িতে।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেল। দেহ মন সতেজ হয়ে ওঠে মেরীর। আবার ওয়ারশ-তে ফিরে এলেন। মেরীর ইচ্ছা ছিল ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করবেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর অনুরোধ অবজ্ঞা করল।

সেই সময় তাঁর বোন প্যারিসের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। মেরীর ইচ্ছা সেও বোনের সঙ্গে গিয়ে পড়াশুনা করবে।

বড় বোন গেলেন প্যারিসে। তখন একমাত্র প্যারিসেই মেয়েরা ডাক্তারি পড়তে পারত। বোনের পড়ার খরচ মেটাবার জন্য গভর্নেসের চাকরি নিলেন মেরী।

অল্প কয়েক মাস যেতেই এক সমস্যা দেখা দিল মেরীর জীবনে। পড়াশুনার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বোনের বাড়িতে সারাদিন গানবাজনা বন্ধু-বান্ধবদের আসা-যাওয়া।

মেরী স্থির করলেন কলেজের কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবেন। প্রথমে প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মেরীর ইচ্ছাকেই মেনে নিলেন তাঁর বোন-দুলাভাই। শুরু হল সাধনা আর সংগ্রাম। আরামের জীবন ত্যাগ করে নিজের খরচ চালাবার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিলেন। আয় বলতে নিজের সামান্য সঞ্চয় আর বাবার পাঠানো যৎসামান্য অর্থ, সব মিলিয়ে মাসে ৪০ রুবল।

শিক্ষকেরা মেরীর কল্পনাশক্তি, উদ্যাম ও দক্ষতা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে নতুন নতুন গবেষণায় উৎসাহিত করতেন। গভীর আত্মবিশ্বাসে মেরী স্থির করলেন শুধু পদার্থবিদ্যা নয়, অঙ্কতেও তিনি ডিগ্রী নেবেন। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হল না। তিনি প্রথমে পদার্থবিদ্যা (১৮৯৩), পরের বছর অঙ্কে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করলেন।

এই সময় একদিন পরিচয় হল পিয়ের কুরীর সাথে। পিয়ের ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। কোন নারী নয়, বিজ্ঞানই ছিল তাঁর জীবনের আকর্ষণ।

একদিন দুজনের দেখা হল এক অধ্যাপকের বাড়িতে। তারা দু'জন বিজ্ঞান নিয়েই কথাবার্তা শুরু করেছিলেন এবং তাদের অজান্তেই পরস্পরের বন্ধু হয়ে যান।

পিয়ের মেরীকে তাঁর গবেষণাগারে যোগ দিতে বললেন। পিয়ের তখন চুম্বকত নিয়ে কাজ করছিলেন। মেরী তাঁর সাথে কাজ শুরু করলেন (১৮৯৪)। পরের বছর দুজনে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

সেই সময় পিয়ের স্কুল অব ফিজিক্সে মাত্র ৫০০ ফ্রাঙ্ক মাইনে পেতেন। এই অর্থেই দুজনের সংসার চলত। স্বামীর ল্যাবরোটারিতে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটত মেরীর।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল একদিন বিরল ধাতু ইউরেনিয়ামের একটি অংশ লবণ দিয়ে পরীক্ষা করবার সময় লক্ষ্য করলেন ঐ লবণ থেকে এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি বার হয় যা অস্বচ্ছ বস্তু ভেদ করে যেতে পারে। তিনি দেখেছিলেন এই অদৃশ্য রশ্মি একটা কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফির প্লেটের উপরও বিক্রিয়া করে। কোন রশ্মির ভেদ ক্ষমতা সম্পর্কে সম্ভবত এটাই প্রথম আবিষ্কার।

এই ব্যাপারটি কুরী দম্পতির গোচরে আনেন বেকেরেল। তাঁরা অন্য গবেষণা ছেড়ে এই সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করলেন। তারা স্থির করলেন এই বিষয়টিকেই তাঁরা ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার জন্য গবেষণার বিষয় হিসাবে স্থির করবেন। পিচব্লেণ্ডের ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় মেরী নিউমনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিন মাস গবেষণাগার ছেড়ে বিশ্রাম নিলেন।

১৮৯৭ সালে মেরীর প্রথম সন্তান আইরিনের জন্ম হল। সন্তান জন্মের পর কিছুদিন গবেষণা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে বাধ্য হলেন মেরী। আইরিনের বয়স কয়েক মাস হতেই গবেষণার কাজে আবার স্বামীর সঙ্গী হলেন মেরী।

১৮৯৮ থেকে ১৯০২ এই ৪৫ মাস অমানুসিক পরিশ্রম করেছেন স্বামী-স্ত্রী। দিনমজুরের মত খাটতেন মেরী। আটচালার নীচে তাঁর স্বামী নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ডুবে থাকেন।

প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন পিচব্লেণ্ডের মধ্যে শতকরা একভাগ অন্তত অদৃশ্য বস্তুটি পাওয়া যাবে। এখন সে সব চিন্তা কোথায় হারিয়ে গেল। নতুন পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা এত বেশি যে অশোধিত আকারের মধ্যে তার অতি সামান্য পরিমাণে উপস্থিতিও সত্যি বিস্ময় জাগাত। মূল আকারের সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে যে, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিসটি উদ্ধার করাই হল কঠিন কাজ।

১৯শে এপ্রিয় ১৯০৪ সাল। সকাল থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। পিয়ের কুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একটা অধিবেশনে যোগ দিয়ে সেখান থেকে এক প্রকাশকের কাছে যাচ্ছিলেন। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে সাময়িক ভেঙে পড়লেন মেরী। কিন্তু অল্পদিনেই ধীরে ধীরে নিজেকে মানসিক দিকে থেকে প্রস্তুত করে তুললেন। নতুন এক শক্তি জেগে উঠল তাঁর মধ্যে মনে হল স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজকে সমাপ্ত করতে হবে।

কর্তৃপক্ষ মাদাম কুরীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করলেন এবং গবেষণা কাজের সমস্ত ভার তাঁর অর্পণ করা হল।

স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ১৫ই নভেম্বর ১৯০৬ সালে তিনি পিয়েরের উত্তরাধিকারী হিসাবে বিজ্ঞান একাডেমিতে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর অসাধারণ বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন সকলে।

শুরু হল মেরীর নতুন এক জীবন। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তারই সাথে অধ্যাপনা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সেরে দুটি মেয়ে আর বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা-যত্ন করা। ১৯১০ সালে শ্বশুর মারা গেলেন। ছেলের সমাধির পাশেই বাবাকে সমাধিস্থ করা হল।

এই বছরেই তিনি রেডিয়াম ক্লোরাইডকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রেডিয়াম নিষ্কাষণ করলেন। এই অসাধারণ উদ্ভাবনের জন্য ১৯১১ সালে নোবেল পুরস্কার কর্তৃপক্ষ তাঁকে রসায়নের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করল। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি দু'বার এই পুরস্কার পেয়েছেন।

বহু অর্থব্যয়ে তৈরি হল কুরী ইনস্টিটিউট। এর পরিচালনার ভার দেওয়া হল মেরী কুরীর উপর। এখানে রেডিয়াম বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য গবেষণার কাজ চলবে।

প্যারিসে মেরীর কর্মভূমি হলেও নিজের জন্মভূমিকে তিনি ভুলতে পারেননি। তাঁর আন্তরিক সাহায্যে পোল্যাণ্ডের ওয়ারশতেও গড়ে উঠল রেডিয়াম গবেষণাগার।

আশৈশব অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ক্রমশই মেরীর দেহ অক্ষম হয়ে পড়ছিল। কিন্তু তবুও কাজের বিশ্রাম ছিল না। দিন অতিক্রান্ত হচ্ছিল ক্রমশই চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছিল মেরীর।

কিন্তু ল্যাবরেটারি ছেড়ে ছুটি নেবার দিন ক্রমশই এগিয়ে আসছিল আর মনের মধ্যে কোন দুঃখ নেই বিষাদ নেই। দুই মেয়েই উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। বড় মেয়ে আইরিন গবেষণা করছে। (মেরীর মৃত্যুর এক বছর পর আইরিন জোলিও ও তাঁর স্বামী ফ্রেডারিক জোলিও কুরী রসায়নে নোবের পুরস্কার পান।

একদিন গবেষণাগার থেকে ফিরে এসে মেরী বিছানায় শুয়ে পড়লেন, আপন মনেই তিনি বললেন, "আমি বড় ক্লান্ত।"

পরের দিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। দেশের সেরা ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা করেও রোগ নির্ণয় করতে পারল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত রোগের কারণ জানা যায়নি। এটি ছিল রেডিয়ামের বিষ। তাঁরই আবিষ্কৃত সন্তান সমস্ত জীবন ধরে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই এই মহিয়সী বিজ্ঞানসাধিকার জীবনদীপ চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হল।

৫৫

কনফুসিয়াস

[খ্রিঃ পূর্ব ৫৫১–৪৭৯]

আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। চীনদেশের লু রাজ্যে বাস করতেন ল শিয়াং নামে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি। মনে শান্তি ছিল না লু শিয়াং-এর। কারণ তিনি নয়টি কন্যার পিতা হলেও একটিও পুত্র সন্তান নেই তাঁর। একদিন গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে তাঁর ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। পথের পাশেই ছিল এক গরীব চাষীর কুটির। সেখানে গিয়ে পানি চাইতেই একটি কিশোর মেয়ে এসে পানি দিল। মেয়েটির নাম চেং সাই। তাকে দেখে লু শিয়াং-এর মনে হল মেয়েটি সর্ব সুলক্ষণা। এর গর্ভে নিশ্চয়ই তাঁর পুত্র সন্তান জন্মাবে। চাষীকে তাঁর মনের কথা জানায়।

লু শিয়াং-এর ইচ্ছায় চাষী এবং তার কন্যা সম্মতি দিল। সেই রাত্রিতেই মিলিত হলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের এই মিলনের কথা সকলের কাছে গোপন রেখে দিলেন লু শিয়াং।

অবশেষে চেং সাই একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য লু শিয়াং-এর। পুত্র সন্তান জন্মের সংবাদ অন্য স্ত্রীদের কানে যেতেই তারা লু শিয়াংকে পাগল বলে ঘরে আটকে রাখল। কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হল।

ওদিকে চেং সাই-এর কাছেই বড় হয়ে উঠতে লাগল নবজাত শিশুসন্তান। এই শিশুসন্তানই ভবিষ্যতে কনফুসিয়াস নামে সমস্ত জগতে পরিচিত হন।

লু শিয়াং তঁর প্রতিশ্রুতি মত কোন অর্থই দিয়ে যেতে পারেননি চেং সাইকে। কিন্তু তার জন্যে নিজের দায়িত্বকে অস্বীকার করলেন না চেং সাই।

চরম অভাব অনটনের মধ্যেও চেং সাই স্বামীর প্রতি ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাশীল। মনে মনে স্বামীর বংশমর্যাদা তাঁর খ্যাতি বীরত্বের জন্য গর্ববোধ করতেন।

স্কুলে যাবার বয়েস হতেই চেং কনফুসিয়াসকে স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। অল্প

কিছু দিনের মধ্যে শিক্ষক ছাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন কনফুসিয়াস। একদিকে যেমন তাঁর ছিল জ্ঞান অর্জনের প্রবল ইচ্ছা, অন্যদিকে অসাধারণ মেধা। শুধুমাত্র স্কুলের পাঠ্যপুস্তক পড়ে তাঁর মন ভরত না। ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ।

মায়ের স্নেহে অভাব অনটনের মধ্যেই দিন কাটছিল কনফুসিয়াসের: কনফুসিয়াসের তখন ১৫ বছর বয়স। হঠাৎ তাঁর মা মারা গেলেন। কনফুসিয়াসের জীবনে মাই ছিলেন সব। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে কনফুসিয়াস বিরাট আঘাত পেলেন।

কিন্তু সেই কিশোর বয়েসেই নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন, এত বড় বিয়োগ বেদনাতেও ভেঙে পড়লেন না। আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিজেকে সংযত রাখলেন।

তখনকার প্রচলিত নিয়ম ছিল স্ত্রীকে স্বামীর পাশেই কবর দেওয়া হবে। পিতার সমাধির পাশে মায়ের দেহ সমাহিত করলেন কনফুসিয়াস। নিজের গৃহে ফিরে এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হতেই পরিচিত জনেরা সকলে তাঁকে পরামর্শ দিল পিতার সম্পত্তির অধিকার দাবি করতে।

কিন্তু কনফুসিয়াসের আত্মমর্যাদাবোধ এতখানি প্রবল ছিল, তিনি বললেন, যে সম্পত্তি পিতা আমাকে দিয়ে যেতে পারেননি তাতে আমার কোন লোভ নেই।

পরবর্তীকালে কনফুসিয়াস বলতেন, আত্মমর্যাদা না থাকলে কোন মানুষই অন্যের কাছে মর্যাদা পেতে পারে না। যে মানুষের মধ্যে এই আত্মসম্মানবোধ আছে একমাত্র সেই হতে পারে প্রকৃত জ্ঞানী।

মায়ের মৃত্যুতে সাময়িক অসুবিধার মধ্যে পড়লেও নিজের বিদ্যাশিক্ষা অধ্যয়ন বন্ধ করলেন না কনফুসিয়াস। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কনফুসিয়াস থাকতেন লু প্রদেশে। এই প্রদেশের অন্যতম প্রধান শাসক ছিলেন চি চি-র কানেও গিয়ে পৌঁছেছিল কনফুসিয়াসের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। প্রথম পরিচয়েই মুগ্ধ হলেন চি। কনফুসিয়াসের দারিদ্র্যের কথা শুনে তাঁকে হিসাব রাখবার কাজ দেওয়া হল অল্পদিনেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন কনফুসিয়াস। চি খুশি হয়ে তাঁকে আরো উঁচু পদ দিলেন। কিন্তু পদের কোন মোহ ছিল না কনফুসিয়াসের। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল জ্ঞান অর্জন। যে কোন পুঁথি পেলেই গভীর মনোযোগ সহকারে তা পড়তেন। উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতেন তার অন্তর্নিহিত সত্য। তাই যখনই সময় পেতেন পুঁথি সংগ্রহ করতেন। কিম্বা যেখানেই কোন পুঁথিসন্ধান পেতেন সেখানেই ছুটে যেতেন।

কনফুসিয়াসের চরিত্রের উদারতা মহত্ত্বতার কারণে সকলেই তাঁকে ভালবাসত। তখন কনফুসিয়াস সবেমাত্র যৌবনের পা দিয়েছেন। সকলের পরামর্শে বিবাহ করলেন। স্ত্রীর নাম পরিচয় সব কিছুই ছিল অজ্ঞাত। তর স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র, দুটি কন্যা (কারো মতে একটি কন্যা) জন্ম গ্রহণ করে। স্ত্রীর সঙ্গে কনফুসিয়াসের কি রকম সম্পর্ক ছিল তা জানা যায় না। সম্ভবত স্ত্রীর সাথে কনফুসিয়াসের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল। অনেকের মতে স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

তাঁর কাজে খুশি হয়ে চি তাকে তার সমস্ত গবাদি পশুর দেখাশুনা করা, তাদের তত্ত্বাবধান করা, পালন করার সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। আপাতদৃষ্টিতে সহজসাধ্য মনে হলেও কাজটি ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ।

কনফুসিয়াস তখন ত্রিশ বছরে পা দিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করছিলেন প্রকৃত জ্ঞান শুধু পুঁথির মধ্যে পাওয়া যাবে না। চারপাশের জগতে ছড়িয়ে রয়েছে জ্ঞানের উপকরণ। তিনি বেরিয়ে পড়তেন শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

এই ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন চীনদেশের প্রকৃত অবস্থা। দেখলেন সমস্ত দেশ জুড়ে শুধু অভাব অনটন। রাজা, রাজপুরুষদের নৈতিক অধঃপতন। প্রতিনিয়তই এক দেশের সাথে অন্য দেশের যুদ্ধবিগ্রহ চলেছে। কোথাও শান্তি-শৃঙ্খলা নেই। নেই ন্যায়নীতি, ধর্মবোধ।

গভীর চিন্তার মধ্যে দিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন সমাজ জীবন, ব্যক্তি জীবন, রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন শৃঙ্খলার। এই শৃঙ্খলা রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে, ঈশ্বরের সমস্ত বিধানের মধ্যে। তাই দিন রাত্রি, সপ্তাহ, মাস, বৎসর বিভিন্ন ঋতু একই নির্দিষ্ট নিয়মে আবর্তিত হচ্ছে।

কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন আইন বা দণ্ডের দ্বারা এই শৃঙ্খলাকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আইন যতই কঠোর হবে ততই তাকে অমান্য করবার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে প্রবল

হয়ে উঠবে। একমাত্র মানুষের অন্তরের বিবেকবোধ নীতিবোধই তাকে সঠিক শৃঙ্খলার পথে চালিত করতে পারে। আর এই বিবেকবোধ নীতিবোধই তাকে সঠিক শৃঙ্খলার পথে চালিত করতে পারে। আর এই বিবেকবোধ তখনই মানুষের মধ্যে জাগ্রত হবে যখন ধর্মীয় চেতনা জেগে উঠবে।

কনফুসিয়াসের মধ্যেকার এই উপলব্ধি, গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা আসতে আরম্ভ করল তাঁর কাছে। তাদের শিক্ষাদনের জন্য তিনি একটি এ্যাকাডেমি স্থাপন করলেন।

কিন্তু কনফুসিয়াস শুধু জ্ঞানী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন একজন আদর্শ শাসক হতে।

তাই জ্ঞানী হিসাবে যেমন ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন, অন্যদিকে সংস্কারক হিসাবে সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করতেন। নানান বিষয়ে সুপরামর্শ দিতেন।

তাঁর আকৃতি ছিল কুৎসিত। অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহ, মাথাটি ছিল বিশাল আকৃতির, চওড়া মুখ। ছোট দুটি যথেষ্ট বড়। নাকটি ছিল স্বাভাবিক দ্বিগুণ। যখন তিনি হাঁটতেন, হাত দুটো পাখির ডানার মত দুপাশে ছড়িয়ে থাকত। পিঠটা ছিল কালো কচ্ছপের মত।

এই দৈহিক অপূর্ণতা সত্ত্বেও ভ্রমর যেমন মধুর আকর্ষণে ফুলের কাছে আসে, মানুষও তেমনি তাঁর জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখায় নিজেকে আলোকিত করবার জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে।

শিক্ষক হিসাবে আচার্য হিসাবে তাঁর খ্যাতি ক্রমশই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এতদিন শুধু সাধারণ ঘরের ছেলেরাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করত। ক্রমশই অভিজাত ঘরের ছেলেরাও তাঁর কাছে জ্ঞান লাভের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। কনফুসিয়াস কোন দরিদ্র ছাত্রের কাছ থেকে অর্থ না নিলেও ধনীদের কাছ থেকে অর্থ নিতেন। ক্রমশই কনফুসিয়াস আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হয়ে উঠলেন।

এই সময় আরো একটি ঘটনার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কনফুসিয়াসের প্রভাব আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেল।

কিন্তু আকস্মিকভাবে দেশে দেখা দিল সামরিক বিপর্যয়। প্রতিবেশী দেশের আক্রমণ দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন কনফুসিয়াস। অন্য এক দেশে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেই রাজ্যের শাসনকর্তার নাম ছিল চিং।

কনফুসিয়াসের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই করে দিলেন। মাঝে মাঝেই তিনি কনফুসিয়াসের কাছে এসে নানান বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, একজন শাসনকর্তার প্রকৃত সাফল্য কিভাবে নিরূপণ করা যায়?

কনফুসিয়াস বললেন, একজন শাসক তখনই সফল যখন তিনি প্রকৃতই শাসক। ভৃত্য সকল সময়েই ভৃত্য, পিতা প্রকৃতই পিতা, পুত্র সত্যিকারের পুত্র।

ডিউক চিং উপলব্ধি করলেন কনফুসিয়াসের কথার প্রকৃত তাৎপর্য। যিনি প্রকৃতই শাসক তার মধ্যে একাধিক গুণের সন্নিবেশ ঘটবে। একটি গুণের অভাব ঘটলেও তিনি প্রকৃত শাসক বলে পরিগণিত হবেন না।

দীর্ঘ সাত বছর ডিউক চিং-এর রাজ্যে সুখেই দিন কাটিয়ে দিলেন কনফুসিয়াস।

কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পর শিষ্যরা তাঁর সমাধিস্থলকে ঘিরে মন্দির গড়ে তুলল। সেখানেই কুঁড়েঘর করে বাস করতে থাকে। তিন বছর ধরে এইভাবে তারা শোক পালন করে।

কনফুসিয়াস নতুন কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেননি। কোন মতবাদ বা দর্শনের জন্ম দেননি। বা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শও প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। যা কিছু ছিল তাকেই নতুনভাবে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করেছেন। যখন কেউ তাকে স্বর্গ, ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন করত, তিনি নিজের বুকের উপর হাত রেখে বলতেন, এখানেই আছে স্বর্গ ঈশ্বর।

তিন বলতেন, দয়া, সততা, পবিত্রতা, ভালবাসা, জ্ঞান, মহত্ত্বতা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ। এই সব গুণের মধ্যে দিয়েই মানুষ নিজেকে দেবত্বে উন্নীত করতে পারে, অন্যের শ্রদ্ধা-ভালবাসা অর্জন করতে পারে।

কনফুসিয়াসের মধ্যে এই সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটেছিল বলেই আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে তার শ্রদ্ধার আসন পাতা রয়েছে।

৫৬

বারট্রান্ড রাসেল

[১৮৭২-১৯৭০]

এই প্রজ্ঞাবান মানুষটির জন্ম হয় ইংল্যান্ডের মন্মথশায়ারের ট্রেলাক গ্রামে। জন্মতারিখ (১৮৭২ সালে ১৮ই মে)। ইংল্যান্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। দাদু লর্ড জন রাসেল ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। বাবা ভাইকাউন্ট ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্য। পরিবার পরিকল্পনা সপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি তার সদস্যপদ হারান। তার মাও ছিলেন উদারনৈতিক চরিত্রের মহিলা। শৈশবেই বাবা-মাকে হারান রাসেল।

এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "আমার ছেলেবেলা ছিল চরম বিয়োগান্তক। জন্মের এক বছর পরেই বাবা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। চাচা হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেলেন। মা আর বোন একই সাথে ডিপথেরিয়ার মারা গেলেন। ১৮ মাস পর বাবা মারা গেলেন। ভাই ফ্রাঙ্ক কাঁদছিল, আমি চুপ করে সব দেখছিলাম।"

মা-বাবার অবর্তমানে শিশু রাসেলের সব ভার নিজের হাতে তুলে নেন দাদী রাসেল।

বাড়িতেই পড়াশুনা শুরু হল। একজন জার্মান গভর্নেস ও ইংরেজ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, অঙ্কের পাঠ নিতে আরম্ভ করলেন। ভাইয়ের কাছে শিখতেন জ্যামিতি। কিন্তু তার প্রিয় বিষয় ছিল বীজগণিত।

১৮৯০ সালে আঠারো বছর বয়সে কেমব্রিজের ট্রিনটি কলেজে ভর্তি হলেন। তার বিশেষ আগ্রহ ছিল গণিতে। এখান থেকে গণিতে প্রথম হলেন ট্রাইপোস। পরে সপ্তম বাংলার।

গণিত ছাড়াও তার আকর্ষণ ছিল দর্শনে। দর্শনে সম্মানের সাথে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে কলেজের ফেলো নির্বাচিত হলেন।

কেমব্রিজে ছাত্র অবস্থাতেই পরিচয় হয় অ্যালিস পিয়ার্সন স্মিথ নামে এক আমেরিকান তরুণীর সাথে। অল্পদিনেই দুজনে গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন ১৮৯৪ সালে দুজনের বিয়ে হল। রাসেল তখন মাত্র ২২ বছরের যুবক।

বিয়ের অল্প কিছুদিন পর রাসেল জার্মানিতে গিয়ে সেই সময়কার বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক ভায়ারট্রাসের সাথে একসাথে গণিত সংক্রান্ত কিছু কাজকর্ম করলেন। এখানে তিনি গণিতে অধ্যাপনাও করেছেন।

১৯০০ সালে রাসেলের জীবনে ঘটল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্যারিসে বসেছিল দর্শনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

ইংল্যান্ডে ফিরে এসে তিনি এবং অধ্যাপক হোয়াইটহেড একই সাথে গবেষণা শুরু করলেন। ১৯০২ সাল থেকে ১৯১০ দীর্ঘ আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর প্রকাশ করলেন গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধনীয় যুগান্তকারী রচনা প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা (Principia Mathematica)।

প্রিন্সিপিয়া উত্তরকালে গণিতজ্ঞদের কাছে এক অমূল্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের উপর এমন প্রামাণ্য গ্রন্থ খুব কমই রচিত হয়েছে। দুই মহান পণ্ডিতের অক্লান্ত সাধনার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ।

১৯০৮ সালে তিনি লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলেন। তার প্রিন্সিপিয়া রচনা শেষ করে তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি পার্লামেন্টের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার ব্যাপারে মনস্থির করলেন।

১৯১০ সালে লিবারেল পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়ালেন। কিন্তু স্থানীয় ভোটদাতারা সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল, রাসেল ঈশ্বর মানেন না, চার্চে যান না। এমন লোককে ভোটে নির্বাচিত করার কোন অর্থই হয় না। ভোটে পরাজিত হলেন রাসেল।

উত্তরকালে আরো দুবার তিনি পার্লামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, দুবারই পরাজিত হন।

১৯১৪ সালে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রাসেল ছিলেন যুদ্ধবিরোধী। তিনি ইংল্যান্ডের মানুষদের সঙ্গী মনোবৃত্তির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেন।

তার এই যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের জন্য সমস্ত দেশবাসীর কাছে অপ্রিয়ভাজন হয়ে উঠলেন। রাসেলকে অভিযুক্ত করা হল এবং তার বিরুদ্ধে জরিমানা ধার্য করা হল। তিনি জরিমানা দিতে অস্বীকার করলেন। এর জন্যে তার গ্রন্থাগারের অধিকাংশ বই বিক্রি করে জরিমানার অর্থ আদায় করা হল।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে, তিনি ট্রিবিউনাল পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করবর অপরাধে কারারুদ্ধ হলেন। ইংল্যান্ডের মিত্রপক্ষ আমেরিকার বিরুদ্ধে এই লেখার জন্য ছ মাসের জন্য তাকে কারারুদ্ধ করা হল। কারাদণ্ড ভোগ করার অপরাধে তাকে ট্রিনটি কলেজের অধ্যাপকের পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়।

কারাগারে বসেও এই জ্ঞানতাপস বৃথা সময় নষ্ট করেননি। এই সময় রচনা করলেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ Introduction to Mathematical Philosophy। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দীর্ঘ কয়েক বছর তিনি কোন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাননি। এই সময় লেখা ও বক্তৃতা দিয়ে উপার্জন করতেন।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। দেশে গড়ে উঠেছে সমাজতন্ত্র। রাসেল সমাজবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

১৯২০ সালে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন। রাসেল ইংল্যান্ডের শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে রাশিয়ায় গেলেন। এখানে সাক্ষাৎ হল লেনিনের সাথে। রাশিয়ার নতুন সমাজব্যবস্থা দেখে হতাশ হয়েছিলেন রাসেল।

রাসেলের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। নিজে পৈত্রিক সম্পত্তি বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানে দান করে দিয়েছিলেন। এই সময় শুধুমাত্র লেখাই ছিল তার জীবিকা অর্জনের পথ। রাসেল শিক্ষা সম্বন্ধে বরাবরই গভীরভাবে চিন্তা করতেন। শিক্ষা সম্বন্ধীয় এই সব চিন্তা-ভাবনাকে তিনি প্রকাশ করেছেন তার দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "On education"ও" Education and the social order"-এ।

১৯২৯ সালে তিনি রচনা করলেন তার চেয়ে বিতর্কিত এবং উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "ম্যারেজ অ্যান্ড মরালস" (Marriage and Morals)।

ডাক এল আমেরিকা থেকে। সপরিবারে গেলেন আমেরিকাতে। প্রথমে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন তারপর লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিলেন। এক বছর পর (১৯৪১) ডাক এল নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনের অধ্যাপনা করবার জন্য। কিন্তু তার ম্যারেজ অ্যান্ড মরালস বই-এর ইতিমধ্যে চারদিকে তর বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। কলেজের এক ছাত্রীর মা অভিযোগ জানাল রাসেলের মত মানুষ শিক্ষক হলে তার মেয়ের সর্বনাশ হবে।

এছাড়া একজন বিশপ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল তিনি ধর্ম ও নৈতিকতার বিরোধী। বিচারক ম্যাকগীহান এই অভিমতের সমর্থন করে আদেশ দিলেন রাসেলকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। এর জন্যে তিনটি কারণ দেখালেন। প্রথমত, রাসেল আমেরিকার নন, দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হবার জন্য তিনি কোন পরীক্ষা দেননি, তৃতীয়ত, তিনি যা লিখেছেন তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক।

এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন এই সুন্দর পৃথিবীতে যাজকরাই বার বার মানুষকে উত্তেজিত করে আর প্রতিভাবানরা হয় নির্বাসিত।

এই সময় হার্ভাডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউলিয়াম জেমস স্মারক বক্তৃতা দেবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানান হল। তাকে বারনেস ফাউনডেশনের তরফ থেকে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হল। তিনি এখানে পর পর বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। হঠাৎ তাকে পদচ্যুত করা হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন তা মোটেই উন্নত মানের নয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের, এই সময় তিনি যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা সংকলন করে প্রকাশিত হল "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস।" এই যাবৎকাল পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে যত বই লেখা হয়েছে এটি তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই সময় চাকরি হারিয়ে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর সাথে ছিল তৃতীয় স্ত্রী প্যাট্রিসিয়া স্পেন্স এবং শিশুপুত্র কনরার্ড।

এইবার ডাক এল ইংল্যান্ড থেকে। তার পুরানো কলেজ ত্রিনটি পুনরায় অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পর কেমব্রিজ তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্য করল। এই আমন্ত্রণ পেয়ে লন্ডনে ফিরে এলেন রাসেল।

ইংল্যান্ডে ফিরে এসে প্যাট্রিসিয়ার সাথে সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হল। কিছুদিনের মধ্যে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

বিবাহ বিচ্ছেদ, আর্থিক সংকট. যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা কোন কিছুই কিন্তু তার সৃজনীশক্তিকে সামান্যতম ব্যাহত করতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হল তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর একটি রচনা "Human Knowledge-its scope and limits"। ক্রমশই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিল দেশে দেশে। তিনি যখনই যে দেশে যেতেন, অভূতপূর্ব সম্মান বর্ষিত হত তার উপর। প্রকৃতপক্ষে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ববাসীর কাছে বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

অবশেষে এল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ৯৫০ সালে তার ম্যারেজ অ্যান্ড মরাল বইটির জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হল।

আশি বছরে পা দিলেন রাসেল। এডিথ ফিঞ্চ নামে আমেরিকান মহিলাকে তিনি বিবাহ করলেন। এডিথ তার চতুর্থ ও শেষ স্ত্রী। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এডিথের কাছ থেকেই তিনি সুখ ও শান্তি পেয়েছিলেন। এতদিন রাসেল ছিলেন জ্ঞানের পূজারী-ব্যক্তিগত জীবনের সুখ ভোগ, ছোট-বড় সামাজিক সমস্যা, এই ছিল তার জগৎ। ব্যক্তি জীবনের বহু কিছুর মধ্যেই লক্ষ্য করা গিয়েছে স্বার্থপরতা হীনমন্যতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি।

নিজের ছাত্রকে, বন্ধুকে প্রতারিত করতে যার সামান্যতম বাধেনি, মনুষ্যত্বের চেয়ে অর্থ যার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল, তিনিই আবার নিজের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দান করে যান।

প্রকৃতপক্ষে রাসেলের মধ্যে ছিল দ্বৈত্য সত্তা-ব্যক্তিসত্তা এবং সামাজিকসত্তা। জীবনের প্রথম ৮০ বছর ব্যক্তিসত্তাই ছিল প্রবল কিন্তু উত্তরকালে সমগ্র মানব সমাজ, পৃথিবী হয়ে উঠল তার কর্মভূমি।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে এগিয়ে এলেন মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। যারা পৃথিবীর বুকে প্রচার করতে চেয়েছিলেন শান্তি বাণী। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রাসেল আর আইনস্টাইন-তারা প্রকাশ করলেন এক ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাব।

জাপানের হিরোসিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন সমস্ত মানব সভ্যতার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হতে চলেছে।

পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী পদার্থবিদদের কাছে আবেদন করে—বললেন, একমাত্র আপনারাই পারেন সমস্ত পৃথিবীকে রক্ষা করতে। আসুন সকলে মিলে পৃথিবী থেকে পারামাণিক যুদ্ধের সব সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিই।

পৃথিবী থেকে সব পারমাণবিক অস্ত্র নিশ্চিহ্ন করার জন্য স্থাপিত হল "ক্যাম্পেন ফর নিউক্লিয়ার ডিসআর্মামেন্ট" (Campaign for Nuclear Disarmament)। রাসেল হলেন এর প্রেসিডেন্ট। তিনি ইংল্যান্ডের নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন রাখলেন তারা যেন পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করে অহেতুক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় না নামে। তিনি ব্রিটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানকে চিঠি লিখলেন কিন্তু তার সেই ডাকে কেউ সাড়া দিল না।

এইবার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেমে পড়লেন রাসেল। ১৯৬১ সালে ট্রাফালগার স্কোয়ারে ত্রিশ হাজার মানুষের মিছিলে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিলেন। তাকে আইন ভাঙার অপরাধে সাত দিনের জন্য কারারুদ্ধ করা হল। বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়, রাসেল তখন প্রায় নব্বই বছরের বৃদ্ধ। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিশ্বশান্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত হল "বারট্রান্ড রাসেল পিস ফাউন্ডেশন"। যে রাসেল একদিন শিষ্যকে ন্যায্য প্রাপ্য দেননি, তিনি তার জীবনের সমস্ত উপার্জিত অর্থ তুলে দিলেন এই পিস ফাউন্ডেশনে।

শান্তি আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক হলেও কিন্তু তার লেখনী স্তব্ধ হয়নি। তবে এইবার আর দর্শন গণিত নয়, লিখলেন, "ওয়ার ক্রাইমস ইন ভিয়েৎনাম" এবং এতে তিনি সমস্ত পৃথিবীর সামনে আমেরিকান সৈন্যদের ভিয়েৎনামে অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরলেন।

এই সময় প্রকাশকদের তাগিদে রচনা করলেন তার তিন খণ্ডে আত্মজীবনী। এই আত্মজীবনী তিন খণ্ডে বিভক্ত (১৮৭২-১৯১৪), (১৯১৪-১৯৪৪), (১৯৪৪-১৯৬৭)-রচনার প্রথমেই তিনি বলেছেন তিনটি শক্তি তার জীবনকে চালিত করেছে। প্রথম প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানের তৃষ্ণা, মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনার অনুভূতি।

রাসেলের সমস্ত জীবন ছিল কর্মময়। কমবেশি প্রায় ৭৫টি বই লিখেছিলেন। এই বইগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে তার অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রখর যুক্তবোধ, অসাধারণ মনীষা এবং অপূর্ব রচনাশৈলী।

৫৭
পার্সি বিশী শেলী
(১৭৯২-১৮২২)

১৭৯২ সালের ৪ঠা আগস্ট ইংলন্ডের সাজেক্সের অন্তর্গত ওয়ার্ইহ্যামে শেলীর জন্ম। টিমথি শেলীর প্রথম পুত্র পার্সি বিশী শেলীর ছেলেবেলাকার স্মৃতিমধুর ছিল না। ছেলেবেলা থেকে পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন তিনি। শেলীর জগৎ ছিল স্বপ্নের এবং কল্পনার। প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি ভর্তি হলেন লন্ডনের সবচে নামী স্কুল ইটনে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে ইটন ছাড়তে হল কারণ এক সহপাঠীর হাতে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিলেন তিনি।

শেলী ছিলেন অসাধারণ সুন্দর। দশ বছর বয়সে তাঁকে সিয়ন এ্যাকাডেমি'র আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। আঠারো বছর বয়সে তিনি ভর্তি হলেন অক্সফোর্ডের কলেজে। ইতিমধ্যে তাঁর রোমান্টিক কবি কল্পনায় শুরু হয়েছে কাব্য রচনা। ১৮১১ সালে শেলী লিখলেন The necessity of Atheism। এই প্রবন্ধ লেখার অপরাধে তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়। এর বিরুদ্ধে শেলীর বন্ধু প্রতিবাদ জানালে তাকেও কলেক থেকে বহিষ্কার করা হয়। দুই বন্ধু কলেজ ছেড়ে লন্ডনের পোলক স্ট্রীটের এক বাড়িতে এলেন। তাঁর এই দুর্দিনে এগিয়ে এলেন তাঁর ছোট বোন। নিজের সঞ্চয় থেকে ভাইকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতে শুরু করলেন। এই অর্থ তিনি পাঠাতেন তাঁর এক বান্ধবী হ্যারিয়েট ওয়েস্ট ব্রোকের সাহায্যে। এই পরিচয়ের সূত্র থেকেই হ্যারিয়েটের সাথে সম্পর্কে গড়ে শেলীর। সে বছরেই দু'জনের বিয়ে হয়ে যায়। এ বিবাহে ভালবাসার চেয়ে বেশি ছিল সহানুভূতি। বিয়ের পর দুজনে গেলেন আয়ারল্যান্ড।

শেলীর বয়স তখন উনিশ। তিনি আয়াল্যান্ডের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখে খুশী হন। এরপর ফিরে আসেন লন্ডনে। বিয়ের পর দুটি বছর তাঁরা এক সাথে সুখে-শান্তিতে কাটিয়েছেন। ১৮১২ সালে শেলী রচনা করলেন, "Queen Mab"। এক দীর্ঘ কবিতা। মধ্যে অপরিণতির ছাপ থাকতে একজন মহৎ কবির আগমন ধ্বনি এতে উচ্চারিত হয়েছে।

১৮১৩ সালে হ্যারিয়েট একটি কন্যার জন্ম দিল। কুইন মবের নায়িকার নাম অনুসারে তাঁর নাম রাখা হল ইয়ানথি। এর কিছু দিন পর সরকারি আইনের নিয়ম অনুসারে হ্যারিয়েটকে পুনরায় বিবাহ করতে হল।

এই বিবাহের পর থেকেই শেলীর জীবনে নেমে এল এক মানসিক অস্থিরতা।

সংসারের এই অশান্তির মধ্যে শেলীর পরিচয় হল দার্শনিক গডউইনের সাথে। গডউইনের Political Justice বইটি শেলীর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। গডউইনের সাথে প্রথমে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। তার পর দুজনের পরিচয় হল।

গডউইনের সাথে ছিল তাঁর প্রথম পক্ষের সতেরো বছর বয়সী সুন্দরী কন্যা মেরি।

শেলীর সাথে গড়ে উঠল তাঁর গোপন প্রণয়। এবং ক্রমশই হ্যারিয়েটের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে আরম্ভ করলেন শেলী।

পুত্র সন্তান জন্মের দু বছর পর হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করেন। শেলীর জীবনে তখন তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না।

১৮১৫ সালে লিখলেন এ্যালাস্টার "Alastor"। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা এক কাব্য। এটি একটি আত্মজীবনীমূলক রচনা।

Alastor or the Spirit of Solitude প্রকাশের দু মাস পর শেলী জেনিভায় গেলেন। সাথে মেরি ও কবি বায়রনের প্রেমিকা জেনি। তাঁরা জেনেভায় পৌঁছবার অল্পদিনের মধ্যেই বায়রন এলেন সেখানে। দেখা হল দুই কবির।

আগস্ট মাসে শেলী ফিরে এলেন ইংল্যান্ডে এসে পরিচয় হল কবি লে হান্টের সাথে। হান্ট ছিলেন তৎকালীন কবিদের প্রধান উৎসাহদাতা।

শেলী মেরিকে বিয়ে করলেন। এর পর শেলী হাত দিলে প্রমিথিয়াস আনবাউন্ড (Prometheus Unbound) রচনার কাছে। এর মধ্যে নাটক এবং গীতিকবিতার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। ১৮১৮ সালের মার্চ মাসে শেলী রওনা হলেন ইটালির পথে। সাথে মেরি, জেনি, তাদের ছেলেমেয়ে। এই সময়েই রচিত হয় তাঁর জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিতা।

শেলীর জীবনের শেষ চারটি বছর অতিক্রান্ত হয় ইটালিতে। এই সময়টুকুই তাঁর জীবনের মহত্তম সৃষ্টির কাল।

ইটালিতে এসে শেলী কোন স্থায়ী বাসা বাঁধেননি। তাঁর মনে হল তিনি সমগ্র ইটালি পরিভ্রমণ করবেন। বর্তমানের জগতে থেকে ফিরে যাবেন অতীতের জগতে। এখানেই পরিচয় হল এক অধ্যাপকের সাথে, তিনিও যোগ দিলেন তাদের মজলিসে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বললেন ফ্লোরেন্সের এক কাউন্টেই দুই কন্যা সৎ মায়ের তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে এক আশ্রমে। দুজনেই সুন্দরী রূপসী।

কয়েকদিন পর শেলী অধ্যাপককে সাথে নিয়ে সেই তরুণীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করলেন। যখন দুজনে আশ্রমে এসে পৌছলেন, বড় বোন এমিলিয়া বাগানে দাঁড়িয়েছিল। শেলীর মনে হল কোন ভাস্কর যেন খোদাই করে তাঁর নারী রূপ সৃষ্টি করেছে। প্রথম পরিচয়ে দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

শেলী গৃহে এলেন, তখন তাঁর সমস্ত মন জুড়ে শুধু এমিলিয়া। শেলীর জীবনের এই নতুন নারীকে মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না মেরি। তবুও কখনো নিজের অন্তরের ব্যথাকে প্রকাশ করেননি।

শেলী এমিলিয়ার প্রেম দীর্ঘদিন স্থানী ছিল না। একদিন শেলী পত্র পেলেন, এমিলিয়ার বাবা তার বিবাহ স্থির করে ফেলেছেন...।

শেলী ব্যথিত হলেন কিন্তু সৃষ্টির উন্মাদনায় তখন তিনি ক্রমশই সৃষ্টির গভীরে ডুব দিচ্ছিলেন।

সাংসারিক সমস্যা থেকে ক্রমশই দূরে সরে যেতে চাইছিলেন শেলী। এমন সময় অপ্রত্যাশিত এক আঘাত নেমে এল তাঁর উপর। মেরির প্রথম সন্তান জন্মের কয়েক সপ্তাহ পরেই মারা গেল। এর পর শেলীর আরো দুটি সন্তান হয়। দুটি সন্তানই অকালে মৃত্যু বরণ করেছিল।

এই বেদনা থেকে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে সৃষ্টির সাধনায় ক্রমশই ডুব দিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমি বেদনার মধ্যে যা পেয়েছি, কবিতার মধ্যে তাকেই প্রকাশ করেছি।"

তাঁর অনুভূতিবোধ থেকে জন্ম নিতে থাকে একের পর এক কবিতা। Ode tothe west wind, The cloud, The skylark, Song to prosperine, The Indian serenade, Music, When soft vioces die, On a Faded violet, To night। এর এক একটি কবিতা যেন সৌন্দর্যে, বর্ণচ্ছটায় এক একটি হীরক দ্যুতি।

যখন তিনি সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠেছেন, এমন সময় দুঃসংবাদ এল বন্ধু কবি কিটস্ মারা গিয়েছেন। চিকিৎসার জন্য ইটালিতে এসেছিলেন কিটস্ শোকাহত কবি কিটসের এই প্রয়াণে রচনা করলেন, Adonais_এমন মর্মস্পর্শী কবিতা শুধু ইংরাজি সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে কম লেখা হয়েছে।

....He lives, he walks-it is death is dead, not he;
Mourn not for Adonais-Thou young Dawn, Turn all thy
dew to splendour for from three
The spirit thou lamentest is not gone.
Ye caverns and ye forests cease to moan!

.শহরের কোলাহল থেকে মুক্তি পাবার জন্য ১৮২২ সালে শেলী এবং বন্ধু উইলিয়ম স্পেজিয়া উপসাগরের তীরে একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। শেলী সমুদ্র ভালবাসতেন কিন্তু সাঁতার জানতেন না।

জুন মাসে শেলী সংবাদ পেলেন কবি লে হান্ট ইংল্যান্ড থেকে ইটালিতে এসেছেন। হান্টের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন শেলী। বন্ধু উইলিয়ামকে সাথে নিয়ে লেগহর্নে গেলেন হান্টের সাথে দেখা করবার জন্য।

কয়েকদিন হান্টের সাথে কাটিয়ে ১৮২২ সালের ৮ জুলাই কবি উইলিয়ামকে সাথে নিয়ে এলেন লেগহর্নে। তাঁরা নৌকায় উঠতেই জেলেরা বারণ করল।

জেলেদের কথায় কান দিলেন না দুই বন্ধু। নৌকা নিয়ে ভেসে চললেন। কয়েক মাইল যেতেই আচমকা ঝড় উঠল। ঘন মেঘে চারদিক ছেয়ে গেল। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু শেলীর নৌকা খুঁজে পাওয়া গেল না। দশ দিন পর রেগপিয়োর সমুদ্রের তীরে জেলেরা একটি মৃতদেহ খুঁজে পেল। তাঁর জামার এক পকেটে কবি কিটসের কবিতার কপি, অন্য পকেটে সফোক্লিসের নাটক। বন্ধুরা এসে শনাক্ত করল শেলীর দেহ।

সমুদ্র ভালবাসতেন শেলী। তাই সমুদ্রতীরেই তাঁর চিতায় আগুন জ্বালান হল। তখন শেলীর বয়স মাত্র ত্রিশ।

শেলীর মূল পরিচয় বিপ্লবী আদর্শবাদের কবি হিসাবে। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ তাঁর চেতনা মন জগৎতে এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই তিনি ফরাসি বিপ্লবের আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তার প্রকাশ দেখা যায় The Revolt of Islam promethous Unbound_এ। শেলীর প্রমিথিয়াস চিরস্বাধীন। জিউসের পতনেই তাঁর মুক্তি।

শেলী এক কল্পনার মধ্যে খুঁজে ফিরেছেন এক আদর্শ জগৎকে, তাই তিনি সন্ধান করেছেন অনাগত যুদকে। যেখানে থাকবে প্রেম, সৌন্দর্য স্বাধীনতা। তিনি দেখতে পান পৃথিবীর মানুষ সেই পথে এগিয়ে চলেছে। একদিন সব অন্ধকার দূর হবে। পশ্চিমে বাতাস সব মলিনতা দূর করে দেবে...তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা Ode to the west wind_এ লিখেছেন, এক প্রলয়ঙ্করী ঝড় এসেছে পশ্চিমা বাতাসের রূপ ধরে। সে যেন ধ্বংসের মূর্তি। সে মিলনতাকে ধ্বংস করে কিন্তু যাবার সময় সৃষ্টি করে নব জীবনের সূচনা। তাই সে ভয়ঙ্কর হলেও সুন্দর, ভীষণ হলেও মধুর, ধ্বংস করলেও প্রতিশ্রুতিবান।

ঋতুকাব্য হিসাবে The west wind যেমন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি কবিতা, তেমনি তাঁর আর একটি অসাধারণ কবিতা The cloud. ভেসে চলা মেঘের বর্ণনায় কবি যেন শিল্পী হয়ে উঠেছেন। রঙের তুলি দিয়ে ছবি এঁকেছেন এখানে।

স্কাইলাক পাখির ডানায় ভর দিয়ে কবি সমস্ত মলিনতা, জীবনের সব অন্ধকার, সব কলুষতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন। তাই কবি লিখেছেন–

The trumpet of a prophecy! O wind,
If winter comes, can spring be far behind?

"শীত যদি আসে, বসন্ত কি দূরে থাকতে পারে?" এই বিশ্বাসই শেলীকে এক মহত্তর কবির স্তরে স্থান দিয়েছে।

৫৮

ইবনে সিনা

(৯৮০–১০৩৭ খ্রিঃ)

যিনি কঠোর জ্ঞান সাধনা ও অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে ছিলেন সারাটা জীবন, এক রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ধন-সম্পদ, ভোগ বিলাস ও প্রাচুর্যের মোহ যাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, যিনি ছিলেন মুসলমানদের গৌরব তিনি হলেন ইবনে

সিনা। তাঁর আসল নাম আবু আলী আল্ হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সিনা। তিনি সাধারণত ইবনে সিনা, বু–আলী সিনা এবং আবু আলী সিনা নামেই অধিক পরিচিত।

৯৮০ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীস্তানের বিখ্যাত শহর বোখারার নিকটবর্তী আফসানা গ্রাম তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম সিতারা বিবি। পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন খোরাসানের শাসনকর্তা। জন্মের কিছু কাল পরই তিনি ইবনে সিনাকে রোখারায় নিয়ে আসেন এবং তাঁর লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করেন। ছোট বেলা থেকেই তাঁর মধ্যে লুকিয়ে ছিল অসামান্য মেধা ও প্রতিভা। মাত্র ১০ বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কোরআনের ৩০ পারা মুখস্থ করে ফেলেন। তাঁর ৩ জন গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইসমাইল সুফী তাঁকে শিক্ষা দিতেন ধর্মতত্ত্ব, ফিকাহ শাস্ত্র ও তাফসীর; মাহমুদ মসসাহ শিক্ষা দিতেন গণিত শাস্ত্র এবং বিখ্যাত দার্শনিক আল্ না'তেলী শিক্ষা দিতেন দর্শন, ন্যায় শাস্ত্র, জ্যামিতি, টলেমির আল মাজেস্ট, জওয়াহেরে মান্তেক প্রভৃতি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে সকল জ্ঞান তিনি লাভ করে ফেলেন। বিখ্যাত দার্শনিক আল্ না'তেলী'র নিকট এমন কোন জ্ঞান আর অবশিষ্ট ছিল না, যা তিনি ইবনে সিনাকে শিক্ষা দিতে পারবেন। এরপর তিনি ইবনে সিনাকে নিজের স্বাধীন মত গবেষণা দেন।

এবার তিনি চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কিত কিতাব সংগ্রহ করে গবেষণা করতে শুরু করেন। ইবনে সিনা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, এমন বহু দিবারাত্রি অতিবাহিত হয়েছে যার মধ্যে তিনি ক্ষণিকের জন্যেও ঘুমাননি। কেবলমাত্র জ্ঞান সাধনার মধ্যেই ছিল তাঁর মনোনিবেশ। যদি কখনো কোন বিষয় তিনি বুঝতে না পারতেন কিংবা জটিল কোন বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখনই তিনি মসজিদে গিয়ে নফল নামাজ আদায় করতেন এবং সেজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে

কান্নাকাটি করে বলতেন, "হে আল্লাহ তুমি আমার জ্ঞানের দরজাকে খুলে দাও। জ্ঞান লাভ ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কোন কামনা নেই।" তারপর গৃহে এসে আবার গবেষণা শুরু করত। ক্লান্তিতে যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন অমীমাংসিত প্রশ্নগুলো স্বপ্নের ন্যায় তাঁর মনের মধ্যে ভাসতো এবং তাঁর জ্ঞানের দরজা যেন খুলে যেত। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেই সমস্যাগুলোর সমাধান পেয়ে যেতেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে বাদশাহকে সুস্থ করে তোলেন। বাদশাহ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর জন্যে রাজ দরবারের কুতুবখানা উন্মুক্ত করে দেন। মাত্র অল্প কয়েকদিনে তিনি অসীম ধৈর্য ও একাগ্রতার সাথে কুতুবখানার সব কিতাব মুখস্থ করে ফেলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোন বিষয় বাকি ছিল না যা তিনি জানেন না। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতি, ন্যায়শাস্ত্র, খোদতত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অসীম জ্ঞানের অধিকারী হন। ২১ বছর বয়সে 'আল মজমুয়া' নামক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন, যার মধ্যে গণিত শাস্ত্র ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

১০০১ খ্রিস্টাব্দে পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ২২ বছর। নেমে আসে তাঁর উপর রাজনৈতিক দুর্যোগ। তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন এবং পিতার ঘটলে ১০০৪ খ্রিঃ ইবনে সিনা খাওয়ারিজমে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময়ে খাওয়ারিজমের বাদশাহ ছিলেন মামুন বিন মাহমুদ। ১০০৪–১০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি খাওয়ারিজমে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করলেও তাঁর এ সুখ শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইবনে সিনার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে গজনীর সুলতান মাহমুদ তাঁকে পেতে চাইলেন। কারণ মাহমুদ জ্ঞানী ব্যক্তিদের খুব ভালবাসতেন। তাঁদেরকে দেশ বিদেশ থেকে ডেকে এনে তাঁর শাহী দরবারের গৌরব বৃদ্ধি করতেন এবং তাদেরকে মণি–মুক্তা উপহার দিতেন। এতদুদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদ তাঁর প্রধান শিল্পী আবু নসরের মাধ্যমে ইবনে সিনার ৪০ খানা প্রতিকৃতি তৈরি করে সমগ্র পারস্য ও এশিয়া মাইনরের রাজন্যবর্গের নিকট ছবিসহ পত্র পাঠিয়ে দিলেন যাতে তাঁরা ইবনে সিনাকে খুঁজে বের করার জন্যে দেশে বিদেশে সুলতান মাহমুদ লোক পাঠিয়ে দিলেন। এছাড়া তিনি খাওয়ারিজমের বাদশাহ মামুন বিন মাহমুদকে পরোক্ষভাবে এ নির্দেশ দিয়ে একটি পত্র পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর দরবারের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সুলতান মাহমুদের দরবারে পাঠিয়ে দেন। আসলে অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে ইবনে সিনাকে পাওয়াই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য।

ইবনে সিনা ছিলেন স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদা সচেতন ব্যক্তি। ধন সম্পদের প্রতি তার কোন লোভ লালসা ছিল না; কেবলমাত্র জ্ঞান চর্চার প্রতিই ছিল তাঁর আসক্তি। তিনি নিজের স্বাধীনতা ও ইজ্জতকে অন্যের নিকট বিকিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না। অন্যায় ভাবে কারো কাছে মাথা নত করতে তিনি জানতেন না। এছাড়া বিনা যুক্তিতে কারো মতামতকে মেনে নিতেও রাজি ছিলেন না তিনি। এমনকি ধর্মের ব্যাপারেও তিনি যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাই তৎকালীন সময়ে অনেকে তাঁকে ধর্মীয় উগ্রপন্থী এবং পরবর্তীতে কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁকে কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। যারা তাঁকে কাফির ফতোয়া দিয়েছিলেন তাঁরা তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। আসলে ইবনে সিনা ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। যারা তাঁকে কাফির বলেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। এতে তিনি লিখেছেন, "যারা আমাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে তাঁরা পৃথিবীতে বিখ্যাত হোক আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমার মত যোগ্য ব্যক্তি তোমরা আর পাবে না। আমি এ কথাও বলতে চাই যে, আমি যদি কাফির হয়ে থাকি তাহলে পৃথিবীতে মুসলমান বলতে কেউ নেই। পৃথিবীতে যদি একজন মুসলমানও থাকে তাহলে আমিই হলাম সেই ব্যক্তি।"

গজনীর সুলতান মাহমুদ ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী নেতা। তাঁর প্রতাপে অন্যান্য রাজা বাদশাহগণ পর্যন্ত ভয়ে কম্পমান থাকতেন। তাই গজনীতে গেলে ইবনে সিনার স্বাধীনতা ও ইজ্জত অক্ষুণ্ন থাকবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দিহান হয়েই তিনি গজনীতে সুলতান মাহমুদের দরবারে যেতে রাজি হননি। কিন্তু খাওয়ারিজমে তিনি এখন নিরাপদ নন ভেবে ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মামুন বিন মাহমুদের সহায়তায় সেখান থেকে পলায়ন করে এক অনিশ্চিত পথে রওনা দেন। প্রথমে আবিওয়াদি, তারপর তুস, নিশাপুর ও পরে গুরগাও গিয়ে পৌছেন। এখানে এসে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কিতাব রচনায় নিজকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এখানে তাঁর সুখ শান্তি স্থায়ী হয়নি। তিনি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে বেড়ান গ্রাম থেকে গ্রাম এবং

শহর থেকে শহরে। কিন্তু তিনি গজনীতে যেতে রাজি হলেন না। অবশেষে তিনি যান রাও প্রদেশে। বিভিন্ন কিতাব লিখতে শুরু করেন। কিন্তু এখানেও তাঁর সুখ স্থায়ী হল না। তাঁর জ্ঞান সাধনা ও কিতাব রচনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তারপর তিনি চলে যান প্রথমে কাজভীন ও পরে হামাদান শহরে। এখানে এসেই তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আশ্ শেফা' ও আল্ কানুন' লেখায় হাত দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় হামাদানের বাদশাহ শামস-উদ-দৌলা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে ৪০ দিন চিকিৎসা করে তাঁকে মুমূর্ষ অবস্থা থেকে সুস্থ করে তোলেন।

ক্রমান্বয়ে ইবনে সিনা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং বাদশাহ শামস-উদ-দৌলার মন্ত্রীত্বের আসন অলংকৃত করেন। এখানেও তিনি তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্ম দক্ষতার কারণে রাজদরবারের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গের ঈর্ষার সমালোচকগণ সেনাবাহিনীকে তাঁর গভীর ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হন। এক পর্যায়ে সমালোচকগণ সেনাবাহিনীকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে এবং ইবনে সিনার মৃত্যুদণ্ডের দাবি করে। বাদশাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা একটি গভীর ষড়যন্ত্র। কিন্তু সেনাবাহিনীর দাবিকে অগ্রাহ্য করা কিংবা ইবনে সিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া কোনটিই শামস-উদ-দৌলার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইবনে সিনা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে আত্মগোপন করেন এবং দীর্ঘ ৪০/৫০ দিন অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করেন। পরবর্তীতে বাদশাহ পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং সৈনিকগণ তাদের ভুল বুঝতে পেরে ইবনে সিনাকে খুঁজে বের করেন এবং মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানায়। শামস-উদ-দৌলার মৃত্যুর পর সময় ও ঘটনার প্রবাহে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে চলে যান ইস্পাহানে। এ সময়ে ইস্পাহানের শাসনকর্তা ছিলেন, আলা-উদ-দৌলা। তিনি ইবনে সিনাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁর জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করে দেন। এখানে তিনি উদ্যত গতিতে জ্ঞান চর্চা শুরু করেন এবং বিখ্যাত গ্রন্থ 'আশ্ শেফা' ও 'আল্ কানুন' এর অসমাপ্ত লেখা শেষ করেন।

এ মনীষী পদার্থ বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, জ্যামিতি, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় শতাধিক কিতাব রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে আল্ কানুন, আশ্ শেফা, আরযুযা ফিত তিব্ব, লিসানুল আরব, আল্ মজনু, আল্ মুবাদাউন মায়াদা, আল্ মুখতাসারুল আওসাত, আল্ আরসাদুল কলিয়া উল্লেখযোগ্য। আল্ কানুন কিতাবটি তৎকালীন যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বিপ্লব এনে দিয়েছিল।

কারণ এত বিশাল গ্রন্থ সে যুগে অন্য কেউ রচনা করতে পারেনি। আল্ কানুন কিতাবটি ল্যাটিন, ইংরেজি, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় এবং তৎকালীন ইউরোপের চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আল্ কানুন ৫টি বিশাল খণ্ডে বিভক্ত যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ লক্ষাধিক। কিতাবটিতে শতাধিক জটিল রোগের কারণ, লক্ষণ ও পথ্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের তিনিই হলেন জনক। 'আশ্ শেফা' দর্শন শাস্ত্রের আর একটি অমূল্য গ্রন্থ, যা ২০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এতে ইবনে সিনা রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রাণীতত্ত্ব ও উদ্ভিদ তত্ত্বসহ যাবতীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের কল্যাণ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে আজীবন পরিশ্রম করেছেন এবং ভ্রমণ করেছেন জ্ঞানের সন্ধানে। তিনিই সর্বপ্রথম 'মেনেনজাইটিস' রোগটি সনাক্ত করেন। পানি ও ভূমির মাধ্যমে যে সকল রোগ ছড়ায় তা তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। সময় ও গতির সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্কের কথা তিনিই আবিষ্কার করেন। তিনি এ্যারিস্টটলের দর্শন ও ভালভাবে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এ্যারিস্টটলের কিছু কিছু মতবাদের সাথে তিনি একমত হলেও সকল মতবাদের সাথে তিনি একমত হতে পারেননি।

জীবন সায়াহ্নে ফিরে আসেন তিনি হামাদানে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন তিনি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন। একদিন তাঁর এক ভৃত্য ঔষধের সাথে আফিম মিশিয়ে দেয়। আফিমের বিষক্রিয়ায় তার জীবনী শক্তি শেষ হয়ে আসে। ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে মহাজ্ঞানী ও বিশ্ববিখ্যাত এ মনীষী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হামাদানে তাকে সমাহিত করা হয়।

"আল্লাহর ভয় মানুষকে সকল ভয় থেকে মুক্তি দেয়।"

...ইবনে সিনা।

জোহন কেপলার

[১৫৭১-১৬৩০]

কোপারনিকাসের ভূ-ভ্রমণবাদে যে সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জোহন কেপলার অন্যতম। শোনা যায়, কোপারনিকাসের লেখা পুস্তকখানি পাঠ করার পর পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্র প্রভৃতির সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধিৎসা জাগরিত হয়। তারপরেই তিনি আরম্ভ করেন জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা। তাঁর প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে। সেই থেকেই কেপলার বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন বিজ্ঞানী হিসাবে।

১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির ওয়েল নামক একটি শহরে জোহন কেপলার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। তার উপর ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন বড় রোগা। তাই পিতা সাহস করে ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে পারেননি। নিজেই দান করেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু বালকের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ ছিল ভয়ানক। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই আগ্রহ এবং অজানাকে জানার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পায়। সে কৌতূহলকে চরিতার্থ করার ক্ষমতা পিতার ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই একটু বেশি বয়সে পুত্রকে প্রেরণ করলেন স্থানীয় এক অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। কারও কারও মতে কেপলারের পিতার আর্থিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, বাল্যকালে কেপলারকে একটি সরাইখানায় কাজ নিতে হয়েছিল।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী কেপলার অতি অল্পদিনেই স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে ভর্তি হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ডিগ্রি গ্রহণ করে যোগদান করলেন গণিতের অধ্যাপক হিসাবে। সেই সময় তিনি টাইকোব্রাহের সংস্পর্শে আসেন এবং টাইকোব্রাহের সহকারীরূপে কিছুদিন কাজ করেন।

কেপলারের প্রিয় বিষয়গুলি ছিল গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা। অধ্যাপনার অবসরে তিনি মেতে উঠলেন গবেষণায়। প্রথমত তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল গণিত। কিন্তু কোপারনিকাসের লেখা পুস্তকখানি হস্তগত হলে তাঁর মত পরিবর্তিত হয় এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেই গবেষণা আরম্ভ করেন।

কোপারনিকাসের নতুন চিন্তাধারার প্রতি দৃষ্টিপাত না করলেও কেপলারের মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ ঘনীভূত হল। চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন তিনি। ভাবতে শুরু করলেন, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করা সম্ভব অথবা পৃথিবীর পক্ষে নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করা সহজ। অনেক চিন্তা করে শেষে কোপারনিকাসের মতকেই সমর্থন করলেন। এই উদ্দেশ্যে রচনা করলেন একখানি পুস্তক। পুস্তকটির নাম "ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য।" কথিত আছে পুস্তকখানি রচনার পর সমর্থনের জন্য কেপলার প্রেরণ করেছিলেন তাঁরই সমসাময়িক বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ গ্যালিলিওর কাছে। গ্যালিলিও কী মতামত দিয়েছিলেন জানা যায় না। তবে পুস্তকটি পরবর্তীকালে গবেষকদের পথকে অনেকটা প্রশস্ত করে দিয়েছিল। আজও পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করছে জার্মানি।

কেপলারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুস্তকটির নাম "নিউ অ্যাসট্রোনমি প্রকাশের পর বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন, সূর্যের চারদিকে গ্রহরা একটি উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করছে। তাই ওরা ঘুরতে ঘুরতে কখনও সূর্যের সন্নিকটবর্তী হয় আবার কখনও দূরে সরে যায়। কেপলারই প্রথম বিজ্ঞানী—যিনি গ্রহদের পরিভ্রমণ পথের অনেকটা সঠিক তথ্য প্রদান করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, কোন গ্রহের কক্ষপথ ঠিক বৃত্তাকার নয়।

অনেকের মতে কেপলার একটি শক্তিশালী দূরবীনও তৈরি করেছিলেন এবং সেই দূরবীনের সাহায্যে তিনি গ্রহ, নক্ষত্র এবং চন্দ্রের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। কিন্তু তাঁর দূরবীনটি কেমন ছিল আজ আর জানার কোন উপায় নেই। বহু পূর্বেই যন্ত্রটি হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে।

কেপলার ছিলেন চিররুগ্ন। তার উপর রাতদিন এত কাজে ব্যস্ত থাকতেন যে শরীরের দিকে একটি বারও দৃষ্টি দিতে পারতেন না। তাই অল্প বয়সেই ভেঙ্গে পড়ল স্বাস্থ্য। মাত্র সাতান্ন কিংবা আটান্ন বছর বয়সেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পণ্ডিতেরা হিসেব করে দেখেছেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি দীর্ঘজীবী হলে জ্যোতির্বিজ্ঞান হয়ত আরও মূল্যবান তথ্য লাভ করতে পারতো।

৬০

জোহান্স গুটেনবার্গ

[১৪০০-১৪৬৮]

মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে জোহান্স গুটেনবার্গের নাম কে না জানে। এই জার্মান বৈজ্ঞানিক পৃথিবী বিখ্যাত। ১৪০০ সালে জার্মানের এক ভদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। ছোটবেলায় ভালভাবে লেখাপড়া শেখার সুযোগ তেমন পাননি তিনি। তাই বাবার ব্যবসাকেই সঙ্গী করে জীবন শুরু করেন। গুটেনবার্গ ছিলেন একজন খুব ভাল শিল্পী। ব্যবসায়েও খুব ভাল ছিলেন। বাজারে তাঁর সুনাম ছিল সৎ ব্যবসায়ী।

গুটেনবার্গের একটা নেশা ছিল তখন খেলায়। তিনি অবসর সময় পেলেই তাঁর স্ত্রী এনার সঙ্গে তাস খেলতে বসে যেতেন। আজকের মতো তখনতো ভাল তাস পাওয়া যেত না, তাই শিল্পীরাই মোটা কাগজ কেটে তার উপর তাসের ছবি আঁকতেন। তখনি তাস খেলতে খেলতে গুটেনবার্গেরও মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তিনি ভাবলেন খুব সুন্দর করে এক বান্ডিল তাস আঁকবেন। ব্যস্ এই কথা মনে হতেই তিনি খেলা বন্ধ করে মেতে গেলেন তাস আঁকতে।

দুই-তিনখানা তাস আঁকার পরই তিনি, ভাবলেন দূর এইভাবে এত কষ্ট করে আঁকা যায়? কিভাবে যন্ত্রের দ্বারা ছবি আঁকা যায় সেই ভাবনাই ভাবতে লাগলেন। গুটেনবার্গ রং তুলি ফেলে তিনি গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি কাঠের ব্লক তৈরি করলেন। সেই কাঠের ব্লকের উপর কালি মাখিয়ে তা কাগজের উপর ছাপ দিলেন। এতে সত্যিই সুন্দর তাসের ছবি পাওয়া গেল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন গুটেনবার্গ। তিনি অনেকগুলো কাঠের ব্লক তৈরি করে প্রচুর তাস তৈরি করে সব বন্ধুদের আনন্দে বিলাতে লাগলেন।

কাঠের ব্লকে তাস ছেপে তিনি খুব খুশি হলেন। শিল্পীমনের চিন্তার শেষ নেই। এবার ভাবলেন অন্যকিছু। গুটেনবার্গ মনে মনে ঠিক করলেন কাঠের উপর মহাপুরুষের ছবি এঁকে ব্লক করলে কেমন হয়? যেই ভাবা সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এই মহাপুরুষের ছবির নিচে কাঠের সূক্ষ্ম এবং ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে কেটে অক্ষরের ব্লক তৈরি করে মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা ছেপে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

এভাবে তিনি বেশ কয়েকজন মহাপুরুষের ছবি তৈরি করে দোকানে রেখে দিলেন। গুটেনবার্গের দোকানে অনেক ভাল ভাল লোকজন আসতেন, তারা তাঁর এই গুণ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অনেকে অনেক দাম দিয়ে ছবিগুলো কিনে নিলেন। হাতের কাছে ব্লক তৈরি থাকার জন্য গুটেনবার্গ অল্প সময়ের মধ্যে সাদা কাগজে ছাপ দিয়ে ছবি তৈরি করে বিক্রি করতেন। প্রথমে তিনি কাঠের ফলকে ছবি ও লেখা এঁকে ফেলতেন তারপর প্রয়োজনমত অংশটা রেখে বাকি কাঠটা কেটে ফেলতেন।

এই সোজা ব্লকটা আর একটা কাঠের ফলকে ছাপ দিয়ে উল্টো ব্লক তৈরি করে নিতেন। এই পরের ব্লকটাই হতো কিন্তু আসল ব্লক।

একদিন গুটেনবার্গের দোকানে এক পাদরী সাহেব এলেন। তিনি গুটেনবার্গের এই কাণ্ড দেখে তো অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বেশ কয়েকটা ছবি কিনে নিলেন। পাদরী সাহেব ভাবলেন তা মহাপুরুষের জীবনী যদি আর একটা বড় করে লিখে জনসাধরণের মধ্যে বিলি করা যায় তাহলে দেশের মানুষের খুবই উপকার হবে, তারা জানতে পারবে ও শিখতে পারবে। পাদরী সাহেব কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনী লিখে নিয়ে হাজির হলেন গুটেনবার্গের কাছে, তিনি বললেন যেমন করে হোক এইগুলো ছাপিয়ে দিতে হবে, তার জন্য যা খরচ হবে সব তিনিই দেবেন।

গুটেনবার্গ তো মহা বিপদে পড়লেন। ভাবলেন কি করে এই সমস্যার সমাধান করবেন। তবে মুখে কিছুই বললেন না। কয়েক মাস ধরে তিনি অসম্ভব পরিশ্রম করে কাটের ফলকের উপর একটার পর একটা করে খোদাই করলেন অক্ষরের উল্টো প্রতিলিপি। এভাবে তিনি চৌষট্টিখানা ব্লক তৈরি করে একদিন প্রকাশ করলেন চৌষট্টি পৃষ্ঠার মহাপুরুষের জীবনী গ্রন্থ। যা সবাইকে অবাক করে দিল। কারণ এর আগে কোন বই ছাপা অক্ষরে বের হয়নি। পৃথিবীতে এটাই হচ্ছে প্রথম ছাপা বই।

এই বইটি ছাপার পর থেকে গুটেনবার্গের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তিনি ঠিক করলেন এবার বাইবেল ছাপাবেন। তিনি , তাঁর স্ত্রী এনা ও আরও কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে আরম্ভ

করলেন কাজ কিন্তু কাজ আরম্ভ করার মুখেই ঘটল এক বিপদ। সবেমাত্র কয়েক পৃষ্ঠার ব্লক তৈরি হয়েছে তা পরীক্ষা করতে গিয়ে হাত ফসকে ব্লকগুলো পড়ে গেল। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো ভেঙ্গে গেল। কারণ এই ব্লকগুলো ছিল খুবই পাতলা কাঠের। এই ঘটনায় গুটেনবার্গ খুবই হতাশ হয়ে পড়লেন। তবুও আশা ছাড়লেন না। ভাবলেন এমন একটা উপায় বার করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আর এমনটি না ঘটে। কিভাবে এই কাজ করা যায়? এই ভাবতে ভাবতে গুটেনবার্গের এক নতুন চিন্তা মাথায় এল। তিনি এবার কাঠের উপর অক্ষর খোদাই না করে কেবল কাঠের অক্ষর তৈরি করতে শুরু করলেন। অনেক অক্ষর তৈরি করে এবার কাঠের ফলকে লেখার মতো সাজিয়ে ছিলেন। তারপর তাতে কালি মাখিয়ে কাগজের উপর ছাপ দিলেন। গুটেনবার্গ দেখলেন এতেই ছাপার কাজের সুবিধে বেশি।

এবার তিনি এই কাঠের অক্ষরগুলির নাম দিলেন টাইপ। কাঠের টাইপ কয়েকবার ছাপ দেওয়ার পর ভোঁতা হয়ে যায় বলে পরের দিকে তিনি ধাতুর তৈরি টাইপ ব্যবহার করতেন। ১৪৫০ সালে গুটেনবার্গ টাইপ আবিষ্কার করেন, তারপরই বাইবেল ছাপা হয়।

যে বিজ্ঞানী এত বিস্ময়কর জিনিস আবিষ্কার করলেন, তাঁর জীবনে কিন্তু অভাব কাটেনি। কারণ তাঁর ও তাঁর স্ত্রী এনার ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল না। কারণ ব্যবসায়ী বুদ্ধি থাকলে ওদের অনাহারে কাটাতে হতো না। তাঁরা ইচ্ছে করলে বাইবেল ও অন্যান্য বই ছেপে প্রচুর আয় করতে পারতেন। গুটেনবার্গ তাঁর নিজের সবকিছু দিয়ে তৈরি করেছিলেন এই ছাপাখানা। শেষ বয়সটা তাঁর খুবই কষ্টে কাটে। কারণ তাঁর স্ত্রী এনা মারা যাবার পর তিনি আরও ভেঙ্গে পড়েন। কাজের যে উৎসাহ সেটাও তাঁর কমে যায়। সেই সময় পাদরী সাহেব দয়া করে তাঁকে অল্পকিছু টাকার পেনসনের ব্যবস্থা করে দেন। সেই পেনসনের উপর নির্ভর করেই তিনি বাকি জীবনটা কাটান।

গুটেনবার্গের কাঠের টাইপ আজও বিজ্ঞান জগতে এক শ্রেষ্ঠ অবদান। তার সময়ে চৌষট্টি পৃষ্ঠার জীবনীগ্রন্থ ও বাইবেলকেও বিস্ময়কর ঘটনা ছাড়া ভাবা যায় না। এই বিজ্ঞানী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৪৬৮ সালে।

আজ পৃথিবীতে ছাপাখানার অনেক আধুনিক উন্নতি হয়েছে। ১৮৮৬ সালে ওটসার মারগেন থ্যাসার নামে এক আমেরিকান যন্ত্রবিদ লাইনো পাইপ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। পরে অবশ্য মনোটাইপ, অফটেস আবিষ্কার হয়ে মুদ্রণ শিল্পকে উন্নত হয়েছে। তবে গুটেনবার্গ হচ্ছে মুদ্রণ শিল্পের প্রথম ও প্রধান জন্মদাতা।

৬১
জুলিয়াস সিজার
[খ্রিঃ পূঃ ১০০-৪৪]

কপালের লিখনই ছিল তাই। প্রথম, সিজার প্রথমই হবে। রোমে যদি দ্বিতীয় হতে হয় তবে সিজার বরং গ্রামে যাবে—যেখানে সে প্রথম হয়ে থাকবে। তবুও প্রথমই হতে হবে তাকে। সেটাই তার ভাগ্যলিপি। সিজারের ভাগ্যই ঠিক করে রেখেছিল, গ্রাম নয়, রোমেই প্রথম হবে সিজার। সে নেবে 'পিতৃভূমির পিতা' এই গর্বিত উপাধি। এসবই যেন ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। সিজার যদি আরও একটু কম উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতো, তাহলে ইউরোপের ইতিহাস, তার সভ্যতার ধারা হয়তো বইতো অন্য খাতে।

সিজার এমন এক ব্যক্তি, যার দাবি ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে বদ্ধ তিনি। আর সিজার যখন ক্ষমতার মধ্যগগনে, তখন তার ঘোষণা, আত্মীয় নয়, তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর। সিজার হল সেই ব্যক্তি যিনি রোমান সাম্রাজ্যের সীমানাকে উত্তর ও পশ্চিমে বিস্তৃত করেছেন, মানব ইতিহাসে এমন এক চিহ্ন রেখে গেছেন যা মুছবে না কোন সময়ই। একদিন যে পথে সিজারের বাহিনী রোম থেকে বেরিয়েছিল বিশ্বজয়ে, একদিন পৌত্তলিক প্রতিভা সাম্রাজ্যের যে ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল–তারই ওপর গড়ে উঠেছিল খ্রিষ্ট্রীয় ইউরোপের বিরাট পরিকাঠামো। সিজারের সেই পথ ধরেই কয়েক শতাব্দী পরে খ্রিষ্ট্রীয় মিশনারিরা বেরিয়েছিল খ্রিস্ট ধর্মের অনুশাসনে পৃথিবী জয়ে।

১০২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে সেই মাসে–যে মাসটার নাম তাঁরই প্রতি সম্মান জানাতে চিহ্নিত হয়েছিল জুলাই নামে, সেই ১০২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের জুলাইয়ে তাঁর জন্মের কয়েক প্রজন্ম আগেও একটা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার গতি ছিল এলোমেলো। কখনও এদিকে। কখনও ওদিকে। ভূমধ্য সাগরের তীরে সভ্যতার কেন্দ্র হবার জন্য ছিল সে সংগ্রাম। গ্রীকরা তাদের যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে দর্শন, সাহিত্য এবং শিল্পে বিস্ময়কর অগ্রগতির মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাসে রেখে গেছে

তাদের সদম্ভ উপস্থিতির চিহ্ন · কার্থে জিয়রা উন্নীত হয়েছিল বণিক জাতি হিসেবে–শাসিত হয়েছিল বণিক ও ধনীদের দ্বারা আর সব সময় অন্তরে পুষে রেখেছিল ক্ষমতা দখলের বাসনা। আর সেই সময়ই গর্ভলক্ষ্মণহীন ইতালির মাটিতে নয়া উপনিবেশ গড়ছিল যারা তারা গ্রীক পর্যটক এবং বণিকদের কাছে থেকে দ্রুত শিখে নিচ্ছিল অনেক কিছু এবং ক্রমেই ধনী প্রতিবেশীদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠছিল।

সে সময় রোমকে কেন্দ্র করে বলিয়ান হয়ে উঠলি যে রোমিওরা, তাদের সঙ্গে কাথেজিওদের শুরু হয়ে গিয়েছিল ক্ষমতা দখল ও শ্রেষ্ঠত্বের এক তীব্র লড়াই। সে লড়াই ছিল অস্তিত্ব রক্ষারও লড়াই। কার্থেজিওদের শাসন বিস্তৃত ছিল স্পেন এবং গলের দক্ষিণ উপকূল ভাগ ধরে। রোমানরা তাদের দেখতে রীতিমত ভয়ের চোখে। কার্থেজিও নেতা হানিবলের সঙ্গে লড়াইয়ে তরা বিপর্যস্তও হয়। তাদের পরাজিত করেই হানিবলের বাহিনী অতিক্রম করে আল্পস পর্বতমালাও, বিধ্বস্ত করে ইতালিকে। এই ব্যর্থতা, এই বিপর্যয় সত্ত্বেও রোমানরা কিন্তু জাতি হিসেবে নিশ্চিহ্ন হয়ে হয়ে যায়নি। সে সময় রোম যে আশ্চর্য অনুষ্ঠানের কৌশল নিয়েছিল তারই কাছে হেরে যেটুকু জয় করেছিল সেটুকুই খুইয়ে বসে হানিবল। পরিণতিতে পূর্ণ প্রতিশোধই নেয় রোম। শুধু অধিকার নয়, কার্থেজকে ধ্বংস করে দেয় তারা। এবং শেষ পর্যন্ত তারাই হয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ। রোমানদের শক্তিই নিহিত ছিল এর মধ্যে। সব কিছু গ্রহণ ও আত্মস্থ করার অসামান্য দক্ষতা ছিল তাদের। সেই সঙ্গে তারা জানত জয়ের ফলাফলকে নিজেদের কাজে লাগাতে। কার্থেজের সাধারণ মানুষের নৈতিক বল ছিল খুবই কম। তারা ছিল মুনাফা তৈরির যন্ত্রের একটি অংশ মাত্র। গ্রীসের শাসকরা অধীনস্থ রাজ্যগুলিকে হেয় করে রেখে করেছিল বিরাট ভুল। কিন্তু রোম যেমন অন্যের কাছ থেকে চিন্তাধারা গ্রহণের ব্যাপারে অকৃপণ ছিল তেমনি গ্রীক দেবতাদের মেনে নিয়েও তারা সেই দেবতাদের দেয় নতুন নতুন নাম। সেই সঙ্গে এই ভূমির অভিবাসনকারী অথবা তার অধিকৃত অঞ্চলের লোকজনের সঙ্গে ও সে এমন ব্যবহার করত যাতে তারা স্বেচ্ছায় এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত।

রোম বরাবরই শিক্ষা নিত ইতিহাস থেকে। সে জানত, একটি বিজয়ী শক্তি যখন জোর করে বিজিতের ওপর সবকিছু চাপিয়ে দেয়, তখন সঙ্কটের সময় একটা বড় ফাটল দেখা দিতে বাধ্য। অন্যের নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে রোম খুঁজে পেত তার শক্তি। ঔপনিবেশিকদের চাতুর্যে, নাগরিকত্ব দানের মধ্য দিয়ে, সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে রোম তার প্রতিপক্ষের সামনে খাড়া করে শক্ত প্রতিরোধের প্রাচীর।

জুলিয়াস সিজারের জীবন ও কর্মধারা আলোচনার সময় ইতিহাসের ঐ প্রেক্ষাপটটি মনে রাখা দরকার। এই প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে, জুলিয়াস সিজার কিভাবে তার সমকালের বহু গুণাবলী এবং দোষ ত্রুটি ও অন্যায়ের বিরল নজির হয়ে উঠেছিলেন তা ঠিক বোঝা যাবে না।

রোমের যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে সিজারের জন্ম, সেই পরিবারটি নিজেদের মনে করত স্বর্গের দেবতা ভেনাস এবং ইলিয়াসের উত্তরপুরুষ হিসেবে। এই দেবতার সঙ্গে সংযোগের এই ধারণাটাই স্ফীত করেছিল সিজারের গর্বকে এবং হয়তো এই গর্বই পরবর্তীকালে তাকে ভাবতে শিখেছিল, তার সমস্ত শক্তি সত্যই অতিমানবিক।

যুবক জুলিয়াসে যুক্ত হয়েছিলেন তার মহান জেনারেল ম্যারিয়াসের দলে। এই দল যখন ক্ষমতা দখল করে তখন পুরস্কার হিসেবেই রোমানদের প্রধান দেবতা জুপিটারের অর্চক পদে নিযুক্ত হন জুলিয়াস। কিন্তু এই সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। এর কিছুদিন পরেই সপ্তমবারের জন্য কনশান পদে নির্বাচিত ম্যারিয়াসের জীবনাবসান হয়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পদ এবং সম্পত্তি দুই হারিয়ে রোম ছাড়তে হয় ম্যারিয়াসের অনুগামীদের।

বিরোধী দল নেতা সুল্লা বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন রোমে। সুল্লা সিজারকে ক্ষমা করতে রাজি ছিলেন একটি মাত্র শর্তে। সে শর্ত, ঘৃণিত গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে যুক্ত তার যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে হবে। সিজার রাজি হলেন না। এই রাজি না হওয়ার জন্য সিজারকে বরণ করতে হয় ভয়ানক বিপদকে। রোম আর তার পক্ষে তখন নিরাপদ জায়গা নয়। সিজার তাই তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে ঘুরতে থাকেন পূর্বদিকে। এই সময়েই যুদ্ধ সম্পর্কে প্রথম শিক্ষাটি নেন তিনি, সেই শিক্ষাই পরবর্তীকালে তাঁকে বিরাট ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছিল। রাজনীতির দাক্ষিণ্য আবার যখন তাঁর ওপর বর্ধিত হল, তখন তিনি রোম ফিরে এলেন আইন শিক্ষার জন্য। সেটাই হল তাঁর রাষ্ট্র নায়ক হবার সোপান।

রোডসে বিখ্যাত অ্যাপেলেনিয়াস মোলোনের কাছে বাগ্মীতা শিখতে গিয়ে সিজার কিছু অসৎ আমোদ প্রমোদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সেনাজীবনের নানা অসুবিধা আর শিক্ষণজীবনের নিষ্ঠার বাইরে এই জীবন বেশি করে টানতে থাকল সিজারকে। নাগরিক জীবনের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম জুয়ায় কেটে যেত তাঁর দিনের অনেকটা সময়। ধারের পর ধারে তিনি যেন আকণ্ঠ ডুবে যেতে থাকলেন। শোনা যায় এক সময় তার ঋণের পরিমাণ দাড়ায় দুলক্ষ পাউন্ড। এই সময়ই স্পেনের গভর্নর পদে নিয়োগ করা হয় সিজারকে। কিন্তু তাঁর মহাজনেরা তাঁর স্পেনে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের এক কথা, আগে ঋণের অর্থ মেটাও তারপর যেখানে খুশি যাও।

এই সময় সিজারের ত্রাতা হিসেবে দেখা দিলেন রোমের বিখ্যাত ধনী ক্র্যাসাস। সিজারের হয়ে তিনি সব ঋণ মিটিয়ে দিলেন। কথা রইল, সিজার যখন আবার আর্থিক দিকে সচ্ছল হবে এবং সামরিক অভিযানের মাধ্যমে নিজের সুনামকে বাড়াবেন সেই সময় মিটিয়ে দেবেন ক্র্যাসাসের সব টাকা।

অসাধারণ দক্ষতায় সিজার এবার ধনী ক্র্যাসাসের সঙ্গে বরি পম্পের বিরোধ মিটিয়ে আবার তাদের বন্ধু করে তুললেন। এই পম্পের সামরিক দক্ষতা তাঁকে রোমের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি করে তুলেছিল। ৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, এই তিনজন মিলে যে শাসক চক্র গড়ে তুললেন তাই হল রোমের প্রথম ত্রয়ীশাসক চক্র। সিজার কন্সাশ হলেও সামরিক বিভাগের পরিবর্তে পেলেন সড়ক ও বনাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব।

সিজার এবার এশিয়া মাইনরের দিকে যান। সেখানে তিনি পম্পের এক পুরনো সহযোগীকে পরাজিত করেন। এই সহযোগী হলেন পন্টাসের রাজা ফারনাসেস। তাঁরা জিলার কাছে এক তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে জয়ের ফলে সিজার নিজের অবস্থা আরও জোরদার করেন। এই যুদ্ধে জয়ের ফলে সিজার নিজের অবস্থা আরও জোরদার করেন। এই অভিযানের সময় সিজার উচ্চারণ করেন সেই বিখ্যাত উক্তি–ভিনি, ভিডি, ভিসি–এলাম, দেখলাম, জয় করলাম।

ইতালিতে ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার সিজারকে বেরতে হল বিদ্রোহ দমনে। এবার তিনি ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকা অভিযানে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি ইতালিতে ফিরে এলেন। এলেন গ্রামে প্রথম হতে নয়। রোমে প্রথম হতে। তিনি প্রথমে দশ বছরের জন্য, পরে আমৃত্যু নিজেকে একনায়ক হিসাবে ঘোষণা করেলেন। স্বল্পকাল ক্ষমতায় থাকার সূত্রেই সিজার সুবিচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেলেন এবং তাঁর এই আত্মশ্লাঘাই ডেকে আনল তাঁর মৃত্যুকে। তবুও ওই সময়েই আল্পসের ওপারেও বিস্তৃত করলেন তিনি ভোটাধিকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক সুবিধা, উপজাতির গুলি পেল বন্ধুত্ব, ক্যালেন্ডার সংস্কার হল, স্বাধীন মানুষ পেল আরও স্বাধীনতার সুনিশ্চিত আশ্বাস, এবং জনস্বার্থে হাত দেওয়া হল বড় বড় কাজে।

সেনেট হাউসে পম্পের মূর্তির পাদদেশে ঘন ঘন অশনি সম্পাতে আলোকিত ঝড়ো হওয়ার মধ্যে ঘাতকের ছুরিকাঘাতে নিভে যায় তাঁর জীবনদীপ। বলা হয় যারা তাঁকে খুন করে তাঁর মধ্যে শত্রুর চেয়ে তাঁর মিত্রই ছিল বেশি। আমরা জানি তাঁর শেষ কথাটি ছিল, হায় ব্রুটাস, তুমিও!

সিজার সেই মৃত্যুর মুখে দেখেছিলেন তার ঘনিষ্ঠজনরাই তাঁকে নিঃসঙ্গ করেন। বুঝলেন তাঁর সাফল্যই পরাজিত করল তাঁকে। সিজারই রোমের দৃষ্টিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে উত্তর ইউরোপের দিকে প্রসারিত করেন। বিচ্ছিন্ন জাতিগুলিকে তিনিই আনেন রোমের পতাকাতলে। শুধু অসি চালনাতেই নয় মসি অর্থাৎ লেখনীতেও তিনি পারদর্শিতার চিহ্ন রেখে গেছেন তাঁর যুদ্ধ বিবরণীতে আর গড়ে দিয়ে গেছেন তার ভাগ্নে অগস্টাসের জন্য সাম্রাজ্য গড়ার রাস্তা। সিজার চরিত্রকে অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে তুলে ধরেছেন লর্ড টুইডসমুরি এইভাবে—

"এই পৃথিবীর গুরুভার কাঁধে নিয়েও তিনি লঘুপদে চলার ক্ষমতা হারাননি। যুদ্ধ কিংবা প্রশাসন কখনই তাঁকে করে তোলেনি এক সঙ্কীর্ণ বিশেষজ্ঞ। তাঁর সংস্কৃতি তাঁর সমকালের যে কোন মানুষের চেয়ে ছিল বিস্তৃত। তিনি ভালবাসতেন শিল্প এবং কবিতা, সঙ্গীত এবং দর্শনকে। জীবনের কঠিনতম মুহূর্তেও তিনি এরই মধ্যে নিমগ্ন হতেন। তাঁর মধ্যে ছিল এক সক্রিয় মানুষের বাস্তবতাবোধ, শিল্পের অনুভূতি, সৃজনশীল স্বপ্নাল ব্যক্তির কল্পনাপ্রবণতা। এতগুলি গুণের সমাহার, আমি মনে করি, আর কোথাও ঘটেনি।"

৬২

গুলিয়েলমো মার্কোনি

[১৮৭৪-১৯৩৭]

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে টেলিফোন, গ্রামোফোন, রেডিও, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, মোটগাড়ি ও এরোপ্লেন। এইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে রেডিও। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে একটা লোকের কণ্ঠস্বর সারা পৃথিবীর মানুষ একই সাথে শুনতে পারে। এই রেডিওর আবিষ্কারক হচ্ছেন দি মার্কিস গিলেরসো মার্কোনি। ইতালির বোলোনিয়া শহরে ১৮৭৪ সালে ২৫ শে এপ্রিল মার্কোনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ইতালীর এক ধনী ব্যক্তি, মা ছিলেন আয়ারল্যান্ডের।

এই রেডিও আবিষ্কারের আগে মানে মার্কোনির জন্মের আগে আকাশ পথে দূর-দূরান্তে শব্দ ও ধ্বনি প্রেরণের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কাজ হয়েছিল। ১৮৬৪ সালে অঙ্ক শাস্ত্রের প্রতিভাবান বিজ্ঞানী জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন বিদ্যুৎ তরঙ্গের অস্তিত আছে। যার থেকে জানা যায় বেতার তরঙ্গের দ্রুতি ও বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। দুঃখের কথা ম্যাক্সওয়েলের এই কথা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত না হওয়ায় কেউই তাঁর তত্ত্বকে সম্মান করেনি বরং তাঁকে বিদ্রূপ করেছে। তবে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে এলেন বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ হেনরিখ রুডলফ হার্জ। হার্জের আবিষ্কার ১৮৮৭ ও ১৮৮৯ সালের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা পায়, বহু বিজ্ঞানী বেতর তরঙ্গের উপর গবেষণা করতে লাগলেন। এদের মধ্যে আছেন ইংলন্ডের আলিভার নাজ, রাশিয়ার আলেকজান্ডার পোপোভ, ভারতের জগদীশচন্দ্র বোস, সত্যেন বোস আরও অনেক বিজ্ঞানী, ইতালির অগাস্টো রিঘি তখন বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, রিঘির ছাত্র ছিলেন তরুণ যুবক মার্কোনি। হার্জের আবিষ্কারের সময় মার্কোনির বয়স ছিল পনের বছর। মার্কোনি তাঁর গৃহশিক্ষকদের কাছ থেকে ব্যাপারটা বুঝে নেন। সেই তখন থেকেই তিনি এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করতে থাকেন। তিনি ছিলেন ধনী ঘরের ছেলে। তাই বাড়িতে বসেই শিক্ষকদের কাছ থেকে পড়তেন। ১৮৯৫ সালে নিজের বাড়িতে বসে পরীক্ষা চালান। পুরানো সব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করেন। প্রথমে তিনি বেতার সংকেতের কার্যকরী পদ্ধতি তৈরি করেন। এর সাহায্যে তিনি এক মাইল দূরে বেতারবার্তা পাঠাতে পারেন।

১৮৯৬ সালে তিনি দুই মাইল দূরত্বে বেতারবার্তা পাঠাতে পারেন, মার্কোনি তাঁর এই আবিষ্কারের কথা ইতালি সরকারকে জানালেন। কিন্তু ইতালি সরকার তাঁকে অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দিলেন, সে বছরই তিনি ইংল্যান্ডে আসেন তাঁর যন্ত্রের পেটেন্ট করতে। এখানে এসেডাকঘরের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি তাঁদের দেখালেন দশ মাইল পর্যন্ত বেতার বার্তা পাঠানো যায়।

যার ফলে ইতালির সরকার মার্কোনির মূল্যটা বুঝতে পারল। তাই সঙ্গে সঙ্গে মার্কোনিকে আমন্ত্রণ জনালেন ও এক বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। এখানে বার মাইল দূরে যুদ্ধ জাহাজে বেতারবার্তা পাঠানো যায়। দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে, এর সাথে বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পারলেন এর গুরুত্ব ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা।

১৮৯৭ সালে মার্কোনি তাঁর আবিষ্কার ইতালির সম্রাট হামবার্ট ও রানী মারগেরিটারে সামনে প্রদর্শন করেন। সেই সময় তিনি জায়গায় বেতার স্টেশন তৈরি হয়। ১৮৯৯ সালে মার্কোনির আবিষ্কারের সম্পর্কে সাধারণ মানুষও সজাগ হয়ে উঠেন। কারণ সে বছরই একটি স্টিমারে সাথে সংঘর্ষে আরোর সংকেতদতা ইস্ট গুডউইন জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বেতারবার্তা পাঠানো হল লাইটহাউসে, সাথে সাথে নৌকা পাঠিয়ে নাবিকদের জীবন বাঁচানো হল। এরপর ইংলিশ চ্যানেলের এপার থেকে ওপারে বেতার যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। তারপর মার্কোনি আটলান্টিক মহাসাগরের এপার থেকে ওপারে বেতারবার্তা পাঠানোর কাজে লেগে যান। ১৯০১ সালে ১২ ডিসেম্বর তিনি সফল হন।

১৯০৫ সালে বেতার যন্ত্রের আরও উন্নতি ঘটে। বেতার গ্রাহক যন্ত্রের সমস্ত অসুবিধাগুলো দূর হয়ে যায়। ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে বেতারবার্তা পাঠানো পদ্ধতি অনেক উন্নত হয়। যার ফলে তখনই রেডিও তৈরি হয়। ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে মার্কোনি প্রচুর পুরস্কার ও সম্মান পান। ১৯০১ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। তাঁকে 'দি মার্কিন'-এ ভূষিত করা হয়। ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

৬৩

রাণী এলিজাবেথ

[১৫৩৩–১৬০৩]

ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ তাঁর প্রথম আইন সভার অধিবেশনে যে স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন, সম্ভবতঃ সেটাই ছিল তাঁর জীবনের আন্তরিকতার ছোঁয়ায় রাঙানো প্রথম ও শেষ বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন, "আমার প্রজাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা ভিন্ন আমার কাছে পৃথিবীর কোন কিছুই মূল্যবান নয়।"

যদিও টিউডরদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল অসংখ্য মানুষকে, আর সেই রক্তস্নাত পিচ্ছিল পথ ধরেই তিনি আরোহণ করেছেন সিংহাসনে, তবুও কিন্তু তিনি তাদের ভালবাসা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু অর্জন নয়। সে ভালবাসা তিনি রক্ষাও করেছিলেন; হ্যাঁ, তাঁর রাজত্বের শেষ দিকের দুঃখময়, বিবর্ণ দিনগুলিতেও যখন তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে শয়তানিতে ভরা ঝগড়াটের এক রক্তবর্ণা স্ত্রীলোক হিসাবে–তিনি লালায়িত ছিলেন যুব-সম্প্রদায়ের ভালবাসার জন্য; যদিও অবশ্য এর জন্য উচ্চ-পদস্থ বা সাধারণ, কোন ব্যক্তিকেই বঞ্চিত করতে বা বিপদে ফেলতে তাঁর হাত এতটুকু কাঁপেনি। পৃথিবীর সবচেয়ে কাঙ্খিতা মহিলা এই এলিজাবেথ প্রেমাসক্তিতে ছিলেন উদ্দাম, বল্গাহারা, নির্মম, নিষ্ঠুর। একটুকরো নিখাদ ভালবাসার জন্য তিনি পারতেন না এমন কোন কাজই পৃথিবীতে ছিল না।

এলিজাবেথ জন্মগ্রহণ করেন ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে; কিন্তু তাঁর পিতা অষ্টম হেনরী তাকে খুশি মনে মনে নিতে পারেন নি। কেননা তিনি চেয়েছিলেন যে কোন পুরুষ বংশধর এসে বহন করুক ঐতিহ্যশালী এই টিউডর বংশের ধারা; বিশেষতঃ অজস্র বাধা আর প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে তিনি যেখানে অ্যান বোলিনকে রাণী করেছিলেন সেখানে সামান্য প্রতিদান হিসাবে সেও তো তাকে একটা পুত্র-সন্তান উপহার দিতে পারত। এলিজাবেথ যদি কন্যাসন্তান না হয়ে পুত্রসন্তান হতেন তো অ্যান বোলিনকে হয়ত তিন বছরের শিশুকে ফেলে রেখে ফাসি কাঠে তার উচ্চাকাঙ্খী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হতো না। শিশু হিসাবে একাকীত্ব, ভীতি, বেদন এবং দুঃখ সম্বন্ধে এলিজাবেথ-এর অভিজ্ঞতা আর পাঁচটা শিশুর থেকে ছিল অনেক বেশি। খুব ছোট্ট বয়স থেকে হঠাৎ মৃত্যুজনিত ভয় ছিল তাঁর চিরসাথী এবং নিজের জন্মের কলঙ্ক ছিল কায়ার ছায়ার মতো সর্বদা সম্মুখে লম্ববান। তাঁর ছোটবেলার বেশির ভাগ সময়টাই কেটেছে প্রকৃত পক্ষে বন্দীদশায়। তবু ভাল, গৃহশিক্ষক, প্রচুর পুস্তক এবং ছোট্ট বৈমাত্রেয় ভাই এডোয়ার্ড-এর সাহচর্যে তিনি কিছুটা তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। সর্বোপরি, রজার অ্যাস্‌চাস এবং ব্যালডাসেয়ার-এর অভিভাবকত্বে 'হ্যাটফিলড হাউস'–এ কাটানো শান্ত দিনগুলি ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের স্মৃতিগুলির অন্যতম।

এরপর ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম হেনরী মারা গেলেন এবং সিংহাসনে বসলেন দশ বছরের বালক ষষ্ঠ এডোয়ার্ড, সঙ্গে অভিভাবক হিসাবে থাকলেন তার মামা ডিউক অব সমারসেট। কিছুদিনের মধ্যেই দিকচক্রবালে ঘনিয়ে এল চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের কালো মেঘ। সমারসেট ক্ষমতালোভী হলেও সেরকম ধূর্ত ছিলেন না; তাছাড়া এটাও নিদারুণ ভাবে সত্য ছিল যে ওই বালক রাজা শারীরিকভাবে এমনই দুর্বল ও অথর্ব ছিল যে তার পক্ষে পরিপূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় পৌঁছানো কখনই সম্ভব ছিল না। তাই অষ্টম হেনরীর উইল অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর পরেই ছিল অ্যারাগণের ক্যাথারিন-এর কন্যা মেরী টিউডর–এর নাম এবং সবশেষে ছিল এলিজাবেথ এর নাম। তবে, এদের দুজনের কাছেই ভয়াবহ বিপদস্বরূপ ছিল ফ্রান্সের দঁফের স্ত্রী ও অষ্টম হেনরীর বড় বোন মার্গারেট-এর নাতনী এবং স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ দাবীদার মেরী স্টুয়ার্ট। আসলে, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের উপরও মেরী স্টুয়ার্ট–এর দাবী ওই দুই টিউডর যুবরাণীর চেয়ে অনেক বেশি ও জোরালো ছিল; কিন্তু মেরী টিউডর এর মতো তার ক্যাথলিক ঘেষা মনোভাব তাকে ইংল্যাণ্ডের জনগণের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করেছিল, এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার ফ্রান্সের রাণী হওয়া, যা তার ইংলণ্ডেশ্বরী হওয়ার পক্ষেও অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

এলিজাবেথ অবশ্য তাঁর বিমাতা ক্যাথারিন-এর নতুন স্বামীর বেশ প্রিয় পাত্রীই হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, পঞ্চদশবর্ষীয়া রাজকুমারীর হৃদয়ে সুখের যে ঢেউ সুদর্শন সেমুর তুলেছিলেন তাঁর যৌবনের তটে। তাই ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথারিন মারা যেতেই সেমুর এলিজাবেথ এর কাছে সরাসরি প্রস্তাব করলেন। সেমুর-এলিজাবেথ সম্পর্কের প্রকৃত চেহারা হয়ত আমরা কোনদিনই

জানতে পারব না. কিন্তু যে লোকনিন্দা ও কলঙ্কের আর্বতে তিনি নিজেকে এবং এলিজাবেথকে ডুবিয়েছিলেন তাতে যুগ্ম মৃত্যুদণ্ড প্রায় অবধারিত ছিল। কারণ, সেমুর-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাজদ্রোহিতার; তিনি চেয়েছিলেন এলিজাবেথকে বিয়ে করে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন অধিকার করতে। শেষ পর্যন্ত একদল দুঁদে উকিলের প্রাণান্তকর জেরায় জেরবার হয়ে এলিজাবেথ তাঁর নির্দোষিতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার পর তাঁরা দুজনে তাদের শির ও সম্মান কোনক্রমে বাঁচালেন।

এলিজাবেথ এর বিরুদ্ধে বরাবরই একটা অভিযোগ ছিল যে তিনি ছিলেন এক মোহিনী নারী। আপাতবিরোধীভাবে এটা যেমন সঠিক, তেমনি বেঠিকও। শোনা গেছে, তাঁর বৃত্তের ধারে কাছে যে যুবকই এসেছে, পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি তার যৌবনরস পান করেছেন। সম্ভবতঃ এসেক্স এর সঙ্গেই তাঁর প্রেম যথেষ্ট গভীরতা লাভ করেছিল; কিন্তু স্পেন-এর ফিলিপ, তাঁর সম্পর্কিত ভাই ডন জন এবং অস্ট্রিয়ার আর্কডিউক চার্লস, আনজাউ এর হেনরী কিংবা তার ভাই ফ্রান্সিস–এদের সকলের সঙ্গেই তাঁর সলাজ সম্পর্ক ছিল ঠাণ্ডা রাজনীতি সঞ্জাত। তাঁর এই নিস্পৃহ এবং শীতল আবরণ কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত সাফল্যেরই অঙ্গীভূত। দুঃসাহস ও যৌবনের আগুনে উত্তপ্ত এবং বিত্ত ও ভোগের লালসায় উত্তেজিত একটা দেশে তিনি চোখ ঝলসানো কোন স্বর্ণ শিখর নয়, ছিলেন রজতশুভ্র পর্বত শৃঙ্গের মতো মহিমান্বিত এক শীতল ব্যক্তিত্ব, যাকে ধরা যায় কিন্তু বেঁধে রাখা যায় না, যার স্পর্শে জাগে শিহরণ কিন্তু তা দেয় না কোন নির্ভরতা। জাঁকজমক, আড়ম্বর ও যে কোন বিলাসিতার প্রতি তাঁর তীব্র আসক্তি। রাজকীয় কোন অনুষ্ঠান বা শোভাযাত্রা, যা বর্ণাঢ্যতায় ও জৌলুষে সাধারণ মানুষের চোখকে ধাধিয়ে দেয় এবং তাদেরকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয় তার জন্য তিনি স্বয়ং পৃষ্ঠাপোষকতা করতেন। অন্যদিকে আপামর জনসাধারণের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন উৎসাহ ও প্রেরণার এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি–যাকে আদর্শ করে অসংখ্য সাহসী, মেধাবী, এমনকি বিবেক–বুদ্ধিহীন মানুষও বেরিয়ে পড়েছিল স্থলে, জলে ও রণাঙ্গণে কিছু একটা করে দেখাবার নেশায়। তবে ধর্মীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে তিনি মোটেই প্রশ্রয় দিতেন না। কারণ, তাঁর এটা ভালভাবেই জানা ছিল যে ইংল্যাণ্ডে পূর্ণধর্মান্তরিত করার জন্য স্পেন থেকে যে বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারকদের পাঠানো হয়েছিল, তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর দেশে বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহের বীজ বপন করা। ওদিকে ওই ধর্মসংস্কারকের তাদের অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি অকপট ও অবিচল আস্থা নিয়ে থাকায় এবং সমগ্র ইংল্যাণ্ডেরও ক্যাথলিক ভাবধারার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করায় তাঁর সিংহাসনের গায়ে তিনি অনুভব করলেন মৃদু তরঙ্গাঘাত। অতএব, এলিজাবেথ ক্যাথালিকদের অযথা হয়রান এবং তাদের উপর নির্যাতন করতে শুরু করে দিলেন। কিন্তু গ্রণি-র বক্তব্য ছিল অন্যরকম তার মতে–"এলিজাবেথই হলেন প্রথম ইংরেজ শাসক যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্মীয় নির্যাতনের অভিযোগ তাঁর শাসন ব্যবস্থার উপর একটা বিরাট কলঙ্ক স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই শুধু মাত্র ধর্মীয় মতদ্বৈধতার কারণে কোন মানুষকে হত্যা করার চেষ্টাকে তিনি সরাসরি অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছিলেন।"

ঠিক তার পরের বছরেরই স্প্যানিশ জাহাজের উপর ইংরেজ অভিযানকারীদের দুর্ব্যবহারে রীতিমত কুপিত হয়ে ফিলিপ তার রণতরীর বহরকে পাঠালেন নেদারল্যান্ডস এবং আমেরিকায় যেখানে শত্রুপক্ষ ব্যাপভাবে তার স্বার্থক্ষুণ্ন করে যাচ্ছিল। ওদিকে শত্রুপক্ষ এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি ছিল না; তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র বা গোলাবারুদ, কোনটারই মজুদ ছিল না। খারাপ কিছু একটা যাতে না ঘটে যায় তার জন্য এলিজাবেথকেও লণ্ডন ত্যাগ করে চলে যেতে বলা হল। নৈরাশ্যবাদীর, প্রমাদ গুনলেন যে হানাদারদের মদতে এই সুযোগ দেশের অভ্যন্তরে একটা আদর্শের জন্য বলি প্রদত্ত আপাময় জনসাধারণের নিষ্ঠাকে সম্বল করে তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন–উপযুক্ত মুহূর্তে তাঁকে নিরাশ করল না। তাই টিলাবেরী–তে এক সমাবেশে তাঁর সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্য তিনি বললেন, "আমার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত দেশবাসীর প্রতি একতিল সন্দেহ বা অবিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। আমি জানি আমি একজন নারী; তাই শরীরগত কারণে আমি ক্ষীণ ও দুর্বল হতে পারি, কিন্তু হৃদয়টা আমার রাজার মতো। এটা ভাবতে আমার রীতিমত দুঃখ ও ঘেন্না হয় যে পারমা অথবা স্পেন কিংবা ইউরোপের কোন যুবরাজ আমার রাজ্যের সীমান্তে এসে নিঃশ্বাস ফেলে যাচ্ছে"। তার বক্তব্যের সমর্থনে সৈন্যদের মধ্য থেকে যে হর্ষধ্বনি উঠল তা মিলিয়ে যাবার আগেই হঠাৎ এক দূত ডেক থেকে ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল এবং জানাল যে তার বিশ্বাস ব্যর্থ হয়নি। কারণ, ঈশ্বরের সহায়তায়

ইংরেজরা স্পেনীয় আরমাডাদের হটিয়ে দিয়েছে। সানন্দে তিনি তাই ঘোষণা করলেন, "দেখুন, ঈশ্বর শুধু সৎ এবং সাহসীদেরই সাহায্য করেন। তাই তাঁর দৈব বায়ুর সাহায্যে তিনি আমাদের শত্রুপক্ষকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন।"

তাই তাঁর সোনালী রাজত্বের গৌরবময় দিন হিসাবে গণ্য করা হয় ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দের এই ১৭ই নভেম্বর তারিখটিকে। কারণ দেশের প্রধান হিসাবে তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কর্তব্যই শুধু সম্পাদন করেননি তিল তিল করে যে দেশকে তিনি নিজের হাতে গড়েছেন এবং তাকে সম্মানের ও গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে গেছেন, চরম বিপর্যয় ও ধ্বংসের হাত থেকে সেই দেশকে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষাও করেছেন। এরপর ইংল্যান্ড তাঁর মহত্ত্বের ও শৌর্যের শান্ত জলরাশির উপর দিয়ে তৃপ্ত মরালীর মত খুশিমনে ঘুরে বেড়িয়েছে, আর তিনি নিজে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছেন তাঁর প্রিয় দেশবাসীর অন্তর থেকে। শেষে, সম্পূর্ণ একাকী এবং ভগ্নমনা অবস্থায় তিনি পেতে চাইলেন একটু প্রেমের উষ্ণ পরশ; কিন্তু সেখানেও তিনি প্রত্যাখাত হলেন। কারণ, সুদর্শন, তরুণ ও স্বেচ্ছাচারী নাইট এসেক্স যে এলিজাবেথকে জানতেন তিনি ছিলেন অহংকারী এবং তেজী এক মহিলা এবং রাজানুগ্রহের প্রতিও তাই তাঁর ছিল চরম এক অবজ্ঞা ও ঘৃণা। তিনি অপেক্ষা করেছিলেন সময়ের করাল থাবায় ক্ষত বিক্ষত কুৎসিৎ ও বিগতযৌবনা এক নারীকে দেখার জন্য। সময়ের চাপে তিনি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নুইয়ে পড়লেও এসেক্স-এর ধারনা ছিল যে ওই টিউডর অগ্নিশিখা যতই স্তিমিত অবস্থায় থাকুক না কেন তাকে গিলে খাবার পক্ষে তা তখনো যথেষ্ট শক্তিশালী। তাঁর আশঙ্কা একদিন সত্যে পরিণত হল। ১৬০১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি সেই এসেক্সকে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতে হল; তার মৃত্যুর সাথে এলিজাবেথ এর হৃদয়ের মৃত্যু ঘটল।

অহংকার যেমন ছিল এলিজাবেথ-এর জীবনের চালিকাশক্তি, তেমনি তা ছিল তাঁর প্রেমের দাহিকাশক্তিও। অহংকার ছিল তাঁর জীবনের উত্থান, তাঁর জীবনের পতনও। তাই জীবেনর প্রান্তসীমায় পৌঁছেও মাঝে মাঝে দেখা গেছে পড়ন্ত সূর্যের দীপ্ত কিরণ—গম্‌গম্ করে বেজে উঠেছে তাঁর উচ্চকিত হাসির সুরেলা অনুরণন, শোনা গেছে চাঁছাছোলা ভাষায় স্পষ্টাপষ্টি বক্তৃতা যা রাষ্ট্রদূতদের অনুপ্রাণিত করেছিল সত্য কথা বলতে এবং রুক্ষ নাবিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল কাব্য রচনা করতে। কিন্তু এসবই ছিল নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপের দেদীপ্যমান শিখার মত হঠাৎ এক উজ্জ্বল বিচ্ছুরণ।

১৬০৩ সালে ২৪শে মার্চ এসেক্স-এর মৃত্যুর ঠিক দু'বছর পরেই ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ-এর জীবনদীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়ে গেল। ফ্যারাওদের পিরামিড-এর চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল তাঁর স্মৃতিসৌধ—আর সেই স্মৃতিসৌধ ছিল তাঁর স্বদেশ, যাকে তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে জগৎসভায় সর্বশ্রেষ্ঠর আসনে বসিয়েছিলেন।

কারোর কোন উপদেশ কেমন করে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে তার কৌশল আয়ত্ব করে এবং অচিরেই তড়িঘড়ি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে না ফেলে, আগামী কল সম্ভবতঃ ভাল কিছু ঘটতে পারে সেই আশায় সেই কাজকে ফেলে রাখা—এই নীতিতে বিশ্বস করে এবং ঝুঁকি নিয়ে তিনি স্পেন ও পর্তুগাল-এর সমুদ্রোপকূলে খবরদারি করার প্ররণতাকে চিরদিনের মত কমিয়ে দিয়েছিলেন; ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে লুথারের সমর্থকদের লেলিয়ে দিয়ে নিজের দেশে স্থাপন করেছিলেন চার্চ অফ ইংলণ্ড, এযাবৎ পৃথিবী যা দেখেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে দেখবে বলে মনেও হয় না সেই সব কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সৈনিক, আবিষ্কারক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সম্প্রদায়ের কাছে তিনি ছিলেন আলোকদায়িনী সূর্যের মত সক্ষাৎ অনুপ্রেরণার প্রতিমূর্তি।

এলিজাবেথ সারাজীবন কুমারীই রয়ে গেছিলেন। শোনা যায় তার নাকি কিছু একটা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ছিল। তবে তা ঘটনা বা রটনা যাই হোক না কেন, ঐতিহাসিকদের কথাটা বিশ্বাস করাই যুক্তিযুক্ত এবং তা শ্রেয়ও—বিয়ে তিনি করেন নি ঠিকই, কিন্তু ভাল তিনি বেসেছিলেন এবং তা গভীরভাবে ও আন্তরিকভাবে। আর সেই ভালবাসার, প্রেমের পাত্রটি ছিল তার অতি আদরের স্বদেশ—ইংল্যাণ্ড।

জোসেফ স্টালিন

[১৮৮২-১৯৫৩]

রুশ বিপ্লবের পুরোধা পুরুষ ভি. আই লেনিনের পর রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে বিশেষ করে প্রথম মহযুদ্ধোত্তর সোভিয়েট রাশিয়ায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যিনি তিনি জোসেফ স্টালিন। লেনিনের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাত তাদের মধ্যেও জোসেফ স্টালিন প্রধান পুরুষ। লেলিনের মন্ত্র শিষ্য বিশ্ববিপ্লবের প্রধান প্রবক্তা ট্রটস্কি আভিজাত্যে, শিক্ষায়, জ্ঞান গরিমায় এবং বাগ্মীতায় হয়ত স্টালিন থেকেও অধিক খ্যাত ছিলেন, পরিচিত ছিলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েট শাসনকে সমগ্র রাশিয়ায় এবং জারের সাম্রাজ্যের নানা প্রান্তে সুদৃঢ় করণে যিনি লেনিনের প্রধান সহযোগী হিসাবে সফল ভূমিকা পালন করেছেন তিনি জোসেফ স্টালিন।

মার্কসবাদের ও সাম্যবাদের সফল প্রসার ত্বরান্বিত করতে যে দুটি ব্যক্তিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল তা লেনিন ও স্টালিন। লেনিনের সহযোগী ট্রটস্কি সাহেব রুশ বিপ্লবে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু লেনিনের স্বল্পকালীন জীবনের সায়াহ্ন বেলায় দেখা যায় যে সারা সোভিয়েট রাশিয়ায় রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ কর্মী ও কৃষক মজদূর সাধারণ মানুষের কাছে স্টালিন, লেনিনের জীবদ্দশায় যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করেন, বিশেষ করে বিশ্ববিপ্লবের প্রধান পুরোহিত ট্রটস্কি, মার্কসবাদের আন্তর্জাতিকতা নিয়ে যতই বেশি মাথা ঘামিয়েছেন স্টালিন ততই বাস্তববাদী রুশ পার্টির কাছে, কাছের মনুষ হয়েছেন।

লেনিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব থেকেই স্টালিন তার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দী কমিউনিস্ট নেতা, ট্রটস্কি, জেনেভিউ, কামেনেঠ, বুখারিন এদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অনেকের মতে লেনিন মৃত্যুর পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থায় তাঁর মৃত্যুর পরই এক বিভীষণ মহানায়কের উত্থান ঘটবে যিনি কমিউনিষ্ট বিপ্লবের গণতান্ত্রিক চরিত্রে একধরনের একনায়কত্বের আবহ সৃষ্টি করবেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনে ও জীবনদর্শনে আপোষহীন সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আছে। ফলে পার্টিতে তথা সোভিয়েট দেশে আস্তে আস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে ক্রেমলিনে এবং সেখানকার অধিশ্বর মহাশক্তিধর মহাবিপ্লবী স্টালিনের হাতে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের সমূলে নির্মূলকরণের স্টালিনীয় অভিযানে হাজার হাজার বিশ্বস্ত, সর্ব্বত্যাগী আদর্শবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যের নিধন ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে রুশ সামরিক বাহিনীতেও যে পার্জ বা ঝারাই বাছাই অভিযান চলে তাতে রুশ সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রায় সকল সামরিক নেতাই পদচ্যুত বা নিহত হয়। ফলে স্টালিনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলে সেনাবাহিতেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। কারণ যদিও রুশ বিপ্লবের প্রধান হোতা লেনিন ও ট্রটস্কি রেড আর্মিকে বিপ্লবী চেতনায় ও উন্মাদনায় মাতিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও স্টালিন তার ক্ষুরধার বুদ্ধি দ্বারা, কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ পার্টি নেতা হিসাবে নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। লেনিন, স্টালিনের কঠোর স্বভাব, নিষ্ঠুরতা ও একগুয়েমি বিষয়ে অবহিত হলেও তার সাংগঠনিক ক্ষমতাও নিরন্তর কর্ম প্রবাহে লিপ্ত থাকার প্রচেষ্টা স্টালিনকে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের কাছের মানুষ করে তুলে।

ফলে ক্যামনেভ, বুখারিন, ট্রটস্কি প্রভৃতি নিতাগণ স্টালিন থেকে তাত্ত্বিক আলোচনায়, আগ্মীতায়, রাজনৈতিক সততায় যতই শ্রেয় হন না নে, স্টালিন বাস্তববাদী, জাতীয়তাবাদী পথ অবলম্বন করে মার্কসিয় কমিউনিষ্ট তত্ত্বকে এক নতুন পথে প্রবাহিত করেন। বিশ্ববিপ্লব আগে, না রুশ দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব তথা ক্ষমতা সংহত করা আগে, এই প্রশ্নে স্টালিন সাধারণ কৃষক, শ্রমিকদের কাছে বাস্তববাদী রাজনৈতিক চিন্তার প্রমাণ রাখেন। ফলে বড় বড় মার্কসবাদী নেতাকে তিনি পেছনে ফেলে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে উঠেন। স্টালিন মূলত রুশ জনগণের কাছের মানুষ। শিক্ষায় দীক্ষায়, আভিজাত্যে, তিনি অতি সাধারণ একজন চর্মকারের সন্তান। মা চেয়েছিলেন ছেলে একজন ভাল ধর্মযাজক হবেন। কিন্তু কৈশোরের কিশোলয় পার না হতেই, স্টালিন দীক্ষা নিলেন বিপ্লবী দলে।

স্টালিন কথার অর্থ লৌহমানব। অর্থাৎ লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট লৌহমানব। অর্থাৎ লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট দেশে যে লৌহ যবনিকার বাতাবরণ রুশ জীবনকে আচ্ছন্ন করে

তা লেনিনের নামকরণের সার্থকতায় আভাষিক। স্টালিন জন্মেছেন ককেসাশ পার্বত্য অঞ্চলের অন্যতম রাজ্য জর্জিয়ায়। জর্জিয়ায় ক্ষুদ্র গোরী শহরে এক সাধারণ সার্ফ অর্থাৎ দাসচাষী পরিবারের চর্মকারের পুত্র। জর্জিয়ান মায়ের নাম একাতেরিয়া। জন্মলগ্ন থেকে জোসেকের শরীর মজবুত ছিল। বাল্যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েও জোসেফ জীবনী শক্তিতে স্বাস্থ্যজ্জ্বোল ছিল। জোসেফের পিতা বিসোরিক্ত রাগী, মাতাল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ফলে দশ বৎসর বয়সে পিতৃহারা জোসেফ স্টালিন মায়ের ও অনাদারে বেড়ে ওঠেন। বহু সফল মহানায়কের ন্যায় জোসেফ স্টালিন তাঁর মায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন আবাল্য। ব্যক্তিগতভাবে বাল্যকাল থেকে কঠোর মাতৃশাসনে ও অনুশাসনে পাদ্রী না হয়ে বিপ্লবী হলেন। জোসেফের মা ছেলেকে জার্জিয়ার রাজধানী টিফ্‌লিসের সেরা বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠান। চরিত্র গঠন থেকে পঠন পাঠন সকল বিষয়েই বাল্যে মার প্রভাবে জোসেফ একটু ভিন্ন ধাতুতে গড়ে উঠতে থাকে। ফলে মার স্নেহচ্ছায়া থেকে মুক্ত হয়ে যখন জোসেফ বিপ্লবী দলে সর্বক্ষণের কর্মী হলে তখন তিনি পুরোহিতের নিষ্ঠায় তাঁর বিপ্লবী কর্ম পরিচালনা করতে থাকেন।

জোসেফ স্টানিল পরবর্তীকালে যে লেনিনের দ্বারাও কখন কখনও কিছুটা কম কঠোর হতে আদিষ্ট হন তা সম্ভবতঃ তাঁর মায়ের কঠোর শাসনে গড়ে উঠা নৈষ্ঠিক ও নিষ্ঠুর চারিত্রিক গুণের জন্যই। স্টালিন দৃঢ়চেতা, স্টালিন একগুয়ে, স্টালিন বাস্তববাদী, স্টালিন জাতীয়তাবাদী এই সকল নানা অভিধায় তিনি ভূষিত। তবে স্টালিন লেনিনের মৃত্যুর পর পরই, অত্যন্ত দ্রুততায় সরা সোভিয়েট রাশিয়ায় সে ব্যাপক শিল্পায়ন, বৈদ্যুতিকরণ ও স্বাক্ষরতা অভিযান চালান তা নিঃসন্দেহে লেনিনের উত্তরসূরী হিসাবে, উত্তরাধিকারী হিসাবে তাকে স্মরণীয় করে তাঁর জীবনকালেই। স্টালিন চরম নিষ্ঠুরতায় প্রতিবিপ্লবী চক্রকে নির্মূল করেন। কিন্তু এই প্রতি বিপ্লবী চক্র নিধনের সাথে সাথে আস্তে আস্তে রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চেতনার বদলে পার্টি কর্তৃত্ব, পার্টির সর্বময় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামরিক বিভাগ সকল বিষয়েই পার্টি তার সর্বাত্মক ও সর্বময় প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। পার্টির ভিতরে গণতান্ত্রিক চেতনার বদলে বুরোক্র্যাটিক চেতন অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। সর্বহারা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্টালিন ১৯২৯ সালে পঞ্চদশ বর্ষে উপনীত হলে দেখা যায় তিনি রাজনৈতিক ভাবে সোভিয়েট রাশিয়ায় গণতন্ত্রের বদলে পার্টিতন্ত্র গড়ে তুলেছেন। ট্রটস্কি, প্লাখনভ, ক্যামেনেভ, জেনোভেব সকলেই অন্তর্হিত, নিহত। এই সকল তাত্ত্বিক মহাপন্ডিত বিশ্ববিপ্লবীগণ লেনিনের মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যে আস্তে আস্তে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। কমিউনিষ্ট পার্টি স্টালিনের মোহময় বাস্তবানুগ নীতিগুলি অধিক সমাদরে গ্রহণ করল। বিশ্ববিপ্লবের বদলে রুশ বিপ্লবের সফল রূপান্তর রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কাছে অধিক বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হল। ফলে সাম্যবাদী বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চেতনায় ছেদ পড়ল। রুশ জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের পথে সোভিয়েট রাশিয়ার পদযাত্রা বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনে এক বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করল। কিন্তু স্টালিনের নেতৃত্বে বিশ্বাসী রুশজনগণ শক্তিশালী লালদূর্গ হিসাবে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রকে বিশ্ববিপ্লবের পরিপূরক হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হল। রুশসাম্রাজ্যের দূরতম প্রান্তেও সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। অনেক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করেই তা সমাধা করা হল। বিশেষকরে এশিয়াটিক রাজ্যগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ কঠোরতা প্রয়োজন হল। রাশিয়ায় ধর্মান্ধ অর্থডোক্সচার্চ এবং এশিয়ায় মুসলমান উলেমাগণ মরনপণ লড়াই করে পরাস্ত লেন স্টালিনিয় নিষ্ঠুরতার কাছে। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী চেতনাও জারের সাম্রাজ্যের দূরপ্রান্ত তাজাকিস্থান, কাজাকিস্তান, কির্গিজিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও কমবেশি কিছু গড়ে উঠেছিল। স্টালিন নিজেও মস্কো থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে জর্জিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরেই জর্জিয়ায় টিফলিসে স্কুলের পাঠ অসমাপ্ত রেখে যাজকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ছেড়ে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। ফলে বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে স্টালিন সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে ব্রতী হন একনিষ্ঠভাবে যাজকের নিষ্ঠায়, সামরিক নির্মমতায়। ১৯২৮ সালেই সারা সোভিয়েট রাশিয়ায় সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা মাফিক পুনর্গঠন কর্ম, উন্নয়ন কর্ম, পরিচালিত হতে থাকে। স্টালিনের নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টি সৈনিকের শৃঙ্খলায় ও পুরোহিতের নিষ্ঠায় সুদূর বিস্তৃত বহুধা বিভক্ত বহু ভাষাভাষী সোভিয়েট রাশিয়ায় দেশ গঠন ও সমাজ গঠনের কাজ চলতে থাকে। স্টালিন যে

দৃঢ়তায় ও দ্রুততায় সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সফল রূপায়ণ ঘটিয়ে সোভিয়েট দেশে যুগযুগান্তরের পশ্চাৎপদতা থেকে আধুনিকতার আলোকবর্তিকা জ্বালেন তা কেবল হিটলারের নাৎসি পার্টির স্যোস্যাল ডেমক্রাসির সাথে তুলনীয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে হিটলার পরাজিত জার্মানিকে ইউরোপের এক মহাশক্তিধর শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত করেন। ঠিক একইভাবে সামরিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ রুশ কমিউনিস্ট পার্টি হাজার হাজার মাইল ব্যাপী বিস্তৃত জারের সাম্রাজ্যের দূরতম অঞ্চলও সাম্যবাদের সফল রূপায়ণ অনুভব করান। ফলে মধ্য রাশিয়ায় উষরপ্রান্তর কেঁপে লেনিনগার্ড থেকে ভাডিভস্টক পর্যন্ত বিশ্বের দীর্ঘতম রেল পথেও বৈদ্যুতিকরণ করা হয়। এছাড়া বাঁধ, খাল খনন, পতিত অহল্যা জমি উদ্ধার করে লক্ষ লক্ষ একর জমি কৃষিযোগ্য করে তোলে। কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত করা সম্ভব হয়। তবে এই সফল গ্রাম উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব করতে গিয়ে মাঝেমাঝে হঠকারী স্টালিনীয় পার্টি সিদ্ধান্ত রুশ জনগণ তথা সারা সোভিয়েট দেশে সাধারণ মানুষের অশেষ দুর্দশার কারণ হয়। অভিজ্ঞতার অভাবে পার্টির আবেগমথিত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে গিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বদলে ব্যহত হয়েছে বার বার। আর হাজার হাজার কৃষক শ্রমিক দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

সারা সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রে স্টেট ফার্ম আর জোত খামার, কৃষি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে ত্রিশের দশকে স্টালিনের নির্দেশে সুদৃঢ় সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিতে ও রেড আর্মিতে কারণে অকারণে প্রতিবিপ্লবী প্রবণতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে স্টালিন নির্দেশে হজার হাজার নিষ্ঠাবান সৈনিক ও পার্টি কর্মী রাষ্ট্রের হাতে নিহত হয়। ফলে রুশ দেশের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে হিটলারকে রোখবার ক্ষমতার সম্বন্ধে সংশয় দেখা যায়। হিটলার নিজেও রুশ পার্টি ও সামরিক বাহিনী সম্বন্ধে হীন মনোভাব পোষণ করেন। কারণ ত্রিশের দশকের শেষ দিকে প্রায়শই কারণে অকারণে সোভিয়েট দেশে হাজার হাজার মানুষকে নিয়তি তাড়িত সাইবেরিয়ার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে দাস শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে পাঠান হত। গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন তখন সোভিয়েট রাশিয়ার দূরঅস্ত। ফলে সাধারণ মানুষ ছাড়াও সামরিক নেতৃত্ব, সংস্কৃতিক জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এমনকি পার্টির বিশ্বস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বও নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ফলে সামগ্রিকভাবে ত্রিশের দশকে কিছু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও দেশ সামগ্রিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে হিটলার যখন রাশিয়াকে আক্রমণ করে তখন রেড আর্মি কেবল পিছু হটতে থাকে।

স্টালিন ও হিটলার উভয়েই জাতি গঠনে জাতীয় চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরাজিত জার্মানির অভিমানী জার্মান মানুষকে ভালভাবে অনুভব করে, হিটলার আস্তে আস্তে জার্মানিতে সর্বময় ক্ষমতা দখল করেন। আর সোভিয়েট রাশিয়ায় স্টালিন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশ্বের বৃহত্তম ভৌগোলিক পরিধিযুক্ত একটি রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করেন। তবে জার্মানির পরাজয়ের পর জার্মানিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে দেখা যায় জার্মান মনন ও মানস হিটলারের ইহুদি হত্যা, গণহত্যা, গণতন্ত্র হত্যাকে ক্ষমা করেনি।

কিন্তু স্টালিন সোভিয়েট রাশিয়া নিষ্ঠুরতায়, নরহত্যায় ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কণ্ঠ রোধে কোন অংশে হিটলারের থেকে কম দক্ষ ছিলেন না। সোভিয়েট শাসনে যে পরিমাণ নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট স্টালিনের আমলেও নিহত হন জারের আমলে তার ঠিক দশমাংশও নিহত হয়েছেন কিনা সন্দেহ।

লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর স্টালিন জামানায় যে জের জবরদস্তি ও বিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার তা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। সোভিয়েট দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা সফল হয়নি। কিন্তু ডিক্টেটরশিপ অব দ্য প্রলেটারিয়েৎ কথার অন্তরালে যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্টালিন ভোগ করেছেন তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। তার নির্যাতনের হাত থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথমশ্রেণীর আদর্শবাদী নেতৃবর্গ থেকে সামরিক বাহিনীর সৎসাহসী সেনানীকূল কেউই বাদ যাননি। সাইবেরিয়ার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি লক্ষ লক্ষ দাস বন্দী শ্রমিকের কাতরানির কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে থেকেছে। স্টালিনের আমলে সোভিয়েট উৎপাদন ব্যবস্থায় দাস শ্রম ব্যবস্থা প্রায় প্রাচীন গ্রীসের দাসশ্রম ব্যবস্থার সমমর্যাদায় ভূষিত হয়। আব্রাহাম লিঙ্কন, স্টানলিলিভিংষ্টোন থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবি ও খ্রিস্টিয় মিশনারীগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই যে

দাস-শ্রম ব্যবস্থা ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ায় ও আমেরিকায় নিষিদ্ধ করেন। স্টালিনের আমলে কার্যত সোভিয়েট রাশিয়ার সাইবেরিয়া রশিয়ার উন্নয়ের স্টালিন সেই একই ঘৃনিত ব্যবস্থা চালু করেন। এছাড়া সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় কোথাও কোন রাষ্ট্রীয় কল, কারখানা ও যৌথ খামারে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে সংঘটিত বা সংঘবদ্ধ হতে দেয়নি স্টালিন। ফলে স্টালিন জামানায় যে উন্নয়নের গতি তা যতখানি স্বতস্ফূর্ত তার থেকে অনেক বেশি জোর জবরদস্তি মূলক। কিন্তু একটা বিষয় রাজনীতি বিজ্ঞানের ও ইতিহাসের গবেষকদের কাছে খুবই আশ্চর্যের যে যেখানে হিটলারের মৃত্যুর পর জার্মানীতে হিটলার চিহ্নিত হয়েছেন জার্মান জাতীয় কলঙ্ক হিসাবে; বিকৃত মানসিকতাযুক্ত এক নির্মম মহানায়ক হিসাবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় স্টালিনের মৃত্যুর পর এমন কি আজও রুশজনগণ স্টালিনের অত্যাচার ও অনাচারের প্রতিবাদে ততখানি মুখর হয়নি। স্টালিন বন্দনা হয়ত বন্ধ হয়েছে কিন্তু ক্রুচেভ ছাড়া আর কোন রুশ রাষ্ট্রপতি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ বিষয়ে খুব পরিষ্কার মতমত প্রকাশ করেন নি। ক্রুশ্চেভ নিজে স্ট ালিনের আমলে একটু একটু করে রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে নিজের আসন দৃঢ় করেন। বহু দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু স্টালিনের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই তিনি স্টালিনের ভজনার বদলে স্টালিনীয় সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। যদিও জীবনের সায়াহ্ন বেলায় ক্রুশ্চেভকে রুশ জনগণ এজন্য ক্ষমা করেনি। পতনের পর ব্রেজনেভের আগমন আবার সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রে স্টালিনীয় লৌহযবনিকার প্রবর্তন ঘটায়। স্টালিন প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থা নিঃসন্দেহে রুশ জনগণকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমী গণতন্ত্রী দেশগুলির তুলনায় অনেক অনেকগুণে কম ভোগ্যপণ্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি দান করেছে। তা সত্ত্বেও আজও গর্বাচভ, ইয়েলৎসিন, প্রভৃতি নেতাদের পক্ষেও সোভিয়েট শাসনে স্টালিনীয় নির্যাতনের তথা বেশি ব্যক্ত কর সম্ভব হয় নি। কারণ সোভিয়েট মানুষ স্টালিনের গুণগুলির কথা আলোচনা করতে যতটা আগ্রহী তাঁর সমালোচনায় তত আগ্রহী নহে। হিটলারের থেকেও দীর্ঘকাল ধরে চরম নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার প্রতিভূ হয়েও স্টালিন কিন্তু আজও সাধারণ সোভিয়েট নাগরিকের কাছের মানুষ। তারা স্টালিনের আমলের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, সাইবেরিয়ার দাসশ্রম ব্যবস্থা, শিক্ষা সংস্কৃতিতে বদ্ধজলাভূমি সৃষ্টি ও লৌহযবনিকার প্রবর্তনের কথা স্বীকার করে কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত দুর্বতায় স্টালিন আজও এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। অস্বীকার করা যায় না যে স্টালিনের দৃঢ় নেতৃত্ব সোভিয়েট রাশিয়াকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি সুচতুর স্টালিনের নির্দেশেই এশিয়ায়, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার পরাধীন বা সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে সফলভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। স্নায়ুযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া যে অনেক সময়ই মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। ফলে সোভিয়েট জনগণ ধর্মের স্বাধীনতায় বঞ্চিত হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বাদ পাইনি। কিন্তু সামান্যবাদের সাম্য ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্টালিনীয় কমিউনিস্ট পার্টি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে সফলভাবে। স্টালিনের আমলে যুদ্ধেবিধ্বস্ত সোভিয়েট রাশিয়ায় যে দেশ গঠন ও নির্মাণকর্ম সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনায় জরুরী ও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলেছে তা পরবর্তী প্রজন্ম অনেকাংশেই প্রশংসাসূচক সহানুভূতিতে মেনে নিয়েছে। সোভিয়েট সাতসালা পরিকল্পনা ও সপ্তবার্ষিকী উন্নয়ন পর্বগুলি নিঃসন্দেহে স্টালিনের নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। বিশেষ করে উৎপাদন ব্যবস্থায় ও শিক্ষা প্রসারে সোভিয়েট সরকার স্টালিনের আমলে জোর-জবরদস্তি মূলক ভাবে কৃষি বিপ্লব ঘটাতে গিযে যে লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় তা সকলেই স্বীকার করেন। এছাড়া কৃষি উৎপাদনে অভিজ্ঞতার অভাবজনিত বহু বিপর্যয় সোভিয়েট রাশিয়াকে খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে পীড়িত করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যার কারণ স্টালিনের নিষ্পেষন। স্টালিন জামানায় যত ভুল হয়েছে তারজন্য সাবেক সোভিয়েট সমাজ কমিউনিস্ট পার্টিকে যতটা সমালোচনা করেছে স্টালিনকে ততখানি নহে। সিক্রেট পুলিশের কর্তা বেড়িয়া সাহেব নিহত হয়েছে, ধিকৃত হয়েছেন তাঁর সিক্রেট পুলিশের সীমাহীন ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য। কিন্তু যে বেড়িয়া স্টালিনের ছায়াসঙ্গী ছিল স্টালিনের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি রেহাই পাননি জনরোষ থেকে। তাঁর মৃত্যু যেন সারা সোভিয়েট রাশিয়ায় এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিতেও যেন এক স্বস্তি ও শান্তির বায়ু প্রবাহিত করে। কিন্তু যে স্টালিনের নির্দেশে বেড়িয়ার ক্রিসেট পুলিশ পরিচালিত হতে সেই স্টালিন সম্বন্ধে মানুষ কিন্তু ততখানি বিতরাগ নহেন।

ফ্রান্সিস বেকন্

[খ্রিঃ ১৫৬১-খ্রিঃ ১৬২৬]

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহ একরকম দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অথচ তারই পাশাপাশি চলছিল কারিগরদের দ্বারা নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন। কারিগররা অবশ্য বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধারেপাশে যেতেন না। কেবল প্রয়োজনই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করাতো নব নব আবিষ্কারে। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার মধ্যে দূরত্বও ছিল অনেকখানি। পন্ডিতেরা চিন্তা করে দেখলেন, এই দুটির মধ্যে বিভেদ আদৌ নেই।

বরং একটি অপরটির পরিপূরক। তখন তাঁরা বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধনে যত্নবান হন। অপরদিকে তাঁদের দেখাদেখি কারিগররাও যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন। ফলে দার্শনিক তত্ত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে বিজ্ঞান তার আপন পথটি খুঁজে পায়। এক কথায় তখনই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসে একটি বিপ্লব। এই বিপ্লবকে যাঁরা বহন করে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস বেকন্ নিঃসন্দেহে একজন।

বেকন্ ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে দর্শন ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর তিনি অধ্যাপক হিসাবে জীবন শুরু করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁর পান্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেম্স-এর বিচার বিভাগে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ আন্তেখন বেকন্ অধ্যাপনা বৃত্তি পরিত্যাগ করে বিচার বিভাগে যোগদান করেন এবং অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্য অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি উক্ত বিভাগের প্রধানরূপে মনোনীত হন।

বেকন্ ছিলেন মূলত ঃ দার্শনিক। তবে বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক টান। এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা করতেন। পরে কেবলমাত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধেই ভাবনা চিন্তা আম্ভ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংগ্রহ করেন প্রাচীন গ্রীক পন্ডিতদের আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমূহ প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী। তার ফলেই বিজ্ঞানের নতুন সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে উদিত হয়।

বেকন্ অতঃপর কারিগরীবিদ্যা এবং প্রচলিত যন্ত্রপাতির দিকে আকর্ষণ বোধ করেন। কিছুকাল এ বিষয়ে চিন্তা করার পর তাঁর জন্মে, ঐ বিজ্ঞান এবং কারিগরীবিদ্যাই মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। উৎসাহিত বেকন্ এবর আরম্ভ করেন প্রচন্ড পরিশ্রম। তাঁর চিন্তা ভাবনাগুলি ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন "দি অ্যাডভনসমেন্ট অফ লার্নিং" নামক একখানি পুস্তকের আরে। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যাকে জনপ্রিয় করার এই তাঁর প্রথম প্রয়াস এবং সত্য কথা বলতে কি, এই ধরনের প্রয়াস তাঁর পূর্বে কেউ করেন নি।

১৬২০ খ্রিস্টাব্দে বেকন্ প্রকাশ করেন "গ্রেট ইনস্টরেশন অফ লার্নিং" নামক দ্বিতীয় একখানি মহামূল্য পুস্তক। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই পুস্তকখানির গুরুত্ব অনেকখানি। পুস্তকটির প্রথম খন্ডে বেকন্ প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেম এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। এই খন্ডে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞানকে অগ্রগতি দান করতে হলে নতুন নতুন তত্ত্ব ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি সংগ্রহ করতে হবে। পন্ডিত ব্যক্তিরা যাতে এই কাজে এগিয়ে আসেন তার জন্যও তিনি অনুরোধ রাখেন। পুস্তকখানির দ্বিতীয় খন্ডে তিনি যন্ত্রবিদ্যার উল্লেখ করেন এবং কোন্ কোন্ যন্ত্রে কোন্ কোন্ বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রযুক্ত হয়েছে তাও ব্যাখ্যা করেন। তৃতীয় খন্ডে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। চতুর্থ খন্ডে কারিগরি জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা করেন। পুস্তকখানির আরও কয়েকটি খন্ড তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সময়াভাবে কৃতকার্য হতে পারেন নি। ফ্রান্সিস বেকনের চিন্তাধারা তৎকালীন পন্ডিতসমাজে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানরাজ্যে তিনিই প্রথম বিপ্লবের সূচনা করেন। পরে গ্যালিলিও, দেকার্ত প্রভৃতি মহামনীষীদের আপ্রাণ চেষ্টা ও যত্নে বিজ্ঞান তার নিজের পথের সন্ধান লাভ করে। তাই ফ্রান্সিস বেকনের নাম বিজ্ঞান চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করবে।

১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে এই মহান চিন্তানায়কের জীবনাবসান হয়।

জেম্‌স ওয়াট

[১৭৩৬–১৮১৯]

জেম্‌স ওয়াইট বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন– এরকম একটা ধারণাই সাধারণভাবে চালু আছে। আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। বাষ্পের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাগুণ নিয়ে জেম্‌স ওয়াটের নশো বছর আগে থেকেই বৈজ্ঞানিক এবং আবিষ্কারকরা মাথা ঘামিয়ে আসছেন। আসলে জেম্‌স ওয়াট যা করেছিলেন, তা হল বাষ্পীয় শক্তি নিয়ে তাঁর পূর্বসূরীরা যেসব সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলিকে বিস্তারিত ভাব বিশ্লেষণ করে তাকে হাতেকলমে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা।

খ্রিস্টের জন্মেরও একশো বছর আগে হিবেরা নামে এক গ্রীক দার্শনিক "এওলিফাইল" বা "এওলাসের বল" নামে এক অদ্ভুত খেলনার সাহায্যে বাষ্পের শক্তিকে কাচে লগিয়েছিলেন। এই যন্ত্ররূপী খেলনাটিতে ছিল ধাতুর তৈরি নিজের অক্ষের ওপর ঘূর্ণায়মান একটি ফাঁপা গোলক এবং তার নীচে রাখা একটি পানির বড় কড়াই। গোলকটির সাথে লাগানে থাকত মুখ আটকানো সছিদ্র কয়েকটি টিউব। এবার কড়াই-এর পানি আগুনে ফুটতে শুরু করলেই গোলকটি বাষ্পে ভরে উঠত এবং টিউবের ছিদ্র দিয়ে ঢোকা বাতাসের ওপর বাষ্পের চাপ পড়ে গোলকটি নিজের অক্ষের উপর ঘুরতে শুরু করত।

বাষ্পশক্তি চালিত সম্ভবতঃ এই প্রথম যন্ত্রটি ষোড়শ শতাব্দীতে গবেষকদের মধ্যে খুবই কৌতূহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। পরের দু'শতাব্দী ধরেই পন্ডিতেরা ফুটন্ত পানির বাষ্পের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনায় মেতে রইলেন। তাঁরা লক্ষ্য করে দেখলেন যে, বাষ্প দিয়ে যদি কোন নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত ওপরে *ঠেলে ওঠে*–কতটা উঠবে তা অবশ্য নির্ভর করে বাইরের আবহাওয়া মন্ডলের চাপের ওপর। এছাড়া আরো দেখলেন, বাষ্পকে কোন পাত্রে ঘনীভূত করলে সেখানে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং পানি এসে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে। এই দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রথমটি ব্যবহার করে সলোমান দ্য কাউস বাষ্পীয় চাপ চালিত ফোয়ারা তৈরি করেছিলেন। একটি গোলাকার পাত্রে দুটি নল আটকানো থাকত; তার মধ্যে পথমটি দিয়ে পানি ঢোকানো হত, এবং দ্বিতীয়টি দিয়ে উত্তপ্ত পত্রের বাষ্পের চাপে ফিনকি দিয়ে পানি বেরোত। আর বাষ্পের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটিকে কাজে লাগিয়ে ক্যাপটেন টমাস স্যাভেরি নামে একজন ইংরেজ সামরিক ইঞ্জিনিয়ার পাম্প তৈরি করে কর্ণিশ অঞ্চলের টিনের খনি থেকে পানি বার করার কাজে লাগালেন।

স্যাভেরিকে নিয়ে এ সম্বন্ধে একটি ভাল কাহিনী চালু আছে। একদিন একটি সরাইখানায় এক বোতল কিয়ান্তি মদ পান করার পর খালি বোতলটি চুল্লীতে ফেলে দিয়ে উনি একটা পানিপাত্র আনিয়ে তাতে হাত ধুচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর নজরে পড়ল যে বোতলের পড়ে থাকা মদটুকু বাষ্প হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বোতলটি চুল্লী থেকে বার করে এনে সেটিকে উল্টো মুখ করে পানিতে ঢুকিয়ে দিলেন তিনি এবং অবাক হয়ে দেখলেন যে বোতলের বাষ্পটি ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোতলের মধ্যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে পাত্রের পানি সেখানে গিয়ে ঢুকছে।

এই সূত্রটি ধরেই তৈরি হল তাঁর পাম্প। দুটি বড় গোলাকার পাত্র রাখা হল আর একটিতে সঙ্গে বয়লার থেকে বাষ্প ঢোকানো হত। অপরটিতে ঢোকান হত খনির পানি। এরপর বাষ্পের চাপে অন্য একটি নল পানি বাইরে ফেলে দেওয়া হত। কিন্তু এ প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকরী হয়ে ওঠেনি কারণ পাম্প করে যতটুকু পানি বারকরা হত, তার চাইতে বেশি পানি খনিতে এসে ঢুকত। পূর্বসূরীদের মত স্যাভেরিও বাষ্পের অসীম সম্ভাবনার কথা বুঝে উঠতে পারেনি।

বাষ্পকে ঠিকমত প্রথম কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন টমাস নিউকোমেন (১৬৬৩–১৭১৯)। বাষ্পের সহায্যে যন্ত্রের অংশবিশেষকে নড়িয়ে তার সহায্যে অন্য যন্ত্রকে কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি–তাঁর যন্ত্র ছিল পাম্প।

নিউকোমেনের ইঞ্জিনের তলে 'চেম্বার' যুক্ত একটি খাড়া সিলিন্ডার থাকত, সিলিন্ডারটির ভেতরে থাকত একটি 'পিষ্টন'। আলাদা একটি বয়লরে বাষ্প তৈরি করে তাকে পিষ্টনের নীচে নিয়ে আসা হত। পিষ্টনটি আবার আটকানো থাকত একটি নিজের সমেত ঘূর্ণয়মান বীমের সঙ্গে। এই বীমটির সঙ্গে যে নব বা রডটি থাকত, সেটিই পাম্পটিকে চালু রাখত। প্রথমে সিলিন্ডারটির মধ্যে পাম্প ঢুকিয়ে দেওয়া হত। সিলিন্ডারটিও তার ফলে একটু উঠে যেত। এবার পিষ্টন আর রযের যুক্ত ওঠানামায় পাম্পটি কাজ করত। সিলিন্ডারের মধ্যেকার বাষ্পকে সিলিন্ডারের গায়ে

ঠান্ডা জলের ফিনকি দিয়ে ঘনীভূত করে নীচের চেম্বারটিতে এক আংশিক শূন্যস্থান পূরণ করত। পুরো প্রক্রিয়াটিই ছিল খুবই সময়সাপেক্ষ। ঘন্টায় ১৫৬ ফুট গভীরতা থেকে এই ইঞ্জিনে ৫০ গ্যালন (প্রায় ২৫০ লিটার) পানি তোলা যেত। ইঞ্জিনটি চালু রাখতে দুটি লোককে সবসময়েই ব্যস্ত থাকতে হত একজন সারাক্ষণ বয়লারের আগুনের দিকে নজর রাখত, অন্যজন পালা করে দুটি "ভাল্‌ভ খুলত আর বন্ধ করত একটি বাষ্পের, অন্যটি ঠান্ডা পানির।

নিউ কোমেনকেই প্রকৃতপক্ষে বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহারের আদি পুরুষ বলা যায়। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি জানতে পারা যায়নি। তখনকার দিনে আবিষ্কার বা উদ্ভাবককে প্রায় সবাই খুব অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন তাই শ্রদ্ধার বদলে সন্দেহটাই তাঁর বরাতে জুটত বেশি।

প্রথম জীবনে নিউকোমেন ফুটন্ত কেট্‌লির ঢাকনার ওঠানামা নিয়ে যে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন সেটাই পরবর্তীকালে বাষ্পচালিত যন্ত্রের আজীবন গবেষক জেম্‌স ওয়াটের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। অনেকেই মনে করেন জেম্‌স ওয়াটের রোমাঞ্চকর কাজকর্মকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই এই কাহিনীটি চালু করা হয়েছিল। নিউকোমেন ছিল ডার্টমুখের এক কামার। স্যাভেরিও তাঁর পাম্পের কিছু কিছু ব্যাপারে নিউকোমেনের পরামর্শ নিয়েছিলেন। এবং নিউকোমেও স্যাভেরির কাজ সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। অবশেষে স্যাভেরির মৃত্যুর পর তাঁর নেওয়া "পেটেন্ট" গুলির মালিক হয়েছিলেন। কোলি নামে তাঁর এক কাজের মিস্ত্রী বন্ধুর তত্ত্বাবধানে পাম্পের ঐ ইঞ্জিনটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি হতে থাকে। এরপর সুদীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে নিউকোমেনের এই "আগুনের যন্ত্রটিই" খনি থেকে পানি বার করবার একমাত্র উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

নিউকোমেন কিন্তু তাঁর এই সৃষ্টির জন্য প্রায় কোন স্বীকৃতিই পাননি। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করার বেশিরভাগ কৃতিত্বই দেওয়া হয় জেম্‌স ওয়াটকে। এই দাবীর মধ্যে অবশ্য কিছুটা যুক্তি আছে। কারণ ওয়াটই বাষ্পচালিত ইঞ্জিনকে তার অতি সীমিত ক্ষমতার এমন এক উৎসে, যাকে অজস্র বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগানো যায়। তাঁর বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের নকশা নিখুঁত রূপ পাওয়ার পরে পাম্পের শক্তিকে দিয়ে খনির পানি পাম্প করা, কলকারখানার যন্ত্রপাতি চালানো, ময়দার কল চালানো, সুড়ঙ্গ খোঁড়া, বাড়ি তৈরি করা, জাহাজে বা খনিতে সরানো, পাহাড় বা মরুভূমির ওপর দিয়ে মালপত্র টেনে নিয়ে যাওয়া-এসবই করানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়াট আসলে নিউকোমেনের নক্‌শাটিকে উন্নততর করে তুলেছিলেন মাত্র, নিজে কিছু আবিষ্কার করেননি।

ওয়াটের এই মাত্রাতিরিক্ত খ্যাতির জন্য মূলতঃ দায়ী একটি প্রচলিত জনপ্রিয় কাহিনী। শৈশবে তাঁর মধ্যে তেমন কোন চোখে পড়ারমত বৈশিষ্ট্য তো ছিল না, বরং আলসে স্বভাবের জন্য ওঁর অভিভাবকরা ওঁকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। একদিন চায়ের টেবিলে ওঁর ওর কাকীমা জেমসকে তো দারুন বকাবকি করে বললেন–"জেমস্‌, তোমার মত কুঁড়ে ছেলে আমি দুটি দেখিনি। হয় পড়াশোনা কর না হয় যাহোক একটা কাজে কাজ কিছু কর। গত এক ঘণ্টা ঘরে দেখছি, তুমি কোন কথাবার্তা না বলে খালি ঐ কেটলির ঢাকনাটা খুলছ, আর বন্ধ করছ। কখনো বা একটা কাপ, আর কখনো বা একটা চামচ নিয়ে বাষ্পের ওপর ধরছ, কি করে কেটলির নল দিয়ে বাষ্পটা বেরোচ্ছে, সেটা মন দিয়ে দেখছ, আর বাষ্প থেকে তৈরি হওয়া পানির ফোটাগুলি হয় গুনছ নয়তো ধরবার চেষ্টা করছো।"

পরবর্তী কালের ভাষ্যকারেরা এই অতিরঞ্জিত কাহিনীর মধ্যে জেমস্‌ ওয়ার্টের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছেন। আসলে কিন্তু নেহাৎ আকস্মিকভাবেই তাঁর মনে বাষ্প নিয়ে কৌতূহল দেখা দিয়েছিল। উনি নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন; সৌভাগ্যক্রমে একবার গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কলেজের গবেষণাগারে একটি নিউকোমেনের ইঞ্জিনের মডেল তাঁকে সারাতে দেওয়া হয়েছিল। উনি দেখলেন যে, ইঞ্জিনটির সব যন্ত্রপাতি ঠিক থাকা সত্ত্বেও একবারে কয়েক মিনিটের বেশি সেটি চলছে না। ব্যাপারটা ঘটছে সেটা কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। হঠাৎই এক রবিবারের সকালে বেড়াতে বেড়াতে এমন একটা সমাধান তাঁর মাথায় খেলে গেল, যাতে উনি হয়ে গেলেন "শিল্প বিপ্লবের" জনক। উনি বুঝতে পারলেন, ইঞ্জিনের পক্ষে বয়লারটি খুবই ছোট আর তাই ইঞ্জিনে অহেতুক বাষ্প নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান এটাই। কম বাষ্প খরচ হবে। এমন একটি ইঞ্জিন তৈরি করা।

ওয়াট দেখলেন বাষ্পের অপচয় বন্ধ করতে গেলে দুটি জিনিস করতে হবে। প্রথমতঃ যে "চেম্বারে" বাষ্প ঘণীভূত হয়, সেখানকার তাপমাত্রা কম রাখতে হবে: এবং দ্বিতীয়তঃ মূল সিলিন্ডাটির তাপমাত্রা বেশি রাখতে হবে। ওয়াট করলেন কি বাষ্প ঘণীভূত হওয়ার "চেম্বার" টি মূল সিলিন্ডার থেকে আলাদা করে দিলেন। দুটির মধ্যে অবশ্য যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা হল। আলাদা এই " চেম্বার"টিতে বাষ্প ঢুকিয়ে অনবরত ঠান্ডা পানি ঢেলে তাকে ঠান্ডা রেখে বাষ্পকে ঘণীভূত করা হতে লাগল এবং এর ফলে মূল সিলিন্ডারটির তাপমাত্রা না কমিয়েই আংশিক বায়ুশূন্যতা তৈরি করা গেল। এই বায়ুশূন্য অবস্থা ঠিক রাখার জন্য আর ঘণীভূত বাষ্প সরিয়ে ফেলার জন্য ওয়াট এর একটি "হাওয়া পাম্প" ও জুড়ে দিলেন। এর ফলে জ্বালানির খরচ তিন-চতুর্থাংশ কমে গেল। ওয়াটের কোম্পানী এই জ্বালানি খরচ কমার ওপর এক-তৃতীয়াংশ স্বত্ব বা "রয়্যালটি" দাবি করলেন। এই ইঞ্জিনের কার্যকারিতা এত গুণ বেড়ে গেল যে, আগে যে পরিমাণ পানি খনি থেকে বার করতে কয়েক মাস লেগে যেত, এখন সেই পানি মাত্র ১৭ দিনেই বার করে দেওয়া গেল।

এরপরে ওয়াট উন্নততর জীবনের ইঞ্জিন তৈরি করতে উদ্যোগী হলেন এই-ধরনের ইঞ্জিনেই বাষ্পের ক্ষমতা পূর্ণ সদ্বব্যবহার করার সুযোগ হল। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে ভারি যন্ত্রপাতি চালাতে গেলে ঐ ইঞ্জিনে কোন কিছু ঘোরানোর বন্দোবস্ত রাখতে হবে। এই ঘোরানোয় গতি আনার সহজতম উপায় ছিল হাতল আর চাকার ব্যবহার করা। দাঁতওয়ালা চাকা, হাতল আর পিষ্টন লাগিয়ে, সিলিন্ডারের দুটি দিকের সঙ্গেই বয়লারের যোগসূত্র ঘটিয়ে রেগুলেটার বসিয়ে, বাষ্পচালিত ইঞ্জিনে একেবারে ভোজবাড়ির মত রূপান্তর ঘটালেন। জেমস্ ওয়াট এই ইঞ্জিনের কার্যকরী ক্ষমতা শক্তি আর গতির আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এর সঙ্গে ইঞ্জিনে বাষ্পের চাপ ও পরিমান মাপার জন্য "ষ্টীম প্রেসারগেজ" ও লাগালেন। ডাক্তারের কাজে স্টেথোস্কোপ যে রকম গুরুত্বপূর্ণ, একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এই "ষ্টীম প্রেসার গেজ" ও তাই। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের যে নকশা জেমস্ ওয়াট তিলে তিলে তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত তাতে আর বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। দুটি ক্ষেত্রে অবশ্য ওয়াট কিছুতেই তাঁর ইঞ্জিনকে আরে বেশি উন্নতর করে তুলতে রাজি হননি। এদের মধ্যে প্রথমটি হল ইঞ্জিনের বহুমুখী, "যৌগিক" প্রসারণ-যার ফলে বাষ্পের সাহায্যে ট্রেন চালানো সম্ভব হতঃ আর দ্বিতীয়টি হল খুব উঁচু চাপে বাষ্প ব্যবহার করা। বহুমুখী, "যৌগিক" প্রসারণ তিনি করতে চাননি, কারণ উনি ভেবেছিলেন, এতে তাঁর নিজের সংস্থার একচেটিয়া অধিকার নষ্ট হয়ে যাবে। আর উঁচু চাপে বাষ্প ব্যবহার করতে তিনি রাজি হননি বিস্ফোরণের সম্ভাবনার কথা ভেবে। তাঁর এই মনোভাবের ফলেই পরে রিচার্ড ট্রেভিথিক (১৭৭১-১৮৩৩) আর জর্জ স্টিফেনসন (১৭৮১-১৮৪৮) বাষ্পশক্তি চালিত রেলগাড়ি তৈরি করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে স্থলপথে যাতায়াত খুবই দ্রুত হয়ে উঠেছিল। অবশ্য বাষ্পচালিত জাহাজ তৈরির ব্যাপারে ওয়াটের বেশ খানিকটা ভূমিকা ছিল। আমেরিকার বাষ্পচালিত জাহাজের প্রথম নির্মাণকারী রবার্ট ফুলটন ওয়াটের কারখানাতেই তাঁর জাহাজের ইঞ্জিনের জন্য অর্ডার দিয়েছিলেন।

ওয়াটের শেষ জীবন কিছুটা করুণ। চৌষট্টি বছর বয়সে ব্যবসাপত্রের ঝমেলা ঝঞ্ঝাট থেকে সরে এসে তিনি নতুন আবিষ্কার করার কাজেই পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে যে ব্যক্তিটির এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সেই ব্যক্তিটি তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নানারকম তুচ্ছ যন্ত্রপাতি নিয়ে টুকটাক করায় মেতে উঠলেন। তাঁর শেষ আবিষ্কারটি ছিল ভাস্কর্যের কাজ নকল করার একটি যন্ত্র। একটি নির্দেশক বা "পয়েন্টার" ভাস্কর্যর ওপরে ঘুরে বেড়াত এবং তার নিয়ন্ত্রণে একটি ঘুরন্ত যন্ত্র অন্য একটি পাথরের চাঁইয়ের ওপর একইরকম ভাবে খোদাই করে যেত। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই এরকম একটি ভাস্কর্যের নকল তাঁর বন্ধুদেরকে "৮৩ বছরের এক তরুণ শিল্পীর" উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন।

১৮১৯ সালে ৮৩ বছর তিনি মারা যান। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার অ্যাবিতে তাঁর স্মৃতিফলক রাখা আছে। স্যাভেরি এবং নিউকোমনে অগ্রদূত হলেও ওয়াইট বর্তমান যুগের আধুনিক বাষ্পচালিত যন্ত্রের আসল উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা। বাষ্পের যে অসীম শক্তি আজ মানুষের করায়ত্ব, তার প্রধান অগ্রদূত জেমস্ ওয়াট। বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিনের জনক ট্রেভিথিক ও স্টিফেনসনকেও তিনিই পথ দেখিয়েছেন।

৬৭

চেঙ্গিস খাঁন

[১১৬২-১২২৭]

ইতিহাসে বিতর্কিত পুরুষ কম নেই। তাদের নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। কিন্তু এমন কোনও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব নেই চেঙ্গিস খানের মতন যার সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ ঠিক সেইখানটিতেই থেমে আছে যেখানটাতে শুরু হয়েছিল। তার কারণ অবশ্য কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করে যে চেঙ্গিস খান একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সমাজ সংগঠনের জন্য যার অবদান অসীম এবং এখনও উল্লেখ্যযোগ্য।

কিন্তু সেই তারই পাশাপাশি অনেকেরই স্থিরবিশ্বাস যে চেঙ্গিস খানের মতন অত্যাচারী সেনানায়ক ইতিহাসে বিরল এবং তিনি শুধু ঘৃণারই যোগ্য।

মোঙ্গোল জাতির প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান এখন থেকে সাত শতাব্দী আগে তার দিগ্বিজয় শুরু করেছিলেন। এই দিগ্বিজয়ের ইতিহাস অনেকের কাছে বিশেষ করে মোঙ্গোলদের কাছে লজ্জার ইতিহাস হয়ে আছে।

১১৬২ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খানের জন্ম মোঙ্গোলিয়ার উত্তরপূর্ব এলাকার দূর প্রত্যন্ত একটি গ্রামে। দীর্ঘদেহী এবং অত্যন্ত বিশাল ছিল তার শরীর। ঐতিহাসিক নাজজোনি লিখেছেন যে চেঙ্গিস খানের চোখ ছিল কটা, বিড়ালের মতন অত্যন্ত সতর্ক ছিল তার দৃষ্টি। মোঙ্গোলিয়ান ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাতে তার দখল ছিল না। তিনি লিখতে শেখেন নি। ঐতিহাসিক বার্থহোলডের ভাষায় চেঙ্গিস খান আক্ষরিক অর্থেই নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনের এবং সামরিক প্রয়োজনের প্রতি তার দৃষ্টি ছিল প্রখর-ডাকপিওনের ব্যবস্থা তিনি তার রাজ্য জুড়ে প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে চেঙ্গিস খান একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা এবং সেনানায়ক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। ইতিহাসের ধারাও অবশ্যই তিনি পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মেঙ্গোলিয়ার স্তেপ অঞ্চলের মধ্যাঞ্চল চেঙ্গিস খান তার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তার রাজধানীর নাম ছিল কারাকোরাম। কারাকোমারে শ্বেত প্রাসাদে রত্নখচিত সিংহাসনে বসে তিনি দূর চীন, ইউরোপ, পারস্য এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদূতদের সাদর সম্ভাষন জানাতেন। সেখানে বসেই তিনি পরিকল্পনা করতেন পরবর্তী যুদ্ধের। সেই সব যুদ্ধের পরিণতিতে মোঙ্গোল বাহিনী পৌঁছে গিয়েছিল ভিয়েনার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত। এই কারাকোরাম শহর পরবর্তী সময়ে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহায়। সেই ধ্বংসস্তূপ আর কোনদিন নতুন করে সৃষ্টি করা হয়নি।

মোঙ্গোলিয়ান রাষ্ট্রের বর্তমান রাজধানী উলান বাটোরে চেঙ্গিস খানের একটি প্রতিকৃতি ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নেই।

বলা বাহুল্য স্তেপ অঞ্চলের অসংখ্য ছোট দল উপদলের সমন্বয় সাধন করে বিশাল একটি রাজত্ব স্থাপনের কৃতিত্ব চেঙ্গিস খানের ছিল। মোঙ্গোল অঞ্চলকে একটি সুনির্দিষ্ট জাতিতে পরিণত করার পর চেঙ্গিস খান অতঃপর তার সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে। ধীরে ধীরে মধ্য এশিয়া থেকে তার রাজত্ব বিস্তৃত হল পারস্য পর্যন্ত। পারস্য অধিকার করার পর তিনি জয় করলেন রাশিয়া, পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলি। অন্যদিকে চীন এবং ভিয়েতনাম পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হতে দেরী হল না। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৬৫ বছর বয়সে মারা যাওয়ার সময়ে পর্যন্ত তিনি নিজেকে 'মানবজাতির সম্রাট' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। সম্ভবত পৃথিবীতে অন্য কোনও সম্রাট এরকম একটি পদবিচিহ্নে নিজেকে চিহ্নিত করার ধৃষ্টতা দেখায় নি।

মোঙ্গোলিয়াতে জনসাধারণের মধ্যে সেই ঘৃণা, সেই ধৃষ্টতা, সেই অহংকারের পরিবর্তে রয়েছে শান্তভাব। অতিথিবৎসল হওয়া উৎসাহ। মোঙ্গোলিয়ার একটি পাঠ্যপুস্তকে চেঙ্গিস খাঁন সম্পর্কে লেখা রয়েছে-"অসংখ্য দল উপদলকে একত্রিত করে চেঙ্গিস খান যে একটি রাষ্ট্র তৈরি করেছিলেন সেই কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তার সেই যুদ্ধের মনোভাব ধ্বংসের মনোভাব সমর্থন করা যায় না।"

অবশ্য সাম্প্রতিককালে চেঙ্গিস খানের প্রতি যুবক মোঙ্গোলদের মনোভাব একটু বদলেছে সম্ভবত। তারা চেঙ্গিস খানকে আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সঙ্গে তুলনা করতে চাইছে, জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে তুলনা করতে চাইছে। পৃথিবীর ইতিহাসে চেঙ্গিস খানের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে গর্ব

বোধ করতে চাইছে। উলান বাটোরের একজন অধ্যাপক লিখছেন যে তার ছাত্রছাত্রীরা 'সিক্রেট হিটলার' পাঠ করার পর চেঙ্গিস খানকে নিয়ে মনে মনে খুবই গর্ববোধ করে থাকে। মানুষ হিসেবে, নেতা হিসেবে তাকে একজন বিশাল পুরুষ হিসেবেই ভাবতে চায়। যদিও সকলে স্বীকার করেন যে চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্যবিস্তারের পদ্ধতিটি সমর্থযোগ্য নয়। রাশিয়া অধিকার করার পর সেখানে চেঙ্গিস খান এবং তার বংশধরদের রাজত্ব চলেছিল ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি। সেসময় অত্যাচারও কম হয়নি। রাশিয়ার জনগণের মনে তার প্রতিক্রিয়া খুবই স্পর্শকাতর হয়ে আছে। চীন চেঙ্গিস খানের প্রশাংসাব্যঞ্জক বিজ্ঞপ্তি ছেপে ব্যাপারটা আরও গুলিয়ে দিয়েছে।

৬৮

ওমর খৈয়াম

(১০৪৪–১১২৩ খ্রিঃ)

ওমর খৈয়াম ১০৪৪ খিস্টাব্দে খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম গিয়াস উদ্দীন আবুল ফতেহ ওমর ইবনে ইব্রাহীম। কিন্তু তিনি ওমর খৈয়াম নামেই সমগ্র বিশ্বে পরিচিত। খৈয়াম হচ্ছে বংশগত উপাধি। খৈয়াম শব্দের অর্থ হচ্ছে তাবু নির্মাতা বা তাবু ব্যবসায়ী। সম্ভবত বংশের কেউ তাবু তৈরি করতেন কিংবা তাবুর ব্যবসা করতেন। আর সে থেকেই বংশের কিংবা পারিবারিক উপাধি হয়েছে খৈয়াম।

আসলে তিনিই ছিলেন খৈয়াম অর্থাৎ তাবু নির্মাতা। তিনি জ্ঞানের যে তাবু নির্মাণ করে গেছেন, আজও বিশ্বের অগণিত জ্ঞান পিপাসু মানুষ প্রবেশ করে জ্ঞানের সে তাবুর অভ্যন্তরে এবং আহরণ করে জ্ঞান। ওমর খৈয়ামের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত জানা যায় না। এমন কি এ মনীষীর জন্ম তারিখ নিয়েও রয়েছে মতভেদ। পারস্য ঐতিহাসিকগণের মতে গজনীর সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আনুমানিক ১০১৮ থেকে ১০৪৮ সালের মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ওমর খৈয়াম ছিলেন একজন বিশ্ব বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, অংক শাস্ত্রবিদ, অর্জন করার তেমন কোন আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। তিনি কেবল মাত্র আত্মসন্তুষ্টির জন্যে বিজ্ঞান চর্চার অবসর সময়ে মনের খেয়ালে এক ধরনের চতুষ্পদী কবিতা লিখতেন। তিনি নিজ মাতৃভূমি ইরানেও জীবিতাবস্থায় কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। অথচ মনের খেয়ালে তাঁর লিখিত কবিতাগুলো আজ সমগ্র বিশ্বে হয়েছে সমাদ্রিত এবং দখল করেছে সাহিত্য ও কবিতা জগতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন। ওমর খৈয়াম আজ সমগ্র বিশ্বের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ইউরোপীয়রা অত্যন্ত কৌশলে এ মহামনীষীকে বিশ্ব বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানীর পরিবর্তে কেবলমাত্র একজন কবি হিসেবে পৃথিবীর মানুষের সামনে পরিচিত কারার চেষ্টা করেছেন। ওমর খৈয়ামের মৃত্যু প্রায় ৭৩৪ বছর পর ১৮৫৭ সালে এডোয়ার্ড ফিজারেল্ড খৈয়ামের 'রুবাইয়াত' নামক চতুষ্পদ কবিতাগুলোর ইংরেজি অনুবাদের দ্বারা সমগ্র ইউরোপে তাঁর রুবাইয়াত ছড়িয়ে দেয় এবং তিনি কবি হিসেবে পরিচয় লাভ করেন।

ওমর খৈয়াম ছোট বেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান। তাঁর স্বরণ শক্তি এত প্রখর ছিল যে, যে কোন দর্শন গ্রন্থ এবং কঠিন কঠিন কিতাব সমূহ মাত্র ৬/৭ বার পাঠ করেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন। তাঁর মেধা ও প্রতিভার সামনে সক্রেটিস, এ্যারিস্টটল এবং ইউক্লিড এর প্রতিভাও ম্রিয়মান হয়ে যায়। ওমর খৈয়ামের শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম মোয়াফিক। মনীষী ওমর খৈয়ামের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। আমীর আবু তাহির তাকে জ্ঞান চর্চার জন্যে কিছু অর্থ সাহায্য করেন এবং রাজ্যের সুলতান জালাল উদ্দিন মালিক শাহের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে তাঁর আর্থিক দূরাবস্থা সামান্য লাঘব হয়। রাষ্ট্রীয় সাহায্য পেয়ে ওমর খৈয়াম ভোগ বিলাসকে স্পর্শও করেননি। বরং রাষ্ট্রীয় সাহায্য তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার কাজে সহায়তা করেছিল। কোন বই হাতে পেলেই তা তিনি পড়ে শেষ করে ফেলতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, বীজ গণিত ও জ্যামিতি ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। এছাড়া দর্শন শাস্ত্রে ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। মানুষ হিসেবে ছিলেন তিনি খাঁটি মুসলমান ও আল্লাহ প্রেমিক।

১০৭৪ খ্রিস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়াম সেলজুকের সুলতান জালাল উদ্দিন মালিক শাহের অনুরোধ রাজকীয় মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর উপর অর্পিত হয় এক গুরু দায়িত্ব। রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহের সুবিধার্থে একটি সঠিক সৌর বর্ষপঞ্জি তৈরির জন্যে সুলতান

জালাল উদ্দিন মালিক শাহ ওমর খৈয়ামকে অনুরোধ জানান। ওমর খৈয়াম মাত্র ৭ জন সহকর্মী বৈজ্ঞানিক নিয়ে অতি অল্প দিনে সাফল্যের সাথে এবং নিখুঁতভাবে একটি সৌর বর্ষপঞ্জি চালু করেন এবং সেলজুকের সুলতান জালাল উদ্দিন মালিক শাহের নাম অনুসারে এর নাম দেন আত্ তারিখ আল জালালী বা জালালী অব্দ।

এ জালালী বর্ষপঞ্জিতে ৩৭৭০ বৎসরে মাত্র ১ দিনের ভ্রান্তি ছিল। অপর দিকে গ্রেগরীয়ান বর্ষপঞ্জিতে ভ্রান্তি ছিল ৩৩৩০ বৎসরে ১দিনের। জালালী অব্দ হিজরী ৪৭১ সালের ১০ রমজান থেকে শুরু হয়। এ মহান বিজ্ঞানী একটি নতুন গ্রহও আবিষ্কার করেছিলেন।

ওমর খৈয়ামের সর্বাধিক অবদান এলজাবরা অর্থাৎ বীজ গণিতে। তিনিই সর্বপ্রথম এলজাবরার সমীকরণগুলোর শ্রেণী বিন্যাসের চেষ্টা করেন। জ্যামিতি সমাধানে বীজগণিত এবং বীজগণিত সমাধানে জ্যামিতি পদ্ধতি তাঁরই বিস্ময়কর আবিষ্কার। ভগ্নাংশীয় সমীকরণের উল্লেখ ও সমাধান করে ওমর খৈয়ামই সর্ব প্রথম বীজগণিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। বীজগণিত সম্পর্কীয় 'ফি আলজাবের' নামক গ্রন্থ তিনিই রচনা করে যান। বীজ গণিতের ক্ষেত্রে 'বাইনোমিয়াল থিউরাম' আবিষ্কার করেন। এই 'বাইনোমিয়াল থিউরাম' এর আবিষ্কার কর্তা হিসেবে বৈজ্ঞানিক নিউটন আজ পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। অথচ তারও শত শত বছর পূর্বে কবি হিসেবে পরিচিত বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়াম তা আবিষ্কার করে গেছেন।

গণিত শাস্ত্রেও তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। গণিত জগতে এ্যানালিটিক জিওমেট্রির কল্পনা তিনিই সর্ব প্রথম করেন। পরে সপ্তদশ শতাব্দিতে জনৈক গণিতবিদ একে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয় মাত্র। এছাড়া পদার্থ বিজ্ঞানেও তাঁর অবদানের কোন কমতি নেই। ওমর খৈয়ামকে মেধা ও চিন্তা শক্তি এত গভীর ছিল যে, একদিন ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ওমর খৈয়ামকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কোন গোলক যে অংশের সাহায্যে অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে, গোলকের সমস্ত অংশ এক প্রকার হওয়া সত্ত্বেও ঐ অংশটি অন্যান্য অংশ থেকে কিভাবে আলাদা রূপে জানা সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাবে ওমর খৈয়াম তখনই অংকের ব্যাখ্যা শুরু করেন। দুপুর থেকে করে বিকেল পর্যন্ত ও তার ব্যাখ্যা শেষ হয়নি। তাঁর জবাবে ইমাম গাজ্জালী (রঃ) সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "সত্যের সন্ধান পেয়ে মিথ্যার যবনিকা অপসারিত হলো। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমার যে ধারণা ছিল তা মিথ্যা।"

ওমর খৈয়াম ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বহু বহু রচনা করে যান। ওমর খৈয়াম যে এত বড় দার্শনিক, বিজ্ঞানী, অংক শাস্ত্রবিদ ও চিকিৎসাবিদ ছিলেন তা মুসলিম জাতির অনেকেই হয়তো আজও জানেন না। কেবলমাত্র একজন কবি হিসেবেই তাঁকে সবাই চিনেন। এ অসাধারণ ব্যক্তিটিকে তাঁর জীবিতাবস্থায় নিজ মাতৃভূমির লোকেরাও চিনত না কিংবা চিনার চেষ্টা করত না। ওমর খৈয়াম কখনো নিজকে জনগণের সামনে জাহির করার চেষ্টা করেননি। তাঁর মত বহু মুসলিম মনীষী নিজের ব্যক্তিত্বকে লুকিয়ে রেখে সারাটা জীবন মানুষের কল্যাণে জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যে অবদান রেখে গেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তার অধিকাংশ গ্রন্থই সংরক্ষণের অভাবে আজ হারিয়ে গেছে। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে–

(১) রুবাইয়াত (মরমী কবিতা), (২) মিজান-উল-হিকাম (রসায়ন বিজ্ঞান), (৩) নিজাম-উল-মূলক (রাজনীতি), (৪) আল জাবরা ওয়াল মুকাবিলা (বীজগণিত), (৫) মুশকিলাত (গণিত শাস্ত্র), (৬) নাওয়াযিম আসকিনা (ঋতু পরিবর্তন বিষয়ক), (৭) আল কাউল ওয়াল তাকলিক (মানুষের নৈতিক দায়িত্ব), (৮) রিসালা মুকাবাহ, (৯) দার ইলমে কুল্লিয়াত, (১০) নওরোজ নামা প্রভৃতি।

বিশ্ব বিখ্যাত এ মনীষী ১১২৩ খ্রিস্টাব্দে ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। জানা যায়, মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর শিষ্যদের শেষ বারের মত বিশেষ উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে আহবান করেন। এরপর তিনি ওজু করে এশার নামাজ আদায় করেন। এদিকে তিনি শিষ্যদের উপদেশ দানের কথা ভুলে যান। নামাজান্তে সেজদায় গিয়ে তিনি কাঁদতে থাকেন এবং জোরে জোরে বলতে থাকেন, "হে আল্লাহ আমি কেবলমাত্র তোমাকে পাবার এবং তোমাকে সন্তুষ্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমি চাই তোমাকে। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমার দয়া ও করুণার গুণে আমাকে ক্ষমা করে দাও।" এরপর তিনি আর মাথা তোলেননি। সেজদা অবস্থায়ই তিন চিরদিনের জন্যে এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্যে।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড

[১৮৫৬-১৯৩৯]

ফ্রয়েডের জন্ম ৬ই মে ১৮৫৬ সালে অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়া প্রদেশের ফ্রেইবার্গ শহরে। তাঁর বাবা জ্যাকব ফ্রয়েড ছিলেন পশম ব্যবসায়ী। সিগমুন্ডের মা এ্যামিলা ছিলেন জ্যাকবের দ্বিতীয় স্ত্রী। দু'জনের বয়েসের ব্যবধান ছিল কুড়ি বছর। জ্যাকবের প্রথম পক্ষের চারটি সন্তান। সিগমুন্ড তাঁর মায়ের প্রথম সন্তান। তাঁর পরে এ্যামিলার আরো ছটি সন্তান জন্ম নেয়। সেই সময় দেশে শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে বয়ন শিল্পে সংকট দেখা দিয়েছে।

জ্যাকব ক্রমশই বুঝতে পারছিলেন মিলে তৈরি কাপড়ের সাথে তাঁর পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। জ্যাকব ফ্রেইবার্গ ছেড়ে পাকাপাকিভাবে ভিয়েনাতে এসে বাসা বাঁধলেন এখানে এসে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করলেন তিনি। এই ভিয়েনা শহরেই কেটেছে সিগমুন্ডের বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব।

আট বছর বয়স পর্যন্ত সিগমুন্ডের বাবাই ছিলেন তাঁর শিক্ষক। যখন তাঁর আট বছর বয়েস, ভিয়েনার স্পার্ল স্কুলে ভর্তি হলেন। প্রথম বছরের পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা অবধি তিনি কোনদিন দ্বিতীয় হননি। নানান বিষয়ে ছিল তাঁর আগ্রহ–সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান। চোদ্দ বছর বয়সে দার্শনিক জন স্টুয়ার্ড মিলের রচনাবলীর বেশ কিছু অংশ জার্মান ভাষা থেকে অনুবাদ করেন। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে স্কুলের পাঠ শেষ হবার আগেই মনস্থির করলেন ডাক্তারি পড়বেন।

ছেলের এই উচ্চাশা দেখে নিজের প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা সত্ত্বেও সিগমুন্ডকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিলেন জ্যাকব। ১৭ বছর বয়সে ভিয়েনা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হলেন সিগমুন্ড।

প্রথম দু বছর চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন শাখা নিয়ে পড়াশুনা করবেন মনস্থির করতে পারেননি সিগমুন্ড। এই সময় সিগমুন্ডের সৎ ভাই ছিলেন ইংল্যাণ্ডে। জ্যাকব তাঁকে ইংল্যাণ্ড ভ্রমণের জন্য পাঠালেন।

১৮৭৬ সালে ফিরে এলেন ভিয়েনাতে।

সেই সময় মেডিকেল শরীরতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন ব্রুকে। শিক্ষক হিসাবে ব্রুকে ছিলেন খুবই খ্যাতিমান। ব্রুকের শিক্ষক রর্বাট মেয়র ছিলেন ভিয়েনার সর্বশ্রেষ্ঠ শরীরতত্ত্ববিদ। তাঁর কিছু মৌলিক আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে সাড়া জাগিয়েছিল। সিগমুন্ডেরও ইচ্ছা ছিল শুধুমাত্র একজন চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা নয়, রবার্ট মেয়রের মত নতুন কিছু উদ্ভাবন করা।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন ব্রুকের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। তাঁর গবেষণাগারেই কাটত দিনের বেশিরভাগ সময়। শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে এতখানি মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্য বিষয়ের প্রতি তেমন সময় দিতে পারতেন না। সেই কারণে অন্য সব ছাত্ররা পাঁচ বছরে যে পাঠ্যসূচি শেষ করত, সিগমুন্ডের সেখানে সময় লাগল আট বছর। এই সময়ের মধ্যেই তিনি স্নায়ুতন্ত্রের উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলির মৌলিকতা লক্ষ্য করে শিক্ষকদের সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

১৮৮১ সালে পঁচিশ বছর বয়সে কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি পেলেন। তাঁর উত্তরপত্র দেখে শিক্ষকরা তাঁকে কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে ঘোষণা করেন।

ছাত্র অবস্থাতেই সিগমুন্ড তাঁর বোনের ননদ মার্থা বার্নেসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। পাশ করবার পর তিনি বুঝতে পারলেন অর্থ উপার্জন করতে না পারলে মার্থাকে বিবাহ করা সম্ভবপর নয়। তাই ব্রুকের গবেষণাগার ত্যাগ করে ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালে ইনটার্ন হিসাবে যোগ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তার পদে উন্নীত হলেন।

ভিয়েনা হাসপাতালে ছিলেন বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ থিওডর মেরারেত। তাঁর অধীনে ফ্রয়েড মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উপর গবেষণা আরম্ভ করলেন।

তিনি ভিয়েনার হাসপাতালে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে চাকরি নিলেন। কয়েক মাস চাকরি করবার পর তিনি একটা স্কলারশিপ পেয়ে প্যারিসে রওনা হলেন।

কিছুদিন শার্কোর অধীনে কাজ করার পর ভিয়েনাতে ফিরে এলেন। মার্থাকে ছেড়ে থাকতে তাঁর সমস্ত মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল : ভিয়েনাতে আসবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মার্থাকে বিবাহ করলেন ফ্রয়েড।

অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর কাছে রোগীর ভিড় লেগেই থাকত। প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে আরম্ভ করলেন ফ্রয়েড

এইবার ভিয়েনার চিকিৎসক সমাজের পক্ষ থেকে প্রবল বাধার সৃষ্টি হল। প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও সামান্যতম বিচলিত হলেন না ফ্রয়েড। তিনি সমস্ত সংস্থা থেকে পদত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে নিজের চিকিৎসা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করলেন। এরই সাথে সাথে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যান।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলল তাঁর অক্লান্ত গবেষণা। এই সময় ব্রুকের নামে একজন চিকিৎসক এগিয়ে এলেন ফ্রয়েডের সাহায্যে। ইতিপূর্বে ব্রুকের বেশ কিছু রুগীকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। দুজনের সম্মিলিত গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হল "Studies in Hysteria" নামে একখানি বই।

এই বইখানি মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। এতেই তিনি প্রথম প্রকাশ করলেন অবচেতন মনই স্নায়ু সংক্রান্ত সমস্ত রোগের মূল কারণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন ধারণার উদ্ভাবন করলেন, যার নাম দেওয়া হল মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) ।

ফ্রয়েড বললেন, মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে চেতন আর অবচেতন মন। মানুষের শৈশব থেকেই তার মধ্যেকার অহংবোধ বা ইগো কোন কারণে অবদমনের ফলে বহু যৌনকামনা চেতন মন ছেড়ে অবচেতন মনের স্তরে ডুব দেয়। তার থেকেই দেখা দেয় মনোবিকার। ফ্রয়েডের মতবাদের মূলকথা ইডিপাস কমপ্লেক্স্। তিনি বলেছেন শিশুর মধ্যে থাকে যৌনবোধ। এই যৌনবোধই অসুকের মূল কারণ বরে চিহ্নিত করেছেন।

তিনি আরো বললেন, মানুষ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে, যদিও ঘুম ভাঙলেই ভুলে যায় সেই স্বপ্নের কথা। কিন্তু স্বপ্ন তার মনের চিন্তা-ভাবনার প্রতীক। প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যেই থাকে বিভিন্ন ইচ্ছা, থাকে কামনা-বাসনা। নানান কারণে সেই কামনা-বাসনা পূর্ণ হয় না। আর এই অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রভাব পড়ে মানুষের স্নায়ুর উপর যার ফলশ্রুতিতে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

নিজের মতবাদকে আরো জোরালোভাবে যুগান্তকারী গ্রন্থ Interpretation of Dream । পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়েছে মাঝে মাঝে এমন এক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে যা মানুষের চিন্তা-ভাবনার জগৎকে ওলটপালট করে দিয়েছে। তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে মানুষের যুগ যুগান্তরের ধ্যান-ধারণা।

এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ইনটারপ্রিটিশন অব ড্রিমস (Interpretation of Dreams)। এই বইটিতে প্রকাশ পেয়েছে স্বপ্ন সম্বন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা, বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের সূত্রেই তিনি বলেছেন মানুষের মনের অবদমিত ও অপরিতৃপ্ত যৌন কামনার কথা।

এতদিন এই স্বপ্ন সম্বন্ধে চিকিৎকদের কোন ধারণাই ছিল না। স্বপ্ন তাদের কাছে ছিল অস্তিত্বহীন এক কল্পনা ফ্রয়েডই যে শুধু তাঁর উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন তাই নয়, তিনিই প্রথম মনোরোগের ক্ষেত্রে স্বপ্নের ব্যবহারের সুচিন্তিত পথ দেখালেন।

ফ্রয়েডের খ্যাতি ভিয়েনা ছাড়িয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বিতর্কিত মতবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আলোচনা শুরু করলেন। নিজের মতবাদকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ফ্রয়েড লিখে চললেন একের পর এক বই–"The Psychopathology of everday life (1904), Wit and its Relation to the Unconscious (1905), The three Contributions to the theory of sexuality (1905), Totem and tabu (1913)" । এই সমস্ত বইগুলির মধ্যে ঘটেছে তাঁর চিন্তা-ভাবনা মনীষীর পূর্ণ প্রকাশ।

১৯০৯ সালে আমেরিকার ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ আসে। আমেরিকাই প্রথম দেশ যারা ধর্মীয় ও মানসিক গোঁড়ামি ত্যাগ করে ফ্রয়েডের মতবাদের সার্থকতা, গভীরতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।

ধীরে ধীরে ফ্রয়েডের মতবাদ বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতরা গ্রহণ করতে থাকেন। ধীরে ধীরে জার্মান ফরাসী চেক ইংরেজদের মধ্যে মুক্ত মনের গবেষকরা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে ফ্রয়েডের চিন্তা-ভাবনা।

১৯৩০ সালে তাঁকে ল্যোটে পুরস্কার দেওয়া হয়। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রমশই উপলব্ধি করতে পারছিল ফ্রয়েডকে অস্বীকার করার অর্থ প্রকৃত জ্ঞান থেকে নিজেদের বঞ্চিত করা। তাই ১৯৩২ সালে তাঁকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুরোগ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হল। ১৯৩৬ সালে ব্রিটেনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে বিদেশী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করল। ১৯৩৩ সালে তাঁর উপর নেমে এল অপ্রত্যাশিত এক বিরাট আঘাত। জার্মানীতে তখন প্রভুত্ব করছেন হিটলার। ইহুদীদের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ। ফ্রয়েড ছিলেন ইহুদী। হিটলারের অনুগত বাহিনীর মনে হল ফ্রয়েডের রচনা খ্রিস্টান ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর রচনা সম্বন্ধে বলা হয় "ইহুদী অশ্লীলতার চরম প্রকাশ"।

নিষিদ্ধ করা হল তাঁর সমস্ত রচনাবলী। নাৎসী অধিকৃত এলাকায় যেখানে তাঁর যত বই পাওয়া গেল সব দখল করে নেওয়া হল। তাঁর অনুগামীদের যে সব গবেষণাগার ছিল ছিল সব ভেঙে চুরমার করে ফেলা হল।

১৯৩৭ সালে জার্মান বাহিনী অস্ট্রিয়া আক্রমণ করল। হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষ তখন প্রবল আকার ধারণ করেছে। ফ্রয়েডের বন্ধুবান্ধব, তাঁর অনুগামীরা তখন তাঁকে অস্ট্রিয়া ত্যাগ করবার জন্য বারংবার অনুরোধ করতে থাকে।

ফ্রয়েড বিরাশি বছরে পা দিয়েছেন। যে শহরে তিনি কাটিয়েছেন তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্য, সেই ভিয়েনা ত্যাগ করে যেতে মন চাইছিল না।

হিটলালের নাৎসী অস্ট্রিয়া দখল করল। বৃদ্ধ ফ্রয়েডকে গৃহবন্দী করা হল।

তাঁকে অস্ট্রিয়ার বাইরে নিয়ে আসার জন্য জোর প্রচেষ্টা শুরু হল। নাৎসী নাকয়দের কাছে বারংবার অনুরোধ জানানো হল তাঁকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। তাঁর মুক্তিপণ হিসাবে নাৎসী সরকার কুড়ি হাজার পাউন্ড অর্থ দাবী করল। দেশে দেশে আবেদন করা হল। ফ্রয়েডের সাহায্যে এগিয়ে এলেন গ্রীসের রাজকুমারী। তিনি এই অর্থ প্রদান করলেন। ফ্রয়েডকে নিয়ে যাওয়অ হল ইংল্যান্ডে।

বৃদ্ধ অসুস্থ এই জ্ঞানতাপসকে সাদরে বরণ করে নিল ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা। তাঁকে রয়াল সোসাইটির ফেলো হিসাবে নির্বাচিত করা হল। ইংল্যান্ডের সেরা চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা আরম্ভ করলেন।

কিন্তু পরবাসে এসে মনের সব শক্তিটুকু হারিয়ে ফেললেন ফ্রয়েড। তাঁর দেহ ক্রমশই ভেঙে পড়ছিল। ইংলন্ডে আসবার পনেরো মাস পরে ১৯৩৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর লন্ডন শহরে মাহপ্রয়াণ ঘটল এই মহাজ্ঞানীর। তার কয়েকদিন আগে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ফ্রয়েড-উদ্ভাসিত তত্ত্বের বাস্তব পরিমার্জনা করে তাকে ব্যাপকভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে প্রথম প্রয়োগ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানীরা। ফ্রয়েড মানুষের সকল কর্মের নিয়ামক হিসাবে যৌনতাবোধের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তাকে উত্তরকালের বিজ্ঞানীরা পুরোপুরিভাবে স্বীকার করতে পারেননি।

মানব মনের জটিলতাকে পুরোপুরি উন্মাচন করতে না পারলেও তিনিই যে এই পথের অগ্রনায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরেই মানুষ একদিন হয়ত জটিল জীবন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবে।

৭০

আলেকজান্ডা গ্রাহামবেল

[১৮৪৭-১৯২২]

টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহামবেলের নাম বিজ্ঞান জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতি। টেলিফোনে প্রথম ধ্বনি ও প্রথম কথা ছিল "Mr. Watgon, come here please. I want you." এই কথাগুলো বলেছিলেন টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল। আজতো সর্বত্র গ্রাহামবেল রয়েছে। পৃথিবীর সব যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে এই গ্রাহামবেলই। টেলিফোনের মাধ্যমেই মানুষ এক দেশ থেকে আর এক দেশে কথা বলছে।

১৮৪৭ সালের ৩রা মার্চ গ্রাহামবেল জন্মগ্রহণ করেন এডিনবরায়। তিনি জাতিতে স্কট

ছিলেন। তাঁর বাবা মেলভিলেবেলও ছিলেন প্রতিভাবান মানুষ। মেলভিলে ফোনেটিক্সে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি এডিনবরা স্কুলে পড়াশুনা করেন ও পরে লন্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে যান। তিনি পরে তাঁর বাবার সঙ্গে কানাডায় যান, যেখানে তিনি মুক ও বধিরদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করেন। পি, এইচ, ডি ডিগ্রী পান জার্মানির উর্জবাগ থেকে।

ছোটবেলায় একটা গল্প তিনি সবাইকেই শোনাতেন। তিনি এডিনবরার এক করাখানায় তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। ছেলেগুলোকে কিছু গমের দানা দিয়ে কারখানার অফিসার বললেন এগুলোর খোসা কালকে ছাড়িয়ে আনবি। বেল বাড়িতে এসে নখ পরিষ্কার করার ব্রাশ দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি খোসা ছাড়িয়ে নিলেন। পরের দিন কারখানার মালিককে এই কথাটা বললেন। মালিক এই কথা শুনে ব্রাশের নীতি অনুসারে এক মেশিন বসালেন। দেখা গেল খুব সহজেই খোসা ছাড়ানো যায়।

মুক ও বধিরদের শিক্ষা দেবার জন্য তিনি একটা বিশেষ ধরনের যন্ত্র তৈরি করেন। যে যন্ত্রটি একই কথা বার বার বলে যাবে, তিনি বধিরদের শিক্ষা দেবার জন্য একটা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছিলেন। বধিরদের শ্রবণশক্তি দান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই তিনি টেলিফোন আবিষ্কার করেন। তাছাড়া তিনি ম্যাবেল হাবার্ড নামে একটি বধির মেয়েকে বিয়ে করেন।

১৮৭৫ সালের একটি ঘটনা যা গ্রাহামবেলকে সজাগ করে তোলে। টেলিগ্রাফে অনেকগুলো বার্তা পাঠানো নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এই কাজ করার সাথে বিদ্যুতের সাহায্যে শব্দ পাঠানো নিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করেন, হঠাৎ তারের ভিতর দিয়ে এক স্প্রিংয়ের টংকার ধ্বনি তাকে সচকিত করে তোলে। সেই তখন থেকেই তিনি এই কাজে মেতে উঠেন, বিজ্ঞানে এই বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে কিন্তু গ্রাহামবেলই প্রথম টেলিফোনীয় সঠিক নীতি ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বায়ুর যেমন ঘনত্বের তারতম্য হয়; তেমনি শব্দ উৎপাদনে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের তীব্রতার তারতম্য ঘটাতে পারি তাহলে টেলিগ্রাফে বার্তা পাঠানোর বদলে আমি শব্দধ্বনি পাঠাতে পারি। অনেক চেষ্টা করে তিনি একটা যন্ত্র তৈরি করলেন, যা আজ টেলিফোন নামে খ্যাত হয়েছে।

কিন্তু টেলিফোন আবিষ্কারক কে এই নিয়ে তুমুল হৈ চৈ বাঁধে। কারণ একই আবিষ্কারের জন্য কাজ করছেন তিনজন তাতেই এত গোলমাল, যখন আবিষ্কর্তা নিয়ে এত হৈ চৈ তখন বেল ও তাঁর এক সহকর্মী ওয়াটসন দুইজনে মিলে টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত। ১৮৭৬ সালে ১০ই মার্চ বিকালে রিসিভার লাগানো তারের এক প্রান্ত কানে লাগিয়ে ওয়াটসন ঘরে বসে কাজ করছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন গ্রাহামবেলের কণ্ঠস্বর, তিনি আনন্দে ছুটে গেলেন গ্রাহামবেলের কাছে। তাকে জড়িয়ে ধরলেন, একদিন ব্রাজিলের সম্রাট ডন পেদ্রো কানে রিসিভার লাগিয়ে বসে আছেন। অন্য প্রান্ত থেকে গ্রাহামবেল হ্যামলেট থেকে দুটো বিখ্যাত লাইন টেলিফোন আবৃত্তি করলেন–"To be or not to be".....সম্রাট চেঁচিয়ে বললেন–My God! It speaks! তারপর এর প্রদর্শনীতে এই টেলিফোন দেখানো হল। এই টেলিফোন দেখার ও কথা বলার ভিড় উপচে পড়ল, মানুষের চোখে ও মনে বিস্ময়। এই যন্ত্রে কথা বলা ও শোনা।

টেলিফোন আবিষ্কর্তা কে এই নিয়ে অনেক মামলা চলে। শেষে গ্রাহামবেলই টেলিফোন আবিষ্কারক হিসাবে গণ্য হন। জীবনে অনেক সম্মান পান, তবে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সুখী ছিলেন না। নিঃসঙ্গ জীবনে খুব কষ্ট পেতেন, নিজের আবিষ্কৃত টেলিফোনটাকে তিনি একসময় ঘৃণা করতেন। বললেন এই জানোয়ারটাকে আমি কখনও ব্যবহার করি না। তাঁর মানসিক যন্ত্রণাই তাঁকে খুব কষ্ট দিত।

১৯২২ সালের ২রা আগস্ট নিজের বাড়িতেই তিনি মারা যান। তাঁর আবিষ্কার টেলিফোন আমাদের প্রতি মুহূর্তেই মনে করিয়ে দেয় বৈজ্ঞানিক গ্রাহামবেলকে।

৭১

যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ

[১৬৮৫–১৭৫০]

১৭৬০ সালের লিজিগ শহর। সবার অলক্ষ্যে ফুটপাথের এক ভিখারিনী মারা যাচ্ছেন। ভিখারিনীর মৃত্যু তেমন নতুন কিছু নয়। তাই কারোই দরকার নেই সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার। তবু সেখানে উপস্থিত রয়েছেন দু-একজন। তাদের মধ্যে একজন একসময়ে এই ভিখারিনীর পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। পেশায় মাংসবিক্রেতা। এই ভিখারিনী ওর মাংসের দোকানের পাশের

ফুটপাথেই বাস করেছেন গত দশ বছর। এই বন্ধুটির দাক্ষিণ্যেই ফুটপাথে আশ্রয় পেয়েছিলেন ভিখারিনীটি। ভিখারিনীটির নাম অ্যানা ম্যাগডালানা বাখ্। যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ-এর দ্বিতীয় স্ত্রী, তার প্রিয়তমা অ্যানা।

১৭৫০ সালে, ওপরের ঘটনার বছর আরও করুণ। বাখ্ ছিলেন লিপজিগের সেন্ট টমাস চার্চের সংলগ্ন সেন্ট টমাস স্কুলের কয়ার মাস্টার। দীর্ঘকাল সারাদিন পরিশ্রমে করার পর বাতি জ্বালিয়ে রাত্রিবেলায় গান আর স্বরলিপি রচনা করার অভ্যাসের ফলে একটা সময়ে তার চোখের অসুখ হয়েছিল। ডাক্তারদের নিদান ছিল অস্ত্রোপচার করতে হবে চোখে। সেটা ১৭৪৮ সাল, শীতকাল। চোখের অসুখ হওয়ার পরে লিপজিগ শহরের অনামী এই কয়ার মাস্টারটিকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। একজন কয়ার মাস্টারের অর্গান বাজানোতে অধিকার নেই। দিনের বেলায় তাই সেই সুযোগ নেই। আবার রাতের বেলাতে অর্গান বাজালে অনেকেরই ঘুমের অসুবিধা হয়। অথচ বাখ্-এর জীবনে সুরই ছিল একমাত্র জীবনীশক্তি। ফলে অকল্পনীয় মানসিক কষ্টে তাকে দিন যাপন করতে হচ্ছিল। তখন তার বয়স ৬৫। প্রথমা স্ত্রী নেই। দ্বিতীয় স্ত্রী অ্যানাই শুধু সর্বক্ষণের সঙ্গিনী। অথচ তার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কুড়ি। অবশ্য তাদের মধ্যে দশজন আগেই মারা গেছে। তবু বেঁচে আছে বাকি দশজন এবং তাদের প্রায় প্রত্যেককে না হলেও কেউ কেউ তো খুবই প্রতিষ্ঠিত। এইরকম এক মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে বাম্ চোখে অস্ত্রোপচার করতে রাজী হতে বাধ্য হলেন তিনি।

অস্ত্রোপচারে দিন ঠিক হল। আগের দিন রাতে বাখ্ ভয়ঙ্করভাবে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন যে তাকে একটু অর্গান বাজাতে দেওয়া হোক। বাখ্-কে নিয়ে ইতিমধ্যেই চার্চের মধ্যে বেশ অশান্তি হচ্ছিল। কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন, অথচ অন্য কোথাও যাওয়ার সংস্থান নেই। অগত্যা চার্চের দয়ায় থাকার জায়গাটুকু অন্তত রয়েছে। ফলে চার্চের হাতে তোলা হয়ে থাকার জন্য খুবই সাবধানে সবার মন জুগিয়েই থাকতে হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে রাত্রিতে অর্গান বাজিয়ে অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালে যে বাসস্থানটুকু আছে তাও হয়ত চলে যাবে। বাখের কাকুতি মিনতিতে তাই অ্যানা খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন। তাছাড়া পরের দিনই অপারেশন। কে জানে অপারেশনের পরে আবার পড়ে কোন নতুন বিপত্তির উদ্ভব হয়। হয়ত ক্ষতি হতে পারে। ডাক্তাররা সেইরকমই ভয় দেখিয়ে গেছে। অনেক ভেবে চিন্তে অ্যানা শেষমেষ মনস্থির করে ফেললেন। না, তার স্বামী জীবনের শেষ সায়াহ্নে কেবল শুধু একটু অর্গান বাজাতে চেয়েছেন মাত্র, আর কিছু নয়। সেটার ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে।

রাত গভীর হল। অ্যানা ধীরে ধীরে বাখ্কে নিয়ে এলেন চার্চের বড় হলঘরে। বিশাল অর্গান সামনে। শিশুর মতন বাখ্ সেটাকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর তিনি বাজাতে লাগলেন। অল্প সময়, খুব অল্পক্ষণ মাত্র। তারপর বাজনা শেষ করে, অ্যানাকে বললেন, 'ঠিক আছে অ্যানা, এবারে আমি প্রস্তুত।'

ততক্ষণে বাজনা শুনে ছুটতে ছুটতে ছলে এসেছেন চার্চের ডিরেক্টর, কিউরেটর উইনলিক। ভয়ংকর চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন। এর আগেও অর্গান বাজানোর অপরাধে বারবার অপমানিত হয়েছেন বাখ। আজ যেন সেসবই চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে অ্যানা আজ চোরের মতন নিয়ে এসেছেন তার প্রিয় যোহানকে। কাল তার চোখের অপারেশন। কে জানে তার ফল কি হয়। তাই যোহানের শিশুর মতন শেষ আবদার তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু উইনলিকের প্রত্যেকটি কথায় চার্চ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ধমক মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয় তাকে। তবু তো যোহান একটুক্ষণ হলেও তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছেন। শান্ত হয়েছে তার মন। এবারে অপারেশনের জন্য সে প্রস্তুত। চোরের মতন মুখ নীচ করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন অ্যানা যোহানকে সঙ্গে নিয়ে।

পরের দিন চোখের অপারেশন হল। কিন্তু অপারেশনের পরে সারা শরীরে প্যারালিসিস হয়ে গেল বাখ্-এর। দুবছর অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করে অবশেষে বাখ মারা গেলেন ২৮ জুলাই ১৭৫০ সালে। অ্যানা মারা গেলেন তারও দশ বছর পরে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৭৬০ সালে।

বাখ্ মারা যাওয়ার পর অ্যানাকে চার্চের ঘর ছেড়ে দিতে হয়েছিল। যা কিছু জিনিসপত্র রইল সব বিক্রি করে দিলেন অ্যানা। শুধু বাখের অসংখ্য রচনার পাণ্ডুলিপির স্তূপ তিনি প্রাণে ধরে ফেলে দিতে পারেন নি। চেনা অচেনা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ছেলেমেয়ে সকলের দরজায় দরজায় তিনি ধন্না দিলেন, নিজের আশ্রয়ের জন্য নয়, শুধু এই পাণ্ডুলিপিগুলো যত্ন করে রাখার জন্য।

কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত জঞ্জাল ভেবে সেগুলো রাখতে রাজী হয় না। ততদিনে অ্যানার শেষ বাসস্থানটুকুও চলে গেছে। এখন তিনি ফুটপাথের বাসিন্দা। সেই সময় লিপজিগের এই মাংসের দোকানদারটি, যে বাখ্ কে এক সময় চিনত গান ভালবাসত একটু আধটু, সে দয়াপরায়ণ হয়ে অ্যানার এই পাণ্ডুলিপির স্তূপ নিজের সেলারে রেখে দিতে সম্মত হল। সেই মাংসের ব্যবসায়ীর দয়াতে, তারই দোকানের পাশের ফুটপাথে কেটে যায় অ্যানার আরও দশ বছর। মাংসের ব্যবসায়ীটিই তাকে যতটুকু সম্ভব খাবার দাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। অবশেষে একদিন অ্যানা ম্যাগডালানা বাখ্-এরও মৃত্যু হয়, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৭৬০ সালে। অ্যানার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাখ্-এর যাবতীয় সঙ্গীত রচনার ওপরেও যাবনিকাপাত ঘটল। সেই যবনিকা আবার উত্তোলিত হয়েছিল তারও প্রায় একশো বছর পরে। ততদিনের লিপজিগের সেই মহান মাংসবিক্রেতা কোয়েলারের মৃত্যু হয়েছে।

লিপজিগের জিওয়ানড্‌হাউস অর্কেস্ট্রার কনডাকটার ফেলিক্স মেনডেলেসনের ঠিক ইচ্ছে ছিল না লিপজিগ শহরে আসতে। ইচ্ছে ছিল তার স্বপ্নের শহর বার্লিনের অর্কেস্ট্রাতে কাজ করা। কিন্তু স্যাক্সানির রাজ্য স্বয়ং তার নাম প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। যত্ন করে ডেকেছে লিপজিগ অর্কেস্ট্রার বোর্ড অব ট্রাষ্টি। নিয়োগপত্র পেয়ে ফেলিক্স খুব একটা খুশি হয়নি। কোথায় বার্লিন, আর কোথায় লিপজিগ। কিন্তু বউ সিসেল শুনেই কেন যেন মন্তব্য করে বলেছিল যে হয়ত স্বয়ং ঈশ্বরের ইচ্ছে যে ফেলিক্স লিপজিগেই যাক। অগত্যা ফেলিক্স কিছুদিন লিপজিগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। তারপর একটা সময়ে সিসেলির কাছে স্বীকার করে, তার নিজেরও মনে হয়েছিল যে ঈশ্বরই হয়ত তাকে জোর করে লিপজিগের দিকে ডেকে নিচ্ছেন।

এবং সেটা প্রমাণিতও হল। সেদিন ওরা একসঙ্গে ফিরছিল বাড়িতে, ধূসর সন্ধ্যা নেমে আসছে। ফেলিক্স ক্লান্ত বোধ করছিল। কিন্তু সিসেলের মাংসের দোকানটা ঘুরে যাওয়া দরকার। কয়েকমিনিটের ব্যাপার তাই ফেলিক্স আপত্তি করে না। মাংসের দোকানে তখন ভিড়। কোয়েলারের মাংস লিপজিগে খুবই বিখ্যাত। মুহূর্তের মধ্যে নিঃশব্দে মাংস কাটা হচ্ছে। কাগজ জড়িয়ে খরিদ্দারকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটা আগে বুঝি মাংস মোড়ানোর কাগজ ফুরিয়ে গেছে। মার্টিন কোয়েলারের বউ ছুটে গেছে বাড়ির ভেতরের চিলে কোঠায় রাখা কাগজের স্তূপ থেকে কিছু কাগজ নিয়ে আসতে। সিসেল দোকানে ঘুরে ঘুরে মাংস পছন্দ করছে। আর ফেলিক্স অলসমনে লক্ষ্য করছিল মার্টিন এর বউয়ের কাণ্ডকারখানা। হঠাৎ যেন ভূত দেখার মতন চমকে উঠল ফেলিক্স মেনডেলেসন। সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল ওর। সব রোমকূপগুলো যেন বিস্ফোরিত হয়ে উঠল। বিস্ফোরিত চোখে ফেলিক্সের নজর পড়ল, মার্টিন কোয়েলায়ের বউয়ের নিয়ে আসা নতুন কাগজের পাঁজাটার ওপরে। এমন হলদে হয়ে যাওয়া কাগজের পাঁজাটার একদম ওপরের কাগজটাতে লেখা রয়েছে "দি প্যাশন অফ আওয়ার লর্ড, অ্যাকর্ডিং টু সেন্ট ম্যাসু-বাই যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ।" সময়টা হল ১৮৬০ সাল।

বাখ জন্মেছিলেন জার্মানির স্যাক্সনির অঞ্চলের আইসনাখ-এর ১৬৮৫ সালের ২১শে মার্চ। যোহান অ্যারোনিয়াস বাখ আর এলিজাবেথ লামারাহার্ট-এর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান তিনি। বাবা ছিলেন আইস বাখ-এর টাউন কনসার্ট-এর যন্ত্রবাদক। বাখের বয়স যখন দশ, তখনই তার মায়ের মৃত্যু হয়, অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাবাকেও। সংসারের সব দায়িত্ব পড়ল বড়ভাই যোহান ক্রিস্টোফারের ওপর। প্রথম জীবনে সঙ্গীতের তালিম তিনি পেয়েছিলেন যোহান পাসলবেলের কাছে। চমৎকার সুরেলা কণ্ঠস্বর ছিল তার। সেই কণ্ঠস্বরের জন্যই মাত্র পনেরো বছর বয়সেই তিনি চাকরি একটা পেয়ে যান। চাকরিটা নিতে বাধ্য হন সংসারিক কারণে। তবে সঙ্গীতে রচনার শুরু সেই পনেরো বছর বয়স থেকেই।

যখন তার বয়স বছর বাইশ তখন বিয়ে করলেন, ১৭০৭ সালে পারিবারিক আত্মীয়া মেরিয়া বারবারাকে। দীর্ঘ তের বছর স্থায়ী হয়েছিল এই বিয়ে। কিন্তু ১৭২০ সালে মেরিয়া বারবারা হঠাৎ মারা যান। বড় অসহায় হয়ে পড়েন বাখ। তখন তার বয়স পয়ত্রিশ । শোকে তাপে, সঙ্গীত রচনার সৃষ্টি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লেন। মেরিয়া মারা যান ১৭২০ সালে ৭ই জুলাই। বছরখানেক পেরোতেই না পেরোতেই দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে থাকতে পারলেন না বাখ। বিয়ে করলেন অ্যানা ম্যাগডালেনাকে ১৭২১ সালে।

ইতিমধ্যে বহুবার কর্মক্ষেত্র বদল করতে হয়েছিল তাকে। নানান শহরে চাকরি করার পর অবশেষে লিপজিগে আসেন ১৭২৩ সালে। আর সেখানেই থেকে যান সাতাশ বছর আমৃত্যু।

বাখ এমন একটা সময়ে জন্মেছিলেন যখন সঙ্গীতকে সমাজে তেমন সম্মানসূচক পেশা বলে ভাবতেই পারত না কেউ। তার ফলে একদিকে যেমন মানুষ হিসেবে নিজের সম্মান আর অর্থ উপার্জনের জন্য তাকে রুখে দাঁড়াতে হত, তেমনিই আবার সঙ্গীতের সম্মান রক্ষার জন্যও তাকে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে হত। এই দুটি কাজ একালেও যেমন যেখানে চাকরি কররেছেন, জার্মানির অনেক কটি শহরেই চাকরি করেছেন তিনি, কোথাও তাকে নিয়ে তেমন অসুবিধায় পড়তে হয়নি কর্তৃপক্ষকে। তার কারণ কাজের ব্যাপারে চিরকালই বাখ ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ। খুবই বিনয়ী। আত্মসচেতন তিনি ছিলেন অবশ্যই। স্পর্শকাতরও কম নন। কিন্তু বৃহত্তর আদর্শ, সৃষ্টিশীল রচনার প্রতি একান্ত আনুগত্য কূপমণ্ডুকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করেছিল তাকে। সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তার যে অবিসংবাদী স্থান তার উপযুক্ত সবরকম গুণের কোনটারই কম ছিল না তার মধ্যে। হয়ত তার থেকেও বেশি কিছুটা ছিল। সেটা তা রোমান্টিসিজম। কিংবা দুর্দান্ত প্যাশন। জ্ঞানীর বিনয় আর অনুসন্ধান ছিল তার সহজাত। কিন্তু শত বৈরিতার মধ্যে, শত কষ্টের মধ্যেও আপোস করেছেন কদাচিত। আপনভোলা এই সম্মানিত শিল্পী উন্মাদের মতন সঙ্গীত রচনা করেছেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অক্লান্তভাবে। কিন্তু তা নিয়ে প্রচার করার মতন মানসিকতা তার একবারেই ছিল না। জীবনের সায়াহ্নে অন্ধত্ব ছিল তার অভিশাপ। চার্চ কর্তৃপক্ষ প্রথমেই তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল তার সঙ্গীত। অর্গান বাজানো তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার অর্গান। কিন্তু সেই অর্গান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

গান ভালবাসে এমন পরিবারেই জন্মেছিল বাখ। ১৭৩৫ সালে বাখ তার পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করে একটা খসড়া তৈরি করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'অরিজিন অফ দি মিউজিক্যাল ফ্যামিলি।' তবে তার পূর্বপুরুষরা সঙ্গীতের জগতে খ্যাতিমান হলেও সঙ্গীত রচনার জগতে পা বাড়াননি কখনও। বাখই প্রথম যিনি সঙ্গীত রচনা করতে অগ্রসর হন। তবে বাখের পূর্বে তার সন্তানদের মধ্যে যেমন উইনহেলস ক্রেডিম্যান, কার্ট ফিলিপ ইম্যান্নায়ন বা যোহান ক্রিষ্টিয়ান সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন তেমনিই তার আগেও তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে যোহান ক্রিস্টোফার যোহান মাইকেল আর যোহান লাউইসও খ্যাতি কম পাননি। বাখের সন্তানদের মধ্যে যোহান ক্রিষ্টিয়ানকে তো ইংলণ্ডের বাখ বলে অভিহিত করা হত।

যে আকস্মিক ও দৈব ঘটনার মধ্যে বাখ রচিত সঙ্গীতের শেষ খণ্ডটি (প্যাশন) লিপজিগের অখ্যাত এক মাংসবিক্রেতার চিলেকোঠা থেকে উদ্ধার করেছিলেন ফেলিক্স মেনডেলেসন তার রূপায়ণের গল্পটিও চমকপ্রদ। মৃত্যুশয্যায় ফেলিক্স বলেছিলেন, যদি আমার গানের শেষ রেশটুকুর হিসাবটিও কালের গতিতে মুছেও যায়, ভবিষ্যতের মানব সভ্যতাকে আমাকে মনে করে রাখতেই হবে। তার কারণ আমি জেকব লাডউইড ফেলিক্স মেনডেলেসন একজন ইহুদি-(আমি খ্রিস্টানদের তাদের সবচাইতে সার্থক সঙ্গীত উপহার দিতে সমর্থ হয়েছিলাম) ফেলিক্স-জীবনে বাখ এর প্যাশন সঙ্গীতে রূপান্তরিত করতে যে সংগ্রাম, বা কৃচ্ছ্রসাধনা, বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল তার ভাবতেও বিস্মিত হতে হয়। সেই গান গাহিবার ব্যবস্থা করার বিরুদ্ধে বাধা এসেছিল সমাজের সর্বস্তর থেকে। মূলত ইহুদিদের দিক থেকেই বেশি। মজার কথা হল সেই গান প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল সঙ্গীতবিশারদ, সঙ্গীতশিল্পীদের নিয়ে নয়, করতে হয়েছিল চারশোজন অখ্যাত চাষী অনুচরদের নিয়ে। এমনকি সেই কাজ করতে বাধা এসেছিল বিস্তর। কিন্তু বাখ-এর সেই গান ঠেকানো যায়নি। তারপর থেকে সেই গান যেই শুনেছে পৃথিবীর একপ্রান্তে থেকে অন্যপ্রান্তের যে কোনও মানুষ সেই মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বারবার শুনতে চেয়েছে সেই গান। এখন আর বাখকে ভাল লাগা মন্দ লাগার প্রশ্ন পৃথিবীতে নেই। বাখ এখন একটি অভিজ্ঞতা একটা অবশেসন, যে একবার শুনেছে তার আর পরিত্রাণ নেই সেই মুগ্ধ মূর্চ্ছনায় হারিয়ে যাওয়া ছাড়া।

বাখ মারা গেলেন। সংগ্রামের একটা অধ্যায় সম্পূর্ণ হল। মৃত্যুর সময়ে তার শেষ কথা ছিল হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সেন্ট জন কবরখানায় তাকে সমাহিত করা হল। কয়েকবছর পর একটা নতুন রাস্তা তৈরি করার প্রয়োজনে সেই কবরখানা গেল ভেঙে। সেই ডামাডোলে বাখ-এর সমাধিটিও সরানো হল। আর সেটা হারিয়েও গেল চিরতরে, আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মানুষের মন থেকে দূরে থেকেও ভোলেননি তাকে ঈশ্বর যার কাছে তিনি সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে এবং তার সৃষ্ট সঙ্গীতের অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলি।

জন. এফ. কেনেডি

[১৯১৭-১৯৬৩]

আজ পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়টি পরিবার শিক্ষায়, দীক্ষায়, ত্যাগে, আভিজাত্যে, অর্থকৌলিন্যে ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় বিশ্ববিশ্রুত, তাদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ নন্দিত প্রেসিডেন্ট কেনেডির পরিবার অন্যতম। রুজভেল্ট, চার্চিল, দ্যাগল, নেহেরু, বন্দরনায়েক ইত্যাদি পরিবারের সাথে সমভাবে সমমর্যাদায় বিশ্বখ্যাত আরও একটি পরিবার নাম কেনেডি পরিবার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে তরুণতম, উচ্চশিক্ষিত, রুচিশীল ও প্রগতিশীল পরিবার কেনেডি পরিবার। জাতিতে ক্যাথলিক হলেও প্রটেস্টান্ট চার্চের প্রবল প্রতিপত্তি সত্ত্বেও কেনেডি পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিল্প প্রসারেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগের প্রতিযোগিতায় অসাধারণভাবে সফল এক পরিবার। বিদ্যাবত্ত, প্রগতিশীলতা ও আভিজাত্য এক অসাধারণ জনপ্রিয়তা দান করে এই পরিবারকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত এক শহরের শহরতলীতে বোস্টনের ব্রুকলিনে ফিটজিরাল্ড কেনেডির জন্ম। ১৯১৭ সালের ২৯শে মে জন কেনেডি জন্মগ্রহণ করেন। আয়ারল্যাণ্ডের অত্যন্ত রক্ষণশীল ক্যাথলিক পরিবারের মানুষ তার পিতামহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন আলুর ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকে পাথেয় করে। আর কেনেডি সাহেবের পিতা পারিবারিক বিত্তসম্পদকে অসাধারণ নিষ্ঠায় বৃদ্ধি করেন বেশ কয়েকগুণ। আলুর ব্যবসা ও চাষ আবাদ ছেড়ে তেলের খনির সন্ধানে সফল অভিযান চালিয়েও এই পরিবার আর্থিক দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ স্থানীয়দের অন্যতম হয়ে ওঠেন। ফলে প্রেসিডেন্ট কেনেডির পড়াশুনা দু'পুরুষ ধরেই চলে হার্ভাড, কেমব্রিজ ইত্যাদি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিতা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে ইউরোপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন দেশের কাজে। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল যে তাঁর প্রথম পুত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি হবেন। কিন্তু প্রথম পুত্র যোশেফ দ্বিতীয় মহযুদ্ধে যোগদান করে অল্প বয়সে বিমান যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পুত্রও তখন মার্কিন নৌবহরে নিয়োজিত হয়ে হনলুলুর কাছে জাপানী বোমার আক্রমণে বিধ্বস্ত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থান করছেন। মোকাবিলা করছেন জাপানী আক্রমণের। বেশ কয়েকদিন উপকূলের জল আর জলের মধ্যে থেকে কেনেডি আক্রান্ত হলেন ম্যালিরিয়ায়। এর পর ম্যালিরিয়ায় আক্রান্ত ক্লান্ত সৈনিক কেনেডি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নৌবহর থেকে দেশে ফিরতে বাধ্য হলেন শারীরিক অসুস্থতার কারণে। মার্কিন জনজীবনে কেনেডি পরিবারের অবদান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালেই অনুভূত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ভাইয়ের রাজনৈতিক জীবনের উত্তারাধিকারের গুরুদায়িত্ব বর্তায় জন কেনেডির উপর। আসলে কেনেডির ইচ্ছা ছিল ভাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবেন আর তিনি হবেন বিখ্যাত লেখক। বাল্যকাল থেকেই কেনেডি ভাবুক প্রকৃতির আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। তাই রাজনীতির প্যাঁচ পয়জার তাঁর জন্য নয়। তিনি লেখক ও সাহিত্যিক হবেন এই আশায় নিজেকে গড়ে তোলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলে অনেক পরিবারের ন্যায় কেনেডি পরিবারেও অনেক পরিবর্তন এল। জন কেনেডি অত্যন্ত আস্তে আস্তে কিছুটা পিতার অনুপ্রেরণায় কিছুটা সামাজিক সচেতনতার তাড়নায় জনজীবনের সাথে যুক্ত হলেন। জন ফিটজিরলাণ্ড কেনেডি নির্বাচিত হলেন সিনেটে। অল্প বয়সে সিনেটে প্রবেশ করেই নানা বিষয়ে অসাধারণ বাগ্মীতায় সারা দেশকে চমকিত করলেন। কেনেডি সিনেটর হিসাবে অদ্বিতীয়, সমাজসেবী হিসাবে অসাধারণ জননায়ক হিসাবে অবিসংবাদিত, দূরদৃষ্টি, সম্পন্ন উদারচেতা বিদগ্ধ কেনেডি বিবাহ করেন এক খ্যাতনামা পরিবারের সুন্দরী কন্যাকে। পরবর্তী দশকে জাকুলিন কেনেডি নামে এই বিদগ্ধা নারী বিশ্বখ্যাতি ও অখ্যাতি লাভ করেন, অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে সিনেটর থেকে প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হন। বিপুল ভোটে অত্যন্ত কম বয়সে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এক অতি শক্তিশালী, শক্তিধর দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির প্রেক্ষাপটে এক অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেন। সিনেটর হিসাবে কিছুকাল হাসপাতালে বাস করে চিকিৎসার প্রয়োজনে হাসপাতালে থাকার সময় Profiles in Courage নামে গ্রন্থটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেনেডিকে সফল লেখক হিসাবে যতখানি পরিচিত দেয় তার থেকেও বেশি পরিচিত দেয় রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর জন্মগত বুৎপত্তির প্রকাশ প্রদর্শনে। তিনি এই গ্রন্থে বিগত কয়েকজন প্রেসিডেন্টের কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে

খোলাখুলি আলোচনা সমালোচনা করেন। বিদ্বান, সংস্কৃতি সম্পন্ন, রুচিশীল পরিবার হিসাবে কেনেডি পরিবার দুই পুরুষ ধরেই পরিচিত। এছাড়া ক্যাথালিক হওয়ার সুবাদে তাদের পারিবারিক রক্ষণশীলতাও মূল্যবাধের রাজনীতি প্রচারে কেনেডিকে যথেষ্ট প্রেরণা দেয়। কেনেডি প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনায় পুষ্ট হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে যে সব বক্তৃতা দান করেন তা পরবর্তীকালে তার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পথ সুগম করে তোলে। তাঁর মেধা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা ও দূরদর্শীতা তাকে শীর্ষ স্থানীয় রাষ্ট্রীয় প্রধানদের কাছের মানুষ, শ্রদ্ধার মানুষ, স্নেহের মানুষ করে তোলে। কেনেডি ডেমক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসাবে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। সারা বিশ্বে কেনেডির এই নির্বাচন রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের কাছে এক অসাধারণ মহিমান্বিত এক ঘটনা। কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শুধু পাশ্চাত্য জগৎ নয় প্রাচ্য ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট করেন। কেনেডির আবির্ভাবে ইউরোপে যে অস্থিরতা, স্নায়ুযুদ্ধের মহড়া তা কিছুটা প্রশমিত হয়। প্রেসিডেন্ট কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হয়ে প্রথমেই ঘোষণা করলেন যে জেট প্লেনের যুগে পৃথিবীর নানা প্রান্ত দূরত্ব হারিয়ে ফেলেছে। বিশ্ব বড্ড ছোটো হয়ে গেছে। আমরা একই বিশ্বের নাগরিক। আফ্রিকা, এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম ইউরোপ কোন দেশই বিশ্বের দরবারে একা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিশ্বের অগণিত উন্নত, অনুন্নত হত দরিদ্র দেশের একজন সহমর্মী সহ অবস্থানকারী। বিচ্ছিন্নভাবে পৃথিবীতে কোন ধনী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষেও একা থাকা সম্ভব নয়। মার্কিন দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবস্থানে রুজভেল্টের মৃত্যুর পর যে "মুনরো ডকট্রিন" মুখীনবাদী জন জাগরণ তা তিনি কয়েকটি বক্তৃতায় সমালোচনা করে শেষ করে দেন। মুনরোনীতি আমেরিকাকে বিশ্ব রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তিনি ঘোষাণা করেন আমরা বিশ্বের সকল দেশের সুখ ও দুঃখের অংশীদার। আমাদের দায়িত্ব আগামী পৃথিবীকে যুদ্ধের বিষ বাষ্প থেকে মুক্ত করা। আর সমস্ত প্রকার বঞ্চনা, বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বে এক শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা।

১৯৫৮ সালে অত্যন্ত কম বয়সে তিনি চতুর্থ বারের জন্য সিনেটর নির্বাচিত হন বিপুল ভোটে। আর এই জয় থেকেই সকলেই বুঝতে পারেন এই প্রখ্যাত সিনেটর অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনায় অবতীর্ণ হবেন। ১৯৬০ সালে সিনেটর কেনেডি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হলেন বিপুল ভোটে ডেমক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসাবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে সাথে নিলেন প্রাক্তন বিদ্যালয় শিক্ষক লিঙ্কন জনসনকে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেনেডির বক্তৃতাবলী লিঙ্কনের বক্তৃতার সমমর্যাদা তারে বেতারে সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দূরতম প্রান্তে ধ্বনিত হয়। তিনি সকলের জন্য সমঅধিকার ঘোষণা করেনঃ–মার্কিন দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতিগুলি রিপাবলিকান দলের মাধ্যমে যে ভাবে অনুসৃত হয়েছে আগামী প্রজন্মের বিশ্ববাসীর কাছে, মার্কিনবাসীর কাছে তা কখনই গ্রহণীয় নয়। গণনীতি গণতান্ত্রিক ও রিপাবলিকান দলের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বদলে প্রগতিশীল নীতি তিনি অনুসরণ করেন। তিনি বললেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এক উন্নত দেশের পররাষ্ট্রনীতি ও অভ্যন্তরীন নীতি আরও প্রগতিশীল জনমুখী ও গণমুখী হওয়া দরকার। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন বিপুল ভোটে, যা নিশ্চিতভাবেই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তিনি নির্বাচিত হওয়ার পরই ঘোষণা করলেন আমরা এক নতুন বিশ্বে অগণিত সমস্যা পীড়িত মানুষের সাথে বাস করছি। বিশ্বের সকল দেশের সমস্যার প্রতি উদাসীন থেকে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি, সুস্থিতি ও শান্তি সম্ভব নয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য তাড়িত বিশ্ব আমাদের সকলের শান্তি বিঘ্নিত করবে। তাই আমরা সকলে মিলে সকলের উন্নয়নের জন্য, মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হব। দূর করব দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, কুসংস্কার আর বৈষম্য। কেবল তাঁর চিন্তা চেতনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যই নয় তার চিন্তা ভাবনা বিশ্ববাসীর জন্যও। অগণিত বিশ্বমানবতার আর্তক্রন্দন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরের, পরের দশকেও তাঁকে পীড়িত করেছে, ভাবিত করেছে। "সকলের তরে সকলের আমরা প্রত্যেক আমরা পরের তরে" তাঁর জীবনবেদ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে কেনেডি তাঁর মন্ত্রিসভায় প্রখ্যাত পণ্ডিত, খ্যাতনাম বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রদূত হিসাবেও প্রেরণ করেন প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিদের। বুদ্ধিজীবি, পণ্ডিত ও স্পেশালিস্টদের নিয়ে তার মন্ত্রী পরিষদ তৈরি হল। স্টিভেনশনের ন্যায় সুপণ্ডিত জাতিসংঘে মার্কিন প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত হলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ডিন রাস্ক মনোনীত হলেন বিদেশ মন্ত্রীর পদে। তাঁর প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ভ্রাতা রবার্ট কেনেডি ভ্রাতা রবার্ট কেনেডি মনোনীত হলেন অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বপূর্ণ পদে। কেনেডে বয়সে তরুণ হলেও সিনেটার

হিসাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার ও সুনামের অধিকারী ছিলেন। কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবীন প্রজন্মের জাগ্রত প্রতীক। মাত্র পৌনে তিন বছরের প্রেসিডেন্ট থাকাকালেই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল সমস্যার প্রতি নিজেও দৃষ্টি দান করেন এবং মার্কিন জনগণের দৃষ্টি সেধারেই নিবিদ্ধ করেন।

তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতির বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় Civil Rights Bill এর যথাযোগ্য রচনায়, প্রয়োগে ও প্রকাশে। নিগ্রোজাতীর কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে শ্বেতাঙ্গদের সাথে সমভাবে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে তিনি লিঙ্কনের ন্যায় অক্ষয় কৃর্তি স্থাপন করেন। মার্কিন সমাজে বর্ণবৈষ্যমের যে দুষ্ট ক্ষত যুগ যুগ ধরে মার্কিন জনজীবনকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে তার মূলোচ্ছেদ ঘটান। আর আন্তর্জাতিক নীতির বলিষ্ঠতা প্রদর্শনে সোভিয়েট দেশের সাথে সহ অবস্থানে বিশ্বাস ঘোষণা করেন। তবে কিউবায় সোভিয়েট রণতরীর আগমনকে সম্মুখ সমরে আহ্বান জানিয়ে যে সাহস ও রাজনৈতিক দৃঢ়তার পরিচয় তিনি দেন তা নিঃসন্দেহে তাকে বিশ্ববাসীর কাছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগণিত মানুষের কাছে নতুন মহাদেশের অগণিত মহাদেশবাসীর কাছে তাঁকে এক সুযোগ্য সাহসী রাষ্ট্রপতির মর্যাদা দান করে। বৈদেশিক নীতিতে কেনেডি ছিলেন। Friendship For Progress-এর পক্ষপাতি। পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিষ বাষ্প থেকে বিশ্বকে অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নে হাত প্রসারিত করতে জাতিসংঘের নানা সংস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল অপরিসীম। সকলের জন্য সমান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ও সফল আইন প্রনয়ণের রূপকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি মাত্র আড়াই বা তিন বছরের রাজনৈতিক ক্ষমতায় যা করেছেন তা তছার দূরদৃষ্টির দ্যেতনা ঘোষণা করেছে। নিগ্রোদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ভিতরেই যে শক্তিশালী সুসংহত সমৃদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভরশীল এই কথার সারবত্তা তিনি আজ থেকে অন্ততঃ তিন দশক পূর্বের মার্কিন জনগণকে সফল ভাবে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করে যেমন আব্রাহাম লিঙ্কন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। সিভিল রাইটস্ বিল পাশ করেও কার্যকরী করতে গিয়েই দক্ষিণের এক স্কুলের দরজা কৃষ্ণাঙ্গ ভাই বোনদের; কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের জন্য খুলতে গিয়ে আততায়ীর গুলিতে এই মহান নায়ক কেনেডির জীবন অবসান হয়। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অগণিত মানুষই নয় সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ স্তব্ধ বিস্ময়ে তারে বেতারে শুনলেন মর্মাহত হলেন, শোকস্তব্ধ হলেন শুনে, যে লিঙ্কনের ন্যায় আর এক মহান প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণাঙ্গ ভাইদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ঘাতকের গুলিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন। দ্বিতীয় লিঙ্কন হয়েই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন প্রতি মমতায় আব্রাহাম লিঙ্কনের উত্তরসূরী হিসাবে তাঁর সৎ সাহসী ভূমিকা বিশ্ববাসীর কাছে জন ফিটজিরাল্ড কেনেডিকে এক যুগবতার, যুগযন্ত্রণার মুক্তির প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্বের দরবারে যে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে আসীন তা কেনেডির দূরদৃষ্টির ফল। সাফল্যের উজ্জ্বল ধারার প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করছে। কেনেডি তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে অনুভব করেছিলেন যে বিশ্বনেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সফল ভূমিকার পথে প্রধান বাধা নিজ দেশের বর্ণবৈষম্য। আর জীবনের বিনিময়ে তিনি তা দূর করে গেছেন।

৭৩

গ্যালিলিও গ্যালিলাই

[১৫৬৪-১৬৪২]

গ্যালিলিও গ্যালিলাই, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ। গ্যালিলিওর জন্ম ইতালির পিসা শহরে। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। কিন্তু সঙ্গীত ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তার ছিল গ ভীর ভালবাসা। গ্যালিলিওর মা ছিলেন উগ্র স্বভাবের মহিলা। সামান্য ব্যাপারেই অন্যের প্রতি রাগ আর বিদ্রূপে ফেটে পড়তেন। পিতার অনিচ্ছা সত্বেও অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ তাঁকে পরিণত করেছিল এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীতে। অন্যদিকে নিজের উগ্র স্বভাব ও সহনশীলতার অভাবের জন্য চারপাশে গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য শত্রু যা তাঁর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের জন্য আংশিক দায়ী।

ছেলেবেলা থেকেই গ্যালিলিওর মধ্যে প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। বিচিত্র বিষয়ের প্রতি তাঁর ছিল কৌতূহল। Vallombrosa—র ধর্মীয় পড়তে পড়তে সেখানকার ধর্মীয় শিক্ষকদের প্রভাবে তিনি স্থির করলেন যাজকের পথই জীবনে গ্রহণ করবেন।

যখন সময় পান পুঁথিপত্র নিয়ে বসেন। বিশেষ করে অঙ্ক। এক এক সময় অঙ্ক কষতে কষতে ব্যবসার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন।

গ্যালিলিওর বাবা তাঁর এই পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন যে পথে নিশ্চিত অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে, তাতেই ছেলেকে ভর্তি করবেন। গ্যালিলিওর ইচ্ছা ছিল অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করা। পিতার আদেশে ডাক্তারি পড়ার জন্য তিনি ভর্তি হলেন পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষকদের প্রতিটি কথাকেই তিনি ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে পারলেন না। প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষকদের নানান বিষয়ে প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলতেন। কিন্তু তাতেও তাঁর মন সন্তুষ্ট হল না। নিজের ছোট্ট ঘরে গড়ে তুললেন একটা পরীক্ষাগার। অতীতের প্রতিটি ধ্যান-ধারণাকে বিচার করতেন, বিশ্লেষণ করে দেখতেন তার মধ্যে কতটা সত্য আর কতটুকু মিথ্যে।

এই সময় গ্যালিলিও পরিচিত হলেন তার পিতার বন্ধু রিচির সাথে। রিচি ছিলেন ইতালির রাজপরিবারের অঙ্কের শিক্ষক। গ্যালিলিও তখন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, বয়স ১৯। একদিন গ্যালিলিও রিচির বাড়িতে গিয়েছেন, রিচি তখন তার ঘরের মধ্যে ছাত্রদের ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়াচ্ছিলেন। গ্যালিলিও ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে শুনতে লাগলেন তার বক্তৃতা। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন। নতুন করে আবার তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল অঙ্কের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ।

ডাক্তারি বই-এর মধ্যে লুকিয়ে রেখে পড়তে আরম্ভ করলেন ইউক্লিড আর্কিমিডিস। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন রিচি। ডাক্তারিতে আর মন নেই, দিন-রাত চলতে লাগল অঙ্কের চর্চা। এই সময় তাঁর জীবনে ঘটল একটি বিখ্যাত ঘটনা।

একদিন তিনি আরো অনেকের সাথে পিসার ক্যাথিড্রালে বসে প্রার্থনা করছিলেন।সেই ক্যাথিড্রালের মাঝখানে ছিল একটা বিরাট ঝাড়লণ্ঠন। একজন কর্মচারী তাতে প্রদীপ জ্বালাবার সময় অন্যমনস্কভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রতিবার ঝাড়লণ্ঠন দোলবার সাথে সাথে তার ঘর্ষণের আওয়াজ হতে থাকে। গ্যালিলিও লক্ষ্য করলেন ক্রমশই ঝাড়লণ্ঠন দুলুনি কমে আসছে। কিন্তু প্রতিটি দুলুনির সাথে সাথে যে ঘর্ষণের আওয়াজ হচ্ছে, তার গতি এক রয়ে গিয়েছে। ডাক্তাররা যে ভাবে নাড়ী দেখে সেই ভাবে একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন ঝাড়লণ্ঠনের দোলন। ক্রমশই তিনি উপলব্ধি করলেন ঝাড়লণ্ঠনের দোলানির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ছন্দ আছে। এর থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন পেন্ডুলাম। গ্যালিলিওর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে এই নক্সা দেখে তৈরি করেছিলেন পেন্ডুলাম ঘড়ি।

বাধ্য হয়েই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হল আর তাঁর ডাক্তারি ডিগ্রী নেওয়া হল না। তিনি ফিরে এলেন ফ্লোরেন্সে।

এবার আর ডাক্তারী পরক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চিন্তা নেই। শুরু হল পদার্থবিদ্যা আর অঙ্কশাস্ত্রের গভীর অনুশীলন। যেমন নিষ্ঠা করতে লাগলেন যদি কোথাও অধ্যাপনার চাকরি পাওয়া যায়। এই সময়ে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের শিক্ষকের একটি পদ খালি ছিল। মাইনে মাত্র কুড়ি শিলিং। তবুও সানন্দে সেই পদ গ্রহণ করলেন গ্যালিলিও। তখন তিনি পঁচিশ বছরের এক তরুণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় পা রাখতেই গ্যালিলিও দেখলেন যে দিকেই তাকান শুধু অ্যারিস্টটল আর অ্যারিস্টটল। তিনি যা কিছু বলে গিয়েছেন তাই সত্য, তাকে নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু গ্যালিলিও তাঁর অনেক কিছুই মানতে পারলেন না।

অনেকে তাঁকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করল, অনেকে তাঁর স্পর্ধা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "দুটি জিনিসকে উপর থেকে একই সঙ্গে ফেললে ভারী জিনিসটি আগে পড়বে, হালকা জিনিসটি পরে মাটি স্পর্শ করবে"—অ্যারিস্টটলের এই তথ্য ভুল। প্রকৃতপক্ষে দুটি জিনিস একই সঙ্গে পড়বে।

গ্যালিলিও বললেন, আমি সকলের সামনে প্রমাণ করব আমার বক্তব্যের সত্যতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, শহরের সমস্ত জ্ঞানী-গুণী মানুষদের সাথে নিয়ে গ্যালিলিও এলেন পিসার খ্যাতি হেলানো টাওয়ারের সামনে। কয়েকজনকে নিয়ে তিনি উঠে গেলেন টাওয়ারে মাথায়। এক হাতে দশ পাউন্ডের বল অন্য হাতে এক পাউন্ডের বল একই সাথে মাটি স্পর্শ করল। গ্যালিলিওর সিদ্ধান্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হল। তবুও অনেকে মানতে পারলেন না। তারা প্রচার করতে লাগলেন এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কারসাজি ছিল।

পিসার ডিউকের পুত্র রাজকুমার ডন জিওভান্নি ছিলেন ইনজিনিয়ার। তিনি একটা যন্ত্র তৈরি

করেছিলেন স্থানীয় বন্দরের পলি পরিষ্কার করবার জন্য। ডিউক যন্ত্রটি পরীক্ষার জন্য গ্যালিলিওর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সব দেখে শুনে গ্যালিলিও বললেন যন্ত্রটি কাজের অনুপযুক্ত। জিওভান্নি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। অন্য সকলের সাথে তিনিও চাইলেন গ্যালিলিওর বিতাড়ন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হলেও গ্যালিলিও।

গ্যালিলিওর কয়েকজন বন্ধু অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের সাহায্যে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক পদ পেলেন (১৫৯২) মাইনে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। সবচেয়ে বড় কথা এখানে তিনি পেলেন বিদ্যাচর্চার আদর্শ পরিবেশ। এখানে গ্যালিলিও শুরু করলেন তাঁর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনা করলেন একাধিক প্রবন্ধ। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল সমস্ত ইউরোপে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর মাইনে আরো বাড়িয়ে দিলেন। ছাত্রদের ভিড় সামলাবার জন্য তিনি বিরাট একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন।

মাঝে মাঝে সব ছেড়ে দিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতেন শহরের উপকণ্ঠে সমাজ পরিত্যক্তা এক রমণীর কাছে। তার নাম মারিনা গাম্বা। কিছুদিন পর তাকে নিজের গৃহে নিয়ে আসেন। যদিও তখনো মারিনাকে তিনি বিবাহ করেননি তবুও উত্তরকালে তার গর্ভে গ্যালিলিওর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল।

এই সময় নানান যন্ত্রপাতি তৈরি করলেন। প্রথমে কম্পাস, এর মধ্যে দিয়ে বোঝালেন পৃথিবীর চুম্বকত্ব শক্তির কথা। তারপর পানি উত্তোলনের জন্য উন্নত ধরনের লিভার। বাতাসের উত্তাপ পরিমাপ করবার জন্য থার্মোমিটার। এই সমস্ত যন্ত্রপাতির ক্রমশই এত চাহিদা বাড়তে থাকে. তিনি বাড়িতে লোক রাখলেন তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। এই সব আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁর মাইনে আরো বাড়িয়ে দিল কিন্তু তবুও তাঁর অভাব দূর হল না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়ে মনোনিবেশ শুরু করেন ১৬০৪ সাল থেকে। এই সময় আকাশে একটি নতুন তারা দেখা গেল। বিভিন্ন লোকের মধ্যে আলোচনা শুরু হল, কেউ বললেন উল্কা, কেউ বললেন নতুন কোন তারা।

গ্যালিলিও কয়েকদিন পর্যবেক্ষণ করে সর্বসমক্ষে তার মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, এটি কোন গ্রহ নয়, উল্কাও নয়, সৌরমন্ডলে অবস্থিত নিতান্তই একটি তারা। তার এই বক্তৃতা শুনতে দলে দলে লোক এসে হাজির হল।

এরপর তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর। তার সাথে লিখতে লাগলেন গতিতত্ত্ব, বিশ্ব প্রকৃতি, শব্দ আলো রং প্রভৃতি নানান বিষয়ের উপর রচনা।

১৬০৯ সাল। চারধারে গুজব শোনা গেল একজন ডাচ চশমার দোকানের কর্মচারী কাজ করতে করতে এমন একটা জিনিস আবিস্কার করেছে যা দিয়ে নাকি অনেক দূরের জিনিস দেখা যায়। গ্যালিলিও কথাটি শুনলেন। শুরু হল চিন্তা-ভাবনা। নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর একটি ফাঁকা নলের মধ্যে একটি উত্তল ও একটি অবতল লেন্সকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসাতেই দেখতে পেলেন বহু দূরের বাড়িটি মনে হচ্ছে কয়েক হাতের মধ্যে এসে গিয়েছে। আবিষ্কৃত হল টেলিস্কোপ।

অবশেষে ১৬০৯ সালের ২১শে আগস্ট তিনি সর্বসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য টেলিস্কোপ নিয়ে গেলেন ভেনিসের এক উঁচু বাড়ির মাথায়। লোকেরা বিস্ময়ে দেখতে লাগল দু মাইল দূরের সমুদ্র, তাতে ভেসে চলা জাহাজ। আরো দূরের পাহাড়। রাতের আকাশে বড় বড় তারা। চারদিকে আলোড়ন পড়ে গেল। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কৃতিত্বকে সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁকে আজীবন অধ্যাপক পদ দিলেন।

চারদিক থেকে টেলিস্কোপ তৈরির অর্ডার আসতে লাগল। তিনি বাড়িতে কারখানা করে প্রায় ১০০টির মত টেলিস্কোপ তৈরি করলেন। নিজের জন্য তৈরি করলেন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একটি টেলিস্কোপ। আকারে আয়তনে এই টেলিস্কোপ অন্য সব টেলিস্কোপের চেয়ে বড়।

বিরাট সেই টেলিস্কোপ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গ্যালিলিও পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করলেন সমস্ত আকাশ। তিনি বললেন চাঁদ একটি উপগ্রহ। তার মধ্যে রয়েছে, ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড় আর গিরিখাদ।

তিনি আবিষ্কার করলেন শনির বলয়। জুপিটারের উপগ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহপুঞ্জ। এই পর্যবেক্ষণ আর আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে তিনি রচনা করলেন প্রথম বই SIDERUS NUNCIUS (The messenger).

গ্যালিলিওর বহু আগেই ১৫৪৩ সালে পোলান্ডের মহান জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাতে লিখেছিলেন সূর্য স্থির এবং তাকে কেন্দ্র করেই এই পৃথিবী ও অন্য গ্রহণ আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের ভয়ে এই বই তিনি জীবিতকালে প্রকাশ করতে পারেন নি।

১৬১১ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন সূর্যের উপরে কিছু চিহ্ন। তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধু ও অনুরাগীর কাছে তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রথমে প্রকাশ করলেন, কোপার্নিকাসের মতের সমর্থনের প্রকাশ করলেন তাঁর যুক্তি ও অভিমত। ক্রমশই তার সেই ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল তাঁর শত্রুর সংখ্যা। যে সমস্ত অধ্যাপকরা এতদিন অ্যারিস্টটলের মতের বিশ্বাসী ছিল তাদের মনে হল নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বুঝি এইবার ধ্বংস হয়ে যায়। এইবার গ্যালিলিও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের কাছে ডেকে প্রথমে তাদের প্রতিটি যুক্তি অভিমত শুনতেন তারপর সামান্য কয়েকটি কথায় তাদের সমস্ত যুক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতেন। বন্ধুরা অনুভব করতে পারছিলেন গ্যালিলিওর বিপদের দিন ঘনিয়ে আসছে। তারা বারংবার তাকে সাবধান করতে থাকে। কিন্তু গ্যালিলিও কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না।

গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতেই ইনইকুইজিশানের পক্ষ থেকে গ্যালিলিওকে ডেকে পাঠনো হল।

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৬১৬ সালে গ্যালিলিও বিচারকদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁকে আদেশ দেওয়া হল তিনি সূর্য ও পৃথিবীর সম্বন্ধে যে সব কথা প্রচার করেছেন তা ধর্মবিরুদ্ধে সুতরাং তিনি এই সম্বন্ধে আর কোন বই লিখতে পারবেন না। কোন মত প্রকাশ করতে পারবেন না। এই আদেশ অমান্য করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

তিনি জানতেন কি ভয়ঙ্কর শাস্তির বোঝা নেমে আসবে তার উপর। গ্যালিলিও তাই অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করে সমস্ত আদেশ মেনে নিলেন।

অপমানিত লাঞ্ছিত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফ্লোরেন্সে নিজের পরিবারে ফিরে এলেন গ্যালিলিও। গোপনে পুনরায় শুরু করলেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কেউ তাঁর কোন সংবাদই জানতে পারল না।

দীর্ঘ পনেরো বছর পর তিনি রচনা করলেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ। 'বিশ্বের প্রধান দুটি নিয়ম সম্বন্ধে কথোপকথন।'

গ্যালিলিও রোমে গিয়ে পোপের কাছে তা প্রকাশ করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পোপ কিছু নির্দিষ্ট শর্তে তা প্রকাশ করবার অনুমতি দিলেন।

বইটিতে তিনটি চরিত্র। একজন কোপারনিকাসের মতকে সমর্থন করেছেন, আর একজন টলোমির সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আর তৃতীয়জন নিরপেক্ষ। প্রথম চরিত্রটি গ্যালিলিওর প্রতিচ্ছায়া। দ্বিতীয় ব্যক্তি সিমপ্লিসিও কিছুটা মজার আর বোকা ধরনের লোক।

১৬৩২ সালে বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিছুদিনের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। পণ্ডিতদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হল। অপরদিকে ধর্মীয় সম্প্রদায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তাদের মনে হল ১৬১৬ সালের নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে এই বই রচনা করেছেন গ্যালিলিও মজার চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন।

সাথে সাথে বইয়ের প্রচার বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। বইটির সম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হল। কমিটি সব কিছু বিচার করে রায় দিল গ্যালিলিও পূর্বের নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে এই বই রচনা করেছেন।

রোমে বিচারসভায় উপস্থিত হবার জন্য গ্যালিলিওকে আদেশ দেওয়া হল। গ্যালিলিও তখন সত্তর বছরের বৃদ্ধ। বাধ্য হয়ে ১৬৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি রোমে এসে হাজির হলেন। দীর্ঘ চার মাস অন্তরীণ থাকার পর ১৬৩৩ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি প্রথম ইনকুইজিশানের সামনে উপস্থিত হলেন। ৩০শে এপ্রিল তিনি দ্বিতীয়বার কোর্টের সামনে এসে হাজির হলেন। কথোপকথন বইটি সম্বন্ধে তাকে জেরা করা হল। তিনি ভয়ে বই-এর কিছু অংশ পরিবর্তন করতে চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু পরিবর্তন করার পরও বিচারকরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। জুন মাসের ১৬ তারিখ পোপের সভাপতিত্বে সভা বসল, এতে ঠিক হল যদি গ্যালিলিও তার অপরাধ স্বীকার না করেন তবে তাঁর উপর অত্যাচার করা হবে।

২১তারিখে তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। শুরু হল তাঁর উপর অত্যাচার। গ্যালিলিও তাঁর শারীরিক মানসিক সব শক্তি হারিয়ে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত সব অভিযোগ স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দিলেন।

২২ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে ১৬১৬ সালের নির্দেশ লঙ্ঘন করার জন্য এবং ধর্মবিরুদ্ধ মত প্রকাশ করার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হল। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দীত্বের আদেশ দেওয়া হল। নির্দেশ দেওয়া হল ভবিষ্যতে তিনি আর কোন বই রচনা করতে পারবেন না।

ডিসেম্বর মাসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

অবশেষে তার গ্রাম Arcetry-তে যাবার অনুমতি দেওয়া হল। অসুস্থ শরীরে নতুন উদ্যমে তিনি আবার কাজ শুরু করলেন। এবার সম্পূর্ণ গোপনে রচনা করলেন "দুটি নতুন বিজ্ঞানের বিষয়ে কথোপকথন"। এই বই-এর মধ্যে তিনি তাঁর আগেকার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন, সেই সঙ্গে বলবিদ্যার মূল তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। আইজাক নিউটন পরবর্তী কালে বলবিদ্যার যে সমস্ত সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, গ্যালিলিও তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— এই বই ইতালিতে প্রকাশ করবার সাহস হয় না। গোপনে তিনি পাঠিয়ে দিলেন হল্যান্ডে। সেখান থেকে ১৬৩৮ সালে প্রকাশিত হল তাঁর এই অমূল্য সৃষ্টি।

কিন্তু নিজের সৃষ্টি ছাপা অবস্থায় দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। ক্রমশই তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেলেন গ্যালিলিও।

জীবনের শেষ পাঁচ বছর তিনি অন্ধ অবস্থায় কাটান। এই সময় তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে ফ্লোরেন্সে যেতে দেওয়া হল। কিছু বাধা-নিষেধ শিথিল করা হল। ইউরোপের অনেক দেশ থেকেই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা তাঁর কাছে, আসতে আরম্ভ করল। গ্যালিলিও তখন অসুস্থ, বিছানায় শয্যাশায়ী। জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর কাছে এলেন আঠারো বছরের তরুণ ছাত্র ভিভানি। গ্যালিলিওর প্রথম জীবনীকার। তিনি সেবা-যত্নে গ্যালিলিওর শেষ দিনগুলি ভরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৬৪২ সালের জানুয়ারি মাসে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি দু হাতে আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা "The law of Montion"। যা তাঁর মৃত্যুর স্থিতিকে অতিক্রম করে পৌঁছে দিয়েছিল জীবনের অনন্ত পতিতে।

৭৪

হো চি মিন

[১৮৯০-১৯৬৯]

সকলে তাঁকে ডাকে 'আঙ্কেল' বলে। রোগা পাতলা চেহারা, মুখে সামান্য দাড়ি। পরনে সাদাসিদে পোশাক। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই কি অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর তেজ লুকিয়ে আছে মানুষটির মধ্যে। সমস্ত বিশ্বের কাছে তিনি বিপ্লবের প্রতীক, আলোকের দূত, ভিয়েৎনামের প্রাণপুরুষ হো চি মিন। কোন কোন মানুষ জীবনে সংগ্রাম করেন। আবার কারোর গোটা জীবনটাই সংগ্রাম। হো চি মিন ছিলেন চিরসংগ্রামী সৈনিক।

১৮ বছর বয়সে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য শুরু হয় তাঁর সংগ্রাম। ৭৯ বছর বয়সে যখন তাঁর জীবন শেষ হল তার প্রাক মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে গিয়েছেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। যেদিন সেই সংগ্রাম শেষ হল জয়ী হল তাঁর স্বদেশভূমি, সে দিন তিনি তা প্রত্যক্ষ করবার জন্য পৃথিবীতে না থাকলেও, পৃথিবীর মানুষের অন্তরে ধ্রুবতারার মত চিরজীবী হয়ে রইলেন। ১৮৯০ সালের ১৯শে মে উত্তর ভিয়েৎনামের নখেআন প্রদেশের এক গ্রামে হো চি মিনের জন্ম। তাঁর পিতৃদত্ত নাম নগুয়েন থান থাট। বাবার নাম নগুয়েন মিন হুয়ে। তাঁরা ছিলেন তিন ভাইবোন। হো ছিলেন সকলের চেয়ে বড়। বাবা ছিলেন এক দরিদ্র চাষী। যখন চাষের কাজ থাকত না, অন্যের জমিতে খেতমজুরের কাজ করতেন। ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শিশু বয়েস থেকেই হো ছিলেন গ্রামের সমবয়সীদের চেয়ে আলাদা। শান্ত ধীর। অন্যেরা যখন খেলা করত, তিনি বাবাকে কাজে সাহায্য করতেন। সারা দিন নানান কাজকর্মে কেটে যেত। রাতের বেলায় মায়ের কাছে শুয়ে গল্প শুনতেন। ছেলেবেলা থেকেই হো-কে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত বীর মানুষদের গল্পগাথা। হোয়ের শৈশবে মায়ের সান্নিধ্য ছিল সবচেয়ে প্রিয়। সেই সান্নিধ্য বেশিদিন ভোগ করতে পারলেন না হো। হো তখন এগারো বছরের বালক। ছেলের বিমর্ষতা দেখে গ্রামের পাঠশালায় তাঁকে ভর্তি করে দিলেন নগুয়েন। অল্পদিনেই পড়াশুনায় আগ্রহ জন্মে গেল হোয়ের। পাঠশালার প্রাথমিক পাঠ শেষ করলেন।

হো ছিলেন পাঠশালার সেরা ছাত্র। ছেলের এই আগ্রহ দেখে নগুয়েন স্থির করলেন, তাঁকে বড় স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

গ্রামে বড় স্কুল ছিল না। হো ভর্তি হলেন হুয়ে শহরের হাই স্কুলে। এই প্রথম গ্রামের বাইরে এলেন হো। এ তাঁর চেনাজানা পরিবেশ নয়, অন্য জগৎ। এতদিন ছিলেন স্বাধীন। শহরে এসে হো প্রথম উপলব্ধি করলেন তাঁরা পরাধীন। তাদের দেশ শাসন করছে বিদেশী ফরাসীরা। নিজেদের মাতৃভূমিতেও নিজেদের কোন অধিকার নেই।

১৯৫৬ সালের ৮ই মে জেনেভায় বসল আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন। পশ্চিমি দেশগুলি শান্তির শর্ত হিসাবে ভিয়েৎনামকে বিভক্ত করতে চাইল। যুদ্ধক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত ভিয়েৎনামের মানুষের কথা চিন্তা করে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন হো। যদিও তিনি অন্তর থেকে চেয়েছিলেন ভিয়েৎনাম এক ও অবিভক্ত থাকুক।

উত্তরের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন হো চি মিন। আর দক্ষিণের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন নো দিন জিয়েস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁকে এই আসনে বসিয়েছিলেন পুতুল সরকার হিসাবে দেশ শাসন করবার জন্য। স্থির হয়েছিল সেই বছরই দেশের দুই অংশে নির্বাচন হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পেরেছিল এই নির্বাচন হলে হো হবেন সমগ্র ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপ্রধান। তাই আমেরিকার প্ররোচনায় নির্বাচন করা সম্ভব হল না। হো ছিল ছিলেন অত্যাচারী শাসক। অল্পদিনেই তাঁর শোষণ অত্যাচারে সমস্ত দক্ষিণের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। দাবি উঠল অখণ্ড ভিয়েৎনামের। তাদের সাহায্যে এবার এগিয়ে এল উত্তরের মানুষ। হো সমর্থন জানালেন দক্ষিণের মানুষের গণ আন্দোলনকে।

হো সে দিন সরকার বিপদ আসন্ন বুঝতে পেরে এবার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমেরিকা। শুরু হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক নারকীয় অত্যাচার। একদিকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ আমেরিকা, অন্যদিকে এক ক্ষুদ্র সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ ভিয়েৎনাম।

সেই অজেয় শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সামান্যতম বিচলিত হয়নি ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষ কারণ তাহাদের সাথে ছিলেন তাদের প্রিয় নেতা হো চি মিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামের বুকে যে পরিমাণ নাপাম বোমা ফেলেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। ভিয়েৎনামের মানুষ হোর নেতৃত্ব সেদিন প্রমাণ করেছিল কোন অস্ত্র দিয়েই মানুষের অদম্য মনোবলকে ধ্বংস করা যায় না। হো দেশের মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা ইস্পাতের মত কঠিন, বজ্রের মত মহাতেজী হও।

১৯৬৯ সালের ১০ই মে অসুস্থ হয়ে পড়লেন হো। বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ বার্তা রচনা করলেন। 'যখন আমার জীবনের শেষ ক্ষণ আসবে তখন আমার সমস্ত মন ভারাক্রান্ত হবে আরো দীর্ঘদিন তোমাদের সেবা করতে পারলাম না বলে। আমার মৃত্যুর পর কোন শোক অনুষ্ঠান করে যেন জনগনের অর্থ আর সময়ের অর্থ আর সময়ের অপচয় না করা হয় সবশেষে আমি রেখে গেলাম পার্টির সকল সদস্য, সেনাবহিনী আর প্রতিটি স্বদেশবাসীর জন্য আমার গভীর ভালবাসা।"

এর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুতে ভিয়েৎনামের মানুষের সংগ্রাম শেষ হয়নি। তাঁর স্বদেশপ্রেম আর আত্মিক শক্তির অনুপ্রেরণাতেই উজ্জীবিত হয়ে একদিন তারা আমেরিকাকে বিতাড়ন করে নতুন স্বাধীনতা পতাকাকে উড্ডীন করেছিল।

হো চিন মিন আর নেই। কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব শুধু ভিয়েৎনাম নয়, পৃথিবীর সমস্ত সংগ্রামী মানুষের মধ্যে আজও চির বিরাজমান।

৭৫

মহাকবি ফেরদৌসী

(৯৪১-১০২০ খ্রিঃ)

পৃথিবীর বুকে বিশ্ব বিখ্যাত যে ক'জন কবির আগমন ঘটেছে 'মহাকবি ফেরদৌসী'র নাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি। বর্তমান যুগে ঘরে ঘরে যেমন কবির জন্ম হচ্ছে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দের মিল দিতে পারলেই কবি হিসেবে পরিচিত হওয়া যায়, পরিচিত হতে না পারলেও জোর করে পরিচিত হবার চেষ্টা চালায়; কিংবা ২/১টি অশ্লীল শব্দ বা বাক্য সংযোজন করে আলোচিত হবার চেষ্টা করে; তখনকার দিনে এমনটি ছিল না।

যেমন তেমন লোক কবিতা লিখতেন না। কবির মন, কবির দেখান শক্তি, কবির চিন্তা, কবির দেখার বিষয়বস্তু সাধারণ লোক হতে অনেক ভিন্ন। সাধারণ মানুষ যা দেখে, যা ভাবে সেগুলো কবির চোখে নতুন করে দেখা দেয় এবং বাস্তব জীবনের সত্যগুলো কবির হৃদয়ে জেগে ওঠে। বর্তমান অধিকাংশ কবিদের লেখা কবিতা একবার পড়লেই যেমন দ্বিতীয় বার পড়তে বছর আগে মহাকবি ফেরদৌসী ইন্তেকাল কারলেও আজও প্রায় প্রতিটি মুসলমানের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় তাঁর লেখা কবিতা। কি যেন আকর্ষণ ও সত্য লুকিয়ে রয়েছে তাঁর কবিতায়; নেই কোন বিরক্তি, অতৃপ্তি ও তিক্ততা। যতবার পড়া হয় ততবারই যেন ইচ্ছে হয় শুনতে বা পড়তে।

মহাকবি ফেরদৌসী'র জীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী পরে ইরানের বিখ্যাত কবি নিজামি আরযী তাঁর 'দিবাচায়, ফেরদৌসী সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে জানা যায়, মহাকবি ফেরদৌসী ৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের সমরকন্দের অন্তর্গত তুস নগরের 'বাঝ' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ আবুল কাশেম। 'ফেরদৌসী' তাঁর উপাধি। গজনির সুলতান মাহমুদ তাঁকে এ উপাধি দিয়েছিলেন। সে থেকেই তিনি ফেরদৌসী নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ ইসহাক ইবনে শরফ শাহ তুস নগরের রাজকীয় উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ফেরদৌসী ভাল লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থাও ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল। জানা যায়, তিনি উত্তারিধকার সূত্রে অনেক জায়গা জমি পেরেছিলেন এবং এ সব জমি থেকে প্রতি বছর প্রচুর অর্থ আয় হত। তিনি বাল্য বয়স থেকেই কবিতা লিখতে ভালবাসতেন। কম বয়সেই বিয়ে করেন। যৌবনে তিনি একান্তভাবে কবিতা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং রাজকীয় উদ্যানের পার্শ্ববর্তী ছোট্ট নদীর তীরে বসে কাব্য লিখতেন। সুখ ও শান্তিময় জীবনের দিনগুলো এখানেই তিনি কাটাতেন। কিন্তু সুখ তাঁর জীবনে বেশীদিন স্থায়ী হল না। তাঁর পরিবারে তুসের শাসনকর্তার খারাপ দৃষ্টিতে পতিত হল। অবশেষে নিজ গৃহে অবস্থান করাই ছিল তাঁর জন্যে দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁর মাত্র একটি কন্যা সন্তান ছিল। কন্যাকে সৎপাত্রে বিবাহ দেয়া ছিল তার জীবনের বড় আশা। এছাড়া নিজ দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটন দেখে তাঁর মন প্রায়ই কেঁদে উঠত। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যেভাবেই হোক তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবেন। কিন্তু তাঁর মনের এ আকঙ্ক্ষা আর পূরণ হল না। নিজ গৃহে অবস্থান করাই যখন তাঁর অসম্ভব হয়ে উঠল, তখন জনগণের কল্যাণে কাজ করবেন কিভাবে। তিনি কন্যাকে সাথে নিয়ে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়লেন অজানা এক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। তাঁর জীবনের এ দুঃসময়ে সাক্ষাৎ পেলেন গজনীয় সুলতান মাহমুদের।

৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ গজনীয় সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি দেশ বিদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিদের খুব সম্মান করতেন এবং তাছাড়া দরবারে দেশ বিদেশের কবিদের কবিতা আবৃত্তির আসর হত। মহাকবি মুহাম্মদ আবুল কাশেম ফেরদৌসী সুলতান মাহমুদের নিকট যথাযথ কদর পাবেন চিন্তা করে গজনীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। গজনীর রাজ দরবারে প্রবেশ করা ছিল তখন কঠিন ব্যাপার। তিনি দরবারের অন্যান্য কবিদের ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হন। অবশেষে সুলতান মাহমুদের উজির মোহেক বাহাদুরের সহযোগিতায় তিনি রাজদরবারে প্রবেশ করেন। সুলতানের সাথে কবির প্রথম পরিচয় হয় কয়েকটি কবিতা পাঠের মাধ্যমে। সুলতানের সাথে প্রথম পরিচয় হয় কয়েকটি কবিতা পাঠের মাধ্যমে। প্রথম সাক্ষাতেই সুলতান কবির আবৃত্তি করা কয়েকটি কবিতা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং এ বলে কবিকে সংবর্ধনা করলেন,

"আয় ফেরদৌসী, তু দরবারে মে ফেরদৌস কারদী।

অর্থাৎ হে ফেরদৌসী, তুমি সত্যিই আমার দরবারকে বেহেশ্‌তে পরিণত করে দিয়েছ।

এ থেকেই কবির নাম ফেরদৌসী হল এবং পরবর্তীতে তিনি ফেরদৌসী হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেন। সুলতান কবির জন্যে পৃথকভাবে উন্নতমানের বাসস্থান ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং কবিকে রাজকবি হিসেবে মনোনীত করেন। আস্তে আস্তে কবি ফেরদৌসী'র সাথে সুলতান মাহমুদের সম্পর্ক গভীর হয়ে যায়। কবির কবিতা ও তাঁর জ্ঞান বুদ্ধিতে সুলতান তাঁর প্রতি মুগ্ধ হন। কিন্তু এখানেও সুলতানের সাথে কবির গভীর সম্পর্ক আজীবন স্থায়ী হল না।

কবি ফেরদৌসী'র সাথে সুলতানের গভীর সম্পর্ক এবং রাজদরবারে কবির শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখে রাজসভার অন্যান্য কবিরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল এবং কবিকে রাজদরবার থেকে বের করার জন্যে কবির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করল। অন্যদিকে সুলতানের প্রধানমন্ত্রী খাজা ময়মন্দীও

কবির সাথে গোপনে শত্রুতা আরম্ভ করলো। ইতিমধ্যে সুলতান মাহমুদ কবিকে 'মহাকাব্য শাহনামা' রচনা করার অনুরোধ জানান এবং এর প্রতিটি শ্লোকের জন্যে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। যতদূর জানা যায়, কবি সুদীর্ঘ ৩০ বছর পরিশ্রম করে 'শাহনামা' রচনা করেন। এর মধ্যে শেষের ২০ বছর কবি রাজসভাতে কাটান। 'শাহনামা' পৃথিবীর মহাকাব্য সমূহের অন্যতম। ইহা ৭টি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত এবং ৬০ হাজার শ্লোক রয়েছে এতে। কাব্যের কোথাও অশ্লীল বাক্য বা ইতর উপমার প্রয়োগ নেই। কবি নিযামীর মতে 'শাহনামা' কাব্য রচনা শেষ হয় হিজরী ৩৯৩ সনে। 'শাহনামা' কাব্য রচনা শেষে সুলতান রাজদরবারের কতিপয় ঈর্ষাপরায়ণ ও ষড়যন্ত্রকারীর কুমন্ত্রণা শুনে তাঁর প্রতিশ্রুতি ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ৬০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা মাতন্তরে ৬০ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। সুলতান কবির বিরুদ্ধে আমলাদের ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পারেননি। এদিকে কবি ফেরদৌসী সুলতানের প্রতিশ্রুতি ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা না পেয়ে ক্রোধে, ক্ষোভে ও দুঃখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। কবি অর্থের লোভী ছিলেন না। বরং সুদীর্ঘ ৩০ বছর পরিশ্রমের বিনিময়ে তাঁকে যে অর্থ দেয়া হয়েছে তা কবি নিজের জন্যে অপমান মনে করেছেন। ফেরদৌসী দীন হতে পারেন কিন্তু তাঁর আত্মা দীন নয়। এছাড়া এ অর্থ দিয়ে নিজ দেশের অসহায়, গরীব, নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনগণের এবং কন্যা সন্তানের যে উপকার করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন তা যেন সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। সুলতান হয়ে তিনি কিভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারলেন? এসব কথা চিন্তা করেই কবি সুলতানের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং কবিকে সুলতানের দেয়া সমুদয় অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। শুধু তাই নয়, সুলতানের দেয় সমুদয় অর্থ ভৃত্য, স্নানাগারের রক্ষক ও নিকটস্থ গরীব লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দেন। রাজ পুরস্কারকে অপমান করার ঘটনা সুলতানের কানে পৌছল। রাজসভার অন্যান্য কবি ও আমলারা সুলতানকে বিষয়টি ভালভাবে বুঝায়নি বরং তাঁরা সুলতানের নিকট কবির বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছেন। তাঁরা সুলতানের নিকট কবির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা ও বানোয়াট কথাবার্তা বলে কবির বিরুদ্ধে সুলতানকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। সুলতান ক্ষুব্ধ হয়ে কবিকে হাতির পদতলে পিষ্ট করে হত্যা করার আদেশ দেন এবং পরক্ষণে এ আদেশ তুলে নিয়ে কবিকে গজনী ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

সুদীর্ঘ ২০টি বছর কবি কাটিয়েছেন গজনীতে। তাঁর জীবনের মূল্যবান সময় ও শ্রম ব্যয় হয়েছে এখানে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে এবং রিক্ত হস্তে জীবন সায়াহ্নে গজনী ত্যাগ করে আবার বের হতে হল অজানা অচেনা নিরাপদ এক আশ্রয়ের সন্ধানে। গজনী ত্যাগ করার পূর্বে কবি সুলতান মাহমুদের এ হীনমন্যতার জন্যে তাঁকে গাল-মন্দ করে একটি ব্যঙ্গ রসাত্মক কবিতা লিখেন এবং তা মসজিদের দেয়ালে টাঙিয়ে রাতের অন্ধকারে গজনী ত্যাগ করেন।

সুলতানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'কুয়েস্তানের' রাজা নসরুদ্দিন মুহতাসেম কবি ফেরদৌসীর উচ্চ প্রশংসা করে সুলতান মাহমুদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পাঠান্তে সুলতান খুব মর্মাহত হন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সুলতান কবির প্রতি ন্যায় বিচার করেননি বরং ষড়যন্ত্রকারীদের কুপরামর্শে তিনি কবির প্রতি অন্যায় আচরণ করেছেন। তাই সুলতান নিজেকেই অপরাধী মনে করে কবি ফেরদৌকে ক্ষমা করে দেন এবং কবির প্রতি সুলতানের সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন সরূপ কবির প্রাপ্য সমুদয় স্বর্ণমুদ্রা সহ কবির জন্মভূমি ইরানের তুস নগরীতে কবির নিজ বাড়িতে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু দূত যখন স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যান তখন কবি পৃথিবীতে বেঁচে নেই।

১০২০ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে কবি এ অশান্তময় পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। কবির ইন্তেকালের হাজার বছর অতিবাহিত হলেও কবি ও কাব্য ও সাহিত্য পৃথিবীতে রেখে গেছেন তাতে মুসলিম জাতি কর্তৃক কবিকে কখনো ভুলার মত নয়।

৭৬

মহাত্মা গান্ধীজী

[১৮৬৯-১৯৪৮]

গুজরাটের পোরবন্দরে এক মধ্যবিত্তপরিবারে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম (১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর)। বাবার নাম করমচাঁদ গান্ধী। তার কনিষ্ঠ পুত্র গান্ধী। তাঁর নাম ছিল মোহনদাস। গুজরাটি প্রথা অনুসারে পুরো নাম হল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মায়ের নাম পুতলীবাঈ। গান্ধী ছেলেবেলায় বাবা-মায়ের সাথে পোরবন্দরে ছিলেন। সেখানকার স্থানীয় পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু

হয়। যখন তাঁর সাত বছর বয়েস, বাবা রাজকোটের বিচারপতি হয়ে গেলেন। প্রথমে রাজকোটের এক পাঠশালায় এবং পরে হাই স্কুলে ভর্তি হলেন।

মাত্র তেরো বছর বয়েসে গান্ধীর বিবাহ হয়। গান্ধীর কাছে সেই সময় স্ত্রী কস্তুরীবাঈ বা কস্তুরা ছিলেন এক খেলার সাথী। কস্তুরীবাঈ ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর, গান্ধীর আন্তরিক চেষ্টায় সামান্য পড়াশুনা শিখেছিলেন।

বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যেই গান্ধীজির পিতা মারা গেলেন। ১৮৮৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্থানীয় কলেজে ভর্তি হলেন। এই সময় তাঁর বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়বার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে।

গান্ধীর পরিবারের সকলেই ছিলেন নিরামিষভোজী এবং রক্ষণশীল মনোভাবের। ছেলে বিলাতে গিয়ে বংশের নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাবে এই আশঙ্কায় কেউই তাঁকে প্রথমে যাবার অনুমতি দিতে চায় না। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর বড় ভাই তাকে বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়বার অনুমতি দিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডের পথে রওনা হলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিজের অভ্যস্ত জীবন শুরু করলেন।

১৮৯১ সালে গান্ধী ব্যারিস্টারি পাস করে ভারতে ফিরে এলেন। কয়েক মাস পরিবারের সকলের সাথে রাজকোটে থাকার পর বোম্বাই গেলেন। উদ্দেশ্য ব্যারিস্টারি করা। কিন্তু চার মাসের মধ্যে অর্থ উপার্জনে তেমন কোন সুবিধা করতে পারলেন না। এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার আবদুল্লা কোম্পানির একটি মামলা পরিচালনা করার ব্যাপারে গান্ধীর ভাইয়ের কাছে সংবাদ পাঠালেন. তবে তার সমস্ত খরচ ছাড়াও মাসে একশো পাঁচ পাউন্ড দেবেন। গান্ধী এই প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে রওনা হলেন। এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার একটি ঘোষণায় ভারতীয়দের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবার হুকুম জারি করে। এই অবিচারের বিরুদ্ধে গান্ধী তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি স্থির করলেন এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবেন।

গান্ধীর এই আন্দোলন সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করল এবং প্রায় দশ হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষর দেওয়ার এক দরখাস্ত উপনিবেশ মন্ত্রী লর্ড রিপনের কাছে পাঠানো হল। মূলত তাঁরই চেষ্টায় ১৮৯৪ সালের ২২শে মে জন্ম হল নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের। গান্ধী হলেন তার প্রথম সম্পাদক। এর পর তিনি কয়েক মাসের জন্য ভারতবর্ষে ফিরে এসে নিজের পরিবারের লোকজনকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার রওনা হলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জিয়া প্রদেশে বুয়র সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব ছিল। এই বুয়রদের সাথে সোনার খনির কর্তৃত্ব নিয়ে ১৮৯৯ সালে ইংরেজদের যুদ্ধ হল। গান্ধী বুয়রদের সমর্থন না করে রাজভক্ত প্রজা হিসাবে ইংরেজদের সেবা করবার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী তৈরি করলেন। এই বাহিনী আহত ইংরেজ সৈন্যদের সেবা করে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল। এই যুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে গান্ধীর জীবনে এক পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি সরল সাদাসিদা জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলেন।

১৯০৬ সালে ট্রান্সভালে এক অর্ডিনান্স জারি করে আট বছরের উপরে সব ভারতীয় নারী-পুরুষকে নাম রেজিস্ট্রী করার আদেশ দেওয়া হয় এবং সকলকে দশ আঙুলের ছাপ দিতে হবে বলে নতুন আইনে ঘোষণা করা হয়।

এত গান্ধী তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন। এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিকার করার জন্য ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। গান্ধী আরো বহু ভারতীয়দের সাথে বন্দী হলেন। বিচারে তার দু মাস কারাদণ্ড হল। এই প্রথম কারাবরণ করলেন গান্ধী। ১৫ দিন পর সরকার কিছুটা নরম হলেন। গান্ধীর সাথে চুক্তি হল যে ভারতীয়রা যদি স্বেচ্ছায় নাম রেজিস্ট্রি করে তবে এই আইন তুলে নেওয়া হবে। অনেক সম্প্রদায় এই আইন মেনে নিলেও পাঠানেরা তা মেনে নিল না, তাদের ধারণা হল গান্ধীজি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

গান্ধীর আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজরা তাঁর কোন দাবি মেনে নেয় না। সত্যাগ্রহ আন্দোলন ক্রমশই বেড়ে চলে। গান্ধী সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন।

গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের ভার অন্যদের হাতে তুলে দিয়ে প্রথমে ইংল্যান্ডে যান কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভারতে ফিরে এলেন। ১৯১৫ সালে আহমেদাবাদের কাছে কোচরার নামে এক জায়গায় সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করলেন।

সেই সময় ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানো হত। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবারে সোচ্চার হয়ে উঠলেন গান্ধী। কিছুদিনের মধ্যেই এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল। এর ফলশ্রুতিতে ১৯১৭ সালের ৩১শে জুলাই ভারত থেকে শ্রমিক পাঠানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল।

১৯১৮ সাল, ইউরোপের বুকে তখন চলেছে বিশ্বযুদ্ধ। ইংরেজরাও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড দিল্লীতে গান্ধীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এই যুদ্ধে ভারতীয়দের ইংরেজ পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ করলেন।

গান্ধীর ধারণা হয়েছিল ভারতবাসী যদি ইংরেজদের সাহায্য করে। অচিরে সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। ইংরেজদের প্রতি তাঁর এক মোহ ছিল যা থেকে তিনি কোনদিনই মুক্ত হতে পরেননি। যুদ্ধের পর সকলেই আশা করেছিল ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসন পাবে। কিন্তু তার পরিবর্তে বড়লাট রাউলাট আইন নামে এক দমনমূলক আইন পাস করলেন। এতে বলা হল কেউ সামান্যতম সরকারি-বিরোধী কাজকর্ম করলে তাকে বিনা বিচারের বন্দী করা হবে।

১৩ই এপ্রিল রামনবমীর মেলা উপলক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামে এক জায়গায় কয়েক হাজার মানুষ জড় হল। জায়গাটার চারদিকে উঁচু পাঁচিল বার হবার একটি মাত্র পথ। ডায়ারের নির্দেশ সেই নিরীহ জনগণের উপর নির্মম ভাবে গুলি চালান হল। কয়েক হাজার মানুষ হতাহত হল। এই ঘটনায় সমস্ত দেশ ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। বহু জায়গায় হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হল। গান্ধীর সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। তিনি নিজেই তাঁর ভুল স্বীকার করলেন। নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে (১৯২০) গান্ধীজির অসহযোগ আন্দেলনের প্রস্তাব সমর্থিত হল।

গান্ধী ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, সব সরকারী স্কুল-কলেজ, আইন-আদালতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করতে হবে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে হবে। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে চরকা ও তাত প্রচলন করতে হবে। গান্ধীর এই ডাকে দেশ জুড়ে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো শুরু হল। লোকে চরকায় বোনা কাপড় পরতে আরম্ভ করল।

১৯২২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক স্থানে উত্তেজিত জনতা কিছু পুলিশকে হত্যা করল। এর প্রবিতবাদে তিনি আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। গান্ধীকে গ্রেফতার করা হল। দেশব্যাপী আন্দোলনের দায় গান্ধীজি নিজেই স্বীকার করে নিলেন। বিচারে তার ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল। জেলে তিনি চরকা কাটতে চাইলেন। কিন্তু তাঁকে সে অনুমতি দেওয়া হল না। তিনি উপবাস শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সব দাবি মেনে নেওয়া হল। কিন্তু কিছুদিন পূর্বেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অসুস্থতার জন্যেই তাকে ১৯২৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেওয়া হল। ১৯২৫, ২৬,২৭ সালে গান্ধীজি কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত থাকলেও তাতে সক্রিয়াভাবে অংশগ্রহণ করেননি। সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলে একটি প্রস্তাব আনতে চান। এতে গান্ধীজি ক্ষুব্ধ হন। তিনি চেয়েছিলেন আপোষ আলোচনায় মাধ্যমে স্বায়ত্ত শাসন।

১৯৪০ সালে গান্ধীজি শান্তিনিতনের এলেন। কবিগুরুর সাথে ছিল তাঁর মধুর এবং আন্তরিক সম্পর্ক। শান্তিনিকেতনের কাজে গান্ধী নানাভাবে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছেন।

এই বছরেই রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশন বসল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন। এই অধিবেশনে ঘোষণা কর হল একমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের কাম্য। গান্ধীকে পুনরায় দলের নেতা হিসাবে নির্বাচিত করা হল। শুরু হল সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

৯ই আগস্ট ১৯৪২ সালে বোম্বাইতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় 'ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত হল। সাথে সাথে কংগ্রেসের সমস্ত নেতাকে গ্রেফতার করা হল। গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, মহাদেব দেশাই, মীরাবেনকে বন্দী করে আগা খাঁ প্রাসাদে রাখা হল।

সমস্ত ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠল। শুরু হল গণবিক্ষোভ। পুলিশের হাতে প্রায় ১০০০ লোক মারা পড়ল।

গান্ধীর শরীরের অবস্থাও ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে থাকে। ইংরেজ সরকার অনুভব করতে পারল কারাগারের গান্ধীর কোন ক্ষতি হলে সমস্ত বিশ্বের কাছে তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাই বিনা শর্তে গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হল।

১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল–ইংল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদল জয়ী হল। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ ইংল্যান্ডকে এতখানি বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল তারা উপলব্ধি করতে পারছিল ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়।

এদিকে দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানদের বিভেদ ক্রমশই প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে। শুরু হল ভয়াবহ দাঙ্গা।

পরস্পরিক এই দাঙ্গাবিভেদে গান্ধী গভীর দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ নয়। কিন্তু তিনি বেদনাহত হলেন। দেশ বিভাগের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করল।

দিল্লীতেও তখন নানান সমস্যা। একদিকে দাঙ্গাপীড়িত মানুষ, মন্ত্রিসভায় মতানৈক্য. খাদ্য-বস্ত্রের সমস্যা। দিল্লীতে মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য তিনি অনশন করলেন এবং এই তাঁর শেষ অনশন। সম্মিলিত সকলের অনুরোধে ১৮ই জানুয়ারি অনশন ভঙ্গ করলেন। এই সময় গান্ধী নিয়মিত প্রার্থনাসভায় যোগ দিতেন। ৩০শে জানুয়ারি তিনি প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে চলেছেন এমন সময় ভিড় ঠেলে তার সামনে এগিয়ে এল এক যুবক। সকলের মনে হল সে বোধ হয় গান্ধীকে প্রণাম করবে। কিন্তু কাছে এসেই সে সামনে ঝুঁকে পড়ে পর পর তিনবার পিস্তলের গুলি চালাল। দুটি গুলি পেটে, একটি বুকে বিধল। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন গান্ধী। তার মুখ থেকে শুধু দুটি শব্দ বার হল "হে রাম"। তারপরই সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

সমস্ত দেশ শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল–পরদিন যমুনার তীরে চিতার আগুনে তাঁর পার্থিব দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল। দেশ-বিদেশ থেকে মানুষেরা শ্রদ্ধঞ্জলী পাঠালেন। তাদের মধ্যে ছিলেন দেশবরেণ্য মানুষেরা। তাদের সকলের কাছে গান্ধী ছিলেন বিপন্ন মানব সভ্যতার সামনের একমাত্র আশার আলো।

৭৭

ইমাম গাজ্জালী (রঃ)

(১০৫৮–১১১১ খ্রিঃ)

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পথহারা মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যে এবং পৃথিবীর বুক থেকে সকল অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্যায়, অসত্য, শোষণ, জুলুম, অবিচার, ব্যভিচার, শিরক, কুফর, কুসংস্কার এবং মানব রচিত মতবাদ ও মতাদর্শের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লক্ষাধিক নবী–রাসূল। তাঁর পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী বা রাসূলের আবির্ভাব ঘটবে না।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক নবুয়্যতের দরজাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে এ কথা অসত্য নয় যে, প্রত্যেক যুগেই পথহারা মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্যে ঐশী জ্ঞানে সমৃদ্ধ এক বা একাধিক মনীষীর আবির্ভাব ঘটবে এ ধরাতে। তাঁরা নবী কিংবা রাসূল হিসেবে আবির্ভূত হবেন না; কিংবা নতুন কোন মত বা মতাদর্শও প্রচার করবেন না। বরং তাঁরা বিশ্বনবী (সাঃ) এর নির্দেশিত পথে এবং তাঁরই আদর্শের দিকে আহবান করবেন মানব জাতিকে। তাঁদের চরিত্র ও স্বভাব হবে মার্জিত, আকর্ষণীয় ও অনুপম। তাঁরা দুনিয়াকে ভোগ বিলাসের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে মনে করবেন না। তাঁদের চরিত্র, স্বভাব ও সাধারণ জীবন যাত্রা দেখে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ফিরে আসবে সত্য ন্যায়ের পথে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ছিলেন তাঁদেরই একজন। একাদশ শতাব্দীতে মানুষ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুফর, শিরক, বিদআত, কুসংস্কার ও নানাবিদ পাপ কাজে লিপ্ত হতে শুরু করেছিল, অপরদিকে শিক্ষিত যুব সমাজ এরিস্টটল, প্লেটো এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য অমুসলিম দার্শনিকদের ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ইসলামের সত্য পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, তখন পৃথিবীতে সত্যের আলোক বর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হন মুজাদ্দিদ ইমাম গাজ্জালী (রঃ)। তিনি ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল এ ইরানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শেখ সাদী (রঃ) মহাকবি ফেরদৌসী (রঃ), আল্লামা হাফিজ (রঃ), আল্লামা রুমী (রঃ), এর মত বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম মনীষীগণ।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর প্রকৃত না আবু হামেদ মোহাম্মদ গাজ্জালী। কিন্তু তিনি ইমাম গাজ্জাল নামেই খ্যাত। গজ্জাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সূতা কাটা। এটা তাঁর বংশগত উপাধি। কারো মতে তাঁর পিতা মোহাম্মদ কিংবা পূর্ব পুরুষগণ সম্ভবত সূতার ব্যবসা করতেন। তাই উপাধি হয়েছে গাজ্জালী।

তাঁর পিতা ছিলেন দরিদ্র এবং শৈশবেই তিনি তাঁর পিতাকে হারান। পিতার মৃত্যুতে তিনি নিদারুণ অসহায় অবস্থায় পড়েন কিন্তু সাহস হারাননি। জ্ঞান লাভের প্রতি ছিল তাঁর খুব আগ্রহ ; তৎকালীন যুগের বিখ্যাত আলেম হযরত আহমদ ইবনে মুহাম্মদ বারকানী এবং হযরত আবু নসর ইসমাইলের নিকট তিনি কোরআন, হাদিস, ফিকাহ ও বিবিধ বিষয়ে অস্বাভাবিক জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু এতে তিনি তৃপ্তি বোধ করলেন না। জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে পাগলের ন্যায় ছুটে যান নিশাপুরের নিযামিয়া মাদ্রাসায়। তৎকালীন যুগে নিশাপুর ছিল ইসলামী জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যে সমৃদ্ধ ও উন্নত। এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্ব প্রথম ও পৃথিবীর বৃহৎ নিযামিয়া মাদ্রাসা। সেখানে তিনি উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুল মালিক (রঃ) নিকট ইসলামী দর্শন, আইন ও বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

আবদুল মালিক (রঃ) এর মৃত্যুর পর তিনি চলে আসেন বাগদাদে। এখানে এসে তিনি একটি মাদ্রাসায় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং বিভিন্ন জটিল বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনে তাঁর সুখ্যাতি আস্তে আস্তে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে তিনি আল্লাহকে পাবার জন্যে এবং আল্লাহর সৃষ্টির রহস্যের সন্ধানে ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ির মায়া মমতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন অজানা এক পথে। প্রায় দশটি বছর দরবেশের বেশে ঘুরে বেড়ান দেশ থেকে দেশান্ত। আল্লাহর ইবাদত, ধ্যান মগ্ন, শিক্ষাদান ও জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেন দিন রাত। জেরুজালেম হয়ে চলে যান মদীনায়। বিশ্বনবীর রওজা মোবারক জিয়ারত শেষে চলে আসেন মক্কায়। হজ্জব্রত পালন করেন। এরপর চরে যান আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে আবার ফিরে আসেন মাতৃভূমিতে।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর। আল্লাহর স্বরূপ ও সৃষ্টির রহস্য তিনি অত্যন্ত নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে আত্মা ও সৃষ্টির রহস্য এবং আল্লাহর অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্কে মীমাংসা করার বিষয় নয়; বরং এরূপ চেষ্টা করাও অন্যায়। আল্লাহর অস্তিত্ব ও সৃষ্টির রহস্য অনুভূতির বিষয়। পরম সত্য ও অনন্তকে যুক্তি দিয়ে বুঝার কোন অবকাশ নেই। তাঁর মতে যুক্তি দিয়ে আপেক্ষিকতা বুঝা যায় মাত্র। তিনি সকল প্রশ্নে মীমাংসা করেছেন কোরআন, হাদিস ও তারই ভিত্তিতে নিজের বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল পর্বতের ন্যায় অটল ও সুদৃঢ়। ধর্ম ও দর্শনে তাঁর ছিল প্রভূত জ্ঞান। ধর্ম ও যুক্তির নিজ নিজ বলয় তিনি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আত্মা কখনো ধ্বংস হয় না কিন্তু দেহ ধ্বংস হয়। আত্মা মৃত্যুর পর জীবিত থাকে। হৃদপিণ্ডের সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই হৃদপিণ্ড একটি মাংসপিণ্ড মাত্র, মৃত্যুর পরও দেহে এর অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু আত্মা মৃত দেহে অবশিষ্ট থাকে না। মৃত্যুর পর আত্মার পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ও মুক্তি সম্ভবপর হয়ে থাকে।" তিনি ইসলামী জান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যে ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছেন। তিনি ছিলেন ধর্ম, আদর্শ ও সুফিবাদের মূর্তিমান প্রতীক। তিনি অন্ধ বিশ্বাসের উপর যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু যা চিরন্তন সত্য ও বাস্তব সেখানে তিনি যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন না বরং সেক্ষেত্রে ভক্তি ও অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিতেন।

অংকশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। এ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল ম্যাজিক স্কোয়ার। সাবিত ইবনে কোরা ও ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ব্যতীত ম্যাজিক স্কোয়ার মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি নক্ষত্রাদির গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ২টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর এ গ্রন্থ দু'টি আক প্রায় বিলুপ্তি। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রায় চার সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দিতে ইউরোপ অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

(১) ইহিল-উল-উলুমুদ দীন, (২) কিমিয়াতে সা'দাত-এ গ্রন্থটি ক্লড ফিল্ড The Alchemy of happiness নাম দিয়ে ইংরেজি ভাষার অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থটি 'সৌভাগ্যের পরশ মণি' নামে বাংলা ভাষায়ও অনূদিত ও বহুল প্রচারিত হয়ে আছে, (৩) কিতাবুল মনফিদলিন আদ দালাল-এ গ্রন্থটি The liberation Fromerror নাম দিয়ে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, (৪) কিতাবুত তাকাফাতুল কালাসিফা এ গ্রন্থটি ক্লড ফিল্ড The Internal Contradiction of philosophy নাম দিয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন, (৫) মিশকাতুল আনোয়ার, (৬) ইয়াক্কুত্তাবলিগ, (৭) মনখুল প্রভৃতি গ্রন্থ সমগ্র ইউরোপে সমাদ্রিত হয় এবং আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ মহামনীষী ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ইসলামের এক নব জাগরণ ঘটিয়েছিলেন।

তিনি ১১১১ খিস্টাব্দে সুস্থ অবস্থায় এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান; যাকে পাবার জন্যে, যার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে, যার স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্যে সারাটা জীবন ঘরবাড়ি ছেড়ে ঘুরে ফিরেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। মৃত্যুর দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি ফজরের নামাজ আদায় করেন। তারপর নিজ হাতে তৈরি করা কাফনের কাপড়খানা বের করে বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি তো রহমান এবং রাহিম। হে আল্লাহ, একমাত্র তোমাকে পাবার জন্যে এবং তোমার স্বরূপ বুঝার জন্যেই আমি সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করে ঘুরে ফিরেছি বছরের পর বছর এবং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তরে। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।" এরপর তিনি কাফনের কাপড় পরিধান করেন এবং পা'দুখানা সোজা করে শুয়ে পড়েন এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১১১১ খ্রিস্টাব্দে। বিশ্ব বিখ্যাত এ মনীষী চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন মুসলিম জাহানে।

৭৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮৬১-১৯৪১]

দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মণধর্মে দীক্ষিত। উপনিষদের সুমহান আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সারদা দেবী ছিলেন পনেরোটি সন্তানের জননী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চতুর্দশ সন্তান। তাঁর জন্ম হয় ঠাকুরবাড়িতে ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮। ঠাকুর বাড়ি ছিল সেই যুগে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, সংগীতের পীঠস্থান। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, মধ্যম সত্যেন্দ্রনাথ, পরবর্তী সন্তান হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিন্দ্রনাথ, সকলেই ছিলেন প্রতিভাবনা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই চার ভাইয়ের প্রভাব পড়েছিল খুব বেশি। শিশু রবীন্দ্রনাথের জীবন কেটেছিল নিতান্তই সরল সাদাসিদেভাবে ঝি-চারকদের হেফাজতে।

একটু বড় হতেই প্রথমে ভর্তি হলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। অল্প কিছুদিন পর সেখান থেকে গেলেন নর্মাল স্কুলে। বাড়িতে ছেলেদের সর্ববিদ্যা পারদর্শী করবার জন্য বিচিত্র শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। ভোরবেলায় পালোয়ানের কাছে কুস্তি শেখা, তারপর গৃহশিক্ষকের কাছে বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস পড়া। তারপর স্কুল। ছুটির পর ইংরাজী পড়া, ছবি আঁকা, জিমনাস্টিক। রবিবার সকালে বিজ্ঞান পড়া। রুটির বাঁধা জীবনে শিশুমন হাঁপিয়ে ওঠে।

এগারো বছর বয়েসে প্রথম মুক্তির স্বাদ পেলেন রবীন্দ্রনাথ। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গেলেন। ১৮৭৩ সাল। বোলপুর তখন নিতান্তই এক গ্রাম। সেই প্রথম প্রকৃতির সাথে পরিচয় হল। এখানেই বালক কবির কাব্য রচনায় সূত্রপাত্র। বোলপুর থেকে হিমালয়। চার মাস পশ্চিমের ভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ। স্কুল ভাল লাগে না। বাড়িতেই শিক্ষক স্থির হল। পড়াশুনা আর কবিতা লেখা। তেরো বৎসর আট মাস বয়েসে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম স্বনামে কবিতা ছাপা হল, "হিন্দুমেলার উপহার"।

১২৮৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ভারতী পত্রিকা বের হল। নিয়মিত লিখে চলেন রবীন্দ্রনাথ। ষোল বছর বয়েসে লিখলেন ভানুসিংহের পদাবলী।

ধীরে ধীরে কৈশোর উত্তীর্ণ হন রবীন্দ্রনাথ। অভিভাবকদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্কুলের গণ্ডি উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। স্থির হল বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হবেন। মেজভাই সত্যেন্দ্রনাথের সাথে রওনা বিলাতের পথে। লণ্ডনে গিয়ে প্রথমে পাবলিক স্কুলে তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু পড়াশুনায় মন নেই, বেশির ভাগ সময় কাটে সাহিত্যচর্চা আর নাচ-গানে। দেড় বছর বিলেতে কাটালেন। যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন তার কিছুই হল না। দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে দেশে ফিরে এলেন। তখন তিনি উনিশ বছরের এক তরুণ যুবক।

কবির মন তখন নতুন কিছু সৃষ্টির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। লিখলেন গীতিনাট্য "বাল্মীকি প্রতিভা"—কবি প্রতিভার প্রথম সার্থক প্রয়াস যা আজও সমান জনপ্রিয়।

তরুণ কবির হাতে ঝর্ণাধারার মত কবিতা রচিত হতে থাকে। প্রকাশিত হল ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ড। কবি প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ না ঘটলেও সেইসময় এই কাব্য দুটি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ভাবি কাদম্বরী দেবী তখন ছিলেন চন্দননগরে। কবি গেলেন তাঁদের কাছে, বাড়ি পাশেই গঙ্গা।

এখানে বসেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "বৌঠাকুরাণীর হাট" তাঁর প্রথম উপন্যাস,

প্রতাপাদিত্যের জীবন অবলম্বনে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। বৌঠাকুরাণীর হাট ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৮৩)।

চন্দননগর থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এসে বাসা বাঁধলেন সদর স্ট্রীটের বাসাবাড়িতে। এখানে কবির জীবনে ঘটল এক নতুন উপলব্ধি।

এই অপূর্ব অনুভূতির মধ্যে দিয়েই জন্ম হল কবির অন্তস্থিত কাব্যসত্তার। সেই দিনই কবি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল ঠাকুর বাড়িরই এক কর্মচারীর কন্যা। বারো বছর বয়স। বিয়ের আগে নাম ছিল ভবতারিণী। নতুন নাম হল মৃণালিনী।

ঠাকুরবাড়ি শুধু যে বাংলার সংস্কৃতির জগতের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল তাই নয়, আর্থিক দিক থেকেও ছিল অন্যতম ধনী। পূর্ববঙ্গ উত্তরবঙ্গে ছিল বিস্তৃত জমিদারি। সব ভার এসে পড়ল রবীন্দ্রনাথের উপর। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে নদীপথে ঘুরতে ঘুরতে রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তা তাঁর সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বিভিন্ন সময়ে লেখা কবিতাগুলি নিয়ে প্রকাশিত হল মানসী (১৮৯০)। এতে কবি প্রতিভার শুধু যে পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তাই নয়, বাংলা কাব্য জগতেও এ এক নতুন সংযোজন।

বন্ধু শ্রীশচীন্দ্র প্রকাশ করলেন নতুন একটি পত্রিকা 'হিতবাদী।' রবীন্দ্রনাথ হলেন এর সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক। সেই সময় জমিদারির কাজে নিয়মিত যেতে হল শিলাইহে। ঘুরে বেড়ান গ্রামে গ্রামে। সেখানকার মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের আলোয় জন্ম দিতে থাকে একের পর এক ছোট গল্প—দেনা-পাওয়া, গিন্নি, পোস্টমাস্টার, ব্যবধান রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, প্রতিটি গল্পই প্রকাশিত হয় হিতবাদীতে। কিন্তু কয়েক মাস পরেই হিতবাদীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। তার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা একটি পত্রিকা বের করল, 'সাধনা'। রবীন্দ্রনাথের গল্পের জোয়ার বইতে শুরু হল। প্রথম গল্প বার হল খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, তারপর সম্পত্তি সমর্পণ, কঙ্কাল, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, জয় পরাজয় দালিয়া। প্রতিটি গল্পই বিয়োগান্ত। নিজের দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে লিখেছিলেন বেশ কিছু প্রবন্ধ, "ইংরেজ ও ভারতবাসী", "ইংরেজের আতঙ্ক", সুবিচরের অধিকার", "রাজা ও প্রজা"।

১৩০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁরই উদ্যোগে বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। দক্ষিণারঞ্জন রচনা করলেন ঠাকুরমার ঝুলি।

পরের বছর প্রকাশিত হল চিত্রা আর চৈতালি। চিত্রায় কবি স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব জীবনের পটভূমিতে নেমে এসেছেন। এতে সংকলিত হয়েছে কবির কিছু অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এবার ফিরাও মোরে, পূর্ণিমা, স্বর্গ হতে বিদায় উর্বশী, ব্রাহ্মণ। এছাড়া তাঁর দুটি জনপ্রিয় কবিতা পুরাতন ভৃত্য ও দুই বিঘা জমিতে অবহেলিত নির্যাতিত মানুষের প্রতি ফুটে উঠেছে গভীর সমবেদনা। কবিতা আর গানের পাশাপাশি লিখতে থাকেন একের পর এক কাব্য নাটক। বহুদিন পূর্বে লিখেছিলেন প্রকৃতির পরিশোধ, চিত্রাঙ্গদা, বিদায়, অভিশাপ, মালিনী। এবার লিখলেন গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

কবিতা আর গানের জগতে থাকতে মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। লিখলেন হাস্যরসাত্মক রচনা চিরকুমার সভা।

১৩০৮ (ইং ১৯০১) নতুন করে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ হলেন তার সম্পাদক। প্রবন্ধ কবিতার সাথে প্রকাশিত হল নতুন উপন্যাস চোখের বালি।

শিলাইদহে বহুদিন ছিলেন সপরিবারে। এলেন শান্তিনিকেতনে। এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন আবাসিক বিদ্যালয়। স্ত্রী মৃণালিনী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল। তখন মৃণালিণী দেবীর বয়স ছিল ত্রিশ, রবীন্দ্রনাথের একচল্লিশ। তাঁদের তিন কন্যা মাধুরীলতা, রেণুকা, মীরা, দুই পুত্র রথীন্দ্রনাথ আর মনীন্দ্র।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অল্পদিন পরই কন্যা রেণুকা অসুস্থ হয়ে পড়ল। কবির আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো গেল না। তখন রেণুকার বয়স মাত্র তেরো।

কবির ভাবনা বিকশিত হয়ে ওঠে শান্তিনিকেতন আর শিলাইদহে। তারই সাথে গীতাঞ্জলির গান লেখা। প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে কবি লিখতে আরম্ভ

করলেন 'গোরা' উপন্যাস। প্রায় তিন বছর ধরে গোরা প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে। রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। হিন্দু সমাজ জীবন, তার দর্শীয় সংকীর্ণতা. [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] সত্যের ইঙ্গিত করেছেন।

শান্তিনিকেতনে বসে কবি লিখেছেন 'ডাকঘর'।

বহুদিন দেশের বাইরে যাননি রবীন্দ্রনাথ। পুত্র-পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে নিয়ে গেলেন বিলেতে।

বিলেতে এসে কবির সাথে পরিচয় হল ইংরেজ কবি ইয়েটস্-এর সাথে। ইয়েটস্ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ। তিনি এর ভূমিকা লিখলেন।

ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হল গীতাঞ্জলি। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কাগজে কাগজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

কবি আমেরিকা হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। সেখানকার পরিবেশ ভাল না লাগায় [illegible] এলেন শান্তিনিকেতনে। ১৫ই নভেম্বর ১৯১৩। সন্ধ্যাবেলায় সংবাদ এল কবি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনিই প্রথম প্রাচীনবাসী যিনি এই পুরস্কার পেলেন।

লিখলেন নতুন কবিতা 'ছবি'। তারপর একের পর এক সৃষ্টি হতে থাকে বলাকার অবিস্মরণীয় সব কবিতা। সবুজের অভিযান, শঙ্খ, শাজাহান, ঝড়ের খেয়া, বলাকা।

নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'সবুজ পত্র'। নতুন কোন পত্রিকা চালু হলেই তাকে জমিয়ে তোলবার দায়িত্ব এসে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের উপর।

সবুজ পত্রে একে পর এক প্রকাশিত হল ছোট গল্প। এদের মধ্যে বিখ্যাত হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র। ১৩২২ সাল রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্র লিখতে আরম্ভ করলেন, "ঘরে বাইরে"।

১৯১১-এর ১৩ই এপ্রিল ইংরেজ সৈন্যরা জালিয়ানওয়ালাবাগে ৩৭৯ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করল। তীব্র ঘৃণায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অন্তর ভরে উঠল। তিনি বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে লেখা এক খোলা চিঠিতে সরকার প্রদত্ত নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করবার কথা ঘোষণা করলেন।

প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন কবি। পরিণতির সাথে সাথে রচনায় ফুটে ওঠে [illegible]। লিখলেন রক্তকরবী, চণ্ডালিকা। রাশিয়ায় গিয়ে ভাল লেগেছিল [illegible] কর্মপ্রচেষ্টা। নতুন দেশ গড়ার উদ্যত কবিকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখলেন রাশিয়ার চিঠি। [illegible] বয়সে এসে কবি ডুবে থাকেন গান আর ছবি আঁকায়। আবার তারই পাশে পাশে [illegible] শ্যামলী, প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশ প্রদীপ, ছড়ার উৎসব, নৃত্যনাট্য শ্যামা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেবার জন্য কবির ডাক এল। তিনিই প্রথম বেসরকারী ব্যক্তি যিনি এই সম্মান পেলেন। চিরাচরিত প্রথা ভেঙে তিনি বাংলায় [illegible] দিলেন।

১৯০৪ সালের ৭ই আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে শান্তিনিকেতনে কবিকে ডক্টর উপাধি দেওয়া হল। ইংরেজরা দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত সম্মান জানাল কবিকে।

কবির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। দেহ আগের মত সচল নয়। তবুও তারই মধ্যে লিখলেন [illegible] বিখ্যাত গল্প ল্যাবরেটরি, বদনাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলে যান অন্যে লিখে নেয়। এই সময়ে লেখা কবিতাগুলি সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হল 'রোগশয্যায়'।

কবি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হল। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবির অপারেশন করা হল। তার কিছুক্ষণ আগে লিখেছেন জীবনের শেষ কবিতা।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করে
বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী।

....

শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে আপন ভাণ্ডারে
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে শান্তি অক্ষয়
অধিকার

অপারেশনের পর কবি জ্ঞান হারালেন। সে জ্ঞান আর ফিরল না। রাখী পূর্ণিমার দিন দুপুর বেলায় ১৩৪৮ সালের ২২ শে শ্রাবণ (ইং ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট) একটি মহাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

৭৯

হিপোক্রেটস

(৪৬০–৩৭০)

মানব সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীকদের দান অতুলনীয়। দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই পৃথিবীর মানুষ তাদের কাছে ঋণী। দর্শনে সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল মানুষের চিন্তা মনীষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ্যাসকাইলাস, সোফাক্লিস, ইউরিপিদেস বিশ্বের নাট্য সাহিত্য ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছেন তাদের অবিস্মরণীয় সব নাটকে। বিজ্ঞানের জগৎকে আলোকিত করেছেন হিপোক্রেটস, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, পিথাগোরাস। মানুষের মনের অন্ধকারের বুকে এঁরা জ্ঞানের আলো জ্বেলেছিলেন।

এই সব মহান মানুষের মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিপোক্রেটস। তাঁকে বলা হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক। যে সময় তাঁর জন্ম সেই সময় চিকিৎসা বিজ্ঞান ছিল কুহেলিকায় ঢাকা। শুধুই কুসংস্কার আর বিচিত্র সব তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যেই চিকিৎসকদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রাচীন গ্রীসদেশে চিকিৎসার দেবতা ছিলেন অ্যাপেলো। তার হাতে থাকত দণ্ড। একে বলা হত হার্মিসের দণ্ড। এই দণ্ড চিকিৎসাবিদ্যার প্রতীক। গ্রীসের বিভিন্ন স্থানে এই অ্যাপেলোর মন্দির ছিল। লোকে অসুস্থ হলে এই মন্দিরে গিয়ে পূজা দিত, শূকর ভেড়া উৎসর্গ করত। মন্দিরের পুরোহিতরাই প্রধানত ছিল চিকিৎসক। তারা খুশিমত চিকিৎসার নানান বিধান দিত। লোকে ভাবত দেবতার ক্রোধে মানুষ অসুস্থ হয়। পুরোহিতরা দেবতার প্রতিনিধি, তারা ইচ্ছা করলে সেই রোগ সুস্থ করে তুলতে পারে। এইভাবে এক শ্রেণীর পুরোহিত সম্প্রদায় গড়ে উঠল, চিকিৎসাই হল তাদের প্রধান পেশা। কালক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিকিৎসার সম্বন্ধে তারা কিছু জ্ঞান অর্জন করল। যে যেটুকু জ্ঞান অর্জন করত তাকে অ্যাপেলো প্রদত্ত মনে করে গোপন করে রাখত। তখন চিকিৎসাবিদ্যাকে বলা হত গুপ্ত বিদ্যা। এই বিদ্যা শুধুমাত্র পিতা তার সন্তানকে দিত। হিপোক্রেটস ছিলেন এমনি এক চিকিৎসকের পুত্র। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রায় একই সময়ে গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সক্রেটিস, এ্যাসকাইলাস, কিছু পরে সোফোক্লিস প্লেটোর মত মহান দার্শনিক নাট্যকাররা। তাদের মুক্ত স্বাধীন চিন্তা হয়ত হিপোক্রেটসকে প্রভাবিত করেছিল।

হিপোক্রেটসের জন্ম অ্যাপিয়ান সাগরের "কস" দ্বীপে। তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য উদ্ধার যায় না। সামান্য যেটুকু তথ্য পরবর্তীকালে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার ভিত্তিতে জানা যায় হিপোক্রেটসের বাবা ছিলেন কসের অ্যাপোলো মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। সেই সূত্রে সমাজে ছিল যেমন প্রভাব তেমনি প্রতিপত্তি। সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন তিনি। শিক্ষার সূত্রপাত হয় তাঁর পিতার কাছে। পিতার কাছ থেকে যাবতীয় গুপ্তবিদ্যা তিনি অর্জন করেছিলেন। ছেলেবলা থেকেই হিপোক্রেটস ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। সেই সময় একমাত্র এথেন্সে চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত কিছু পড়াশুনা হত। হিপোক্রেটস পিতার কাছ থেকে সব কিছু শিক্ষা লাভ করবার পর এথেন্সে গেলেন চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করতে। সেখানে তার শিক্ষক ছিলেন ডিমোক্রিটাস। তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন তিনটি বিষয়েই ডিমোক্রিটাসের ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। এছাড়ও এথেন্সের আরো কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের কাছে হিপোক্রেটস শিক্ষা লাভ করেন।

সেই যুগে এথেন্স ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হত লাইসিয়াম-এর অর্থ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এক একটি লাইসিয়াম এক এক জন প্রখ্যাত শিক্ষকের অধীনে গড়ে উঠত। প্রত্যেকে নিজের অধিগত বিদ্যা ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা জ্ঞানের সামান্য অংশই ছাত্রদের দিতেন। নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বেশির ভাগ অংশই প্রকাশ করতেন না।

হিপোক্রেস চিকিৎসকের পুত্র হলেও নিজের গভীর জ্ঞান, বাস্তব যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, যে যুগের চিকিৎসা ব্যবস্থার ভ্রান্তি আর দোষত্রুটি। তাঁর অবৈজ্ঞানিক দিকগুলি তাঁর চোখে প্রকট হয়ে উঠেছিল।

তিনি ঠিক করলেন বিভিন্ন চিকিৎসকদের কাছ থেকে তাঁদের জ্ঞানকে অর্জন করতে হবে। কিন্তু কাজটি সহজ ছিল না। কারণ বেশির ভাগ চিকিৎসকই ছিলেন অহংকারী দাম্ভিক। হিপোক্রেটস তাঁদের অনুগত শিষ্য হয়ে নানান স্তুতি প্রশংসায় তাদের মন জয় করে নিতেন। তারপর নিজের অসাধারণ প্রতিভায় অল্পদিনের মধ্যেই গুরুর সব জ্ঞান আয়ত্ত করে নিতেন। তিনি

তার চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করলেন। শুরু হল রুগীর চিকিৎসা। এতদিনকার প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে এ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তখন শুধুমাত্র রোগীর রোগের উপসর্গ দেখে চিকিৎসকরা বিধান দিত। অন্য কিছু জিজ্ঞাসা বা বিচার করবার প্রয়োজন মনে করত না। কিন্তু হিপোক্রেটস বললেন, একজন প্রকৃত চিকিৎসকের উচিত রোগ নয়, রুগীর চিকিৎসা করা। একটি উপসর্গ বা রোগ লক্ষণের উপর নির্ভর করে রোগ নির্ণয় করা উচিত নয়। একজন চিকিৎসকের রোগীর যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন—যেমন রোগীর প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা, তাঁর পিতা-মাতা বা অন্যদের রোগের ইতিহাস, তাঁর কাজকর্ম, কোন পরিবেশে সে বাস করে। এই সব তথ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই রোগীর সঠিক চিকিৎসা প্রণালী নির্ধারণ করতে হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হিপোক্রিটাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল বিভিন্ন ধরনের ঘা, ফোঁড়া, কাটা, পচনের কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়। এই বিষয় নিয়ে তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন অপরিচ্ছন্নতা ও দূষিত দ্রব্য ব্যবহারই এই সব রোগের বৃদ্ধি ঘটায়। তাই তিনি পরিষ্কার পানি, ব্যান্ডেজ, ঔষধ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

মৃগীরোগ সম্বন্ধে শুধু সেই যুগে নয়, বর্তমান কালেও বহু মানুষের ধারণা, কোন অপদেবতা কিম্বা শয়তান যখন মানুষের উপর ভর করে তখন মৃগীরোগ হয়। কিন্তু সেই যুগে হিপোক্রেপটস তাঁর অন দি স্যাক্রেড ডিসিস গ্রন্থে লিখেছেন আর দশটি ব্যাধির মতই মৃগী একটি ব্যাধি এবং সুনির্দিষ্ট কারণেই এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সেই যুগের প্রচলিত সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে হিপোক্রেটস তাঁর শিষ্যদের কাছে নিজের জ্ঞানকে উজাড় করে দিতেন যাতে তারা চিকিৎসার আলোকে ছড়িয়ে দিতে পারে বৃহত্তর মানব সমাজের কাছে। মহান দার্শনিক প্লেটোর সাথে হিপোক্রেটসের পরিচয় ছিল। তিনি হিপোক্রেটসকে বলছেন চিকিৎসাবিদ্যার এক মহান গুরু আদর্শ শিক্ষক।

হিপোক্রেটস তাঁর জীবনব্যাপী গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতার আলোর যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তাঁকে তিনি বিভিন্ন রচনায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। এই সব রচনার সংগ্রহ ছিল প্রায় সাতাশিটি খণ্ডে। এক একটি খণ্ডে এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। আলেক-জান্দ্রিয়ার একটি সংগ্রহশালা থেকে এই সব রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। এই সব রচনা থেকে জানা যায় হিপোক্রেটস শুধু রোগ বা রোগীদের সম্বন্ধেই আলোচনা করেননি, তিনি চিকিৎসকদের প্রতিও বহু নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন এবং এই নির্দেশগুলি সর্বকালেই প্রযোজ্য। যেমন তিনি বলেছেন যে চিকিৎসক রোগীর প্রাসঙ্গিক সর্ব বিষয়ে খোঁজ না নিয়ে শুধুমাত্র রোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কখনোই মহৎ চিকিৎসক হতে পারেন না। তিনি বলতেন জীবন ছোট কিন্তু বিধ্যা বিরাট। সকল বিদ্যার মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ। শুধু মাত্র কিছু অজ্ঞ চিকিৎসকের জন্যেই এই বিদ্যা অন্য সব বিদ্যার পেছনে পড়ে রয়েছে।

এই মহান চিকিৎসাবিজ্ঞানী সমস্ত অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের অন্ধকারকে দূর করে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্ব আর তথ্যের। তাই তিনি শুধু সে যুগে নন, সর্ব যুগে চিকিৎসকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যাতে চিকিৎসকরা তাদের সুমহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হন সেই কারণে তিনি তাঁর ছাত্রদের বিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে শপথ করাতেন। একে বলা হল "হিপোক্রেটিস শপথ"। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সর্ব দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্ররা আজও এই শপথ নিয়ে থাকেন। 'আমি আমার জীবন ও এই পেশাকে পবিত্র, সুন্দর, নির্মল করে রাখব।' হিপোক্রেটিসের নামাঙ্কিত এই শপথবাক্য আজও সর্বদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষানবীশ হওয়ার পূর্বে উচ্চারণ করিতে হয়। এই থেকেই হিপোক্রেটিস ও তাঁর অনুগামী চিকিৎসকদের সেবার আদর্শ ও সুমহানত্ব-র পরিচয় পাওয়া যায়।

যিনি আমাকে এই ব্যাখ্যাদান করছেন তাঁকে আমার নিজ পিতামাতা জ্ঞান করব। তাঁর সন্তান-সন্ততিরা এই বিদ্যালাভে অভিলাষী হলে বিনাব্যয়ে শিক্ষাদান করব। আমি যে পথ্যাপথ্যের নির্দেশ দেব তা আমার যোগ্যতা ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে রোগীর উপকারার্থে নির্ধারিত হবে। আমার কাছে চাইলেই কোনও ব্যক্তিকে কোন মারাত্মক ও ক্ষতিকারক ওষুধের পরামর্শ দেব না। রোগীর এবং তাদের পরিবারের সকল তথ্য সাধারণের কাছে গোপন রাখব। আমার জীবন ও শাস্ত্রকে আমি বিশুদ্ধ এবং পবিত্র রাখব। এই শপথ যথাযথ পালন করে সকল লোকের প্রশংসার পাত্র হয়ে আমি যেন আমার জীবন ও শাস্ত্র সমভাবে উপভোগ করতে পারি। শপথভ্রষ্ট হলে আমার ভাগ্যে যেন বিপরীত ঘটে। যুগে যুগে এই আদর্শ চিকিৎসককে ন্যায়-সত্য ও সেবার পথে অবিচলিত রেখেছে।

জগদীশচন্দ্র বসু

[১৮৫৮—১৯৩৭]

বিজ্ঞান তাপস আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বাড়ীখাল গ্রামে। তাঁর বাবা ভগবানচন্দ্র ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জগদীশচন্দ্র যে বাড়িতে থাকতেন, বাড়ির পাশ দিয়ে পদ্মার একটি শাখা নদী বেয়ে গিয়েছিল। জগদীশচন্দ্র এই নদীর ধারে বসে থাকতে খুবই ভালবাসতেন। সমস্ত জীবনই তাঁর নদীর প্রতি আকর্ষণ ছিল। তাই পরবর্তীকাল তিনি গঙ্গার উৎসে সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন।

স্থানীয় স্কুলে পড়া শেষ হলে ভগবানচন্দ্র জগদীশকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু ইংরেজীতে আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় তিন মাস পর জগদীশচন্দ্র ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। ভগবানচন্দ্র তখন বর্ধমানের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হল জগদীশচন্দ্রের। সেই সময় জগদীশচন্দ্রের বয়স এগারো।

ছাত্র হিসাবে জগদীশচন্দ্র ছিলেন যেমন মেধাবী, পড়াশুনায় ছিল তেমনি গভীর অনুরাগ। ষোল বছর বয়েসে জগদীশচন্দ্র প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেন।

১৮৭৭ সালে বয়েসে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলেন। তিন বছর পর দ্বিতীয় বিভাগেই বিজ্ঞান বিভাগে বি-এ পাশ করলেন। ১৮৮০ সালে জগদীশচন্দ্র বিলাতের পথে যাত্রা করলেন।

লন্ডনে গিয়ে ডাক্তারি পড়বার জন্যে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেম। কিন্তু মৃতদেহ কাটাকুটির সময় প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। শেষে ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে তিনি কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলেন। অবশেষে ১৮৮৪ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস-সি ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে।

ভারতে ফিরে আসার আগে ইংল্যান্ডের পোস্ট মাস্টার জেনারেল ভারতের বড়লাট লর্ড রিপনের কাছে জগদীশচন্দ্র বসুর সম্বন্ধে চিঠি লিখে দিলেন।

লর্ড রিপন তখন ছিলেন সিমলায়। তিনি বাংলার গভর্নরকে চিঠি লিখে দিলেন যাতে জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষা বিভাগে কোন ভাল পদ দেওয়া যায়। সেই সময় সাহেবদের ধারণা ছিল ভারতীয়রা বিজ্ঞান শিক্ষায় অনুপযুক্ত। সেই কারণে চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে নানা অজুহাত সৃষ্টি করা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লর্ড রিপনের আদেশে তাঁকে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হল। এই পদে ইংরেজ অধ্যাপকরা যে বেতন পেত, জগদীশচন্দ্রকে তার দুই-তৃতীয়াংশ বেতন স্থির হল। আবার অস্থায়ী বলে ঐ বেতনের অর্ধেক হাতে দেওয়া হত।

এই ব্যবস্থায় জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে এই বৈষম্য দূর করবার জন্য তিনি প্রথমে প্রতিবাদ জানালেন। বাঙালী তরুণ অধ্যাপকের এই প্রতিবাদে কেউ কোন কর্ণপাত করল না। শেষে তিনি স্থির করলেন কোন বেতন নেবেন না। বেতন না নিলেও তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন।

১৮৮৭ সালে জগদীশচন্দ্র অবলা দাসকে বিয়ে করলেন। অবলা দাস ছিলেন বিদূষী উচ্চশিক্ষিতা। মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে কয়েক বছর ডাক্তারি পড়েছিলেন। যখন দুজনের বিয়ে হল তখন জগদীশ বসু কোন মাইনে নেন না। সংসারে অভাব অনটন।

অধ্যাপনার এক বছরের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণাপত্র ইংলন্ডের রয়েল সোসাইটিতে পাঠালেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার প্রকাশিত হল। রয়েল সোসাইটির তরফ থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বৃত্তি দেওয়া হল। এছাড়া লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে D. Sc. উপাধি দিল। ইতিমধ্যে তিন বছর তিনি বিনা পারিশ্রমিকে কলেজে অধ্যাপনা করে গেলেন। তাঁর এই অসহযোগ আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল কলেজ কর্তৃপক্ষ। জগদীশচন্দ্রকে শুধু যে ইংরেজ অধ্যাপকের সমান বেতন দিতে স্বীকৃতি হল তাঁর তিন বছরের সমস্ত প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হল। এই অর্থে পিতার সমস্ত দেনা শোধ করলেন জগদীশচন্দ্র।

গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়াই জগদীশচন্দ্র ইলেকট্রিক রেডিয়েশন বিষয়ে গবেষণা করতেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ছিল, "বিদ্যুৎ-উৎপাদক ইথার তরঙ্গের কম্পনের দিকে

পরিবর্তন" এই প্রবন্ধটি তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে পেশ করেছিলেন। এর পরের প্রবন্ধগুলি ইংল্যান্ডের "ইলেকট্রিসিয়ান" পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই সময় জগদীশচন্দ্র বিনা তারে বৈদুতিক তরঙ্গের মাধ্যমে শব্দকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিভাবে পাঠানো যায় সেই বিষয়ে গবেষণা করছিলেন. আমেরিকায় বিজ্ঞানী লজ, ইতালিতে মার্কনী। জগদীশচন্দ্র ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী। ১৮৯৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম এই বিষয় পরীক্ষা করেন। কলকাতার টাউন হলে সর্বসমক্ষে এই পরীক্ষা করেন। এর পরে তিনি বিনা তারে তাঁর উদ্ভাসিত যন্ত্রের সাহায্যে নিজের বাসা থেকে এক মাইল দূরে কলেজে সঙ্কেত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। এই কাজ অসমাপ্ত রেখেই তিনি পশ্চিমে যাত্রা করলেন।

১৮৯৬ সালে তিনি এক বছরের ছুটির জন্য দরখাস্ত করলেন। প্রথমে সম্মত না হলেও শেষ পর্যন্ত গভর্নর তাঁকে গবেষণার জন্য ইংল্যান্ডে যাবার অনুমতি দিলেন।

Wirelcss telgraphy সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কার ইংল্যান্ডে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন. "একটি বিখ্যাত ইলেকট্রিক কোম্পানি আমার পরামর্শ মত কাজ করে Wirelcss telgraphy বিষয়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছেন আমি আর একটি নূতন পেপার লিখিয়াছি তাহাতে Practical Wirelcss telgraphy-র অনেক সুবিধা হইবে।"

অর্থনৈতিক কারণে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ব্যাহত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৮৯৬ সালে মার্কনী Wirelcss telgraphy-র প্রথম পেটেন্ট নিলেন।

ব্রিটেনে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

লন্ডনে থাকার সময় জগদীশ অনুভব করলেন বিলাতে বিজ্ঞানীরা কত আধুনিক গবেষণাগারের সুযোগ পাচ্ছে। তাঁর অনুরোধে লর্ড কেলভিন ও অন্য বিজ্ঞানীরা ভারত সচিবের কাছে গবেষণার সুযোগ প্রদান করবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

ভারতবর্ষে এসে তিনি এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন, মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯১৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি আধুনিক ল্যাবরেটরি গড়ে উঠল।

১৮৯৭ সালে জগদীশচন্দ্র দীর্ঘ প্রবাস জীবন যাপন করার পর ভারতবর্ষে ফিরে এলেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে আবার অধ্যাপনার কাজ শুরু করলেন সেই সাথে গবেষণা। এই সময়েই তাঁর উদ্ভিদ বিষয়ক যুগান্তকারী গবেষণা আরম্ভ করেন।

১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ডাক এল জগদীশচন্দ্রের। জুলাই মাসে জগদীশচন্দ্র প্যারিসে পৌঁছবেন। এখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "জীব ও জড়ের উপর বৈদ্যুতিক সাড়ার একত্বতা।"

ফ্রান্স থেকে জগদীশচন্দ্র গেলেন ইংলন্ডে। সেখানে জীব ও জড়ের সম্পর্ক বিষয়ে ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশনের ব্রাডফোর্ড সভায় বক্তৃতা দিলেন।

১৯০২ সালে জগদীশচন্দ্র ভারতে ফিরে এসে রচনা করলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে "জীব ও জড়ের সাড়া" (১৯০২) (Responses in the living and non living) ১৯০৬ সাল প্রকাশিত হল তাঁর আর একটি গ্রন্থ "উদ্ভিদের সাড়া" (Plant Responses 1906)। এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে তিনি প্রমাণ করলেন উদ্ভিদ বা প্রাণীকে কোনভাবে উত্তেজিত করলে তা থেকে একই রকম সাড়া পাওয়া যায়। এই সময় ইউরোপ থেকে ডাক এল। তিনি প্রথমে গেলেন ইংল্যান্ড, সেখান থেকে আমেরিকা। বিশেষত আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে ছিল যথেষ্ট কৌতূহলী তাছাড়া ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী মহলও ধীরে ধীরে গবেষণার সত্যতাকে স্বীকার করে নিচ্ছিলেন। দেশে ফিরে এসে তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের গবেষণা শুরু করলেন, "উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহকলার মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা"। এই সময় তিনি উদ্ভাবন করলেন তাঁর বিখ্যাত যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর অতি সূক্ষ্মতম সঞ্চালনকেও বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেখানো সম্ভবপর।

ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে তাঁর একাধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৪ সালে তিনি চতুর্থবারের জন্য ইংল্যান্ড গেলেন। এইবার যাত্রার সময় তিনি সাথে করে শুধু যে তাঁর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে গেলেন তাই নয়, তাঁর সঙ্গে ছিল লজ্জবতী ও বনচাঁড়াল গাছ। এই গাছগুলি সহজেই সাড়া দেয়। তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, এছাড়া রয়েল সোসাইটিতেও তাঁর উদ্ভাসিত যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করলেন, জীবদেহের মত বৃক্ষেরও প্রাণ আছে, তারাও আঘাতে উত্তেজনায় অনুরণিত হয়।

১৯১৩ সালে জগদীশচন্দ্র চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবার সময় ছিল, কিন্তু তাঁর চাকরির মেয়াদ আরো দু'বছর বাড়ানো হল। ১৯১৫ সালে সুদীর্ঘ ৩১ বছর অধ্যাপনা করবার পর চাকরি জীবন থেকে অবসর নিলেন।

চাকরি জীবন শেষ হলেও তাঁর গবেষণার কাজ বন্ধ হল না। তিনি ইংল্যান্ডে থাকার সময় লন্ডনের রয়াল ইনস্টিটউটের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল ভারতবর্ষে যদি এই ধরনের একটি গবেষণার কাজে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

তিনি তাঁর পরিচিত জনের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাঁর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন।

এবার এই কাজে এগিয়ে এলেন দেশের বহু মানুষ। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীচন্দ্রচন্দ্র নন্দী দুই লক্ষ টাকা দিলেন। এছাড়া বম্বের দুই ব্যবসায়ী মিঃ এস আর বোমানজী দিলেন এক লক্ষ টাকা। মিঃ মূলরাজ খাতা সোয়া লক্ষ টাকা দিলেন। তাছাড়া জগদীশচন্দ্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে অর্থ সঞ্চয় করলেন, এইভাবে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা সংগৃহিত হল। জগদীশ নিজের সমস্ত জীবনেরর উপার্জন পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন। সরকারের তরফেকে বার্ষিক অনুদান হিসাবে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হল। এবং জমি অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে সাহায্য করা হল। অবশেষে ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের ৫৯তম জন্মদিনে প্রতিষ্ঠা হল বিজ্ঞান মন্দির। জগদীশচন্দ্রের স্বপ্নের এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার।

১৯২৮ সালে জগদীশচন্দ্র জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য জেনেভা গেলেন। জেনেভাতে অভূতপূর্ব সম্মান পেলেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর গবেষণা দেখে আইনস্টাইন মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলেন, জগদীশচন্দ্র পৃথিবীকে যে সব অমূল্য উপহার দিয়েছেন তার যে কোন একটির জন্যই বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

পরিণত বয়সে তিনি বেরিয়ে পড়েন পদ্মার উৎস সন্ধানে। তাঁর এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন অপূর্ব ভাষায় 'অব্যক্ত' গ্রন্থে বিজ্ঞানী আর সাহিত্যিক জগদীশ একাকার হয়ে গিয়েছেন। বাংলা গ্রন্থ আর লেখা হয়নি।

বয়স বাড়বার সাথে সাথে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়তেন জগদীশচন্দ্র।

গবেষণার কাজ ছেড়ে দিলেও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কাজ নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। মাঝে মাঝে দার্জিলিং যেতেন। জীবনের শেষ চার বছর কয়েক মাসের জন্য গিরিডিতে চলে যেতেন। ১৯৩৭ সালে তিনি তখন গিরিডিতে ছিলেন, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন,২৩শে নভেম্বর সকালের গোসলের সময় অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর হৃদয়স্পন্দন চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

জগদীশচন্দ্রের কোন সন্তান ছিল না। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর স্ত্রী অবলা দাস সব কিছু বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে দান করে যান।

৮১

জন মিলটন

[১৬০৮–১৬৭৪]

"একজন মহৎ কবি হবার জন্যে অবশ্যই তোমাকে একজন মহৎ মানুষ হতে হবে।" সমালোচক টেনির এই উক্তি সম্ভবত একটি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি ইংল্যান্ডের কবি জন মিলটন। মিলটনের জন্ম ৯ই ডিসেম্বর ১৬০৮ সাল, লন্ডনের ব্রড স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। বাড়ির পাশেই ছিল সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল গীর্জা। গীর্জার ঘন্টাধ্বনির ছন্দ শুনতে শুনতে জন্মমুহূর্ত থেকেই মিলটনের মনে জেগে উঠেছিল কবিতার ছন্দ। মিলটনের যখন জন্ম হয়, সমগ্র লন্ডন তখন শেক্সপীয়রের সৃষ্টির বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শোনা যায় মিলটনের সাথে একবার শেক্সপীয়রের সাক্ষাৎ হয় তখন মিলটন সাত বছরের বালক, শেক্সপীয়র পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়।

পিতা-মাতার ছয় সন্তানের মধ্যে মিলটন ছিলেন তৃতীয়। বাড়ির পরিবেশ ছিল মুক্ত স্বাধীন। শিক্ষা ও সঙ্গীতের একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠছিল বাড়িতে। তিনি লিখেছিলেন–ছেলেবেলা থেকেই আমার বাবা আমাকে সাহিত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করে তোলেন।

শৈশবে তাকে লন্ডনের বিখ্যাত সেন্ট পলস্ স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। স্কুলের চেয়ে বাড়ির পরিবেশ ছিল শিক্ষার অনুকূল।

ষোল বছর বয়েসে ক্রেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হলেন। সেখানকার পরিবেশ তাঁর মনোমত ছিল না একবার তাঁর কোন এক শিক্ষকের সাথে অকারণ বির্তকে জড়িয়ে পড়ে হাতাহাতি করবার অভিযোগ সাময়িকভাবে কলেজ থেকে বিতাড়িত হলেন।

কিছুদিন পর আবার কলেজে ভর্তি হলেন। তাঁর সৌন্দর্য, আচার ব্যবহার, মধুর কথাবার্তার জন্যে সকলেই ভালবাসত। সমস্ত কলেজে মিলটনের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল কেমব্রিজের নারী "The Cambridge Lady"। শিক্ষক ছাত্ররা তাঁর অভিমতকে সমর্থন না করলেও তাঁর চরিত্রের সততার জন্য শ্রদ্ধা করত। চব্বিশ বছর বয়েসে কেমব্রিজ থেকে পাশ করে বার হলেন। তিনি শুধু সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেলেন না, আটটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলেন।

তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল মিলটন সাহিত্য সৃষ্টির সাথেই যাজকের জীবন বেছে নেবেন। কিন্তু আজন্ম বিদ্রোহী মিলটন কোনদিনই চার্চকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি।

তিনি লন্ডনের সতেরো মাইল দূরে হর্টন গ্রামে গেলেন। সেখানে তাঁর বাবার একটি বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতেই তাঁর মা থাকতেনই এখানে পাঁচ বছর ধরে চলল সাহিত্য, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রতিটি বিষয়েই গভীর অধ্যয়ন।

মিলটন লিখেছেন এই পাঁচ বছর আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। বাবার কারবার আমাকে সমস্ত আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রেখেছিল।

পাঁচ বছরের অজ্ঞাতবাস শেষ করে তিনি স্থির করলেন, মানুষের সমাজে ফিরে যাবেন। নাইটঙ্গেলের গান, মুক্ত প্রকৃতি ছাড়াও নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে গেলে মানুষের সান্নিধ্য প্রয়োজন। তিনি লন্ডনে ফিরে এলেন। পরিচয় হল কিছু জ্ঞানী মানুষের সাথে। কয়েকজনের সাথে গড়ে উঠল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।

১৬৩৭ সালে মিলটনের মা মারা গেলেন। মায়ের মৃত্যুতে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন মিলটন।

মিলটনের বাবা ছেলের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে ইতালি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এখানে এসে পেলেন এক নতুন জীবন। একের পর এক ইতালির বিভিন্ন শহর ঘুরতে থাকেন। পরিচয় হল সে দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষের সাথে। দেখা হল গ্যালিলিওর সাথে। গ্যালিলিও তখন বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। এখানে কয়েকজন বিখ্যাত সঙ্গীতকারের সান্নিধ্য পেলেন। ইতালির তৎকালীন সাহিত্য, শিল্পকলার চেয়ে সঙ্গীত তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। ইতালির কিছু কবি সমালোচক তাঁর ল্যাটিন ভাষায় লেখা কবিতা পড়ে মুগ্ধ হলেন। তাদের আন্তরিকতায় মনে হল ঘরের ছেলে যেন ঘরে ফিরে এসেছে।

ইংল্যান্ড থেকে সংবাদ এল দেশে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাঁর দেশভ্রমণের ইচ্ছা স্থগিত রাখলেন। তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন।

ইতালি থেকে প্রত্যাবর্তন করবার আগে মিলটন ভেবেছিলেম তিনি এক অসামান্য কাব্য রচনা করবেন, কিন্তু ইংল্যান্ডে ফিরে আসবার পরেই তাঁর মধ্যে জেগে উঠল বিদ্রোহী সত্তা- "এবার আর কাব্য নয়, এখন প্রয়োজন গদ্যের।"

লন্ডনে এসে পাকাপাকিভাবে ঘর বাধলেন মিলটন। নিজেকে ঘোষণা করলেন এই যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে। তবে তাঁর অস্ত্র বন্দুক নয়, কলম।

মিলটন ধর্মীয় বিবাদ-বিসংবাদকে অপছন্দ করতেন কিন্তু মানুষের এই বিবাদকে অস্বীকার করলেন না। "অন্য মানুষের ঘামঝারানো পরিশ্রমে আমি আরাম আনন্দ ভোগ করতে চাই না। যারা তা ভোগ করে আমি তাদের ঘৃণা করি।"

মিলটনের অন্তরের ক্ষোভ ফেটে পড়ল তাঁর লেখায়। প্রথম আঘাত হানলেন খ্রিস্টান যাজক ধর্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে। যারা ধর্মের নামে চার্চের পবিত্র পরিমণ্ডলকে দূষিত করে তুলেছে। যারা হিংস্র নেকড়ের মত অন্যকে সেবা করবার পরিবর্তে নিজেরাই অন্যের সেবায় পরিপুষ্ট হচ্ছে। শুধু ধর্ম নয় আরো অনেকের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার কলম গর্জে উঠল। সমাজের শাসক শ্রেণীর দুর্নীতি, তাদের ব্যভিচার, শাসনের নামে শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করলেন। মিলটন জানতেন তাঁর এই লেখার পরিণতি কি ভয়ঙ্কর হতে পারে। শুধু কারাদণ্ড নয়, মৃত্যু অবধি হতে পারে তাঁর। তবুও সামান্যতম ভীত হলেন না।

১৬৪৪ সালে ২৪ শে আগস্ট রাজার নির্দেশে নতুন আইন প্রস্তুত করে বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সমস্ত বিষয়ে লেখার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হল।

স্যামসনের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মিলটন যেন নিজেকেই প্রতিবিম্বিত করেননি, এতে ফুটে উঠেছে সমগ্র ইংরেজ জাতির অবক্ষয়। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চার্লসের আমলে সমগ্র জাতি যেন নতজানু হয়ে রাজশক্তির করুণা ভিক্ষা করছে।

তিনি স্বপ্ন দেখতেন স্যামসনের মত তাদের অন্তরেও চিরবিদ্রোহী আত্মা জেগে উঠুক। জন্ম নিক নতুন স্বাধীন মুক্ত ইংল্যান্ড।

এই বুকভরা স্বপ্ন নিয়েই ১৬৭৪ সালের ৮ই নভেম্বর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন ইংরাজি তথা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জন মিলটন।

৮২

জর্জ ওয়াশিংটন

[১৭৩২-১৭৯৯]

জর্জ ওয়াশিংটনের জন্ম আমেরিকায় ভার্জিনিয়াতে। জন্ম তারিখ ২২.২.১৭৩২। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ইংল্যেন্ডের নর্দাম্পটন-সায়ারের অধিবাসী। জর্জের বাবা নিজের চেষ্টায় বেশ কিছু বিরাট বিরাট খামার গড়ে তুলেছিলেন। জর্জের বাবা প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রীর একটি মাত্র ছেলে ছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রথম সন্তান জর্জ। ছেলেবেলায় বাড়িতেই পড়াশুনা করতেন জর্জ। আর বাকি সময়ে খামার ঘুরে ঘুরে চাষবাস দেখাশুনা করতেন। যখন তাঁর এগারো বছর বয়স, অপ্রত্যাশিতভাবেই বাবা মারা গেলেন।

জর্জের বৈমাত্রেয় ভাই লরেন্স শ্বশুরবাড়িতে থাকত। লরেন্সের শ্বশুর লর্ড ফেয়ারফ্যাক্স ছিলেন ভার্জিনিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। লরেন্স জর্জকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। তিনিই জর্জের শিক্ষার বন্দোবস্ত করলেন। পাঁচ বছর ফেয়ারফ্যাক্স (FairFax) পরিবারেই রয়ে গেলেন জর্জ। এই সময় সেনানডোয়া নামে এক উপত্যাকায় ষাট লক্ষ একর জমি কিনলেন লর্ড ফেয়ারফ্যাক্স। এই জমির মাপ করবার জন্য একদল সার্ভেয়ারকে সেখানে পাঠানো হল। জর্জ ওয়াশিংটনকে একজন সহকারী সার্ভেয়ার হিস্যাবে কাজে নিলেন ফেয়ারফ্যাক্স।

প্রতিকূলতা অসুবিধা সত্ত্বেও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন ওয়াশিংটন। যথাসময়ে কাজ শেষ হল। জর্জের কাজে খুশি হয়ে ফেয়ারফ্যাক্স তাঁকে প্রধান সার্ভেয়ারের পদে নিযুক্ত করলেন। তখন ওয়াশিংটনের বয়স মাত্র ১৭। দু'বছর প্রধান সার্ভেয়ার হিসাবে কাজ করলেন।

ভার্জিনিয়ার সেনাপতি হিসাবে তিনি মাত্র তিন বছর ছিলেন। তারপর স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করে ফিরে এলেন নিজের জমিদারি মাউন্ট ভার্ননে। এই সময় পরিচয় হল মার্থা ড্রামড্রিজের সাথে। ড্রামড্রিজ ছিলেন বিধবা, বিরাট জমিদারির মালিক। মার্থা আকৃষ্ট হলেন ওয়াশিংটনের ব্যক্তিত্বে বিয়ে হল দুজনের। এই বিবাহিত জীবনে দুজনেই সুখী হয়েছিলেন। এর পরের সতেরো বছর তিনি জমিদারির কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

১৭৭৪ সালে ফিলাডেলফিয়া শহরে তেরোটি মার্কিন উপনিবেশের প্রতিনিধিদের প্রথম সম্মেলন বসল। জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন ভার্জিনিয়ার সবচেয়ে ধনী ও সম্মানীয় ব্যক্তি। তাঁকে ভার্জিনিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করা হল। এই অধিবেশনেই সমস্ত সদস্যদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল ইংল্যেন্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

পরের বছর দ্বিতীয় অধিবেশন বসল। এই অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে ওয়াশিংটনকে সমগ্র উপনিবেশের সেনাপ্রধান হিসাবে নিযুক্ত করা হল। ওয়াশিংটন স্ত্রীকে লিখলেন, "আমার ভাগ্য আমাকে এই পদ দিয়েছে।"

অবশেষে ৭ই জুন ১৭৭৬ তেরোটি প্রদেশের প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করল। পাঁচজনের এক পরিচালনা গোষ্ঠী তৈরি হল। এর প্রধান হলেন টমাস জেফারেসন। ৪ঠা জুলাই (4th July) ১৭৭৬ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করা হল। এতে স্বাধীনতা ঐক্যের কথা প্রচারিত হল। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে শুরু হয়ে গেল ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে আমেরিকানদের যুদ্ধ। নানান প্রতিকূলতার মধ্যে ওয়াশিংটনকে তাঁর সৈন্যবহিনী সংগঠিত করতে হয়েছিল। তাঁর সৈন্যদের মধ্যে খুব কমই ছিল নিয়মিত সৈন্য। তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও ছিল না। উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না।

ওয়াশিংটন জানতেন তাঁর সেনাদলের সামর্থ্য নিতান্তই কম। তারা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে যুদ্ধ করে চলেছে। তাই পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে গেলেন। ওয়াশিংটনের সৈনিকরা তাঁকে বলত "দরকারী মানুষ"। অথচ নিজের জীবনকে তিনি কখনো

দরকারী বলে মনে করতেন না। একদিন অন্য সব সামরিক অফিসারদের সাথে খেতে বসেছেন, এমন সময় একটি রেড ইন্ডিয়ান ঘরে ঢুকে পড়ল। টেবিলের উপর রাখা মাংসের পুরো রোস্টটা তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। তখন খাবারের ভীষণ অভাব। সকলে রেড ইন্ডিয়ানকে শাস্তি দেবার জন্য উঠে দাঁড়িতেই ওয়াশিংটন বাধা দিলেন। তিনি বললেন, ওকে ছেড়ে দাও, দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন ওর কিছু খাওয়া হয়নি।

তাঁর দলের সৈনিকদের সুযোগ-সুবিধার দিকে তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ নজর। একদিন কোন একটি ক্যাম্পে একজন সৈনিক ঠাণ্ডা লেগে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সমস্ত রাত ধরে কাশছিল। শেষ রাতে হঠাৎ দেখতে পেল কেউ তার তাঁবুতে ঢুকছে। কাছে আসতেই চমকে উঠল, স্বয়ং ওয়াশিংটন তাঁর কষ্ট দেখে চা নিয়ে এসেছেন। প্রথম দিকে ইংরেজ বাহিনী সাফল্যলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। দীর্ঘ পাঁচ বছর মরণপণ সংগ্রামের পর অবশেষে ইংরেজ সেনাপতি কর্ণওয়ালিশ ১৭৮১ সালে আত্মসমর্পণ করলেন। যুদ্ধে জয়ী হল আমেরিকানরা। এই যুদ্ধ জয়ের পেছনে ওয়শিংটনের ভূমিকার ছিল সবেচেয়ে বেশি। তাঁর ইচ্ছাশক্তি, সৈনিকদের প্রতি ভালবাসা এবং শৃঙ্খলাবোধ এই যুদ্ধে তাঁকে বিজয়ী নায়কের গৌরব দিয়েছিল।

আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক হয়েও তার কোন উচ্চাশা ছিল না। তিনি নিজের কর্তব্য শেষ করে প্রধান সেনাপতির পদ ত্যাগ করলেন। ফিরে এলেন নিজের জমিদারিতে।

কিন্তু আমেরিকার মানুষ চাইছিল তাঁর অসামান্য কর্মকুশলতাকে কাজে লাগাতে। ১৭৮৭ সালে দেশের সংবিধান তৈরি করার জন্য সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিরা সম্মিলিত হলেন। ওয়াশিংটনও সেখানে যোগ দিলেন। নতুন সংবিধানের রূপরেখা বর্ণনা করে সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে জর্জ ওয়াশিংটনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করলেন। তিনি হলেন আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রথমেই তিনি দেশ ও সমস্ত জাতিকে শান্তিপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানালেন।

তিনি জানতেন দেশের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মত ও বিরোধী পক্ষ। সকলে সাহায্য ছাড়া এই শিশু রাষ্ট্রকে কখনোই গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। তাই তিনি তাঁর মন্ত্রিসভায় দুটি বিরোধী পক্ষকে একত্রিত করবার চেষ্টা করলেন। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ছিলেন রক্ষণশীল দলের প্রধান এবং ধনতন্ত্রের জোরালো সমর্থক। তাঁকে দেশের রাজস্ব বিভাগের ভার দেওয়া হল এবং টমাস জেফারসন ছিলেন গণতন্ত্রের সমর্থক, তাঁকে স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব দিলেন।

ওয়াশিংটন জানতেন দেশের সামনে এখন সমস্যা। একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তিরাই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। তাই সমস্ত দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে জেফারসন ও হ্যামিলটনকে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক। হ্যামিলটন ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ। তিনি নানান কর বসিয়ে ইউনিয়ন সরকারের আয় বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে ঋণ হয়েছিল। সেই ঋণভার রাজ্য সরকারের হাত থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিলেন। জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হল। অভ্যন্তরীণ উন্নতির সাথে সাথে বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলবার দিকে নজর দিলেন ওয়াশিংটন। এমনকি ব্রিটেনের সাথেও তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন নতুন কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে।

১৭৯৩ সালে যখন ফরাসী বিপ্লব শুরু হল, তিনি বিপ্লবীদের সমর্থন করলেও নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করলেন। এর ফলে আমেরিকা প্রতিটি বিবদমান দেশেই বাণিজ্য করবার সুযোগ পেল। দেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে অসাধারণ যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য ১৭৯২ সালে তাঁকে দ্বিতীয়বারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হল।

দ্বিতীয় বারে নির্বাচন কাল শেষ হল। তাঁকে সকলেই অনুরোধ জানালে তৃতীয় বারের জন্য নির্বাচিত হতে। তিনি সবিনয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি কর্মক্ষম স্বাস্থ্যবান রয়েছি...শুধুমাত্র সেই কারণেই আমি এই পদ চাই–না এটা শুধু অযৌক্তিক নয়, অপরাধ হবে যদি আমি পদ আঁকড়ে থাকি। হয়ত অপর কেউ আমার চেয়েও আরো ভালভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারবে।" তিনি ইংল্যান্ডের ক্রমওয়েলের মতই এক নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু ক্রমওয়েলের মত তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁকে যে মহান দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। তার পর সেই দায়িত্ব অন্যের উপর তুলে দিয়ে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছিলেন।

উইলিয়াম হার্ভে

[১৫৭৮–১৬৫৭]

শরীরে রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভে। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ছিল মানুষের। সেই ভুল ধারণা নিয়েই এতকাল মানুষের চিকিৎসা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম হার্ভে দীর্ঘ ন'বছর ধরে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৬২৮ সালে একটি বাহাত্তর পৃষ্ঠার বই বার করেন। এই ছোট বইটার মধ্যে তিনি তুলে ধরেছেন শরীরের জটিল সমস্যাগুলো।

১৫৭৫ সালে ১লা এপ্রিল ফোকস্টোনে উইলিয়াম হার্ভের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। উইলিয়াম প্রথমে কিংস স্কুলে ও পরে কেমব্রিজে পড়াশুনা করেন। ১৫৯৭ সালে তিনি পাদুয়ায় পড়তে আসেন। এই পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্যাব্রিমিয়াসের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিক্ষালাভ করেন। যা পরবর্তীকালে তাঁর আবিষ্কারে সাহায্য করে। বিজ্ঞানী ফ্যাব্রিমিয়াসই বলেন যে মানুষের শরীরে শিরার মধ্যে ভাল্‌ভ বা কপাটক আছে। এই ভাল্‌ভ বা কপাটকের কি কাজ তিনি বুঝতে পারেননি। তাই রক্ত সঞ্চালনের ব্যাখ্যা অসমাপ্তই রয়ে গেল। হার্ভে তা পরীক্ষার দ্বারা দেখালেন যে এই ভাল্‌ভ বা কপাটকই হৃৎপিণ্ডে অন্য যে কোন দিক থেকে রক্তের প্রবাহকে বাধা দেয়। তিনিই রক্ত সঞ্চালনের গুরুত্ব বিষয় আবিষ্কার করলেন।

পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ মেডিসিন ডিগ্রী নিয়ে তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন। ১৬০৯ সালে তিনি বার্থোলোমিউ হাসপাতালে চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি রোগীদের পরীক্ষা করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন ও এই সিদ্ধান্তে এলেন যে মানুষের শরীরে রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে এতদিন যা ধারণা ছিল তা সবই ভুল। তবে পুরনো তথ্যের ভুলটা কোথায়–সেটা জানার জন্যে তিনি বছরের পর বছর যা পেয়েছেন তাকেই কাটাকুটি করে দেখেছেন। সব জন্তু-জানোয়ার, পাখি, ব্যাঙ, সাপ, ইঁদুর সবই তিনি কাটাকুটি করেছেন ও তার সাথে পরীক্ষাও করেছেন।

এখন তো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শোণিত সংবহন পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু চারশ বছর আগে এটা খুবই কঠিন কাজ ছিল। তখন তো অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না।

ফ্যাব্রিসিয়াসের কাছ থেকে হার্ভে জেনেছিলেন শিরায় কপাটক আছে। এই কপাটকের মানেই হল রক্ত একমাত্র শিরার ভেতর দিয়ে একদিকে প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু কোন দিকে রক্ত প্রবাহিত হয় সেকথা তিনি বলতে পারেন নি। হার্ভে দেখলেন এই রক্ত প্রবাহ হয় হৃৎপিণ্ডের দিকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে রক্ত কোথা থেকে আসছে? পাকস্থলী বা যকৃত থেকে রক্ত আসছে এই আগে ধারণা ছিল, কিন্তু উইলিয়াম হার্ভে তা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে রক্ত মোটেই দু'রকমের নয়। একই রকমের রক্ত শিরা ও ধমনীতে প্রবাহিত হয়। রক্ত শুধু হৃৎপিণ্ডের মধ্যেই নয় শরীরের সব জায়গায় এবং সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে যে রক্ত পাম্পের মত প্রতিক্রিয়ায় বেরিয়ে আসে, বৃত্তাকারে তা শরীরে প্রবাহিত হয় এবং আবার তার সূত্রে ফিরে আসে। শোণিত সংবহন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই মৃত্যু হওয়া। হৃৎপিণ্ড এ কাজ করে রক্তবাহী নালীর সাহায্যে। উইলিয়াম হার্ভে তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করতে চাননি। ১৬১৫ সালে বই প্রকাশের বার বছর আগে রয়্যাল কলেজে বক্তৃতা দেবার সময় তাঁর আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেন। তখন কেউই পাত্তা দেয়নি।

১৬২৮ সালে তাঁর গবেষণা প্রায় বন্ধ হবার পর চিকিৎসা মহলে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেইসময় তাঁর গবেষণা প্রায় বন্ধ হবার মুখে। হার্ভের বিরোধীরা অনেক পরীক্ষা করেও হার্ভের আবিষ্কারকে নিয়ে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারল না। তাঁরা দেখলেন হার্ভের কথাই ঠিক ও অভ্রান্ত। তাঁর আবিষ্কারে ডাক্তারদের চিকিৎসাও ভাল হতে থকে।

এতে ডাক্তারদের প্র্যাকটিস বেড়ে গেল। যার ফলে হার্ভের খ্যাতি ও যশ বেড়ে গেল। তিনি প্রথম চার্লসের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। প্রথম চার্লস হার্ভের আবিষ্কারে খুব খুশী হন। তিনি তাঁকে গবেষণার জন্য সব ব্যবস্থা করে দিলেন। হার্ভে রাজাকে তাঁর বই উৎসর্গ করলেন, এই বলে যে শরীরের কাছে হৃৎপিণ্ডের যে স্থান, রাজতন্ত্রের কাছেও রাজার সেই স্থান। তিনি খুব রাজার ভক্ত ছিলেন। এরপর লাগল গৃহযুদ্ধ। রাজার সাথে হার্ভে ত্যাগ করলেন লন্ডন।

প্রচন্ড যুদ্ধের মধ্যেও তিনি গবেষণা করে যান। তিনি রাজার সঙ্গে অক্সফোর্ড সফরে যান।

রাজপরিবারের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল বলে তাঁর বার্থোলোমিউ হাসপাতালের চাকরিটাও চলে যায়। অক্সফোর্ড ছেড়ে তিনি চলে আসেন লন্ডনে। তিনি খুব ভুগছিলেন গেঁটেবাতের যন্ত্রণায়। ঠান্ডা পানিতে পা ডুবিয়ে তিনি সারাটা দিন কাটাতেন। তখন তাঁর বয়স ছিল আটষট্টি।

হার্ভের আবিষ্কার ইউরোপের সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। ১৬৫৪ সালে রয়্যাল কলেজ তাঁকে সভাপতির পদে বসিয়ে সম্মান দেন। কিন্তু তিনি তার গ্রহণ করেন নি। কারণ বয়স বেশি ও শারীরিক অসুস্থতা। ১৬৫৭ সালে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এবং কথা বলার ক্ষমতাও ছিল না। হার্ভে নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা যান। স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রয়্যাল কলেজকে দান করে দেন। যাতে চিকিৎসকরা গবেষণা করে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারে।

১৮৮৩ সালে কলেজের ফেলোরা হার্ভের যাবতীয় স্মৃতি সরিয়ে সংরক্ষণ করেন হেম্পস্টেড গির্জার মার্বেল পাথরে তৈরী হার্ভে স্মৃতিকক্ষে। উইলিয়াম হার্ভের আবিষ্কার চিকিৎসা জগতে এক অমর কীর্তি। ১৬৫৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এক ভাইপোকে দিতে না দিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৮৪

ইবনে রুশ্‌দ

(১১২৬-১১৯৯ খ্রিঃ)

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মুসলিম সভ্যতাকে বিশ্ব জনমনের স্মৃতিপট থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশ্ব বিখ্যাত যে সকল মুসলিম মনীষীদের নামকে বিকৃত করে লিপিবদ্ধ করেছে, তাঁদের মধ্যে ইবনে রুশ্‌দ এর নাম অন্যতম। তারা অধিকাংশ মনীষীর নাম এমনভাবে বিকৃত করেছে, নাম দেখে বুঝার উপায় নেই সে উনি একজন খাঁটি মুসলমান এবং খোদা ভীরু ছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইবনে রুশ্‌দ এর নাম বিকৃত করে 'এভেরোস' লিপিবদ্ধ করেছে। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল ওয়ালিদ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে রুশ্‌দ।

১১২৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে একটি বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ স্পেনের রাজনীতিতে বিশেষভাবে জাড়িত ছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি। এছাড়া তিনি কর্ডোভা জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন এবং মালেকী মাজহাবের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিতও ছিলেন।

ইবনে রুশ্‌দ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান আধ্যাত্মবাদী। কথায় ও কাজে ছিলেন আল্লাহ্‌ পাকের এক অনুগত বান্দা। বাল্য ও কৈশোরে তিনি কর্ডোভা নগরীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি যে সকল শিক্ষকের নিকট জ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম হল-ইবনে বাজা এবং আবু জাফর হারুন। জ্ঞান সাধনার প্রতি তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। তিনি তাঁর মেধা ও প্রতিভার বলে খুব কম সময়ের মধ্যেই কোরআন, হাদিস, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা তাঁর পাণ্ডিত্য ও কর্ম দক্ষতার সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে তাঁকে অপরদিকে তাঁর চিকিৎসার খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে মুগ্ধ হয়ে খলিফা আবু ইয়াকুব ইউসুফ ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসক ইবনে তোফায়েলের মৃত্যুর পর তাঁকে রাজ চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করেন এবং পরবর্তীতে ইয়াকুবের পুত্র খলিফা ইয়াকুব আর মনুসুরও ইবনে রুশদকে রাজ চিকিৎসক পদে বহাল রাখেন। এরূপ রাজকীয় পদমর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এ মহান মনীষী ভোগ বিলাসের মধ্যে ডুবে যাননি।

সরকারি বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পর তিনি জীবনের সমস্ত অবসর সময়ে মানুষের কল্যাণে জ্ঞান সাধনা, দর্শন, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করতেন। কথিত আছে, তিনি বিবাহ ও পিতার মৃত্যুর রাত্রি ব্যতীত আর কোন রাত্রিতেই অধ্যয়ন ত্যাগ করেননি।

ইবনে রুশ্‌দ কখনো অন্যায় ও অসত্যের সামনে সত্য ও ন্যায়কে প্রকাশ করতে ভয় করতেন না। তিনি তাঁর দর্শন ও ধর্মীয় বিষয়ে বলিষ্ঠ মতবাদ ব্যক্ত করতেন। এতে কখনো কখনো খলিফারা তাঁর নির্ভীক ও স্পষ্ট মতবাদে বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠতেন। অপরদিকে খ্রিস্টান পাদ্রীরা প্রচার করেন, "তাঁর নাম পাপের প্রতি শব্দ।" অবশেষে খলিফা ইয়াকুব আল মনসুর তাঁকে প্রধান বিচারপতি'র পদ থেকে অপসারণ করেন। এতেও খলিফা সন্তুষ্ট হলেন না।

১১১৯ ইং সালে খলিফা তাঁকে কর্ডোভার নিকটবর্তী ইলিসাস নামক স্থানে নির্বাসন দেন এবং তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ইবনে রুশ্‌দ চরম অপমান ও আর্থিক দূরবস্থায় পতিত হন। ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে খলিফা তাঁর ভুল বুঝতে পেরে লোক পাঠিয়ে ইবনে রুশ্‌দকে ফিরিয়ে আনেন এবং পূর্ব পদে পুর্নবহাল করেন। কিন্তু তিনি এ সুযোগ বেশি দিন ব্যবহার করতে পারেননি। ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে এ মুসলিম মনীষী ইহলোক ত্যাগ করেন।

এ মনীষী দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আইন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে যান। কিন্তু তাঁর প্রণীত অনেক গ্রন্থই সংরক্ষণের অভাবে আজ বিলুপ্ত প্রায়। তাঁর প্রণীত প্রায় ৮৭টি বই এখনো পাওয়া যায়। তিনি গোলকের গতি সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম 'কিতাবু ফি হারকাতুল ফালাক'। গ্রন্থটি জ্যাকব আনাতোলি কর্তৃক ১২৩১ সালে হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২০টি। এগুলোর অধিকাংশই ইংরেজি, ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর তাঁর প্রণীত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'কিতাব আল কুলিয়াত ফি–আততীব'। এ গ্রন্থটিতে তিনি অসংখ্য রোগের নাম, লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী বর্ণনা করেছেন। ধর্ম ও দর্শনের উপর তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'তাহদজুল আল তাহদজুল' যার ইংরেজি অনুবাদের নাম হচ্ছে, 'The Incoherence of the Incoherence' এছাড়া ইবনে রুশ্‌দ সঙ্গীত ও ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করেন।

৮৫

পিথাগোরাস

[৫৮০–৫০০]

গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে যিনি আদিপুরুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন তাঁর নাম পিথাগোরাস। তিনি ছিলেন একাধারে গণিতজ্ঞ চিন্তাবিদ দার্শনিক। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বর্তমান তুরস্কের পশ্চিমে ইজিয়ান সাগরের সামস দ্বীপে পিথাগোরাসের জন্ম। এই সামস ছিল গ্রীসের ক্রোতনা দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। ছেলেবেলা থেকেই বিদ্যা অনুরাগের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল পিথাগোরাসের। তিনি বিশ্বাস করতেন কোন একজন গুরুর কাছে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। জ্ঞানের ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে পৃথিবীব্যাপী। তাই সামস শহরে তাঁর শিক্ষা শেষ করে বার হলেন দেশভ্রমণে। সেই সময় গ্রীস দেশের বাণিজ্যতরীগুলি বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করতে যেত। এমনি একটি জাহাজে করে তিনি রওনা হলেন মিশরে। প্রাচীন গ্রীসের মত প্রাচীন মিশরও ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রভূমি। এখানে প্রধানত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষালাভ করেন।

মিশরে অবস্থানের সময় পিরমিড দর্শন করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। বিশাল পিরামিড নির্মাণের সময় যে গাণিতিক নিয়ম অনুসারে পাথরগুলিকে সাজান হয়েছিল তা থেকেই সম্ভবত তাঁর মনে প্রথম জ্যামিতির সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা জেগে ওঠে। যদিও জ্যামিতির জনক ইউক্লিড, (আনুমানিক ৩২০–২৭৫ খ্রিস্টপূর্ব)। তিনিই প্রথম জ্যামিতির জন্য সুসংহতভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।কিন্তু তাঁর অন্তত দুশো বছর আগে পিথাগোরাস জ্যামিতি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এরই পরণতি তাঁর বিখ্যাত উপপাদ্যটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ ওই ত্রিভুজের অপর দুই বাহুর উপর বর্গের যোগফলের সমান।

এই বিষয়ে ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। পিথাগোরাস দেশভ্রমণ করতে করতে ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হন। প্রাচীন মিশরের মত প্রাচীন ভারতবর্ষও ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রভূমি। পিথাগোরাসের আবির্ভাবের অন্তত একশ বছর ভারতীয় পণ্ডিত বৌধয়ন জ্যামিতি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। সম্ভবত তাঁর কোন সূত্র থেকে পিথাগোরাস এই উপপাদ্যটি রচনা করেন। কোন সূত্র থেকে তিনি এই রচনাটি করেছিলেন তা জানা না গেলেও এটি যে তার মৌলিক রচনা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিবাহ ও বন্ধু নির্বাচনের সময় তিনি সংখ্যার খুবই গুরুত্ব দিতেন। শোনা যায় কোন এক যুবরাজ তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বিবাহের সময় তিনি গণনা করে দেখলেন তাঁর নামের সংখ্যা ২৮৪। তিনি ঘোষণা করলেন যে কন্যার নামের সংখ্যা হবে ২২০, সেই হবে তাঁর আদর্শ স্ত্রী। তবে পিথাগোরাস তাঁর নিজের বিবাহের সময় এই সংখ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তিনি তাঁরই এক ছাত্রী থিয়ানোকে বিবাহ করেছিলেন। থিয়ানো শুধু তাঁর যোগ্য ছাত্রী ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন আদর্শ স্ত্রী। থিয়ানোর গর্ভে পিথাগোরাসের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

তার নাম ড্যামো। ড্যামো ছিলেন পিতার মতই পণ্ডিত দার্শনিক। পিথাগোরাস সমস্ত জীবন ধরে যা কিছু রচনা করেছিলেন তা গুপ্ত রাখবার জন্য কন্যাকে নির্দেশ দিয়ে যান। আমৃত্যু কন্যা সেই নির্দেশ পালন করেছিল।

সংগীতের সঙ্গে সংখ্যার যে নিবিড় সম্পর্ক-অর্থাৎ সংগীতের সাথে তাল ও লয়ের যে ঐক্য-তা পিথাগোরাসেরই আবিষ্কার। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি একদিন রাজপথ দিয়ে হাঁটছিলেন, পথের ধারে এক কামারের দোকান। অকস্মাৎ তাঁর কানে এল হাতুড়ি ঠোকার শব্দ। একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দের কোন ঐক্য খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি দোকানে সব কটি হাতুড়ি ওজন করে দেখলেন—তাদের ওজন হল ৬, ৮, ৯, ৭, এই সংখ্যাগুলির সম্পর্ক নির্ণয় করলেন (২×৩) অর্থাৎ ৬ (২×৪)= ৮ (৩×৩)= ৯। এই তিনটি হাতুড়ির আওয়াজের মধ্যে মিল খুঁজে পেলেন কিন্তু চতুর্থ হাতুড়িটির ওজন ছিল সামঞ্জস্যহীন, তাই তার আওয়াজও ছিল বেসুরো।

সংগীত ও ঔষধের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে বার করেছিলেন পিথাগোরীয়ানরা। তাঁদের মতে মানুষের দেহও বাদ্যযন্ত্রের মত নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। সংগীতের উচ্চ স্বর নিম্ন স্বরের মতই দেহ কখনো শীতল কখনো উত্তপ্ত হয়। নির্দিষ্ট সুরে যখন বাদ্যযন্ত্র বাঁধা থাকে তখনই তার তেকে সংগীতের উদ্ভব হয়। মানব দেহ যদি যন্ত্রের তারের মত চড়া পর্দায় বাঁধা হয় কিম্বা টান শিথিল হয়ে পড়ে তখন শরীরে নানান রোগের উদ্ভব হয়। বিপরীত বস্তুর প্রকৃত সংমিশ্রণের ফলে যে সুর ও ঐক্যের ভাব সৃষ্টি হয় তাই সত্যিকারের স্বাস্থ্য। সাস্থ্য বিষয়ে তাঁর বহু বক্তব্য আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

পিথাগোরাসই প্রথম বলেছিলেন পৃথিবীর আকার গোল। আমাদের চারপাশের গ্রহ-নক্ষত্র এই পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে। কোপার্নিকাস তাঁর রচনায় অপকটে পিথাগোরাসের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মত পিথাগোরাস জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মা অমর-তার লয় নেই। মৃত্যুর পর আত্মা নতুন দেহে জন্ম নেয়। একদিন পিথাগোরাস দেখলেন একটি লোক কুকুরটিকে মারছে। যন্ত্রণায় কুকুরটি চিৎকার করছে। কুকুরটির চিৎকারে বিচলিত হয়ে পড়লেন পিথাগোরাস। তাঁর মনে হল ঐ কণ্ঠস্বর তাঁর মৃত বন্ধুর। মৃত্যুর পর সে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। গণিতে তাঁর অবদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হেরোক্লিটাস স্বীকার করেছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অন্য সকলকে তিনি অতিক্রম করে গিয়েছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নির্ণয়ের প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, বিজ্ঞানের মধ্যেই আছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধতা এবং যে মানুষ এই বিশুদ্ধতাতেই নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। অ্যারিস্টটল তাঁর প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "পিথাগোরাসই প্রথম পাটিগণিতকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনের সীমারেখার গণ্ডি অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি ত্রিভুজের ব্যবহার জানতেন এবং ৩, ৪, ৫ সংখ্যার সাহায্যে সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করতে জানতেন। পরবর্তীকালে এটি পিথাগোরীয় ত্রিভুজ নামে পরিচিত হয়।

জীবনকালে গ্রীস দেশে পিথাগোরাসের জনপ্রিয়তা ছিল বিরাট। তাঁর ছাত্র শিষ্য ছাড়াও দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করত। ক্রমশই পিথাগোরাসের অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞানচর্চার চেয়ে রাজনীতির চর্চায় বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে। দেশের রাজশক্তি এতে চিন্তিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া কিছু বুদ্ধিজীবীও পিথাগোরাসের খ্যাতির জনপ্রিয়তা সম্মানে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। তারা রাজশক্তির সাথে একত্রিত হয়ে পিথাগোরাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করতে আরম্ভ করল। এই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে জনসাধারণ পিথাগোরাসের শিক্ষাকেন্দ্র আক্রমণ করল। পিথাগোরাসের শিষ্য যারা বাধা দিতে এল তারা মারা পড়ল, অনেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

শিষ্যদের অনুরোধে পিথাগোরাসও পালাতে আরম্ভ করলেন। তিনি বিক্ষুব্ধদের প্রায় নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ সামনে পড়ল কলাই জাতীয় এক শস্যের ক্ষেত। তিনি ইচ্ছে করলেই ক্ষেতের উপর দিয়ে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি বিশ্বাস করতেন-কলাইয়েরও প্রাণ আছে। একটি জীবন্ত কলাইয়ের উপর পা দেওয়ার অর্থ একটি জীবনকে হত্যা করা। নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও কলাইয়ের উপর পা রাখলেন না। সেই সুযোগে বিপক্ষ দলের লোকেরা এসে তাঁকে হত্যা করল। নিজের জীবন দিয়ে নিজের আদর্শকে রক্ষা করলেন পিথাগোরাস।

৮৬

ডেভিড লিভিংস্টোন

[১৮১৩-১৮৭৩]

প্রায় দেড়শো বছর আগেকার কথা। তখন আফ্রিকা মহাদেশকে বলা হত অন্ধকার মহাদেশ। উত্তরে মিশরকে বাদ দিয়ে আফ্রিকার অবশিষ্ট সমস্ত অঞ্চল জুড়েই ছিল গভীর অরণ্য। মানুষেরা ছিল আদিম অসভ্য বর্বর। শিক্ষার কোন আলোই সেখানে পৌছায়নি। সভ্য মানুষেরা যেখানে যেত শিকারের লোভে আর দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষায়। ডেভিট লিভিংস্টোন প্রথম মানুষ যিনি অন্ধকারে মহাদেশে গেলেন, মনে অদম্য সাহস, উৎসাহ, ভালবাসা আর আত্ম-উৎসর্গের অনুপ্রেরণা। তিনিই প্রথম মানুষ যিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে তুলে ধরেছিলেন আফ্রিকার মানুষের কাছে।

ডেভিড লিভিংস্টোনের জন্ম ১৮১৩ সালের ১৯শে মার্চ গ্লাসগোর কাছে ব্লানটায়ারে। তাঁর পিতা নীল লিভিংস্টোন ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। খুচরো চায়ের কারবারের সাথে মিশনারীর কাজ করতেন। প্রায়শই ধর্মীয় কাজে এত বেশি জড়িত হয়ে পড়তেন, ব্যবসায়ের ক্ষতি হত। কখনো তার জন্যে সামান্যতম দুঃখিত হতেন না নীল লিভিংস্টোন। মনে করতেন তিনি যা কিছু করেন ঈশ্বরের অভিপ্রেত অনুসারেই করেন।

নিজের এই ঈশ্বর বিশ্বাস পুত্রের মধ্যে অনুপ্রাণিত করেছিলেন পিতা। তিনি চাইতেন লিভিংস্টোন যেন কোন বিজ্ঞানের বই না পড়ে। ধর্মীয় সাধনায় পরিপূর্ণভাবে আত্মানিয়োগ করে। লিভিংস্টোন সমস্ত জীবন ধরে ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী কিন্তু কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি লিখেছিলেন কোন কোন ব্যাপারে আমি পিতার সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারতাম না। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কোনদিনই আমি ধর্মের শুকনো নিয়মের মধ্যে নিজেকে বাঁধতে পারিনি।

সংসারের অভাব-অনটনের জন্য দশ বছর বয়েসে ডেভিডকে সুতো কারখানায় কাজ নিতে হল। সেই শিশু বয়সেই তাঁকে প্রতিদিন চোদ্দ ঘণ্টা করে কাজ করতে হত। এত পরিশ্রম করেও তাঁর মধ্যে ছিল পড়াশুনা করবার প্রবল আগ্রহ। কাজের ফাঁকে যেটুকু সময় পেতেন তখনই নানান বিষয়ের বই পড়তেন। কারখানার অন্য শ্রমিকরা ভাবত বয়সের তুলনায় পাকা ছেলে। অনেকেই তাঁকে ঠাট্টা করত। কিন্তু শিশুকাল থেকেই এমন গভীর আত্মবিশ্বাস ছিল যে সামান্যতম বিচলিত হতেন না লিভিংস্টোন।

বই পড়তে পড়তে মনের মধ্যে জেগে উঠত নানান কল্পনা। সবচেয়ে ভাল লাগত ভ্রমণ কাহিনী। তাঁর মন ভেসে চলত অজানা দেশে। ভাবতেন তিনিও যাবেন ঐ সমস্ত দেশে। একদিন এক জার্মান মিশনারীর লেখা একটি বই তাঁর হাতে এল। বইখানি পড়তে পড়তে মিশনারী জীবনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। কিন্তু পিতার ধর্মীয় উন্মাদনাকে কোনদিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেননি লিভিংস্টোন। তাঁর মনের মধ্যে জেগে ওঠে এক গভীর সংশয় আর দ্বন্দ্ব। টমাস ডিকের লেখা একটি বই পড়ে তাঁর মনের মধ্যে এক নতুন চেতনার উন্মেষ হল। "ধর্ম এবং বিজ্ঞান কেউ পরস্পরের বিরোধী নয়। উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। বিজ্ঞান চেতনা নিয়ে যদি ধর্মের সাধনা করা যায় তবে সেখানে কোন গোঁড়ামি, ধর্মীয় উন্মাদনা প্রবল হয়ে উঠতে পারে না।" তখনই তিনি মিশনারী জীবনকে গ্রহণ করবার জন্য মনস্থির করলেন।

মিশনারী সোসাইটি থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তিনি তাঁর জবাবে বললেন, "আমি নিজেকে কখনো ঈশ্বরের দাস ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করিনি। তাঁরই অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণে আমি চালিত হয়েছি। মিশনারী হিসাবে আমি যে দায়িত্ব পালন করেছি তা বাইবেল হাতে ধর্মান্ধ প্রচারকদের থেকে কিছুমাত্র আলাদা নয়। তবে আমি শুধু ধর্মের প্রচারের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিনি। তারই সাথে সাথে মানুষের চিকিৎসা করেছি, রাজমিস্ত্রির কাজ করেছি, ছুতোরের কাজ করেছি। আমি মনে করি যখন আমি আমার সঙ্গীদের খাবার জন্য শিকার করি, যখন আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করি, মানুষের জন্য কোন কাজ করি, সবই প্রভু যীশুর সেবা।"

তিনি ফিরে এলেন আফ্রিকায়। শুরু হল নতুন করে জাম্বেসি অভিযান। এইবার লিভিংস্টোনের সঙ্গী হলেন তাঁর ভাই জন। কিন্তু নানান অসুবিধার জন্য মাঝপথেই এই অভিযান পরিত্যাক্ত হল। অকস্মাৎ লিভিংস্টোনে জীবনে নেমে এল এক বিচ্ছেদ বেদনা। তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু হল। লিভিংস্টোন লিখেছেন, "যখন তিনি তাকে বিয়ে করেছিলাম তখন থেকেই তাকে ভালবাসি, যতদিন বাঁচব তাকে ভালবেসে যাব।"

স্ত্রীর এই বিচ্ছেদ বেদনায় সাময়িক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন লিভিংস্টোন। সময়ের ব্যবধানে মনের শোক প্রশমিত হতেই নতুন অভিযানে বার হলেন। এইবার আবিষ্কার করলেন নিয়ামা হ্রদ। তার দশ দিনের মধ্যে উপস্থিত হলেন বাঙ্গোয়েল হ্রদের তীরে। এই হ্রদটিও অজানা ছিল ইউরোপীয়ানদের কাছে। নিয়ামা হ্রদের তীরে এসে সমুদ্রে ভাসার মত ছোট একটি ডিঙি তৈরি করলেন। এই ডিঙি বেয়েই আফ্রিকার সমুদ্র উপকূল থেকে ২৫০০ মাইল উত্তাল সমুদ্র পার হয়ে লিভিংস্টোন এসে পৌঁছলেন ভারতবর্ষের বোম্বে শহরে। ভারতবর্ষ তখন ইংরেজ উপনিবেশ। ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল লিভিংস্টোনের। কিন্তু তখন লন্ডন অভিমুখী একখানি জাহাজ যাত্রার জন্যে অপেক্ষা করছিল। লিভিংস্টোন আর অপেক্ষা করলেন না। সেই জাহাজের আরোহী হলেন। ১লা জুলাই ১৮৬৪ সালে তিনি ইংলন্ডের মাটিতে পা রাখলেন। ইংলন্ডে থাকাকালীন সময়ে তিনি তাঁর জাম্বেসি অভিযানের কাহিনী নিয়ে একখানি বই লিখলেন। এই বই প্রকাশের ব্যবস্থা করে তিনি আবার ফিরে চললেন আফ্রিকায়। ইংলন্ড তাঁর জন্মভূমি হলেও আফ্রিকা ছিল তাঁর কর্মভূমি। ইংলন্ডের সুখ বিলাসের মধ্যে থেকে প্রতিমুহূর্তে তিনি অন্তরে অনুভব করতেন আফ্রিকার আদিম অরণ্যের আহ্বান। এইবার আফ্রিকা যাত্রার সময় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নীল নদের উৎস আবিষ্কার করবেন। আফ্রিকায় থাকার সময় তিনি দেখেছিলেন নিগ্রোদের নিয়ে ইউরোপীয়ানদের দাস ব্যবসা শুরু হয়েছে। এই ঘৃণিত ব্যবসা দেখে মনে মনে ব্যথিত হতে লিভিংস্টোন। মনে হয়েছিল মানবিতার বিরুদ্ধে এই ঘৃণিত অপরাধকে যেমন করেই হোক তাঁকে বন্ধ করতেই হবে।

আফ্রিকায় ফিরে কিছু সঙ্গী-সাথী, একদল সিপাই নিয়ে যাত্রা করলেন। দলের অধিকাংশই ছিল অভিযানের পক্ষে অযোগ্য। কিছু লোক মাঝপথে দল ত্যাগ করল। তারা ফিরে গিয়ে চারদিকে প্রচার করে দিল লিভিংস্টোনকে হত্যা করা হয়েছে। সাথে সাথে অনুসন্ধানী দল পাঠানো হল। অনেক অনুসন্ধানের পর এই সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হল।

এইবার লিভিংস্টোন উত্তরের পথে চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলেন ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের তীরে। বিশাল হ্রদ। কয়েক হাজার মাইল জুড়ে তার বিস্তৃত জলরাশি। এখানে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন লিভিংস্টোন। কিন্তু নিজের দেহের প্রতি সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ নেই লিভিংস্টোনে। ধীর পদক্ষেপে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছেন। কখনো ভিজে পোশাক গায়েই শুকিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সময়ে খাওয়া হয় না। ক্রমশই শরীরের এমন অবস্থা হল, চলবার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেললেন। একদল আরব সেই পথে যাচ্ছিল। তাদের চিকিৎসা ও সেবাযত্নে পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠলেন লিভিংস্টোন। আবার শুরু হল যাত্রা, লক্ষ্য নীল নদের উৎসস্থল। কিন্তু শরীরে আর আগের শক্তি ছিল না, তার উপর ক্রমাগত জ্বর আর আমাশায় ভুগছিলেন। সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী। একটি নিগ্রো ছেলে তাঁর সমস্ত ঔষুধ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গের জিনিসপত্রও ফুরিয়ে এসেছিল। চলবার শক্তি হারিয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। জীবনের সব আশা হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। ঠিক সেই সময় অযাচিতভাবেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ এসে গেল।

মিঃ এইচ. এম. স্টেনলি নামে এক ইংরেজ অভিযাত্রীকে লিভিংস্টোনের সন্ধানে পাঠানো হয়েছিল। একদিন মিঃ স্টেনলি দেখলেন একদল আরবের সাথে এক শীর্ণকায় শ্বেতাঙ্গ। সারা মুখে বড় বড় দাড়ি, মাথায় টুপি। মিঃ স্টেনলি এগিয়ে গিয়ে হাত ধরলেন–আপনিই কি ডঃ লিভিংস্টোন? মুহূর্তে লিভিংস্টোনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। মনে হল অন্ধকারে যেন আলোর দিশা খুঁজে পেলেন। কয়েকদিন পর নতুন উদ্যমে দুজনে টাঙ্গানিকার উত্তর তীর ধরে এগিয়ে চললেন, এখান থেকে মিঃ স্টেনলি বিদায় নিলেন। যাওয়ার আগে লিভিংস্টোনের প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র, নতুন কুলি যোগাড় করে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু লিভিংস্টোনের জীবনিশক্তি শেষ হয়ে এসেছিল, কিন্তু তাঁর অদম্য মনোবলে এতটুকু ফাটল ধরেনি। কোনক্রমে এগিয়ে চলেছেন আর প্রতিদিনকার বিবরণী খাতায় লিখে রাখলেন। দিনটা ছিল ১৮৭৩ সালের ২৭শে এপ্রিল। শেষ ডাইরি লিখলেন লিভিংস্টোন। তারপর আচ্ছন্নের মত বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন। দুটো দিন কেটে গেল, ১লা মে ভোরবেলায় একটি নিগ্রো চাকর এসে দেখল তিনি বিছানার পাশে প্রার্থনারত অবস্থাতেই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

তাঁর প্রিয় চাকরটি বহুকষ্টে লিভিংস্টোনের মৃতদেহ, তাঁর জিনিসপত্র সবকিছু নিয়ে এল জনজিবারে সাগরের উপকূলে। সেখান থেকে সেই মৃহদেহ জাহাজে করে ইংলন্ডের ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবেতে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করা হল। দেহ ইংলন্ডে গেলেও লিভিংস্টোনের আত্মা রয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রিয় আফ্রিকায়।

আল্লামা শেখ সা'দী (রঃ)

(১১৭৫-১২৯৫ খ্রিঃ)

গগণের উদারতা ও স্বর্গের শান্তির বাণী নিয়ে সময় সময় যে যে সবল মহাপুরুষ মর্ত্যের দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং জগতের কিঞ্চিত যথার্থ কল্যাণ সাধন দ্বারা মানুষের স্মৃতিপটে অক্ষয় পদচিহ্ন রেখে যান, শেখ সা'দী (রঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সীমাহীন দারিদ্রতার মধ্যেও তিনি ধর্য্যের সাথে জ্ঞান অর্জন, পদব্রজে দেশ ভ্রমণ, কাব্য ও সাহিত্য রচনা এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছিলেন সারাটা জীবন। ডাক ও তার প্রথার যখন সৃষ্টি হয়নি, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শত শত পত্র পত্রিকার অবাধ প্রচার যখন ছিল না; লঞ্চ, বাস, ট্রেন কিংবা প্লেনে চড়ে পৃথিবী ভ্রমণ করা যখন সম্ভব ছিল না; ধর্ম সাহিত্য ও ইতিহাসের অভিনব বার্তা যখন জনগণের নিকট পৌছবার কোন সুযোগ ছিল না, তখন শেখ সা'দী (রঃ) নৈশ নক্ষত্রের ন্যায় আপন অনাড়ম্বর কিরণ ধারা উৎসারিত করে জনগণের দুয়ারে দুয়ারে সে আলোক রশ্মি বিতরণ করতেন।

স্যার আউসলী এর মতে ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের ফারেস প্রদেশের অর্ন্তগত সিরাজ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আয়ু ১২০ বছর। তবে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সাল নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে তাঁর জন্ম সাল ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ এবং আয়ু ১০২ বছর। কিন্তু মুজাফফর উদ্দীন আতাবেক সা'দ বিন জঙ্গীর রাজত্বকালে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তাতে কোন দ্বিমত নেই। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল শেখ মোসলেহ উদ্দীন। জানা যায়, ফারেসের শাসনকর্তা আতাবেক সা'দ বিন জঙ্গীর রাজত্বকালে তিনি যখন কবিতা লিখতেন তখন আপন নামের সাথে 'সা'দী' লিখতেন এবং এ নামেই তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। সা'দীর পিতা রাজ দরবারে চাকুরী করতেন এবং তিনি ছিলেন খুব ধার্মিক। ফলে শৈশব থেকেই সা'দীর পিতা রাজ দরবারে চাকুরী করতেন এবং তিনি ছিলেন খুব ধার্মিক। ফলে শৈশব থেকেই সা'দী ধর্মীয় অনুশাসনের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেন। কোন অসৎ সঙ্গ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। শৈশবেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় অসাধারণ প্রতিভা। শিক্ষা লাভের প্রতি ছিল তাঁর অস্বাভাবিক আগ্রহ। কিন্তু শৈশবেই পিতা মৃত্যু বরণ করায় তিনি হয়ে পড়েন নিতান্ত ইয়াতীম ও অসহায়। পিতার আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। সরকারী চাকুরী করে পিতা যে সামান্য বেতন পেতেন তা দিয়েই খুব কষ্ট করে তাঁকে সংসার চালাতে হত। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে সংসারে নেমে আসে চরম দারিদ্রতা এবং তাঁর শিক্ষা লাভের উপর আসে মারাত্মক আঘাত। কিন্তু এ অসহায়ত্ব ও দারিদ্রের মধ্যেও তিনি ধৈর্য্য হারাননি। শেখ সা'দী (রঃ) এর জীবনকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ৩০ বছর শিক্ষা লাভ, দ্বিতীয় ৩০ বছর দেশ ভ্রমণ, তৃতীয় ৩০ বছর গ্রন্থ রচনা এবং চতুর্থ ৩০ বছর আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সাধনা।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিরাজ নগরের গজদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কারো মতে ফারাসের শাসনকর্তা আতাবেক সা'দ বিন জঙ্গী দয়াপর্বশ হয়ে স্বয়ং ইয়াতীম শেখ সা'দীর আশ্রয় দান বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। উক্ত মাদ্রাসায় নিশ্চিত মনে বেশী দিন শিক্ষা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ তখন রাজ্যের সর্বত্র রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিরাজ করছিল। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় দারিদ্রের সাথে লড়াই করে চলে যান বাগদাদে। বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসা ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাগদাদে এসে তিনি অনাহারে, অর্ধাহারে এবং আশ্রয়ের অভাবে দিনের পর দিন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। অতঃপর তিনি একজন সহৃদয় ব্যক্তির সহযোগিতায় স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে শিক্ষা লাভ শুরু করেন। তাঁর প্রতিভা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং শিক্ষা লাভে তার অসাধারণ পরিশ্রমের প্রেক্ষিত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রতি শিক্ষকগণের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এরপর তিনি ভর্তি হন বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসায়। সেখানে তিনি বিখ্যাত আলেম আল্লামা আবুল ফাতাহ ইবনে জওজী (রঃ) এর নিকট তাফসীর, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মাদ্রাসার প্রধান ছাত্র হিসেবে পরিগণিত হন এবং মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ, সাহিত্য, দর্শন, খোদাতত্ত্ব ও ইসলামের বিবিধ বিষয়ে অসামান্য পান্ডিত্য অর্জন করেন। আল্লামা শেখ সা'দী (রঃ) শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভেই সন্তুষ্ট ছিলেন না; বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের প্রতিও ছিল তাঁর অস্বাভাবিক আগ্রহ। শেখ সাদী (রঃ)

এর জন্মের ১০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১১৬৫ খ্রিঃ (৫৬১ হিঃ) তাপসশ্রেষ্ঠ শেখ আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর অলৌকিক তপঃ প্রভাবের কথা সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। শেখ সা'দী (রঃ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের অবসর সময়ে ধন্য পুরুষদের আশ্রমে গিয়ে অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্য সংগ্রহ করতেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন তপস শেখ শাহাবুদ্দিন (রঃ) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধন্য পুরুষদের সঙ্গ লাভে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর ধর্মগত প্রাণ তত্ত্বজ্ঞান ও পুণ্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

৩০ বছর বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শুরু হয় তাঁর ভ্রমণ জীবন। জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করার মানসে সংসার বৈরাগীর ন্যায় খালি হাতে তিনি পদব্রজে বিচরণ করেছেন জগতের বিভিন্ন দেশ এবং নানা স্থানে উপদেশ বিতরণের মাধ্যমে লোকদের ধর্ম ও সভ্যতার পথে উন্নীত করেছেন। স্যার আউসলী'র মতে প্রাচ্য জগতে সুবিখ্যাত ইবনে বতুতার পরে পরিব্রাজক হিসেবে যার নাম শীর্ষে রয়েছে, তিনি হলেন মাওলানা শেখ সা'দী (রঃ)। উদব্রজ বা উষ্ট্রপৃষ্ঠ ব্যতীত যখন মরুভূমি পার হবার কোন উপায় ছিল না তখন শেখ সা'দী (রঃ) শ্বাপদসঙ্কুল ও অসভ্য বর্বর অধ্যুষিত জনপদের শত সহস্র বিপদ উপেক্ষা করে পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে। তিনি সমগ্র পারস্য, এশিয়া মাইনর, আরবভূমি, সিরিয়া, মিসর, জেরুজালেম, আর্মেনিয়া, আবিসিনিয়া, তুর্কিস্তান, ফিলিপাইন, ইরাক, কাশগড়, হাবস, ইয়ামন, শাম, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, হিন্দুস্তানের সোমনাথ ও দিল্লীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন। এ সময় দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে তাঁকে পার হতে হয়েছিল পারস্য উপসাগর, ওমান সাগর, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর প্রভৃতি। এ সুদীর্ঘ সফরের ফলে তিনি বিশ্বের ১৮টি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। পদব্রজে তিনি হজ্জ সম্পাদন করেছিলেন ১৪ বার। তাঁর এ ভ্রমণ কাহিনী তিনি তাঁর গুলিস্তা ও বোস্তা বিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। গুলিস্তায় তিনি লিখেছেন—

"দর আফসায়ে আলম বগাশতাম ব'সে,
বসর বোরদাম আ'য়ামে বহর কা'সে,
তামাত্তায়া যে হরগোশা ইয়াফতাম,
যে হর খিরমানে খোশা ইয়াফতাম।"

অর্থাৎ— "ভ্রমিয়াছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ,
মিলিয়াছি সর্বদেশে সবাকার সনে,
প্রতি স্থানে জ্ঞানে রেণু করি আহরণ,
প্রতি মৌসুমে শস্য করেছি ছেদন।"

বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শেখ সা'দী (রঃ) অর্জন করেছিলেন বিবিধ জ্ঞান; তাঁর চোখের সামনে ঘটেছিল বহু বিচিত্র ঘটনা, তিনি অবলোকন করেছিলেন জাতির উত্থান, পতনের ইতিহাস। কর্ডোভার মুসলিম সাম্রাজ্য যার ঐশ্বর্যে একদিন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা প্রভাবান্বিত হয়েছিল তা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শেখ সা'দী (রঃ) এর চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে ধরা পৃষ্ঠ হতে মুছে গিয়েছিল। এ শতকেই সেলজুক এবং খাওয়ারিজম শাহীর আত্মদ্বন্দ্ব উভয় সাম্রাজ্যের মূল উৎপাটন করে ফেলেছিল। বনি আব্বাসদের রাজ বংশ যা প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর বিপুল বিক্রমে রাজত্ব করেছিল, তাও এ শতকে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সা'দী (রঃ) দেখেছিলেন দুর্ভিক্ষের হাহাকার। মিসর ও পারস্যের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ হানি দেখে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল। যে দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খাঁর নামে আজও সমগ্র এশিয়ার লোক শিহরিত হয়, তারই পৌত্র নৃশংস হালাকু খান এক বিরাট তাতার বাহিনী নিয়ে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের উপর আপতিত হয়েছিল। বর্বরদের নির্মম আক্রমণে ইসলামের শেষ খলিফা মোতাসেম বিল্লাহ নির্দয় ভাবে নিহত হলেন। এরপর শুরু হল নির্মম গণহত্যার অভিনব। নারী পুরুষের অকলঙ্ক শোণিতে রাজপথ, গৃহ ও টাইগ্রাসের পানি রঞ্জিত হল। বাগদাদ পরিণত হল এক মহা শ্মশানে। ইবনে খালদুন লিখেছেন, বিশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ষোল লক্ষ লোক এ আক্রমণে নিহত হয়েছিল। শেখ সা'দী (রঃ) গুলিস্তার প্রথম অধ্যায়েই এ সকল জালেমদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী পরিচালনা করেছেন। তাঁর প্রায় সমগ্র কাব্য গ্রন্থের ভিতরই জালেম বাদশাহর উপর তাঁর শ্লেষ বাক্য ও অবজ্ঞার চিহ্ন বিচ্ছুরিত দেখতে পাওয়া যায়।

দেশ ভ্রমণে নিষ্ঠুর, জালেম ও বর্বরদের হাতে সা'দীকে কতবার যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফিলিস্তিনীতে খিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ

যখন চরম আকার ধারণ করে তখন খ্রিস্টানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে শেখ সা'দী (রঃ) নিকটস্থ এক নির্জন জঙ্গলে আশ্রয় নেন। খ্রিস্টানগণ জঙ্গল থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী হতে আনীত ইহুদিদের সাথে তাঁকে পরিখা খননে নিযুক্ত করে। তখন তাঁর দুরাবস্থার সীমা ছিল না। একদিন আলিপ্পো শহরের এক সম্ভ্রান্ত বণিক (সা'দীর এক সময়ের পরিচিত) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শেখ সা'দী (রঃ) তাঁকে দেখে সমুদয় ঘটনা বললেন। এতে বর্ণিত দয়াপরবশ হয়ে মনিবকে ১০ দিনার ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে সাথে করে আলিপ্পো শহরে নিয়ে যান। কিন্তু আলিপ্পো শহরেও তিনি সুখ পাননি। বণিকের এক বদমেজাজী ও বয়স্কো কন্যা ছিল। তার বদমেজাজের কারণে কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজি হত না। বণিক ১০০ দিনার মোহরের বিনিময়ে কন্যাকে শেখ সা'দীর নিকট বিয়ে দেন এবং মোহরের অর্থ বণিক নিজেই পরিশোধ করেন। সা'দী বিপদে আপদে কখনো ধৈর্য্যহারা হতেন না। বিয়ের পর কবি শেখ সা'দী (রঃ) আর সুখের মুখ দেখতে পেলেন না। বদমেজাজী রমণী একদিন সহসা বলে ফেলল যে, তুমি কি সেই হতভাগ্য নও, যাকে আমার পিতা অনুগ্রহ করে ১০ দিনার মূল্য দিয়ে স্বহস্তে মুক্ত করেছিলেন? উত্তরে শেখ সা'দী (রঃ) বললেন, "হ্যাঁ সুন্দরী! আমি সেই হতভাগ্য, যাকে তোমার পিতা ১০ দিনার দিয়ে মুক্ত করেছিলেন, কিন্তু পুনরায় ১০০ দিনার দিয়ে তোমার দাসত্বে নিযুক্ত করে দিয়েছেন।" সম্ভবত আল্লাহ পাক তার প্রিয় বান্দাদেরকে এভাবে অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন।

আল্লামা শেখ সা'দী (রঃ) বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করে যান। তাঁর এ সকল কাব্যে রয়েছে মানুষের নৈতিক ও চরিত্র গঠনের অমূল্য বাণী। শেখ সা'দীর অলঙ্কারময় ভাষা ও প্রকাশের জাদু পাঠকদের মনকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করে রাখত। আজও তাঁর লেখা কাব্য গ্রন্থ কারিমা, গুলিস্তা ও বোস্তা বিশ্বের বিভিন্ন কওমী মাদ্রাসায় পাঠ্য তালিকার অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা পবিত্র কোরআন শিক্ষার পরই তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থ কারিমা, গুলিস্তা ও বোস্তা শিক্ষা লাভ করে থাকে। তাঁর সমস্ত রচনাই অতি সরল ও প্রাঞ্জল। আলেমগণ বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল ও ধর্মীয় সভায় শেখ সা'দীর কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন। তাঁর কবিতা আবৃত্তি না করলে আলেমগণ যেন ওয়াজ মাহফিল জমাতে পারেন না। শিশুরা শেখ সা'দীর কারিমা গ্রন্থের কবিতা সুললিত কণ্ঠে পাঠ করতে থাকে-

"কারিমা ব-বখশায়ে বর হালে মা
কে হাস্তম আসীরে কামান্দে হাওয়া।
না দারেম গায়ের আযতু ফরিয়াদ রাস্
তু-য়ী আসীয়াঁরা খাতা বখ্শ্ ও বাস্।
নেগাহ্দার মা'রা যে রাহে খাতা
খাতা দার্ গোযার ও সওয়াবম নমা।"

অনুবাদ- হে দয়াময় প্রভু! আমার প্রতি রহম কর। আমি কামনা ও বাসনার শিবিরে বন্দী। তুমি ব্যতীত আর কেউ নেই, যার নিকট আমি প্রার্থনা করব। তুমি ব্যতীত আর কেউ ক্ষমাকারী নেই। তুমি আমাকে পাপ থেকে রক্ষা কর। আমার কৃত পাপ ক্ষমা করে পুণ্যের পথ প্রদর্শন কর।

শেখ সা'দীর গুলিস্তা ও বোস্তা বিশ্ব কাব্য ও সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। গুলিস্তা ও বোস্তা ব্যতীত জগতে এমন গ্রন্থ খুব কমই আছে যা বহু যুগ ধরে বিপুল ভাবে পঠিত হয়ে আসছে। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে জেন্টায়াস নামক এক ব্যক্তি ল্যাটিন ভাষায় আমস্টারডাম নগরে 'রোসারিয়াম পলিটিকাম' নাম দিয়ে গুলিস্তার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে উহা ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। বর্তমানে ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শেখ সা'দীর গুলিস্তাসহ বিভিন্ন কিতাব ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, আরবী, ডাচ, উর্দু, তুর্কি, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শেখ সা'দী (রঃ) এর উপরোক্ত গ্রন্থগুলো ব্যতীত 'নসিহত-অল-মলুক', 'রিসালায়ে আশ্কিয়ানো', 'কিতাবে মিরাসী', 'মোজালেসে খামসা', 'তরজিয়াত', রিসালায়ে সাহেবে দিউয়ান,' 'কাসায়েদল আরবী,' 'আৎ তবিয়াত,' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শেষ বয়সে শেখ সা'দী (রঃ) মাতৃভূমি নগরের এক নির্জন আশ্রমে জীবন যাপন করতেন। এ স্থানেই তিনি অধিকাংশ সময় গভীর ধ্যানমগ্ন থাকতেন। মাঝে মাঝে আগন্তুক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ দেয়ার জন্যে আশ্রমের বাইরে যেতেন। দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিদিন ধনী, গরীব, শিক্ষিত, মূর্খ, রাজা প্রজা এবং নিকট সমবেত হত। শেখ সা'দী (রঃ) বাল্যকাল থেকেই দৈনিক ৪/৫ ঘণ্টা

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি কখনো গৃহে বেনামাজী চাকর নিয়োগ করতেন না। আস্তে আস্তে তাঁর বার্ধক্য ঘনিয়ে আসে। বার্ধক্যেও তিনি যৌবনের তেজ ধারণ করতেন। অবশেষে ১২৮২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৬৯১ হিজরীতে ১২০ বছর বয়সে এ মনীষী ইহলোক ত্যাগ করেন। সিরাজ নগরের 'দিলকুশা' নামক স্থানের এক মাইল পূর্ববর্তী পাহাড়ের নিচে তাঁর সমাধি রয়েছে। সমাধি জিয়ারতকারীদের পাঠের জন্যে সা'দীর নিজ হাতে লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ সমাধি গৃহে রক্ষিত আছে। পারস্যে এ সমাধি গৃহ 'সাদীয়া' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

৮৮

নিকোলাস কোপার্নিকাস

[১৪৭৩-১৫৪৩]

সভ্যতার আদি যুগ থেকেই মাটির মানুষ বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে থাকত আকাশের দিকে। আকাশের চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সব কিছুই তার কাছে ছিল অপার বিস্ময়ের। বিজ্ঞানের কোন চেতনা তখনো মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেনি। তাই অনন্ত আকাশের মতই ছিল তার সীমাহীন কল্পনা। ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে জন্ম নিতে থাকে জ্ঞানের চেতনা। কত প্রশ্ন জেগে ওঠে তার মনে। এই বিশ্ব প্রকৃতির অপার রহস্য ভেদ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। জিজ্ঞাসু মন আর এই জিজ্ঞাসা থেকেই শুরু হল অনুসন্ধান। আকাশের রহস্যভেদের চর্চায় মানুষ কবে থেকে নিয়োজিত হল তার সঠিক কোন তারিখ নেই। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা প্রথম শুরু হয়েছিল চীন দেশে। তবে তাদের উপলব্ধি বা গবেষণার বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদরা প্রথম ঋতুর আবর্তন উপলব্ধি করে তারা এক বছর নির্ণয় করেন। তাদের হিসাবে ছিল ৩৬০ দিনে এক বছর হয়।

বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে প্রথম যে মানুষটি আলোর পথ দেখান তাঁর নাম পিথাগোরাস। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বর্তমান তুরস্কর অন্তর্গত ইজিয়ান সাগরের বুকে সামোস দ্বীপে তাঁর জন্ম হয়। জ্ঞানের আকর্ষণে তিনি কিশোর বয়সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। নানান দেশ ভ্রমণ করে মিশরে যান। সেখানকার পুরোহিতদের কাছে শিখেছিলেন জ্যোতিবিদ্যা ও জ্যামিতিশ্র। ইতালির ক্রোতনায় এসে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুললেন। জ্ঞানের সাধনাতেই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মূলত অঙ্কশাস্ত্রবিদ হলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনিই প্রথম উল্লেখ করেছিলেন— এই পৃথিবী ও গ্রহ আপন অক্ষের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু তাঁর এই অভিমতকে কেউ গ্রহণ করেনি।

তার পরে এলেন প্লেটো ও অ্যারিস্টটল। মানুষের জ্ঞান চিন্তা ভাবনার জগতে এক নতুন দিগন্তের দ্বারকে উন্মোচন করলেন। এর পাশাপাশি কিছু ধারণার কথা প্রকাশ করলেন যা মানুষের জ্ঞানের জগতে অন্ধকার যুগ নিয়ে এল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল কোন পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা ছাড়াই একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল পৃথিবী স্থির। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা একই পথে আবর্তিত হচ্ছে। চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। তাঁর এই মতবাদকে মানুষ অভ্রান্ত বলে মেনে নিল। খ্রিস্টপূর্ব ২৩০ সালে অ্যারিস্টার্চ তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন যে সূর্যই এই সৌরমন্ডলের কেন্দ্রবিন্দু এবং স্থির। কিন্তু এই অভিমতকে সকলেই অগ্রাহ্য করল।

পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানান তত্ত্ব উদ্ভাবন করলেন। তার এই সব তত্ত্বই উদ্ভাবন করলেন। তার এই সব তত্ত্বগুলিই ছিল ভুল। তিনি বললেন বিশ্ব একটা গোলক এবং তা গোলকের মতই ঘুরছে। পৃথিবীও একটি গোলাকার বস্তু এবং তা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। পৃথিবী স্থির, সূর্যই তার চারদিকে ঘুরছে। তাঁর এই অভিমতের সপক্ষে একটি মানচিত্রও অঙ্কন করেন। অ্যারিস্টটল ও টলেমির এই সব তত্ত্ব ও সূত্রগুলি প্রায় চোদ্দশো বছর ধরে মানুষ অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিয়েছে, কেউ তার ভুলভ্রান্তি নিরূপণ করার চেষ্টা করেনি।

যীশুর জন্মের পরবর্তীকালে যখন বাইবেল রচিত হল, বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে বাইবেলের রচনাকারদের সামনে টলেমির সিদ্ধান্তগুলিই বর্তমান ছিল। তাই তাঁরা সেই সব অভিমতকেই বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। অল্প দিনের মধ্রে তা ধর্মের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হল। পরবর্তীালে মানুষ বাইবেলের প্রতিটি কথাকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিল। কারোর মনেই ছিল না কোন সংশয় বা জিজ্ঞাসা। এমনকি বৈজ্ঞানকিরাও বাইবেলকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিল।

এর পেছনে আরো একটি কারণ ছিল ইউরোপের বুকে তখন চার্চের অপ্রতিহত প্রতাপ। একজন সম্রাটের মতই ছিল পোপের ক্ষমতা। অর্থ সম্পদ লোকজন কোন কিছুই কম ছিল না। একটি চার্চ হয়ে উঠেছিল ক্ষমতা, ভণ্ডামি আর সন্ত্রাসের কেন্দ্রভূমি। যে সব বিজ্ঞানী পণ্ডিতরা চার্চ এবং বাইলকে মেনে চলত, তাদের নানাভাবে সাহায্য করা হত। কিন্তু যদি কখনো কেউ চার্চ বা বাইবেলের বিরোধী একটি শব্দও উচ্চারণ করত তখন তাকে কঠোর হাতে দমন করা হত। কারাগারে পাঠান হত, নয়ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হত। ধর্মের আজ্ঞাবহ হয়ে বিজ্ঞান এক অন্ধকার যুগেই পড়ে ছিল। এই অন্ধকারের মধ্যেই অল্প কয়েকজন মানুষ এগিয়ে এলেন। তাঁরা মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে, ধর্মের বন্ধনকে ছিন্ন করে প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন সত্যকে। তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যের আলোয় বিজ্ঞান নতুন পথের সন্ধান পেল। এইসব মহান বিজ্ঞানীদের অগ্র পথিক যিনি তাঁর নাম নিকোলাস কোপার্নিকাস।

১৪৭৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি পোল্যান্ডের থর্ন শহরে কোপার্নিকাসের জন্ম। থর্ন বাল্টিক সাগরের কাছে ভিসটুল নদীর তীরে ছোট বন্দর শহর। বাবা ছিলেন একজন সাধারণ ব্যবসায়ী।

কোপার্নিকাসের পারিবারিক নাম ছিল নিকলাস কোপার্নিক। কোপার্নিক শব্দের অর্থ বিনয়ী। শুধু নামে নয়, আচার ব্যবহারে স্বভাবেও কোপার্নিকাস ছিলেন যথার্থই বিনয়ী।

ছেলেবেলা থেকেই কোপার্নিকাসের আকাশ গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্র তারা সম্বন্ধে ছিল গভীর কৌতূহল। এই সব বিষয়ে বাবা মাকে নানা প্রশ্ন করতেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরই জানা ছিল না ব্যবসাদার বাবার। কোপার্নিকাসের কাকা ছিলেন ধর্মযাজক পণ্ডিত মানুষ। ভাইপোর জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহ দেখে একটি বই পাঠিয়ে দিলেন। এই বইটি ছেলেবেলায় কোপার্নিকাসের সব সময়ের সঙ্গী ছিল।

১৫৪৩ সালে বইটি প্রকাশিত হল। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। শোনা যায় যখন এই বইটি ছাপা অবস্থায় তাঁর কাছে এসে পৌঁছল তখন তাঁর পড়ে দেখবার মত অবস্থা ছিল না। তিনি শুধু দুহাতে বইটি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন, তার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁর মৃত্যু হল (১৫৪৩ সালের ২১ মে)। কোপার্নিকাস এই বইয়ের মধ্যে দিয়ে যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করলেন তার উপর ভিত্তি করে গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন, আইনস্টান জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্তকে উন্মোচন করলেন।

তিনি যে শুধু একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছিলেন তাই নয়, তিনি ইউরোপের প্রথম বিজ্ঞানী মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, অন্ধকার বিশ্বাসের মূলে তীব্র আঘাত হেনেছিলেন। তাই বিংশ শতকের মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাসই হচ্ছেন আধুনিক যুগের পথিকৃৎ।

৮৯
এন্টনি লরেন্ট ল্যাভোর্শিয়ে
[১৭৪৩-১৭৯৪]

১৭৪৩ সালের ২৬শে আগস্ট ফ্রান্সের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ল্যাভোশিঁয়ে। পিতা ছিলেন পার্লামেন্টের এটর্নি। তাঁর পূর্বপুরুষেরা অবশ্য ছিলেন রাজপরিবারের ঘোড়াশালার কর্মচারী। নিজের চেষ্টায় পরিশ্রমে ল্যাভেশিঁয়ের পিতা নিজেকে প্যারিসের সম্ভ্রান্ত মহলে প্রতিষ্ঠিত করেন। পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আইনের ব্যবসায়যুক্ত হবে। এগারো বছর বয়েসে তাকে শিক্ষায়তনে ভর্তি করে দেওয়া হল। জন্ম থেকেই ল্যাভোশিঁয়ে অন্যসব বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানই ল্যাভোশিঁয়েকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত। স্কুলজীবন শেষ করে কলেজে ভর্তি হলেন ল্যাভোশিঁয়ে। এখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত অঙ্কবিদ ও জ্যোতির্বিদ নিকোলাস লুইস। অল্পদিনেই দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। গুরু-শিষ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। নিকোলাস আবহবিদ্যার প্রতি ল্যাভোশিঁয়েকে আকৃষ্ট করে তোলেন। তারই ফলে সমস্ত জীবন আহতবিদ্যার প্রতি ল্যাভোশিঁয়ের ছিল গভীর অনুরাগ।

১৭৬৭ সালে মানচিত্র তৈরির কাজে বেরিয়ে পড়লেন ল্যাভোশিঁয়ে। কাছে আছে মাত্র পঞ্চাশ লুইস। সঙ্গী বলতে একটি ঘোড়া, চাকর জোফেস আর প্রৌঢ় বিজ্ঞানী গুটার্ড। দুজনের মনেই অদম্য সাহস আর অজানাকে জানবার তীব্র কৌতূহল। নির্জন প্রান্তর পাহাড় নদী পথ ধরে দুজনে ঘুরে বেড়ালেন ফ্রান্সের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখেই শুধু মুগ্ধ হন না ল্যাভোশিঁয়ে, তার অপার রহস্য তাঁর মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

প্রতিদিন সকালে উঠে থার্মোমিটার ব্যারোমিটার দেখা। তারপর মাটির রং, তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। যেখানে রয়েছে খনিজ সম্পদ তার সম্ভাব্য পরিমাণ বিস্তৃতি নিরূপণ করা, নদীর গতিপথ হ্রদ ঝর্ণার অবস্থায়, বিভিন্ন ধরনের গাছপালা তাদের বর্ণনা। নিখুঁতভাবে খাতার পাতায় লিখে রাখতে হয়। কয়েক মাস বিস্তৃত পর্যবেক্ষণের পর তাঁরা ফিরে এলেন প্যারিসে। এই দেশভ্রমণের ফলে একদিকে ল্যাভার্শিয়ের মধ্যে গড়ে উঠল নতুন জীবন দর্শন, বিশ্বপ্রকৃতিকে আরো গভীর ব্যাপকভাবে চেনবার ক্ষমতা, অন্যদিকে কঠোর পরিশ্রমের ক্ষমতা।

প্যারিসে ফিরে এসে স্থির করলেন আইন নয়, বিজ্ঞানই হবে তাঁর জীবনসাথী। কিছুটা আশাহীন ভাবেই ফরাসী বিজ্ঞান এ্যাকাডেমিতে সদস্য হবার জন্য আবেদন করলেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই একদিন জানতে পারলেন তাঁকে বিজ্ঞান এ্যাকাডেমির সভ্য হিসাবে জানতে পারলেন তাঁকে বিজ্ঞান এ্যাকাডেমির সভ্য হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। তখন তাঁর বয়েস মাত্র পঁচিশ। এক তরুণের পক্ষে এ অভাবনীয় গৌরব। শুরু হল তাঁর গবেষণা, এ্যাকাডেমির প্রত্যেক সদস্যকেই নিয়মিত গবেষণাপত্র জমা দিতে হত। গবেষণার বিষয় ছিল যেমন বিচিত্র তেমনি ব্যাপক। জীবদেহের উপর চুম্বকত্বের প্রভাব, অভিকর্ষ, জল সরবরাহ, রঙের তত্ত্ব, বাঁকাকপির বীজ থেকে তেল নিষ্কাষণ, চিনি তৈরি, কয়লা থেকে পিচ তৈরি করা, কীটপতঙ্গের শ্বাস-প্রশ্বাস।

এই বিচিত্র ধরনের গবেষণা করে যখন অন্যেরা সমস্ত দিন সামান্যতম সময় পেতেন না, ল্যাভোশিয়ে অন্য সকলের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেও একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল "Ferme"। এদের কাজ ছিল সরকারকে হিসাব মত রাজস্ব জমা দেওয়া। বিনিময়ে তারা চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। খাজনার পরিমাণ রাজস্বের চেয়ে যত বেশি হত ততই "Ferme"_এর লাভ।

ল্যাভোশিঁয়ে বুঝতে পারছিলেন গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই তিনি খাজনা সংগ্রহের চাকরি নিলেন। যে বিজ্ঞানের সাধনার জন্য তিনি অর্থ উপার্জন করতে চেয়েছিলেন সেই অর্থই একদিন তাঁর মৃত্যুর কারণ হল।

Ferme-তে দু বছর চাকরি করবার পর ল্যাভেশিঁয়ে তাঁর এক উচ্চপদস্থ মনিবের সুনজরে পড়ে গেলেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে মেরী এ্যানির সাথে ল্যাভোশিঁয়ের বিবাহ দিলেন। মেরী তখন মাত্র চোদ্দ বছরের বালিকা। পরবর্তী জীবনে মেরী হয়ে উঠেছিলেন ল্যাভোশিঁয়ের যোগ্য সঙ্গিনী। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে নানাভাবে সাহায্য করতেন। বিভিন্ন ইংরাজি প্রবন্ধ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে দিতেন। ল্যাবরেটারির কাজের বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে দিতেন। কখনো নোট তৈরি করতে সাহায্য করতেন। শ্বশুরের সাহায্যে চাকরিতে ক্রমশ উন্নতি করছিলেন ল্যাভোশিঁয়ে। কাজের চাপ বাড়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য তাঁর সময় নির্দিষ্ট ছিল সকাল ছটা থেকে নটা পর্যন্ত, সন্ধ্যেবেলায় সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত।

গবেষণা কাজের জন্য বিরাট একটি ল্যাবরেটারি তৈরি করলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করলেন সর্বাধুনিক সব যন্ত্রপাতি। কিছু দক্ষ সহযোগীকে নিযুক্ত করলেন। গবেষণার জন্য তার মত তরুণ বিজ্ঞানীদের কাছে ল্যাবরেটারির জন্য যে বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় হত, সবটাই দিতেন ল্যাভেশিঁয়ে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর আয়ের প্রায় সবটুকুই এখানে ব্যয় করতেন। ব্যয় বাহুল্যের জন্য তাঁকে নিয়ে লোকে কৌতুক করত, বলত, 'অর্থ খরচের পরীক্ষাগার।' এই অর্থ খরচের গবেষণাগার থেকেই একদিন জন্ম নিল এক বিজ্ঞান যা পৃথিবীর জ্ঞানের জগতে নতুন আলোক শিখা জ্বালিয়ে দিল। অ্যালকেমির কুয়াশাচ্ছন্ন জগতে আবির্ভূত হল আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান।

ল্যাভোশিঁয়ে যখন গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন তখন রসায়ন মধ্যযুগীর এক বিচিত্র চিন্তাভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রসায়নকে বিবেচনা করা হত শুধুমাত্র চিকিৎসার সহায়ক হিসাবে। লন্ডন গেজেটে প্রকাশিত একটি বিবরণ থেকে জানা যায় মিসেস স্টীফেন নামে এক ব্রিটিশ রসায়নবিদ একটি ঔষধ তৈরি করেছেন যা দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পেটের পাথুরী সারানো সম্ভব হয়েছে। ঔষধটি তৈরি হয়েছে ডিমের খোলা, গুগলি, সাবানের দলা, আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া, শাক, আর মধু একসাথে মিশিয়ে। এই বিচিত্র ঔষধ তৈরির জন্য মিসেস স্টীফেন পাঁচ হাজার পাউন্ড পুরস্কার পেয়েছিলেন।

অন্য আর একজন রসায়নবিদ পরীক্ষা করে সর্ব-সমক্ষে দেখালেন একটি বস্তুকে অন্য আর একটি বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায়। একটি পাত্রে জল নিয়ে ফুটাতে আরম্ভ করা হল। পাত্রের মুখ যথাসম্ভব ঢেকে দেওয়া হল। সমস্ত জল বাষ্প হয়ে বার হবার পর দেখা গেল পাত্রের মধ্যে

খানিকটা মাটির মত গুঁড়ো পড়ে রয়েছে। রসায়নবিদ বললেন, এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে জল থেকে সৃষ্টি হয় মাটি। এই ঘটনাই প্রথম ল্যাভোশিয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রকৃতপক্ষে এর সূত্রপাত যখণ তিনি গুটার্ড-এর সাথে মানচিত্র তৈরির কাজে দেশভ্রমণ করছিলেন। তিনি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন জলের ঘনত্ব, তার প্রকৃতি। তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিল সত্যিই কি জলের অবশিষ্ট অংশ মাটি না পাত্রের ভগ্নাবশেষ? শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন কিছুই বিশ্বাস করতে চাননি ল্যাভোশিঁয়ে। তিনি যুক্তি প্রমাণ পরীক্ষার সাহায্যে সত্যকে নিরূপণ করতে চাইলেন। নানাভাবে পরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্তে এলেন জল ফোটাবার পর যে গুঁড়ো পদার্থটুকু পাত্রের মধ্যে পড়ে থাকে তা মাটি নয়, পাত্রের ক্ষয়ে যাওয়া অংশ। তিনি জল পুরোপুরি বাষ্পীভূত হওয়ার পর ওজন করে দেখা গেল পাত্রের ওজন কমে গিয়েছে। যেটুকু ওজন কমেছে তা হচ্ছে গুঁড়ো পদার্থের সমান ওজন। এর থেকেই সিদ্ধান্তে এলেন ল্যাভোশিঁয়ে জল ফোটাবার জন্যেই পাত্রের ক্ষয় হচ্ছে। জল থেকে মাটি সৃষ্টি হচ্ছে না। এই নিরূপিত সত্য এ্যালকেমি সম্বন্ধে বহু যুগের প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করল।

ল্যাভোশিঁয়ে এখানেই থেমে গেলেন না। তিনি বললেন, জলই পরিবর্তিত হয়ে জন্ম দেয় গাছের এই ধারণা ভ্রান্ত। গাছ বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণ। এই সমস্ত পদার্থ গাছ গ্রহণ করে মাটি থেকে, জল থেকে, বাতাস থেকে।

এই প্রতিটি উপাদানই বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। ল্যাভোশিঁয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন বাতাসের উপাদান নিয়ে। তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল বিভিন্ন ধরনের বাতাস আছে। ল্যাভোশিঁয়ে প্রথম বললেন, বাতাসের দুটি উপাদান। একটি শ্বাসযোগ্য অপরটি বিষাক্ত। যেটি শ্বাসযোগ্য তার নাম দিলেন অক্সিজেন। গ্রীক শব্দ "অক্সিস", এর অর্থ অ্যাসিড এবং "জেনান", এর অর্থ উৎপাদন করা। শুধু অক্সিজেন নয়, রসায়ন শাস্ত্রের ব্যবহৃত একাধিক শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণ করলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তিমূল। আধুনিক রসায়নের জনক ল্যাভোশিঁয়ের আরেকটি মহৎ কীর্তি রসায়নের জন্য অভিধান তৈরি করা। তাঁর উদ্ভাসিত বহু শব্দ আজও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

ল্যাভোশিঁয়ে তাঁর এই বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক কাজকর্ম বিভিন্ন ধরনের সরকারী-বেসরকারী কাজের মধ্যেই চালিয়ে যেতেন। তবে Ferme কোম্পানির খাজনা আদায় করবার জন্যই তাঁকে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হত। এছাড়াও ফরাসী বিজ্ঞান এ্যাকাডেমির সদস্য হিসাবে তাঁকে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের গবেষণাপত্র জমা দিতে হত।

পরিশ্রম করবার ক্ষমতা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, মৌলিক সৃষ্টির জন্য ল্যাভোশিঁয়ের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সরকারী তরফেও কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ক সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের ভার দেওয়া হত ল্যাভোশিঁয়ের উপর।

সেই সময় একটি বেসরকারী সংস্থা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র কামানের গোলা-বারুদ তৈরি কর ফরাসী সরকারের কাছে বিক্রি করত। কিন্তু ক্রমশই তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের গুণমান খারাপ হচ্ছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ফ্রান্সের সম্রাট দেশের বিজ্ঞান এ্যাকাডেমিকে অভিমত দেবার জন্য আহ্বান করলেন। বিজ্ঞান এ্যাকাডেমি চারজনের একটি কমিটি তৈরি করলেন। তার প্রধান হলেন ল্যাভোশিঁয়ে। তাঁদের উপর ভার দেওয়া হল কিভাবে সামরিক প্রয়োজনে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ানো যায় এবং কিভাবে তার গুণমান বৃদ্ধি করা সম্ভব সেই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

এ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ। কিন্তু দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সানন্দে নতুন কার্যভার গ্রহণ করলেন। শুরু হল তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা, কিভাবে সামরিক প্রয়োজনে গোলা-বারুদের উন্নতি করা যায়। এই দায়িত্বভার তাঁর জীবনে বিরাট এক আশীর্বাদ হয়ে এল। গবেষণার প্রয়োজনে তাঁকে চাহিদা মত গবেষণার সাজ-সরঞ্জাম। সামরিক বাহিনীর কাজের সাথে দীর্ঘ সতেরো বছর (১৭৭৫-১৭৯২) তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি গোলা-বারুদের ব্যবহারিক কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকেও আরো সহজ করে তোলেন। এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকেও আরো সহজ করে তোলেন। এর ফলে শুধু ফরাসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হয় তাই নয়, আয়ও বৃদ্ধি পায়।

সামরিক কাজকর্মের মধ্যেও তিনি তাঁর নিজস্ব গবেষণা সংক্রান্ত কাজকর্ম বন্ধ করেননি। দিনের বেলায় চলত সামরিক কাজের প্রস্তুতি। রাতের বেলায় তিনি লিখতেন বৈজ্ঞানিক হিসাবে

তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, গবেষণার নানা বিষয়, বিভিন্ন তথ্য, বিবরণ। দীর্ঘ তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করবার পর তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর যুগান্তকারী রচনা "Elementary Treatise of Chemistry" (1789)। এই বইয়ের কোথাও তিনি একটি অজানা তথ্যকে যুক্ত করেননি। শুধুমাত্র যা তাঁর পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকেই গ্রহণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে এই বই আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করল। কিন্তু একদল প্রাচীনপন্থী মানুষ মুখর হয়ে উঠল এর বিরুদ্ধে, "এই বই-এর সমস্তই অবাস্তব ধারণার উপর গড়ে উঠেছে। যা কিছু নতুন তাই সত্য নয়। আবার যা কিছু সত্য তাই নতুন নয়।"

ল্যাভোশিঁয়ের বিরুদ্ধবাদীদের সরব চিৎকারের জবাব দিতে এগিয়ে এলেন বিজ্ঞান এ্যাকাডেমির সদস্যরা। রসায়ন বিজ্ঞানের কুয়াশাচ্ছন্ন জগতে যে আলো ল্যাভোশিঁয়ে জ্বালালেন তার জয়গানে সকলে মুখর হয়ে উঠলেন।

এক চিঠিতে ল্যাভোশিঁয়ে লিখেছেন, আমি খুবই আনন্দিত। আমার নতুন তত্ত্ব পণ্ডিত মহলে এক ঝড় তুলেছে। এরই মধ্যে ল্যাভোশিঁয়ে আরো একটি যুগান্তকারী তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। নির্দিষ্ট অনুপাতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন-এর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ চালনা করে সৃষ্টি করলেন জল। ল্যাভোশিঁয়ে যখন তাঁর নতুন নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাজগতে বিপ্লব সৃষ্টি করে চলেছেন, তখন সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে চলেছে আরেক বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লব। দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে বিপ্লবী ট্রাইবুন্যাল। তৈরি হয়েছে বিপ্লবী আইন। যারা বিপ্লবের বিরোধী, যারা পুরনো রাজতন্ত্রের সমর্থক বা কোনভাবে তার সঙ্গে জড়িত তাদের সকলকে গিলোটিন নামে এক যন্ত্রে শিরোচ্ছেদ করা হত। এইভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা পড়ত। সমস্ত দেশ জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হল।

প্রকৃতপক্ষে ল্যাভোশিঁয়ে এই রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। গবেষণার কাজের মধ্যেই তিনি দিনরাত ডুবে থাকতেন। তবুও তিনি বিপ্লবী শাসকদের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। একদিন (১৭৯১ সালের ৭ই জানুয়ারি) বিপ্লবী দলের সংবাদপত্রে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপা হল। এক বিপ্লবী নেতা চেয়েছিলেন ল্যাভোশিঁয়েকে সরিয়ে নিজেই বিজ্ঞানের জগতে বিখ্যাত হবেন। সরাসরি ল্যাভোশিঁয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগে আনলেন।

"ল্যাভোশিঁয়ের রাজতন্ত্রের সমর্থক, প্রতারক, ঠক, চোরদের শিরোমনি। অসৎ উপায়ে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জন করে এখন প্যারিসের শাসনকর্তা হতে চাইছে। একে অফিসে পাঠানো নয়, প্রকাশ্য রাজপথের ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রাখাই আমাদের কর্তব্য।" ল্যাভোশিঁয়ে এই সমালোচনা সামান্যতম ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কিন্তু পত্রিকার তরফে একের পর এক অভিযোগে উঠতে থাকে।

এরই মধ্যে বিপ্লবী নেতা আরো নেতার সমর্থনে ফরাসী বিজ্ঞান এ্যাকাডেমিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। ল্যাভোশিঁয়ে তখন এ্যাকাডেমির প্রধান। তিনি এর প্রতিবাদ করলেন। এতদিন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল বিপ্লবী নেতা। বিপ্লবী পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অপরাধে বন্দী করা হল ল্যাভোশিঁয়েকে। কিন্তু অভিযোগহ বাড়ি খানাতল্লাসী করা হল। তাঁর সমস্ত কিছু আটক করা হল। গবেষণার কাগজপত্র ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। তবুও তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল না। কারাগারে বন্দী থেকেও মনের সাহস হারালেন না ল্যাভোশিঁয়ে। তিনি জানতেন তাঁর সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি। অথচ তাঁর এক আত্মীয়কে চিঠিতে লিখিছেন, "আমি দীর্ঘ সুখী জীবন পেয়েছি। এখন বার্ধক্যের ভারে ক্লান্ত। পেছনে ফেলে এসেছি কিছু জ্ঞান, সামান্য কিছু গৌরব। এর বেশি পৃথিবীর মানুষ আর কি আশা করতে পারে?"

শুরু হল বিচারের মিথ্যা প্রহসন। প্রধান সাক্ষী ল্যাভোশিঁয়েরই এক কর্মচারী যাকে চুরির অপরাধে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ল্যাভোশিঁয়ের উকিল তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা উল্লেখ করতেই প্রতিপক্ষের তরফে জবাব এল, "বিপ্লব বিজ্ঞানকে চায় না, তার প্রয়োজন ন্যায়ের।"

অবশেষে সেই বিচিত্র বিচার শেষ হল। সবচেয়ে বিচিত্র তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ, "বিদেশী ও দেশের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।"

মৃত্যুর আগে যেন চিঠিতে তিনি স্ত্রীকে লিখেছেন, তোমার স্বাস্থ্যের যত্ন নিও প্রিয়তমা, দুঃখ করো না, আমি আমার কাজ শেষ করেছি, তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিও।

১৭৯৪ সালের মে মাসের কোন এক সকালে তাঁকে গিলোটিনে হত্যা করা হল। তাঁর মৃত্যুর পর বিজ্ঞানী লরেঞ্জ বলেছিলেন, "শুধু একটি মুহূর্ত লেগেছিল তাঁর মাথাটি কাটতে। তেমন আর একটি মাথা পেতে হয়ত আমাদের আরো একশো বছর অপেক্ষা করতে হবে।"

৯০

এডওয়ার্ড জেনার

[১৭৪৯-১৮২৩]

শীতের রাত, চারদিকে কনকনে ঠাণ্ডা। পথে ঘাটে একটি মানুষও নেই। অধিকাংশ মানুষই নেই। অধিকাংশ মানুষই ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আগুনে পোয়াচ্ছে। যারা বাইরে গিয়েছিল, সকলেই ঘরে ফেরার জন্য উদ্গ্রীব। ইংল্যান্ডের এক আধা শহর বার্কলেতে থাকতেন এক তরুণ ডাক্তার। বয়েসে তরুণ হলেও ডাক্তার হিসাবে ইতিমধ্যে চারিদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। দূর-দূরান্ত থেকে রুগী আসে তাঁর কাছে। বহু দূরের এক রুগী দেখে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামতেই ডাক্তার দেখলেন তাঁর বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাকে ঢাকা এক মহিলা। কছে এগিয়ে গেলেন। সামনে আসতেই মহিলাটি তাঁর পায়ের সামনে বসে পড়ল, আমার ছেলেকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।

.ডাক্তার তাড়াতাড়ি মহিলাটিকে তুলে ধরে বললেন, কোথায় আপনার ছেলে?

–ছেলেকে বাড়িতে রেখে এসেছি ডাক্তারবাবু। আমার চার চারটি ছেলে আগে মারা গিয়ে এই শেষ সম্বল।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন ডাক্তার। তবুও মহিলাটির কাতর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না...তার সাথে বাড়িতে গেলেন। গলির শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটি ঘর, ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছিল। এক কোণায় বিছানার উপর শুয়েছিল ছোট একটি বাচ্চা। সারা গায়ে ঢাকা দেওয়া। ডাক্তার গায়ের ঢাকা খুলতেই চমকে উঠলেন। শিশুটির সমস্ত শরীর গুটি বসন্তে ভরে গিয়েছে। জ্বরে বেহুঁশ।

ঔষধের বাক্স নিয়ে শিশুটির পাশে সমস্ত রাত জেগে রইলেন। সামনে উদবেলিত উৎকণ্ঠা ভরা চোখে চেয়ে আছে মহিলাটি।–এই ভয়ঙ্কর অসুখ আমার আগের চারটি সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে। একে আপনি বাঁচন।

শুরু হল তাঁর সাধনা। একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর। কোন ক্লান্তি নেই, অবসন্নতা নেই, এই সাধনায় তাঁকে সিদ্ধিলাভ করতেই হবে। অবশেষে সাফল্য এসে ধরা দিল সাধনার কাছে। জয়ী হল মানুষের সংগ্রাম। বসন্তের ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল পৃথিবী। যে মানুষটির নিরলস সাধনায় পরাজিত হল ভয়াবহ ব্যাধি, তাঁর নাম এডওয়ার্ড জেনার।

১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মে ইংলন্ডের বার্কলে শহরে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন সেখানকার ধর্মযাজক। বার্কলের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে স্থানীয় মানুষের সুখে-দুঃখে তিনি ছিলেন তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। গরীব-দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর ছিল সীমাহীন ভালবাসা। পিতার এই মহৎ গুণ শিশুবেলা থেকেই জেন্যারের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু পিতার সান্নিধ্য দীর্ঘদিন পাননি জেনার। যখন তাঁর মাত্র পাঁচ বছর বয়েস তখন বাবা মারা যান। তাঁর সব ভার এসে পড়ে দাদা রেভারেন্ড স্টিফেন জেনারেলে উপর। দাদার স্নেহচ্ছায়াতেই বড় হয়ে উঠতে থাকেন জেনার।

জেনার যেখানে থাকতেম সেই বার্কলের সংলগ্ন অঞ্চলে ছিল সবুজ মাঠ, গাছপালা, মাঝে মাঝে চাষের জমি, কোথাও গোচারণ ভূমি। চাষীরা চাষ করত, রাখাল ছেলেরা মাঠে গরু নিয়ে আসত।

ছেলেবেলা থেকেই এই উদার মুক্ত প্রকৃতি জেনারকে নেশার মত আকর্ষণ করত, তিনি একা একা ঘুরে বেড়াতেন মাঠের ধারে গাছের তলায়। মনে হত তারা যেন সজীব পদার্থ। প্রতিটি গাছের পাতায় ছোট ছোট ঘাসের মধ্যে তিনি যেন প্রাণের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছেন। পাখির ডাক তার কলকাকলি মনে হত সঙ্গীতের মূচ্ছর্না। প্রকৃতির মুখোমুখি হলেই তন্ময়তার গভীরে ডুব দিতেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেন, তার বৈচিত্র বৈশিষ্ট্য। যা কিছু দেখতেন জানতেন, বাড়ি ফিরে এসে খাতার পাতায় লিখে রাখতেন আর লিখতেন কবিতা, কবিতার প্রতি ছেলেবেলা থেকেই ছিল তাঁর আকর্ষণ, পরিণত বয়েসেও তিনি অবসর পেলেই কবিতা লিখতেন। অন্তরে ছিলেন তিনি অবসর পেলেই কবিতা লিখতেন। অন্তরে ছিলেন তিনি কবি, প্রকৃতিপ্রেমিক, কর্মে বিজ্ঞানী চিকিৎসক।

দীর্ঘ কুড়ি বছরের গবেষণার পর অবশেষে ১৭৯৬ সালের ১৪ই মে জেনার প্রথমে সারা নেলনিসের হাতের গুটি থেকে ইনজেকশন করে সামান্য পুঁজ তুলে নিলেন তারপর ঈশ্বরের নাম করে সেই পুঁজ জেমসের শরীরে টিকা দিলেন।

জেমসের আগে কোনদিন বসন্ত হয়নি। টিকা নেওয়ার দু-একদিন পরেই দেখা গেল যেখানে টিকা নেওয়া হয়েছিল সেই জায়গায় একটা ঘা সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকদিনের চিকিৎসায় সেই ঘা ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল। কিন্তু ক্ষতস্থানের একটা চিহ্ন রয়ে গেল।

কয়েকদিন ধরে জেনার জেমসকে নিয়ে বসন্ত রুগীদের মধ্যে চিকিৎসার কাজ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জেমসের বসন্ত হল না। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন তাঁর কুড়ি বছরের সাধনা অবশেষে সফল হয়েছে। এখন প্রয়োজন তাঁর এই সাফল্যের কথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। কিন্তু তার আগে সর্বসমক্ষে পরীক্ষ দিতে হবে। প্রমাণ করতে হবে তিনি গুটি বসন্তের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন।

জেনার লন্ডনের বিখ্যাত সব চিকিৎসকদের ডেকে তাঁর গবেষণার কথা জানালেন। ঘোষণা করলেন সর্বসমক্ষে তিনি জেমসের শরীরে বসন্ত রোগের পুঁজ প্রবেশ করাবেন।

চারদিকে গুঞ্জন উঠল, কেউ বলল, জেনার অর্থহীন প্রলাপ বকছেন, কেউ বলল তিনি একটি শিশুকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এ জঘন্য অপরাধ, কেউ কেউ মন্তব্য করর জেনার অর্থের লোভে জুয়াচুরি শুরু করেছেন। কিন্তু জেনার কারো সমালোচনাতেই কান দিলেন না।

১লা জুলাই ১৭৯৬ সাল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য দিন। জেনার উপস্থিত ডাক্তারদের সামনে এক বসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে পুঁজ নিয়ে জেমসের শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন। সকলেই উৎকণ্ঠিত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন...একদিন দুদিন করে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। কিন্তু জেমসের দেহে বসন্তের সামান্যতম চিহ্ন দেখা গেল না। টিকা নেওয়ার জন্যে জেমসের দেহে প্রতিষেধক শক্তি সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু চিকিৎসকরা কেউই জেনারের এই আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিতে চাইল না। এর পেছনে দুটি কারণ ছিল। একদল তাঁর এই অসাধারণ আবিষ্কারে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল, অন্যদল বিশ্বাস করতে পারছিল না গুটি বসন্তের মত ভয়াবহ অসুখকে নির্মূল করা সম্ভব।

নিজের বিশ্বাসে অটল ছিলেন জেনার। একের পর এক তেইশ জনকে টিকা দিলেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি সফল হলেন। এই সময় তাঁর কাছে একাধিক প্রলোভন আসতে থাকে। স্যার ওয়ালটার নামে এক ভদ্রলোক জেনারকে এক লক্ষ পাউন্ড এবং বছরে দশ হাজার পাউন্ড দেবার কথা বলল, বিনিময়ে এই আবিষ্কারের ফর্মূলা তুলে দিতে হবে।

মানব কল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ জেনার হাসিমুখে সেই অর্থ ফিরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, মানুষের কল্যাণে আমি আমার এই আবিষ্কারকে ব্যবহার করতে চাই, অর্থ উপার্জনের জন্য নয়।

অবশেষে ১৭৯৮ সালে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর যুগান্তকারী প্রবন্ধ Inquiry into cause and effect of the Variolae Vaccinae। এর পরের বছর প্রকাশ করলেন দ্বিতীয় প্রবন্ধ Further Inquiry...। এবং চূড়ান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন ১৮০০ সালে Complete Statement of facts and observations.

এই সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশের সাথে সাথে শুধু ইংলন্ড নয়, পৃথিবীর আরো বহু দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হল। প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক থেকে আরম্ভ করে হাতুড়ে ডাক্তার সকলেই এর বিরুদ্ধে মতামত দিতে আরম্ভ করল। অনেকে অভিমত দিল এ এক নূতন ধরনের অপারেশন। এতে মানুষের মৃতু পর্যন্ত হতে পারে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গকৌতুক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হতে লাগল।

এই প্রচণ্ড বিরোধিতা সমালোচনা বিদ্রূপের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জেনার অটল অবিচলিতভাবে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল মানুষ একদিন না একদিন তাঁর আবিষ্কারকে স্বীকরা করে নেবে।

এই সময় গবেষণার প্রয়োজনে চিকিৎসা করতে পারতেন না। হাতে সামান্য যা অর্থ পেতেন গবেষণার কাজেই তা ব্যয় হত। সংসারে অভাব অনটন প্রকট হয়ে উঠল। দু-এক জন হিতৈষী বন্ধু কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাইলে তিনি হাসিমুখে তাদের ফিরিয়ে দিলেন। পরিবারের প্রতিটি মানুষের সাথেই দারিদ্র্যকে ভাগাভাগি করে নিতেন।

একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা। এই দুইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাময়িক বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করলেন। তিনি অনুভব করতে

পারছিলেন তাঁর আরো বাধার সম্মুখীন হতে হবে এবং সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করেই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে হবে।

জেনারকে দুই ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হল। একদল লোক, তাদের বেশির ভাগ মানুষই ছিল ডাক্তার–তারা চারদিকে প্রচার করতে আরম্ভ করল গুটি বসন্তের প্রতিরোধক হিসাবে যে টিকা ব্যবহার করা হচ্ছে তা মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, এতে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এই ধরনের প্রচারে জেনার বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। কারণ তিনি জানতেন যে মানুষ একবার টিকা গ্রহণ করতে পারবে, সে নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে এই টিকা কল্যাণকর না ক্ষতিকারক। কিন্তু বিপদ এল অন্য পথে।

সম্রাটের আদেশে সমস্ত বন্দীদেরই মুক্তি দেওয়া হল। পার্লামেন্টের সদস্যরা ক্রমশই উপলব্ধি করতে পারছিলেন জেনারেল প্রতিভাকে অস্বীকার করে লাভ নেই। এবার তাঁকে হাজার পাউন্ড সাহায্য দেওয়া হল। এই অর্থে জেনার গড়ে তুললেন জাতীয় ভ্যাকসিন ইন্সটিটিউশন। (National Vaccine Institution). এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলাবার জন্য শুরু হল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম। কয়েক মাস পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লন্ডনের পরিবেশ তাঁর ভাল লাগছিল না। বার্কলেন কমওন্ডের সবুজ প্রান্তর, উন্মুক্ত প্রকৃতি ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। লন্ডন ছেড়ে চলে এলেন বার্কলে। লন্ডন ত্যাগ করার পেছনে আরো একটি কারণ ছিল, ভ্যাকসিন ইন্সটিটিউশনের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বেশ কিছু সদস্য নেওয়া হল যাঁরা ছিলেন জেনারের সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন প্রতিবাদ করলেন না জেনার, শুধু নীরবে পদত্যাগ করলেন।

আসলে জেনার ছিলেন একজন প্রকৃতিই বিজ্ঞানী, নম্র বিনয়ী, কোন অর্থ যশ খ্যাতি সম্মানের প্রতি তাঁর সামান্যতম আগ্রহ ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর এই আবিষ্কার থেকে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন তাঁর এই আবিষ্কার মানব কল্যাণের কাজে লাগুক, অর্থ উপার্জনে নয়।

১৮০৬ সালে বিখ্যাত সমাজসংস্কারক উইলবারফোর্স লিখেছেন, "জেনারের টিকা এখন ব্যবহৃত হচ্ছে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে। সুদূর চীন, ভারতবর্ষে।"

সমস্ত পৃথিবী তাঁকে সম্মানিত করলে তাঁর স্বদেশ তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে M.D উপাধি দেওয়অর পর সকলেই অনুমান করেছিল তাঁকে রয়অল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস (Royal college of Physicians)_এর সদস্য করা হবে। কিন্তু কলেজ থেকে জানানো হল তাঁকে এই কলেজের সদস্য হতে গেলে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। (জেনার এই দুটি ভাষার কোনটিই জানতেন না।) তিনি এই অপমানকর প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললেন...আমার কাছে এই সম্মানের কোন মূল্য নেই। তবে জেনার চেয়েছিলেন ইংলন্ডের রয়াল সোসাইটি তাঁর গবেষণাপত্র অনুমোদন করবে। রায়ল সোসাইটি ছিল বিজ্ঞানীদের প্রধান সংগঠন। বিস্ময়ে অবাক হতে হয় যে আবিষ্কার পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল সেই গবেষণাপত্রকে ত্রুটিপূর্ণ বলে অমনোনীত করেছিল রয়াল সোসাইটি। এই ঘটনায় জেনার খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। তবুও তাঁর গবেষণার কাজ বন্ধ হয়নি।

বার্কলের নিভৃত প্রান্তরে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে সুখী জীবন যাপন করতেন। কদাচিৎ লন্ডনে যেতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ক্যাথারিন। শান্ত উদার সহৃদয় স্বভাবের মহিলা। জেনারের প্রতিটি গবেষণা কাজের পেছনে ছিল তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ অনুপ্রেরণা। স্বামীর বিশ্বাস আদর্শকে তিনি গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচার করতেন। তাদের সৎ আদর্শবান হয়ে ওঠার শিক্ষা দিতেন।

জেনার যখনই সময় পেতেন স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে দূরে কোথাও ছুটি কাটাতে যেতেন। ছেলেকে তিনি চিকিৎসক হিসাবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৮১০ সালে ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে মানসিক দিক থেকে একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এরপর থেকে কদাচিৎ ঘরের বাইরে বার হতেন।

১৮১৫ সালে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু হল। এই সময় তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছেন, "আমার চারদিকে সব যেন শূন্য হয়ে গেল।"

স্ত্রী, পুত্রের মৃত্যুর বেদনা ভুলতে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর প্রকৃতির মধ্যে, যে প্রকৃতিতে তিনি আজন্ম ভালবেসেছিলেন। এই সময় তিনি গাছপালা পাখিদের নিয়ে পড়াশুনা করতেন।

মৃত্যুর আগে তিনি শেষ প্রবন্ধ লেখেন দেশান্তরী পাখিদের নিয়ে। জীবনের সব কাজ শেষ হয়ে এসেছিল জেনারের। একা একা বসে মনে করতেন পুরনো দিনে স্মৃতিকথা। একটি মানুষের কথা বড় বেশি মনে পড়ে তাঁর। বহু বছর আগে দেখা সেই অসুস্থ সন্তানের মা। কতবার তার খোঁজ করেছেন, কোন সন্ধান পাননি, কতদিন ঘুমের মধ্যে জেগে উঠেছেন সন্তানহারা সেই মায়ের কান্নায়। জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে আর কোন দুঃখ নেই। মায়ের কান্না তিনি চিরদিনের মত মুছিয়ে দিতে পেরেছেন।

১৮২৩ সালের ২৬শে জানুয়ারি সকলকে কাঁদিয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন কবি, প্রকৃতি প্রেমিক, বিজ্ঞানী, মানবদরদী এডওয়ার্ড জেনার।

৯১

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল

[১৮২০-১৯১০]

১৮৫০ সাল। ক্রিমিয়ার প্রান্তরে ইংলন্ড ও রাশিয়ার যুদ্ধ চলেছে। দুই পক্ষেই শত শত সৈনিক নিহত হচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে কুটারিতে তৈরি হয়েছে আহত সৈনিকদের জন্য হাসপাতাল। মুমূর্ষু মানুষের আর্তনাদে চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। তার মাঝে চলেছেন। কোন ক্লান্ত নেই, বিরক্তি নেই। দু চোখ জুড়ে রয়েছে ভালবাসা, স্নেহের পরশ। যখনই তিনি কারো পাশে গিয়ে দাঁড়ান, মুহূর্তে সে মুহূর্তে সে ভুলে যায় তার সব ব্যথা যন্ত্রণা।

সর্বপ্রথমে হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার করবার জন্য ঝাড়ুন তোয়ালের প্রয়োজন দেখা দিল। সরকারী দপ্তরের যে কর্মচারীর কাছে এই সব ছিল, ফ্লোরেন্স বুঝতে পারলেন তা সংগ্রহ করতে গেলে আইনের নানা বেড়াজাল পেরিয়ে আসতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তিনি টাইমস্ তহবিলের কাছে আবেদন জানালেন। সেখানেও অনিয়ম। আহত সৈনিকদের জন্য পরিচ্ছন্ন পোশাক দরকার। নিরুপায় হয়ে ফ্লোরেন্স স্কুটারিতে নিজেই একটি বিশাল লন্ড্রী খুলে ফেললেন, ততদিনে পোশাক তোয়ালে আসতে আরম্ভ করেছে। ফ্লোরেন্স আদেশ দিলেন মালের পেটি আসা মাত্রই যেন তা খুলে ফেলা হয়। আইনকানুন আর নিয়মের বেড়াজালে যেন এক মুহূর্ত বিলম্ব না হয়।

ফ্লোরেন্সের আত্মত্যাগ কর্মনিষ্ঠা ভালবাসা মানুষকে উজ্জীবিত করতে থাকে। সকলেই কর্মতৎপর হয়ে ওঠে।

হাসপাতাল পরিষ্কার করে আহত সৈনিকদের যত্নের দিকে মনোযোগ দিলেন ফ্লোরেন্স। এতদিন বাহিনীর হাসপাতাল যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হত তিনি তার আমূল পরিবর্তন করলেন। সে সমস্ত কর্মচারীরা হাসপাতালের কাজের উপযুক্ত নয় বিবেচনা করলেন, তিনি তাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন দয়ার প্রতিমূর্তি অন্যদিকে কঠিন কঠোর। কাজের সামান্যতম বিশৃঙ্খলা বিচ্যুতি সহ্য করতে পারতেন না।

ফ্লোরেন্স স্কুটারিতে পৌঁছবার কয়েকদিন পর এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছেন, "সেই সমস্ত অফিসারদের প্রতি আমার কিছু সহানুভূতি আছে যারা আমার ক্রমাগত চাহিদা পূরণ করতে করতে দিশাহারা হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত লোক যারা মানুষের মৃত্যু মেনে নিতে পারবে কিন্তু সরকারী কেতা-কানুন ভেঙে একটি ঝাঁটা দেবে না-তাদের প্রতি আমার সামান্যতম সহানুভূতি নেই।"

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ করে সমস্ত হাসপাতালকে ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করলেন। হাসপাতালের কর্মচারীদের স্বতন্ত্র দল তৈরি করে তাদের উপর জিনিসপত্র ভার অর্পণ করলেন। কারোর উপর জিনিসপত্র কেনার ভার পড়ল, কারোর উপর সমস্ত হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন রাখা, কারো উপর রুগীদের পোশাক-পরিচ্ছদের দায়িত্ব দেওয়া হল। শুধুমাত্র দায়িত্বভার আরোপ করেই নিশ্চিন্ত হলেন না ফ্লোরেন্স। যাতে প্রত্যেককে আপন আপন কর্ম দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে পালন করে তার দিকে প্রতি মুহূর্তে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। দিনের শেষে সকলের কাজের বিশ্লেষণ করতেন, ভুল-ত্রুটি দূর করে আরো কর্মদক্ষ হয়ে উঠবার পরামর্শ দিতেন। অল্প কিছুদিনে মধ্যেই সমগ্র হাসপাতালের চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল। শুধু তাই নয়, নতুন কয়েকটি ওয়ার্ড খোলা হল। চার মাইল অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠল এই হাসপাতাল। ফ্লোরেন্স ছিলেন এই হাসপাতালের এক সেবার প্রতিমূর্তি। দিন-রাত্রির প্রায় সবটুকু অংশই তাঁর কেটে যেত এই হাসপাতালের আঙিনায়। কখনো তিনি আহতদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন, কখনো তাদের পোশাক পরিয়ে দিচ্ছেন। আবার সহকর্মীদের হাতে হাত লাগিয়ে

হাসপাতাল আঙিনা পরিষ্কার করছেন। রুগীদের জন্য খাবার তৈরি করছেন। আবার তিনিই রাতের গভীরে সকলে যখন ঘুমিয়ে আছে, প্রদীপ হাতে রুগীদের বিছানার পাশে ঘুরে বেড়াতেন। রুগীরা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখত। তাদের মনে হত এক মূর্তিময়ী দেবী যেন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সব দুঃখ যন্ত্রণা মুহূর্তে ভুলে যেত তারা। একজন সৈনিক লিখেছেন যখন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে হাঁটতেন, এক অনির্বচনীয় আনন্দে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ ভরে উঠত। তিনি প্রত্যেকটি বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতেন। কোন কথা বলতেন না, শুধু মুখে ফুটে উঠত মৃদু হাসি। তারপর তিনি যখন আমাদের অতিক্রম করে যেতেন, তাঁর ছায়া পড়ত আমাদের শয্যার উপর। সৈনিকরা পরম শ্রদ্ধার সেই ছায়াকেই চুম্বন করত। তারা বলত 'দীপ হাতে রমণী'। এই নামেই তিনি সমস্ত পৃথিবীর মাঝে অমর হয়ে রইলেন। যুদ্ধ যতই এগিয়ে চলল তাঁর কর্মভার বেড়েই চলল। যুদ্ধের প্রয়োজনে যেখানে যত হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল, সব হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালের দূরত্ব কিছু কম ছিল না। কিন্তু কোন দায়িত্বভার গ্রহণেই তিনি অসম্মতি প্রকাশ করতেন না। প্রবল তুষারপাত, বৃষ্টির মধ্যেই তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে বেড়াতেন। সেখানকার কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টায় মৃত্যুর হার হাজারে ষাট থেকে তিনি এসে দাঁড়াল।

তবুও বিশ্রাম নেই ফ্লোরেন্সের। শুধু আহত মানুষের দেহের সুস্থতা নয়, মনের আনন্দের ব্যবস্থা করতেও তিনি সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। আহত সৈনিকরা যাতে নিয়মিত বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারে, তিনি তার ব্যবস্থা করলেন। প্রতিটি হাসপাতালে গড়ে তুললেন লাইব্রেরি। সেখানে আমোদ-প্রমোদের জন্য শুধু বই ছাড়াও বিভিন্ন সংবাদপত্র আনার ব্যবস্থা করলেন। হাসপাতাল ব্যবস্থার সমস্ত চেহারাটাই পরিবর্তিত হয়ে গেল। এতদিনের প্রচলিত ব্যবস্থা ভেঙে জন্ম নিল নতুন সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত আধনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার। শুধু হাসপাতাল নয়, বহুবার তিনি গিয়েছেন যুদ্ধের প্রান্তরে। বুঝেছিলেন শুধু অস্ত্র বা সামরিক শিক্ষা একজন সৈনিককে তার দক্ষতার চরম শিখরে পৌছে দিতে পারে না। তাদের জন্যেও পাঠাতেন গরম খাবার, নানান বই। এই অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছিল, মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন তিনি। একবার এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ডাক্তাররা প্রায় তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করেছিল। কিন্তু তাঁর অদম্য মনোবল, জীবনীশক্তির তাগিদে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল তাঁর সুন্দর চুল, দেহের সৌন্দর্য। আগেকার দেহের শক্তি আর ফিরে পাননি ফ্লোরেন্স। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর কাজ করতেন। ডাক্তাররা, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁকে লন্ডনে ফিরে যাওয়ার জন্য বারংবার অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু সকলের সমস্ত অনুরোধই তিনি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যতক্ষণ না শেষ আহত সৈনিকটি দেশে প্রত্যাবর্তন করছে ততক্ষণ তাঁর পক্ষে স্কুটারি ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের এই অজেয় মনোভাবের জন্য সমস্ত ইংলন্ড তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় প্রশংসায় মুখরিত হয়ে ওঠে। মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে লিখলেন, "যেদিন আপনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন সেই দিনটি আমর কাছে বিরাট আনন্দের দিন হবে কারণ সমস্ত নারী জাতিকে আপনি সুমহান গৌরবে মহিমান্বিত করেছেন। আপনার সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করি।"

অবশেষে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। ১৮৫৬ সাল, দীর্ঘ দু বছর আহত সৈনিকদের সেবার করে ফ্লোরেন্স নাইর্টিঙ্গেলে ফিরে চললেন তাঁর স্বদেশভূমিতে। তাঁর সম্মানে ব্রিটিশ সরকার একটি আলাদা জাহাজ পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু সে অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, সকলের সাথেই দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। সমস্ত দেশ তাঁকে বিপুল সম্মান জানাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সবিনয়ে সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করলেন সামান্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল না। শুধুমাত্র মহারানী ভিক্টোরিয়ার দেওয়া সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের মধ্যে তিনি শুধু নিজেকে একজন সেবিকা নিয়ম ভেঙে নারীকে দিলেন সম্মানের আসন। প্রচলিত কুসংস্কারে নিগড় ভেঙে সেবার কাজকে (Nursing) মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু তখনো তাঁর কাজ শেষ হয়নি। তাঁর আদর্শ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল।

ফ্লোরেন্সের ইচ্ছা ছিল দেশে প্রথম নার্সিং স্কুল স্থাপন করবেন। সমগ্র ইংলন্ডের মানুষ তাঁকে সম্মান জানাতে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড অর্থ তুলে দিল। সেই অর্থে ১৮৫৯ সালে সেন্ট টমাস

হাসপাতালে তৈরি হল প্রথম নার্সিং স্কুল, "নাইটিঙ্গেল হোম" যা আধুনিক নার্সিং শিক্ষার প্রথম পাঠগৃহ।

শারীরিক অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই স্কুলের পঠন-পাঠন পরিচালনা বিধি ব্যবস্থা নিজেই নিরূপন করতেন। নার্সিং শিক্ষার সাথে সাথে সামরিক চিকিৎসা সম্বন্ধেও তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। ১৮৫৮ সালে তিনি প্রকাশ করলেন আটশো পাতার একখানি বিবরণী, Note on matters affecting the health, efficiency and Hospital Administration of the British Army. এছাড়া তিনি নার্সিং-এর উপর একাধিক বই লিখলেন।

শুধু নার্সিং নয়, হাসপাতাল পরিচালনা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাঁর মূল্যবান পরামর্শ শুধু ইংলন্ড নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও গ্রহণ করতে থাকেন। সমগ্র হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থার তিনি আমূল পরিবর্তন করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও ফ্লোরেন্সের আগ্রহ ছিল গভীর। সিপাই বিদ্রোহের সময় তিনি ভারতবর্ষে গিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

ফ্লোরেন্সের দেহের কর্মক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে আসছিল। একসময় শারীরিক দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তিনি। এর পরেও বহু বছর বেঁচেছিলেন তিনি। রোগ যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে তাঁর অন্তরে জেগে থাকত এক গভীর আনন্দ। তিনি তাঁর জীবিতকালেই প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর শিক্ষা, সাধনা ব্যর্থ হয়নি। দেশে দেশে গড়ে উঠছে নার্সিং স্কুল। যে পেশা একদিন ছিল ঘৃণিত তাই হয়ে উঠেছে পরম সম্মানের। নতুন প্রজন্মের মেয়েরা নার্সিংকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করছে।

জীবিতকালে বহু সম্মান পেয়েছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। কিন্তু তাঁর আদর্শের বাস্তব রূপ দেখে যে আনন্দ পেয়েছেন তার চেয়ে বড় পাওয়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না।

অবশেষে ১৯১০ সালের ১৩ই আগস্ট এই মানব দরদী মহীয়সী নারীর মৃত্যু হয়।

৯২

মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী (রঃ)

(১২০৭-১২৭৩ খ্রিঃ)

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? আল্লাহকে চেনা ও বুঝার উপায় কি? মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? ইহজগতে থেকে মানবাকৃতি বজায় রেখে মানুষ কিভাবে অস্তিত্বহীন হতে পারে? নিয়তি ও কর্মের সমস্যার সমাধান কি? নফস কি এবং নফসের প্রভাব থেকে মানুষের মুক্তি লাভের উপায় কি? এ সকল বিস্ময়কর প্রশ্নের জবাব যিনি প্রথম মানুষের সামনে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ)।

৬০৪ হিজরীর ৬ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১২০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর এ মহামনীষী বর্তমান আফগানিস্তানের বলখ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল বাহাউদ্দিন ওয়ালিদ। পিতা ছিলেন তৎকালের স্বনামখ্যাত কবি ও দরবেশ। জানা যায় পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালিদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে পারস্যের রুম প্রদেশের অন্তর্গত 'কুনিয়া'র তৎকালীন শাসনকর্তা আলাউদ্দিন কায়কোবাদ মনীষী বাহাউদ্দিন কুনিয়ায় আমন্ত্রণ করে পাঠান। আমন্ত্রণ পেয়ে বাহাউদ্দিন ওয়ালিদ সপরিবারে কুনিয়ার চলে যান এবং রাজনৈতিক কারণে তিনি সেখানে বাসস্থান নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ রুম প্রদেশের নাম অনুসারে তিনি 'রুমী' নামে খ্যাতি লাভ করেন।

৫ বছর বয়স থেকেই মাওলানা রুমী (রঃ) এর মধ্যে বিভিন্ন অলৌকিক বিষয়াদি পরিলক্ষিত হতে থাকে। বাল্যকালে তিনি অন্যান্য ছেলেমেয়েদের ন্যায় খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদ লিপ্ত থাকতে পছন্দ করতেন না। তিনি সর্বদা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আলোচনা পছন্দ করতেন। ৬ বছর বয়স থেকেই তিনি রোজা রাখতে শুরু করেন। ৭ বছর বয়সে তিনি সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতেন। কোরআন তেলাওয়াতের সময় তাঁর দু'নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হত। সম্ভবত এ বয়সেই তিনি কোরআনের মর্মবাণী ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি অনুধাবন করতে পারতেন। কথিত আছে মাওলানা রুমী (রঃ) এর বয়স যখন ৬ বছর তখন পিতা বাহাউদ্দিন বালক রুমী (রঃ) কে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ইরানের নিশাপুরে যান এবং সেখানে বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তাবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তাব বালক জালাল উদ্দিনের মুখচ্ছবি দেখেই তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যত বুঝতে পেরে তাঁর

জন্যে দোয়া করেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্যে পিতাকে উপদেশ দেন। নিশাপুর ত্যাগ করে পিতা বাহাউদ্দিন রুমী (রঃ) কে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করেন এবং বাগদাদসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। পিতা নিজেই তাঁর পুত্রকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। শিক্ষা লাভের প্রতি তাঁর ছিল পরম আগ্রহ।

১২৩১ সালে পিতার মৃত্যুর পর মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ) মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মারাত্মক বাঁধা এসে দাঁড়ায়। মাতাকে হারিয়ে ছিলেন আরো কয়েক বছর পূর্বে। এ সময়ে কুনিয়া শহরে তিনি সাহচর্য লাভ করেন পিতার প্রধান শিষ্য তৎকালীন পণ্ডিত ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী সৈয়দ বোরহান উদ্দিনের। সৈয়দ বোরহান উদ্দিন পিতৃ শোকাকুল মাওলানা রুমী (রঃ) কে শিক্ষা দান করেন। এরপর উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্যে তিনি চলে যান প্রথমে সিরিয়া ও পরে দামেস্কে। তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৭ বছর অধ্যয়ন করেন। এছাড়া জ্ঞানের সন্ধানে তিনি ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান দেশ থেকে দেশান্তরে। তিনি তাঁর শিক্ষা জীবনে তৎকালীন যুগ শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি যাদের থেকে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুদ্দিন তাব্রীজ (রঃ), ইবনে আল আরাবি (রঃ), সালাউদ্দিন ও হুসামউদ্দিন এর নাম উল্লেখযোগ্য। জালাল রুমী (রঃ) এত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, তৎকালীন সময়ে তাঁর সাথে অন্য কারো তুলনা ছিল না। কথিত আছে ১২৫৯ সালে চেঙ্গীস খানের পৌত্র হালাকু খান যখন বাগদাদ অধিকার করে তদীয় সেনাপতি কুতববেগকে দামেস্কের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন তখন দামেস্কবাসীদেরকে সহযোগিতা করার জন্যে ধ্যানযোগে তিনি দামেস্কে উপস্থিত হয়েছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর রুমী (রঃ) পিতার গদীনেশীন হন। বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর নিকট আগত হাজার হাজার লোকদেরকে তিনি শিক্ষাদান করেন। তিনি বহু কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মসনবী' ও 'দিওয়ান' তাঁকে অমর করে রেখেছে। বাংলা ভাষা সহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গ্রন্থ 'মসনবী' অনূদিত হয়েছে। আলেমগণ আজও বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল ও ধর্মীয় আলোচনা সভায় তাঁর রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতামণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে থাকেন। পারস্যে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের পরই 'মসনবী'কে যথার্থ পথ প্রদর্শক বলে মনে করা হয়। 'দিওয়ানে' রয়েছে প্রায় ৫০ হাজার শ্লোক, যার প্রায় সমস্তই আধ্যাত্মিক গজল। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতি অতুলনীয়। রুমী (রঃ) ছিলেন মহাপণ্ডিত। অসামান্য পাণ্ডিত্যে তাঁকে দরবেশ বা সুফীতে পরিণত করেছে। 'ইলমে মারেফত' ও 'এলমে লাদুনিতে' তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন। এটা হলো শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আলয়। সুফীর মতে দেহই মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের মহা অন্তরায়। দেহের ভিতরে যে কামনা ও বাসনা মানুষকে সর্বদা সত্যপথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যা মানুষকে ব্যক্তিত্ব বা অহংকার প্রদান করে ভোগলিপ্সু করে, সে জৈব আকাংখার নাম সুফীদের ভাষায় 'নফস'। নফসের ধ্বংসই দেহের কর্তৃত্বের অবসান ও আত্মার স্বাধীনতার পূর্ণতা। তাই নফসের বিরুদ্ধে সুফীদের আজীবন সংগ্রাম। রুমী (রঃ) তাঁর সারাটা জীবন নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। রুমীর মতে বুদ্ধি, যুক্তি ও ভক্তি এক নয়। বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে আল্লাহকে চিনা, বুঝা ও পাওয়া যায় না। বরং এর জন্যে প্রয়োজন বিশ্বাস ও ভক্তি। ভক্তিই সোপান। আর ভক্তির উৎস হচ্ছে প্রেম ও আসক্তি। রুমির মতে আল্লাহ নির্গুণ নন। জ্ঞান, দয়া, করুণা, প্রেম ও ক্রোধ ইত্যাদি অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে তাঁর। কিন্তু মানুষ তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তির মাপকাঠি দিয়ে আল্লাহর গুণাবলী অনুধাবন করতে পারে না। কারণ বুদ্ধি ও যুক্তি নিজেই একটি সৃষ্ট বস্তু এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমন্ডলীর সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সৃষ্ট দিয়ে অসৃষ্টকে বুঝা সম্ভব নয়। আল্লাহকে বুঝতে ও চিনতে হলে ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রয়োজন। তাহলেই অন্তর দিয়ে আল্লাহকে অনুধাবন করতে পারবে। মানুষ যখন মা'রেফাতের উর্দ্ধতন স্তরে উন্নীত হয়ে আপনার ভিতর আল্লাহর প্রকাশ অনুভব করে তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের সীমা কোথায় ভাসিয়ে যায়। তিনি তখন অসীমের ভিতর আপনাকে হারিয়ে ফেলেন। কিংবা তিনি নিজের সীমার ভিতরই অসীমের সন্ধান লাভ করেন। তখন তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের রাজৈশ্বর্যকে একেবারেই তুচ্ছ বোধ করেন। মারেফাতের স্তর উন্নীত হলে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আর কোন ভেদাভেদ থাকে না। এ অবস্থার নাম হলো 'হাল'। এ কথাগুলো পৃথিবীর মানুষের সামনে পেশ করে গেছেন মাওলানা রুমী (রঃ)। ইহজগতে থেকে মানবাকৃতি বজায় রেখে মানুষ কিভাবে অস্তিত্বহীন হতে পারে তা মাওলানা রুমী (রঃ) দেখিয়েছেন।

মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (রঃ) 'ভাগ্য ও পুরস্কার' সমস্যার সহজ সমাধান দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের সকল কার্যের নিয়ন্তা আল্লাহ। কিন্তু এর সংগে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে, আল্লাহ পাক মানুষকে কতকগুলো কার্যের পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাধিকার দিয়েছেন, যার সীমারেখার মধ্যে মানুষ নিজেই তার কর্মপন্থা নির্বাচনের অধিকারী। এ সকল কার্যাদির কর্মফলের জন্যে মানুষ নিজেই দায়ী। কারণ এগুলো করা না করা তারই স্বেচ্ছাধিকার ভুক্ত, যদিও কর্ম করার শক্তি আল্লাহই মানুষকে প্রদান করেছেন। রুমী (রঃ) ছিলেন তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী।

রুমী (রঃ) খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ মনে করতেন। তিনি যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন সে তুলনায় দুনিয়া তুচ্ছ হওয়াটাই স্বাভাবিক। মৃত্যু কালে তাঁর কোন সঞ্চিত ধন-সম্পদ ছিল না। ৬৬ বছর বয়সে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হবার সাথে সাথে চতুর্দিক হতে হাজার হাজার লোক গভীর উদ্বেগের সাথে ছুটে আসে। তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক শেখ সদরউদ্দিন, আকমাল উদ্দিন ও গজনফার তাঁর চিকিৎসা করে ব্যর্থ হন। এ সময় রুমী (রঃ) চিকিৎসক শেখ সদরউদ্দিন সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, "আশেক ও মাশুকের মধ্যে একটি মাত্র পর্দার ব্যবধান রয়েছে। আশেক চাচ্ছে তার মাশুকের নিকট চলে যেতে। পর্দাটা যেন দ্রুত উঠে যায়।" শেখ সদরউদ্দিন বুঝতে পেরেছিলেন, রুমী (রঃ) এর আয়ু শেষ হয়ে আসছে; অর্থাৎ রুমী (রঃ) আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার জন্য তখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এরপর তিনি তাঁর শিষ্যদের সান্ত্বনা দিয়ে কিছু উপদেশ দিলেন, যার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ইন্দ্রিয় লালসাকে কখনো প্রশ্রয় দিবে না। পাপকে সর্বদা পরিহার করবে। নামাজ ও রোজা কখনো কাযা করবে না। অন্তরে ও বাহিরে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলবে। বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। বিদ্রোহ ও প্রতিশোধমূলক মনোভাব পোষণ করবে না। নিদ্রা ও কথাবর্তায় সাধ্যানুযায়ী সংযমী হবে। কাউকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না। সব সময় সৎ লোকদের সংস্পর্শে থাকবে। মনে রাখবে, মানুষের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, যার দ্বারা ও দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। তারপর তিনি বললেন, মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু তার আত্মা অবিনশ্বর। এ নশ্বর দেহ ধ্বংসে প্রাপ্ত হয় বটে; কিন্তু তার ভিতর যে অবিনশ্বর আত্মা রয়েছে তা চিরকালই বেঁচে থাকে।

এরপর এ বিখ্যাত মনীষী ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। এ সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

৯৩

হেনরিক ইবসেন

[১৮২৮–১৯০৬]

শেকস্‌পীয়ারের পর ইউরোপের নাট্যজগতে সবচেয়ে প্রভাব যিনি বিস্তার করেছিলেন, তাঁর নাম হেনরিক ইবসেন। নরওয়ের স্কিন শহরে তাঁর জন্ম (২০ মার্চ ১৮২৮)। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। পারিবারিক সূত্রে তাঁদের মধ্যে ডাচ জার্মান স্কট জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। যখন ইবসেন নিতান্তই বালক সেই সময় তাঁর বাবা ব্যবসায়ে সর্বস্বান্ত হন। সুখের সংসারে নেমে আসে চরম দারিদ্র্য। নিদারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যেই শুরু হল হেনরিক ইবসেনের শৈশব। ছেলেবেলা থেকেই সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি।

তাঁর স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হবার, নিদারুণ অভাবের জন্য প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডীটুকুও শেষ করতে পারলেন না। এই সময় তাঁরা স্কিন শহর ত্যাগ করে এলেন ডেনস্টপে। ষোল বছর বয়সে এক ঔষধের কারখানায় কাজ পেলেন। এখানকার পরিবেশ ছিল এক কিশোরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তবুও তারই মধ্যে ছটি বছর তিনি এখানে অতিবাহিত করেন। এখানকার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁর মানসিকতাকে গড়ে তুলতে খুবই সাহায্য করেছিল। এখানে কাজ করবার সময়েই তিনি দেখেছিলেন সমাজের অভিজাত শ্রেণীর কদর্য রূপ। দরিদ্র মানুষদের প্রতি তাদের কি নিদারুণ অবজ্ঞা আর ঘৃণা! এই ঘটনা থেকেই তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠতে থাকে সমাজের প্রতি তীব্র ক্ষোভ আর ঘৃণা, এবং মাঝে মাঝেই তাঁর আচরণের মধ্যে এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটত।

যখন তিনি ঔষধ কারখানাতে কাজ করতেন তখনই প্রথম তিনি সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন। কাজের অবসরে যখনই সময় পেতেন নানান বিষয়ের বই নিয়ে পড়তেন, সাহিত্যচর্চা

করতেন। প্রথম কবিতা রচিত হয় যখন তাঁর ১৯ বছর বয়সে। স্থানীয় একটি পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতা রচনার সাথে সাথে রাজনীতির প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। পরবর্তী দু বছরের মধ্যে তাঁর বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হল। কবি হিসাবে জনগণের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

ইতিমধ্যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে ঔষধ কারখানার চাকরি ছেড়ে দিলেন। আসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। ২২ বছরে তিনি ভর্তি হলেন আসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এক সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে এলেন এক উন্মুক্ত জগতে। এখানে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। গ্রীক নাট্যকারদের নাটক পড়ে তাঁর মনের মধ্যে ধীরে ধীরে নাটক লেখার রচনা করেন Cataline. বন্ধুবান্ধবদের সহযোগিতায় তা প্রকাশিত হল। এর অল্পদিনের মধ্যেই রচনা করলেন The Viking's Tomb নাটকটি মঞ্চস্থ হল কিন্তু তা কয়েকদিনের বেশি চলল না।

সাহিত্য সাধনায় এত বেশি মনোযোগি হয়ে ওঠেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন। বাধ্য হয়ে একটি পত্রিকায় কয়েক মাসের জন্য সাংবাদিকের চাকরি নিলেন। নাটকের প্রতি তাঁর ছিল স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণ। সাংবাদিক হিসাবে কাজ করবার সময়েই নাট্যজগতের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৮৫১ সালে ওল বুল নামে একজন বিখ্যাত বেহালাবাদক বার্গেন শহরে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করলেন। তিনি ইনসেনকে এখানে মঞ্চসজ্জা ও কবিতা রচনার জন্য নিযুক্ত করলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর ইবনেস বার্গেনি রঙ্গমঞ্চের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সময় শুধু যে তাঁর রচিত কয়েকটি নাটক এখানে মঞ্চস্থ করতে পেরেছিলেন তাই নয়, ইউরোপের বিভিন্ন নাট্যকারদের নাটকের সাথেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাছাড়া নাটক দর্শক রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধেও বিস্তৃত ধারণা হয়। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল।

এক বছর পর ১৮৫২ সালে ইবসেনকে দেশ-বিদেশের নাট্যকলার সাথে পরিচিত হবার জন্য বার্গের থিয়েটারের তরফ থেকে একটি বৃত্তি মঞ্জুর করা হল। ইবসেন প্রথমে গেলেন ডেনমার্কে তার পর জার্মানী। জার্মানীতে থাকার সময় তিনি লিখলেন মিড সামার ইভ (Mid summer Eve) নামে একটি নাটক। পরের বছর এই নাটকটি মঞ্চস্থ হল। এই সময় আরো কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। এই সব নাটকগুলির মধ্যে তাঁর ধারাবাহিক উন্নতির চিহ্ন লক্ষ্য করা গেলেও প্রতিভার কোন পরিচয় প্রকাশ পায়নি। তাছাড়া কোন নাটকই মঞ্চে সফল হয়নি।

বার্গেনের রঙ্গমঞ্চটি দর্শকের অভাব বন্ধ হয়ে গেল। অন্য সকলের মত ইবসেনকেও চাকরি হারাতে হল। সংসারে তখন আর ইবসেন একা নন, সাথে সদ্য বিবাহিতা পত্নী সুসালা থোরসেন। সুসালার বাবা ছিলেন নরওয়ের একজন প্রেম পরিণয়। সুসালা সমস্ত জীবন ছিলেন ইবসেনের যোগ্য সঙ্গিনী। চাকরি হারিয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়লেন ইবসেন। অভাব আর দারিদ্র্য দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। এক বছর পর ক্রিস্টিয়ানিয়া নরওয়েজিয়ান থিয়েটারের ম্যানেজারের চাকরি পেলেন।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত তিনি প্রায় ৮টি নাটক লিখেছিলেন। এই নাটকগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু শিল্পকর্ম থাকলেও কোন মৌলিকত্ব বা পরিণত শিল্পসৃষ্টির প্রকাশ ছিল না। এর মধ্যে একটি নাটক Lover's Comedy কিছু কিছু নাট্যমোদীর ভাল লাগলেও তার থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারেননি।

ইবসেন জীবনের প্রথম পর্যায়ে ছিলেন রোমান্টিক, তারপর হলেন বাস্তববাদী। ১৮৮৪ সালে নাটকে দেখা গেল পরিবর্তন, এই সময়ে লেখা নাটকগুলি প্রধানত প্রতীকধর্মী—The Wild Duck (1889), The lady from the sea (1888), এই নাটকগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সমসাময়িক জীবনের সমস্যা থেকে সরে গিয়ে সচেষ্ট হয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। তাঁর Hedda Gables একটি অসাধারণ নাটক। নোরার পরে হেড্ডা সবচেয়ে বিখ্যাত নারী চরিত্র। তাকে সমালোচকরা লেডি ম্যাকবেথের সাথে তুলনা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে হেড্ডা ঘৃণিত, দুশ্চরিত্র এক নারী। তবুও লেখক সেই পঙ্কের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন পদ্মকে। হেড্ডার সৌন্দর্য বোধ, তার সাহস লেখককে মুগ্ধ করেছে—তার মধ্যেকার সব হীনতা, কর্মদর্যতা, প্রতারণার অন্তরালে জীবনের সব বাধাকে অতিক্রম করে মুক্তি পাওয়ার যে তীব্র কামনা, যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা, তার মধ্যে দেখা যায়—তার কোন তুলনা হয় না। এখানেই তাঁর মহত্ত্বতা। তবে এই সব নাটকগুলিতে তাঁর

ব্যক্তিগত শিল্প চিন্তা বিশ্লেষণ এত প্রাধান্য পেয়েছে যে নাটকগুলির গতিস্বতন্ত্রতা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যহত হয়েছে। এরপরে লেখেন The Master Builder (1892), When we dead awaken (1899)। ইউরোপে যে নারী জাগরণের ঢেউ উঠেছিল, তারই জয়ধ্বনি শোনা যায় শেষের নাটকটিতে। ইবসেন তাঁর জীবিতকালেই ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে সম্মান পেয়েছেন। ১৮৮০ থেকে ১৯২০–এই দীর্ঘ চল্লিশ বছর ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে ইবসেনের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর নাটক। ইউরোপে প্রথম তাঁর নাটকের সার্থক মূল্যায়ন করেছিলেন বার্নার্ড শ।

তিনি শুধু যে নাটকের মধ্যে দিয়ে সামাজিক আন্দোলন স্থাপন করেছেন তাই নয়, তিনি নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও নিয়ে এসেছেন নতুন যুগ। চিরাচরিত রীতিকে বর্জন করে নাটকের গঠনশৈলীকে সহজ-সরল করেছেন। নাটকে তিনি রোমান্টিকতা বর্জন করে ন্যাচারলিজম্ বা বাস্তবদের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। বিংশ শতাব্দীর নাট্যকারদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। জীবিতকালে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু পুরস্কারের কোন মোহ ছিল না ইবসেনের। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০০ সালে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, বিশেষ হাঁটা-চলা করতে পারতেন না। ধীরে ধীরে তাঁর স্মৃতিভ্রংশ হতে থাকে। ১৯০৩ সালে একেবারেই পঙ্গু হয়ে যান। ১৯০৬ সালের ২৩শে মে বেলা আড়াইটের সময় তাঁর জীবন দীপশিখা চিরদিনের মত নিভে গেল।

তাঁর উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা জানিয়ে সমালোচক এম. ব্রুক বলেছিলেন, Modern Drama begins with Ibsen—যথার্থই তিনি আধুনিক নাটকের জনক।

১৪

টমাস আলভা এডিসন

[১৮৪৭-১৯৩১]

এডিসনের জন্ম ১৮৪৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি কানাডার মিলানে। তাঁর পিতা ছিলেন ওলন্দাজ বংশোদ্ভুত। কয়েক পুরুষ আগে এডিসন পরিবার হল্যান্ড ত্যাগ করে আমেরিকায় এসে আশ্রয় নেন। কিছুদিন পর তাঁরা আমেরিকা ত্যাগ করে কানাডায় এসে বসবাস শুরু করেন।

এডিসনের পিতার আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ছেলেবেলার দিনগুলি আনন্দেই কেটেছিল। সাত বছর বয়েসে এডিসনের পিতা মিচিগানের অন্তর্গত পোর্ট হারান নামে একটা শহরে নতুন করে বসবাস শুরু করলেন।

এখানে এসেই স্কুলে ভর্তি হলেন এডিসন। ছেলেবেলা থেকেই অসম্ভব মেধাবী ছিলেন তিনি। কিন্তু স্কুলের বাঁধা পাঠ্যসূচী তাঁর কাছে খুব ক্লান্তিকর মনে হত। তাই ক্লাসে ছিলেন সকলের পেছনের ছাত্র। ক্লাসে ছিলেন সকলের পেছনের ছাত্র। ক্লাসে বসে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের মুক্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রায়ই আনমনা হয়ে যেতেন। শিক্ষকরা অভিযোগ করতেন, এ ছেলের পড়াশুনায় কোন মন নেই। শিক্ষকদের কথা শুনে মনে মনে ক্ষুব্ধ হতেন এডিসনের মা। ছোট ছেলের প্রতি তাঁর বরাবরই দুর্বলতা ছিল। তাঁর মনে হত এই ছেলে একদিন বিখ্যাত হবেই। স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন এডিসনকে। শেষ হল এডিসনের তিন মাসের স্কুল জীবন। এর পরবর্তীকালে আর কোনদিন স্কুলে যাননি। এডিসন মায়ের কাছেই শুরু হল তাঁর পড়াশুনা।

ছেলেবেলা থেকেই এডিসনের ঝোঁক ছিল পারিপার্শ্বিক যা কিছু আছে, যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয়, তা নিয়ে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বার করতে পারেন কিনা দেখবার জন্য ঘরের এক কোণে ডিম সাজিয়ে বসে পড়লেন। কয়েক বছর পর কিশোর এডিসন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্য একটা ছোট ল্যাবরেটরি তৈরি করে ফেললেন তাঁর বাড়ির নিজের তলার একটা ঘরে। ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি বলতে ছিল কিছু ভাঙা বাক্স, কিছু শিশি বোতল, ফেলে দেওয়া কিছু লোহার তার, আর এখান-ওখান থেকে কুড়িয়ে আনা যন্ত্রপাতির টুকরো। অল্প কিছুদিন যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন হাতে-কলমে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি আর নানান জিনিসপত্রের। বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অর্থ ছাড়া তো কোন পরীক্ষার কাজই চালানো সম্ভব নয়। এডিসন স্থির করলেন তিনি কাজ করে অর্থ সংগ্রহ করবেন। তেরো বছরের ছেলে চাকরি করবে! বাবা-মা দুজনেই তো অবাক। কিন্তু এডিসন জেদ ধরে রইলেন, একগুঁয়ে ছেলে একবার যা স্থির করবে কোনভাবেই তার নড়চড় হবে না। অগত্যা মত দিতে হল এডিসনের বাবা-মাকে।

কিন্তু তেরো বছরের ছেলেকে কাজ দেবে কে? অনেক খোঁজাখুঁজির পর খবরের কাগজ ফেরি করার কাজ পাওয়া গেল। ট্রেনে পোর্ট হুরোন স্টেশন থেকে ডেট্রয়েট স্টেশনের মধ্যে যাত্রীদের কাছে খবরের কাগজ বিক্রি করতে হবে। বিক্রির উপর কমিশন। আরো কিছু বেশি আয় করবার জন্য এডিসন খবরের কাগজের সাতে চকলেট বাদামও রেখে দিতেন। কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ফেললেন।

এই সময় এডিসন সংবাদ পেলেন একটি ছোট ছাপাখানা কম দামে বিক্রি হচ্ছে। সামান্য যে অর্থ জমিয়েছিলেন তাই দিয়ে ছাপাখানার যন্ত্রপাতি কিনে ফেললেন, এবার নিজেই একটি পত্রিকা বার করে ফেললেন। সংবাদ জোগাড় করা, সম্পাদনা করা, ছাপানো, বিক্রি করা, সমস্ত কাজ তিনি একাই করতেন। অল্পদিনেই তাঁর কাগজের বিক্রির সংখ্যা বেড়ে গেল। এক বছরের মধ্যে তাঁর লাভ হল একশো ডলার। তখন তাঁর বয়েস পনেরো বছর।

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তৈরি হল কার্বন ফিলামেন্ট। এডিসন নিজেই লিখেছেন সেই চমকপ্রদ কাহিনী। "ফিলামেন্ট তৈরি হওয়ার পর তাকে কাচ তৈরির কারখানায় নিয়ে যেতে হবে। ব্যাচিলবের (এডিসনের এক সহকর্মী) হাতে কার্বনের ফিলামেন্ট। পেছনে আমি। এমনভাবে দুজনে চলেছি মনে হচ্ছে যেন কোন .মহামূল্যবান সম্পত্তি নিয়ে যাচ্ছি। কাচের কারখানায় সবেমাত্র পা দিয়েছি, সম্ভবত অতি সতর্কতার জন্যেই হাত থেকে ফিলামেন্টটি মাটিতে পড়ে দু-টুকরা হয়ে গেল। হতাশ মনে ল্যাবরেটরিতে ফিরে গেলাম। নতুন ফিলামেন্ট তৈরি করে আবার চললাম কাচ কারখানায়। কপাল মন্দ, এইবার এক স্বর্ণকারের হাতের স্ক্রু ড্রাইভার পড়ে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। আবার ফিরে গেলাম। রাত হবার আগেই নতুন একটা কার্বন নিয়ে এসে বাল্বের মধ্যে ঢোকালাম। বাল্বের মুখ বন্ধ করা হল, তারপর কারেন্ট দেওয়া হল। মুহূর্তে চোখের সামনে জ্বলে উঠল বৈদ্যুতিক বাতি।"

প্রথম বৈদ্যুতিক বাতিটি প্রায় চল্লিশ ঘন্টা জ্বলেছিল। দিনটা ছিল ২১শে অক্টোবর ১৮৭৯ সাল, এডিসন সেদিন কল্পনাও করতে পারেননি তাঁর সৃষ্ট আলো একদিন পৃথিবীর সমস্ত গৃহের অন্ধকার দূর করবে। প্রথমে তিনি শুধুমাত্র বাল্বের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। এরপর প্রয়োজন দেখা দিল সমগ্র বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির সাধন করা। এডিসন নতুন এক ধরনের ডাইনামো তৈরি করলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার জেনারেটর থেকে শুরু করে ল্যাম্প তৈরি করা, পর্যন্ত তাকে জ্বালানোর উপায় বার করা সমস্তই তাঁর উদ্ভাবন। যখন নিউইয়র্কে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র গড়ে উঠল, এডিসন ছিলেন একাধারে তার সুপারিনটেন্ডন্ট, তার ফোরম্যান, এমনকি তার মজদুর। এত কাজের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েও কখনো বিব্রত বোধ করতেন না। আসলে দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি কাজে লাগাতে চাইতেন। অকারণ বিশ্রাম, হাসি আমোদ সময় কাটাতে চাইতেন না।

একদিন একটি নিমন্ত্রিত বাড়িতে গিয়েছেন তিনি। গৃহকর্তা বিশেষ কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। লোকজনের ভিড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এডিসন। আর অপেক্ষা না করে ফিরে যাবার জন্য বাইরের দরজার সামনে আসতেই গৃহকর্তার সাথে সাক্ষাৎ হল। এডিসনকে দেখামাত্রই তিনি বললেন, "আপনি এসেছেন দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এখন আপনি কি নিয়ে কাজ করছেন?"

এডিসন সাথে সাথে বললেন, "কি করে আমি বার হতে পারি তাই নিয়ে।"

১৮৪৭ সালে এডিসন তাঁর বিখ্যাত মেনলো পার্ক ছেড়ে ওয়েস্ট অরেঞ্জে এলেন (West Orange)। এই সময় তিনি শব্দের গতির মত কিভাবে ছবির গতি আনা যায় তাই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছিলেন। মাত্র দু'বছরের মধ্যে তিনি উদ্ভাবন করলেন 'কিনেটোগ্রাফ' যা গতিশীল ছবি তোলবার জন্য প্রথম ক্যামেরা। যখন আমেরিকাতে বাণিজ্যিভাবে ছায়াছবি নির্মাণের কাজ শুরু করার ভাবনা-চিন্তা চলছিল তখন সিনেমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই উদ্ভাবন করে ফেলেছেন এডিসন। প্রথম অবস্থায় সিনেমা ছিল নির্বাক। ১৯২২ সালে এডিসন আবিষ্কার করলেন কিনেটোফোন যা সংযুক্ত করা হল সিনেমার ক্যামেরার সাথে। এরই ফলে তৈরি হল সবাক চিত্র। অতি সাধারণ জিনিস থেকে সিনেমা ক্যামেরার মত জটিল যন্ত্রের উদ্ভাবনের কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়, কি অসাধারণ ছিল তাঁর প্রতিভা!

এডিসন তাঁর ছুটির দিনগুলি কাটাবার জন্য সুন্দর একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। একদিন তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজনদের সেই বাড়িতে এসে উপস্থিত হলে তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

সবকিছু দেখালেন। বাড়ির বিভিন্ন কাজের সুবিধার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি উদ্ভাসিত করেছেন তাও দেখাতে ভুললেন না। সকলেই মুগ্ধ, শুধু একজন অতিথি বললেন, "আপনার বাড়ির সবকিছুই ভাল শুধু বাড়িতে ঢোকবার গেটটা ভীষণ শক্ত। জোরে চাপ দিয়ে খুলতে হয়।"

এডিসন হাসতে হাসতে বললেন, "তোমরা যখন চাপ দিয়ে দরজা খুলছ তখন আট গ্যালন জল পাম্প করে আমার বাড়ির ছাদে ট্যাঙ্কে ভর্তি হচ্ছে।"

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তিনি নানান পরীক্ষ-নিরীক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। প্রতিভায় বিশ্বাস করতেন না এডিসন, বলতেন, পরিশ্রমই হচ্ছে প্রতিভার মূল কথা। এই মহান কর্মবীর মানুষটির মৃত্যু হয় ১৯৩১ সালের ১৮ই অক্টোবর। তাঁর মৃত্যুর পর নিউইয়র্ক পত্রিকায় লেখা হয়, "মানুষের ইতিহাসে এডিসনের মাথার দাম সবচেয়ে বেশি। কারণ এমন সৃজনীশক্তি অন্য কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি।"

৯৫

জর্জ বার্নার্ড শ

[১৮৫৬–১৯৫০]

প্রায় ছ ফুট লম্বা পাতলা চেহারা, পরনে আধময়লা প্যান্ট আর কোট। মাথায় সস্তা দামের টুপি। বাইশ তেইশ বছরের এক তরুণ। হাতে একতাড়া কাগজ নিয়ে প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ান। অনেক পরিশ্রম করে একটা উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর মনের ইচ্ছে যদি কেউ তাঁর উপন্যাস প্রকাশ করে। এক একদিন এক একজন প্রকাশকের কাছে যান। তাঁর আসার উদ্দেশ্যের কথা শুনেই অনেকে দরজা থেকেই তাঁকে ফিরিয়ে দেন।

অনেকে দু-চারটে কথা বলেন, উৎসাহ দেন আরো লেখ। ছাপাবার জন্য এত ব্যস্ততা কিসের। কাউকে অনুরোধ করা যেন তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। একদিন একজন পড়বার জন্য রেখে দেয়। আশা নিয়ে বাড়ি ফেরেন তরুণ। দুদিন পরে যেতেই পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেন প্রকাশক। ছাপা হলে একটাও বই বিক্রি হবে না।আশায় ভেঙে পড়েন তরুণ। তাঁর ভাগ্যে লেখক হবার কোন আশা নেই। ছয় বছরে পাঁচখানা উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু একটা উপন্যাস ছাপাবার মত প্রকাশক পাওয়া যায়নি। পঞ্চাশজন প্রকাশক তাঁর লেখা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। শেষে এমন অবস্থা হল লেখা পাঠাবার মত হাতে একটি পেনিও নেই। দুঃখে হতাশায় তিনি ঠিক করলেন, আর যাই করুন না কেন কোন দিন লেখক হবেন না। নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেননি তরুণ। কিছুদিন পরে আবার শুরু করলেন লেখা, তবে এবার আর উপন্যাস নয়—নাটক। আর এই নাটকই তাঁকে এনে দিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি। শেকস্‌পীয়রের পরে যাঁকে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতার পূজারী—এই মহান মানুষটির নাম জর্জ বার্নার্ড শ।

আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শ-এর জন্ম। ডাবলিন শহরে পরিবারের ছিল খুবই খ্যাতি আর সম্মান। ১৮৫৬ সালের ২৬ শে জুলাই জন্ম হয় বার্নার্ড শ-এর। তাঁরা ছিলেন দুই বোন এক ভাই। বার্নার্ড-এর বাবা ছিলেন জর্জ কার শ। মায় নাম লুসিন্দা এলিজাবেথ। বাবা ছিলেন হাসিখুশি প্রাণখোলা মানুষ। এক বন্ধুর সাথে ভাগে ময়দার কারবার ছিল তাঁর। বন্ধুর প্রতারণায় কারবার নষ্ট হয়ে গেল। অনেক টাকা ক্ষতি হল। এর পর থেকেই শুরু হল আর্থিক দুরবস্থা। শ-এর মা ছিলেন এক অসাধারণ গুণবতী মহিলা। শ-এর জীবনে মায়ের ভূমিকা বিশাল। তাঁর বড় হয়ে ওঠার পেছনে মায়ের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

লুসিন্দা মানুষ হয়েছিলেন তাঁর এক বড়লোক পিসিমার কাছে। এই পিসিমা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির। খুব কড়া শাসনের মধ্যে মানুষ করতেন লুসিন্দাকে। ঘরের বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। ঘরেই পড়াশুনা গান-বাজনা শেখার ব্যবস্থা করা হল। পিয়ানো শিখতেন লুসিন্দা। বন্দীদশার মধ্যে যখন হাঁপিয়ে উঠেছেন তখন একদিন দেখা হল জর্জ কারের সঙ্গে। লুসিন্দা তখন কুড়ি বছরের তরুণী। জর্জ কর চল্লিশ বছরের যুবক। বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। দরিদ্র স্বামীর ঘরে এসে মানিয়ে নিলেন লুসিন্দা। নিজে ছোটখাট অনুষ্ঠানে গান করতেন, পিয়ানো বাজাতেন।

মায়ের সম্বন্ধে শ বলেছেন, "আমার মা ছিলেন সুন্দরের প্রতিমূর্তি। অনেক নামকরা শিল্পীর গান শুনেছি। কিন্তু মায়ের গানের মতো এমন পবিত্র সৌন্দর্য কারো গানে খুঁজে পাইনি। তাঁর গান শুনলে মনে হত গীর্জার প্রার্থনা সংগীত। এক স্বর্গীয় সুষমা ফুটে উঠত তাতে। মা মানুষ হয়েছিলেন কড়া শাসনের মধ্যে। তাই তিনি আমাদের দিয়েছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। আজ আমি যে

পৃথিবী-বিখ্যাত বার্নার্ড শ হতে পেরেছি তার জন্যে সবচেয়ে বেশি ঋণী সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ আমার মায়ের কাছে।"

দশ বছর বয়েসে সানিকে (শ-এর ছেলেবেলার নাম ছিল সানি) ভর্তি করে দেওয়া হল ডাবলিনের কনেকসানাল স্কুলে। এর আগে বাড়িতেই পড়াশুনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়তেন সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্ক আর আমার কাছে শিখতেন পিয়ানো। নতুন স্কুলে কিছুদিন যাতায়াত করার পরেই হাঁপিয়ে উঠলেন সানি। স্কুলের আবহাওয়া, বাঁধাধরা পড়াশুনা, পরীক্ষা দেওয়া তাঁর ভাল লাগত না। মাত্র ছ বছর বয়েসেই শিশু পাঠ্য বই-এর সীমানা অতিক্রম করে জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী পড়ে ফেলেছিলেন। পাঠ্য বইয়ের জগৎ তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত। তবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল সংগীত। সংগীতের সুরের মধ্যে তিনি যেন নিজেকে খুঁজে পেতেন।

স্কুলে পড়াশুনা হল না শ-র। বাড়িতেই পড়াশুনা করতে আরম্ভ করলেন। সারা দিন শুধু পড়া আর পড়া। এই একাগ্রতা, পরিশ্রম আর নিষ্ঠার সাথে মিশেছিল অনুরাগ আর মেধা। কিশোর বয়েসেই তিনি সাহিত্য,ইতিহাস, দর্শনের বহু করেছিল শেকস্‌পীয়রের নাটক। তখনই তিনি মনে মনে কল্পনা করতেন একদিন তিনিও শেকস্‌পীয়রের মত মস্ত বড় নাট্যকার হবেন।

কিন্তু আচমকা সংসারে নেমে এল বিপর্যয়। তাঁর বাবা বড়লোক ছিলেন না। ব্যবসা করে যা আয় করতেন তাতে মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে সংসার চলে যেত। কিন্তু হঠাৎ কারবারে মন্দা দেখা দিল। আয় বন্ধ হয়ে গেল। নিদারুণ অর্থকষ্ট প্রকট হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে শ-কে চাকরি নিতে হল।

শ-এর বয়স তখন পনেরো। এক জমির দলালীর অফিসে মাসে ১৮ শিলিং মাইনেতে চাকরি পেলেন। কিশোর বয়েসে চাকরিতে ঢুকতে হল বলে কোন দুঃখ ছিল না। বাবার কাছে শিখেছিলেন সব কিছুকে সমানভাবে মানিয়ে নিতে।

অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত তাঁর লেখালেখি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁর কোন লেখাই ছাপা হত না। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে সম্পাদকের কাছে চিঠি পাঠাতেন। তাতে বেশিরভাগই থাকত অন্যের লেখার সমালোচনা। অবশেষে একদিন তাঁর একটি চিঠি ছাপা হল। চিঠির বিষয় ছিল নিরীশ্বরবাদ। সেটাই তাঁর জীবনের প্রথম মুদ্রিত লেখা। তখন শ-এর বয়েস পনেরো।

শ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী। অল্পদিনের মধ্যেই অফিসের কাজে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ক্যাশিয়ারের পদ পেয়ে গেলেন। পাঁচ বছর অফিসে কাজ করলেন। কিন্তু ক্রমশই তাঁর মনে হচ্ছিল এই অফিসের চার-দেয়ালের মধ্যে তিনি যেন ফুরিয়ে যাচ্ছেন। হারিয়ে যাচ্ছে তাঁর বড় হবার স্বপ্ন। জীবনে যদি কিছু করতে হয় তাঁকে যেতে হবে লন্ডন শহরে। যেখানে জীবন কাটিয়েছেন তাঁর প্রিয় নাট্যকার শেকস্‌পীয়ার।

চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। বাবা আঘাত পেলেন। সংসারে যে নতুন করে অভাব দেখা দেবে, তার চেয়েও কথা লন্ডনে গিয়ে শ নিজের খরচ চালাবে কেমন করে! ছেলেকে সাহায্য করবেন, তাঁর তো সেই ক্ষমতাও নেই।

অত কিছু ভাববার মত মনের অবস্থা নেই শ-এর। একদিন সামান্য কিছু জিনিস আর সম্বল করে বেরিয়ে পড়লেন লন্ডনের পথে।

১৮৭৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি এসে পৌছলেন লন্ডন শহরে। তখন তাঁর মা লন্ডনে তাঁর এক দিদির কাছে ছিলেন। মায়ের কাছে এসে উঠলেন শ। ছেলের ইচ্ছার কথা শুনে তাঁকে নিরুৎসাহিত করলেন না। পিগমিলিয়ন শ-এর প্রথম নাটক যা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে পৃথিবীজোড়া খ্যাতি অর্জন করল।

৮০ বছর বয়েসে শ-এর মা লুসিন্দা মারা গেলেন। জীবনের শেষ পর্বে এসে পরিপূর্ণ সুখ আর শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি।

লুসিন্দার মৃত্যু হয়েছিল ১৯১৩ সালে। পরের বছর ইউরোপ জুড়ে শুরু হল বিশ্বযুদ্ধ। ইংলন্ডও জড়িয়ে পড়ল সেই যুদ্ধে। তিনি ছিলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তিনি চেয়েছিলেন ইংলন্ড শান্তি স্থাপনের জন্য এগিয়ে আসুক। এক আবেদনে লিখলেন ইংরেজদের নিউটন, জার্মানদের লেবিনজ এঁদের বংশধররা যদি আজ বিবদমান দুই শিবিরে বিভক্ত হয় তবে ইউরোপের সভ্যতা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বলে আর কিছুই থাকবে না।

কিন্তু সেদিন তাঁর বাণীকে গ্রহণ করবার মত কোন মানুষ ছিল না ইংলণ্ডে। সকলেই তখন যুদ্ধের উন্মাদনায় মত্ত। তাঁর বাণীকে উপলব্ধি করছিল যুদ্ধের পরবর্তীকালে।

যুদ্ধের পরেই লিখলেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাকট 'সেন্ট জোয়ান'–জোয়ান অব আর্কের জীবন অবলম্বন করেই তিনি লিখলেন এই নাটক। এই নাটক তাঁকে শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসাবে পৃথিবীর মানুষের কাছে সম্মান এনে দিল। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে লাগলে সম্মান আর অভিনন্দন। এই চাইল। শ বিনীতভাবে লিখে পাঠালেন "বার্নার্ডশ–এই নামটির পেছনে কিম্বা আগে কোন উপাধির দরকার হয় না।"

এরপর তাঁকে নোবেল পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, এখন আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হল–যে ডুবন্ত মানুষ তীরে এসে পৌঁছেছে তাকে লাইফ বেল্ট ছুঁড়ে দেওয়ার মতন। তিনি আরো বললেন, যাঁরা এখানো সাহিত্যিক খ্যাতির তীরে এসে উঠতে পারেনি সেই নবীন উদীয়মান সুইডিস সাহিত্যিকদের জন্য টাকাটা ব্যয় করা হোক। তিনি সুইডেনে গিয়ে সমস্ত অর্থ উইল করে দিয়ে এলেন। বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন এক চোর তাঁর ঘর থেকে পাঁচশো পাউন্ড চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

গৃহের পরিচারিকা পুলিশে খবর দিতে বললে তিনি সকৌতুকে বললেন–এতদিন ধরে পুলিশ চোর ধরছে। তারপর আদালতে তাকে সাজা দিচ্ছে। তবুও শ-এর বাড়িতে চুরি হল। এখন এই হারানো পাউন্ড উদ্ধার করতে গেলে পুলিশের পেছনে পেছনে ঘুরতে আমার যে সময় নষ্ট হবে সেই সময়ের মধ্যে আমি পাঁচশো পাউন্ড লিখেই উদ্ধার করতে পারব। চোর ঐ অর্থ ভোগ করুক, আমি আমার কাজ করি।

বয়েসের সাথে সাথে ক্রমশই আরো স্থির প্রশান্ত হয়ে আসছিলেন। তিনি যেন হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের বিবেক। ১৯৩৮ সালে লন্ডনের বসবাস উঠিয়ে দিয়ে আইয়ট সেন্ট লরেন্সের নির্জন প্রকৃতির বুকে ঘর বাঁধলেন। বয়েসের ভারে দেহ নুয়ে পড়েছিল। কিন্তু মন ছিল চির নবীন সবুজ সতেজ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাঁর জীবিতকালেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন শিল্প, সাহিত্য, নাটক, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমস্ত বিষয়েই বিশ্বের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তাঁর বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে সর্বদাই ফুটে উঠত প্রখর। ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাথে একটি মানুষের তুলনা করা যায়, তিনি ভলতেয়ার। তাঁরই মত তিনি গল্য পচাখচা সমাজকে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন–এই দূষিত সমাজ ধ্বংস হোক, তার জায়গায় গড়ে উঠুক নতুন সমাজ। নিজের মতকে প্রকাশ করতে তিনি কখনো সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি।

১৯৫০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর বাগানে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হলেন। লন্ডনে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রোপচার করা হল কিন্তু আর সুস্থ হলেন না। ক্রমশই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হল। অবশেষে ২রা নভেম্বর ভোরের আলো ফোটবার সাথে সাথে বার্নার্ড শ-এর জীবনের আলো নিভে গেল। তখন তাঁর বয়স চুরানব্বই।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে টমাস মান লিখেছিলেন, আজ যাঁর মৃত্যু হল এমন প্রতিভাবান চরিত্রবান মানুষ বহু শতাব্দী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে এলে শতাব্দীর শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর কলমে ছিল শাণিত তরবারির তীক্ষ্নতা, উচ্চারিত বাণীতে সুকঠিন স্বচ্ছতা। মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন অতি মানুষ। জাতিতে আইরিশ, বাস করেছেন ইংলন্ডে, কিন্তু দেশকাল জাতির সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি হয়েছিলেন বিশ্ব মানব। বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত মানবতাকে তিনি কল্যাণের সুন্দরের স্পর্শে অপরূপ করে তুলেছিলেন।

৯৬

মার্টিন লুথার কিং

[১৯২৯–১৯৬৮]

"আমেরিকার এই গান্ধী আবির্ভূত হয়েছিলেন এক শ্রান্ত মায়ের ক্লান্ত পা দুখানির দিকে তাকিয়ে।"
১৯৫৫ সালের ১লা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আমেরিকার মন্টগোমারি শহরের সিটি লাইন্সের বাস চলেছে। বাসের সব আসন পূর্ণ। সামনের দিকে বারোজন শ্বেতাঙ্গ, পেছনে চব্বিশজন নিগ্রো। মার্কিন দেশের দক্ষিণের অধিকাংশ রাজ্যেই বাসের সামনের দিকে বসবার অধিকার নেই নিগ্রোদের। সমস্ত বাসই সংরক্ষিত থাকে শ্বেতাঙ্গদের জন্য।

কলেজ থেকে পাশ করবার পর ১৯৪৮ সালে ১৯ বছর বয়সে আমেরিকায় পেনসিলভেনিয়ার ক্রোজার থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে ভর্তি হলেন। এ এক ভিন্ন পরিবেশ।

এখানে শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো ছাত্ররা একই সাথে পড়াশুনা করত, কোন বর্ণবৈষম্য ছিল না। পড়াশুনায় বরাবরই মনোযোগী ছাত্র ছিলেন কিং। এখানে ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তকের সাথে দেশ-বিদেশের দার্শনিকদের রচনাবলী পড়তে আরম্ভ করলেন। পড়লেন বিভিন্ন দেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। তবে যাঁর জীবন রচনা তাঁর মনকে অধিকার করে নিল তিনি ভারতের মহাত্মা গান্ধী। তিনি বলতেন, নাজারেথের যীশু আর ভারতের গান্ধী আমার জীবনসর্বস্ব। যীশু পথ দেখিয়েছেন, গান্ধী প্রমাণ করেছেন সেই পথ পাঠ আমি পেয়েছিলাম বাইবেল ও খ্রীস্টের জীবন আর উপদেশের মধ্যে। আর এই প্রতিরোধের পদ্ধতিটি পেয়েছিলেন গান্ধীর কাছ থেকে। ক্রোজার থিওলজিক্যাল সেমিনারি থেকে স্নাতক হওয়ার পথ তিনি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ডিগ্রি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তাঁর জীবনে আরো একটি প্রাপ্তি ঘটেছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রী ছিলেন কোরেত্তা স্কট নামে একটি তরুণী। কিং-এর সাথে প্রথম পরিচয়ে মুগ্ধ হন স্কট। অল্পদিনের মধ্যেই দুজনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হবার আগেই ১৯৫৩ সালে দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ডেক্সটার এ্যাভিনিউয়ের ব্যাপটিস্ট চার্চের যাজক হিসাবে যোগদান করলেন।

ছাত্র অবস্থা থেকেই নিগ্রো আন্দোলনের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। ধর্মযাজক হিসাবে যোগদান করবার পর থেকে তিনি সরাসরি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়লেন। সেই সময় নিগ্রোদের প্রধান সংগঠন ছিল National Association for the Advancement of Coloured People (N A A C P)। এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিং-এর দাদু। সেই সূত্রে এবং নিজের ব্যক্তিত্বে অল্পদিনের মধ্যেই এই এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কিং।

১৯৫৫ সালে মন্টগোমারিতে শুরু হল ঐতিহাসিক বাস ধর্মঘট। সমস্ত নিগ্রোদের তরফে দাবি তোলা হল (১) বাসে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যে বৈষম্য আছে যে প্রত্যাহার করতে হবে, (২) বাসে যে আগে উঠবে সে আগে বসবে, (৩) নিগ্রোদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে, (৪) নিগ্রো এলাকা দিয়ে যে সব বাস চলাচল করে সেই সব বাসের ক্ষেত্রে নিগ্রো ড্রাইভার নিযুক্ত করতে হবে।

নিগ্রোদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন নিগ্রো খ্রীস্টান ধর্মযাজকরা। প্রতিষ্ঠা হল মন্টগোমারি ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন। মার্টিন লুথার কিংও এর সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তিনি এক প্রকাশ্য সমাবেশে সমস্ত নিগ্রোদের উদ্দেশ্যে বললেন যতদিন না মন্টগোমারি বাস কোম্পানির পক্ষ থেকে আমাদের দাবি না মেনে নেওয়া হচ্ছে ততদিন একটি নিগ্রোও বাসে উঠবে না।

প্রায় এক বছর নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিগ্রোরা সমস্ত সরকারী বাস বয়কট করে। কর্তৃপক্ষ বিরাট ক্ষতির মুখোমুখি হয়ে শেষ পর্যন্ত নিগ্রোদের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হলেন। সুপ্রীম কোর্ট বাসের এই বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থাকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করল। অবশেষে M I A-এর সমস্ত দাবি মেনে নেওয়া হল। বাসে নিগ্রোদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল।

এই জয়ের পেছনে কিং-এর অবদান ছিল বিরাট। তিনি নিগ্রোদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের সাহস দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গরা সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাঁকে নানাভাবে ভয় দেখানো হতে থাকে। এমনকি একদিন তাঁর বাড়িতে বোমা ফেলা হল। কিন্তু কোন কিছুর কাছেই মাথা নত করলেন না কিং। পুলিশ নানাভাবে তাঁকে বিব্রত করতে থাকে। এমনকি তিনি নিগ্রোদের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছেন বলে তাঁকে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাঁকে আদালত থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিগ্রোদের কাছে হয়ে উঠলেন প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করতেন শান্তি আর অহিংসায়। তিনি অন্তরে অনুভব করতেন ন্যায় ও সত্যের সপক্ষে যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন তা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই করছেন। শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে বিদ্রূপ করে বলত নিগ্রো ধর্মগুরু।

মন্টগোমারির বাস আন্দোলনে এই গৌরব-উজ্জ্বল ভূমিকায় কি-এর নাম ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত আমেরিকায়। তাঁর এই অহিংস আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে এগিয়ে এল বহু নিগ্রো নেতা। সমস্ত আমেরিকা জুড়েই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠতে থাকে।

১৯৫৭ সালে আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশের নিগ্রো নেতৃবৃন্দ এবং তাছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক

সরকারের নিগ্রো মন্ত্রীরা মিলিত হলেই আটলান্টা শহরে। নিগ্রোদের সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে আরো জোরদার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হল Southern Christian Leadership Conferance. সংক্ষেপে বলা হল S.C.L.C.। মার্টিন লুথার এর সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৮।

কৃষ্ণাঙ্গদের দাবির সপক্ষে ধীরে ধীরে আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠল। ঘানার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হলেন মার্টিন লুথার ও আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। এখানে দুই নেতার মধ্যে সাক্ষাৎ হল। নিক্সন নিগ্রোদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এক বছর পর রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের আমন্ত্রণে হোয়াইট হাউসে মিলিত হলেন কিং ও অন্যসব নিগ্রো নেতারা। বেশ কয়েকবার আলোচনা বৈঠক বসবার পরেও কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হল না। সরকারের অধিকাংশ প্রস্তাবই তাঁদের সপক্ষে মনোমত হল না। কি-এর ভাষায় This is no real or meaningful settement.

দেশের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের আচরণে ক্রমশই বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, আইনগত ক্ষেত্রেও নানাভাবে নিগ্রোদের বঞ্চনা করা হত। বহু রাজ্যে নিগ্রোদের কোন ভোটাধিকার ছিল না। সরকারী উচ্চপদে বসবার অধিকার ছিল না নিগ্রোদের। কিং আমেরিকার প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে প্রচার করতে লাগলেন, এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে অহিংসা আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য সমস্ত নিগ্রোদের কাছে আহ্বান জানাতে থাকেন। ধীরে ধীরে প্রায় প্রতিটি প্রদেশেই আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। কিং হয়ে উঠলেন সমস্ত আমেরিকার নিগ্রো মানুষের অবিসংবাদিত নেতা।

১৯৫৯ সালে প্রধানমন্ত্রী জহরলালের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষে এলেন কিং ও তাঁর স্ত্রী। ভারতবর্ষ কিং-এর কাছে ছিল এক মহান দেশ। তিনি মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থানে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন।

কিং ভারত ভ্রমণ শেষ করে যখন আমেরিকায় ফিরে এলেন, আমেরিকা জুড়ে আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নিয়েছে। নিগ্রোর শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলেও শ্বেতাঙ্গরা হিংস্র হয়ে ওঠে। নিগ্রোদের মধ্যে ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে। তারাও পালটা আক্রমণ শুরু করে। সর্বত্রই ভাঙচুর লুঠতরাজ গুলি লাঠি চলতে থাকে। কৃষ্ণাঙ্গদের উপর সমস্ত অভিযোগ এসে পড়ে।

১৯৬৫ সালে আমেরিকা ভিয়েৎনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। শান্তির পূজারী কিং ছিলেন যুদ্ধের বিপক্ষে। ভিয়েৎনামের মত একটি ছোট দেশের উপর আমেরিকার এই আক্রমণকে মেনে নিতে পারলেন না কিং। দেশ জুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিগ্রোদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর শ্বেতাঙ্গরা হিংস্রভাবে আক্রমণ করছিল। নিগ্রোরাও এর বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ শুরু করল। সর্বত্রই অহিংস সত্যাগ্রহ হিংসাত্মক আন্দোলনে পরিণত হল। এতে ব্যথিত হতেন কিং। তিনি বার বার সকলকে শান্ত সংযত থাকবার জন্য আহ্বান জানাতেন। আমেরিকা ক্রমশই ভিয়েৎনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বের বহু বুদ্ধিজীবী মানুষের সাথে কিংও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের বিরোধিতা আরম্ভ করলেন। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখে তিনি ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিরোধী পদযাত্রা করবার আহ্বান জানালেন আমেরিকার সমস্ত শান্তিকামী মানুষকে। এরই সাথে তিনি ঘোষণা করলেন ২৭শে এপ্রিল দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করবার জন্য আর্থিক নিরাপত্তার দাবিতে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত দরিদ্র মানুষদের সাথে নিয়ে তিনি ওয়াশিংটন অভিযান করবেন। শান্তি অভিযানে সেদিন হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল শান্তির আহ্বান।

মেমপিস টেনেসি রাজ্যে নিগ্রো পৌরকর্মীরা শ্বেতাঙ্গদের সমান মাইনে ও কাজের সুযোগ-সুবিধা বাড়াবার জন্য আন্দোলন করছিল। কিং সেখানে গেলেন। কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারীদের একটি দাবিও মেনে নিলেন না। কিছু অল্পবয়সী ছেলে এর প্রতিবাদে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেল। পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন মারা পড়ল।

৩রা এপ্রিল কিংকে হত্যার হুমকি দেওয়া হল। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে বললেন। কিন্তু অকুতোভয় কিং বললেন তাঁর যাই ঘটুক না কেন তিনি এখান থেকে যাবেন না। সকলকে হিংসা ত্যাগ করবার আহ্বান জানালেন। পরদিন তিনি যখন হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, আততায়ীর বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। সন্ধ্যে সাতটায় চিরশান্তির প্রতীক মার্টিন লুথার কিং তার আদর্শ খ্রীষ্ট, গান্ধীর মতই হিংস্র মানুষের হিংস্রতার কাছে আত্মাহুতি দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তখন তিনি উনচল্লিশ বছরের এক যুবক।

১৭

সত্যজিৎ রায়

[১৯২১-১৯৯২]

বিশ্ববরেণ্য জাপানী চলচ্চিত্র পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, "এই পৃথিবীতে বাস করে সত্যজিৎ রায়ের ছবি না দেখে চন্দ্র-সূর্য না দেখার মতই অদ্ভুত ঘটনা।" রবীন্দ্রনাথের পর বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের অপর কেউই বিশ্বের দরবারে এতখানি সম্মান পাননি। ভারতীয় চলচ্চিত্রকে তিনি শুধু যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাই নয়, তাকে এক মহত্তর সৌন্দর্যে উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

বিরল প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির জন্ম ১৯২১ সালের ২রা মে। কৃতী বংশের যোগ্য উত্তরপুরুষ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একমাত্র ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেই এই পরিবারের তুলনা করা যায়। সত্যজিতের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন বাংলা শিশু সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা। সাহিত্য ছাড়াও বাংলা ছাপাখানার উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিরাট। ১৯০০ সালে তিনি সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে ইউ রায় অ্যান্ড সন্স নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। এখান থেকে বহু বই প্রকাশিত হয়েছিল।

উপেন্দ্রকিশোরের বড় ভাই সারদারঞ্জন ছিলেন পণ্ডিত মানুষ আর ক্রিকেটের ভক্ত। আরেক ভাই কুলদারঞ্জনও ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁর কন্যা বিখ্যাত সাহিত্যিক লীলা মজুমদার। উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭ সালে। মাত্র আট বছর বয়স থেকেই শুরু হয় তাঁর ছবি আঁকা, কবিতা লেখা। ১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর সন্দেশ পত্রিকা চালু করবার পর সুকুমার সেখানে নিয়মিত লিখতেন। ১৯১৪ সালে সুকুমারের বিয়ে হল ঢাকার বিখ্যাত সমাজসেবক কালীনারায়ণ গুপ্তের নাতনি সুপ্রভার সাথে। বিবাহের ৭ বছর পর জন্ম হয় সত্যজিতের। ১৯২৩ সাল, সত্যজিৎ তখন দু বছরের শিশু, কয়েকদিনের জ্বরে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন সুকুমার। এই স্বল্প জীবনকালেই তিনি রচনা করেছেন আবোল তাবোল, হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশুর মত অসাধারণ শিশু সাহিত্য।

১৯৪০ সালে বি. এ. পাশ করলেন সত্যজিৎ। রবীন্দ্রনাথ খুবই স্নেহ করতেন সত্যজিৎকে। প্রধানত তাঁরই আগ্রহে ভর্তি হলেন শান্তিনিকেতনের শিল্প বিভাগে এখানে নন্দলাল বসুর কাছে ছবি আঁকার তালিম নিতেন। এক বছর পর তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। বাড়িতে বিধবা মা, অন্যের উপর নির্ভর করে কতদিন জীবনধারণ করবেন। ১৯৪৩ সালে ডি. জে. কীমার নামে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করেছেন।

১৯৪৮ সালে সত্যজিৎ তাঁর মায়ের বৈমাত্রেয় ভাই চারুচন্দ্রের ছোট মেয়ে বিজয়াকে বিয়ে করলেন। দুজনেই পরস্পরকে ভালবাসতেন। শুধুমাত্র পুত্রের সুখের কথা ভেবে সুপ্রভা দেবী এই বিবাহে মত দিলেন। চাকরিসূত্রে কয়েক মাসের জন্য ইংলন্ডে গেলেন সত্যজিৎ । এই সময় তিনি ইউরোপ-আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অসংখ্য ছবি দেখতেন। যা দেখতেন গভীরভাবে অনুভব করবার চেষ্টা করতেন। ভারতে ফিরে এসে স্থির করলেন পথের পাঁচালী ছবি করবেন।

সত্যজিতের মায়ের এক বন্ধুর সাথে বিধান রায়ের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রেই সত্যজিৎ তাঁকে পথের পাঁচালীর কিছুটা অংশ দেখালেন। পথের পাঁচালী বিধান রায়ের ভাল লেগেছিল। তিনি দশ হাজার টাকার সরকারী অনুদান দিলেন। আমেরিকা থেকে এসেছিলেন মনরো হুইলার। পথের পাঁচালীর অর্ধেক দেখেই তিনি মুগ্ধ হলেন। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে নিউইয়র্কে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি সেখানে পথের পাঁচালীকে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ছবি শেষ হল। বাক্সবন্দী পথের পাঁচালী ছবি পাঠানো হল আমেরিকায়। ১৯৫৫ সালে পথের পাঁচালী কলকাতার বসুশ্রী সিনেমা হলে মুক্তি পেল। প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রথম দিকে দর্শকরা এই ছবিটিকে গ্রহণ করতে না পারলেও কয়েক সপ্তাহ পর থেকে চারদিকে সত্যজিতের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল। জনসাধারণের ভিড় বাড়তে থাকে। এর মূলে ছিল পথের পাঁচালীর অসাধারণত্ব। বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মূল সুরটিকে এক আশ্চর্য দক্ষতায় ছবির পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্যজিৎ। প্রত্যেকের অভিনয় ছিল জীবন্ত আর সজীব। এর সাথে ছিল রবিশঙ্করের অসাধারণ সংগীত। তিনিই প্রথম দেখালেন চলচ্চিত্রে সংগীতের কত সার্থক প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে পথের পাঁচালীর মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

১৯৫৬ সালে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেল পথের পাঁচালী। তারপর দেশে-বিদেশে একের পর এক পুরস্কার। এক অখ্যাত বাঙালী তরুণ শুধুমাত্র একটি ছবি করেই জগৎবিখ্যাত হয়ে গেলেন। পথের পাঁচালী শুধু একটি ছবি নয়, গভীর প্রশান্ত সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত এক তুলনাহীন সৃষ্টি—যা দেশকাল উত্তীর্ণ হয়ে মানুষকে অভিভূত করে। সেই কারণেই জহরলাল বলেছিলেন, "সত্যজিৎ রায় আর তাঁর ছবি পথের পাঁচালী আমাদের গর্ব।"

পথের পাঁচালীর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সত্যজিৎ তৈরি করলেন অপরাজিতা। অপু ট্রিলজির দ্বিতীয় ছবি। অপুর কৈশোর জীবনের কাহিনী। অপরাজিতা সাধারণ দর্শকরা গ্রহণ করতে না পারলেও ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পেল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার গোল্ডেন লায়ন।

এর পর সত্যজিৎ তৈরি করলেন অপু ট্রিলজির শেষ ছবি অপুর সংসার। এই ছবিতে নিয়ে এলেন তরুণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর চৌদ্দ বছরের কিশোরী শর্মিলা ঠাকুরকে। লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অপুর সংসারকে দেওয়া হল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। বিশ্বের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই ট্রিলজির কোন তুলনা নেই। মহান সাহিত্যস্রষ্টাদের সৃষ্টির সাথেই এর তুলনা করা যায়। অপরাজিতা ছবি মুক্তি পায় ১৯৫৬ সালে। এই ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য না পাওয়ার জন্য সত্যজিৎ অপুর সংসারের আগে দুটি ছোট ছবি তৈরি করেন পরশ পাথর (১৯৫৭) আর জলসাঘর (১৯৫৮)। জলসাঘর তারাশঙ্করের একটি ছোট গল্প। দুটি ছবিতেই সত্যজিতের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

এরপর দেবী। হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানলেন সত্যজিৎ। এক শ্রেণীর মানুষ এই ছবির মুক্তির ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা প্রকাশ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জহরলালের হস্তক্ষেপে এই ছবি মুক্তি পেল। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক রর্বাট স্টীল লিখেছেন, সত্যজিৎ রায় তাঁর সিনেমার জীবন শুরুই করেছেন মাস্টারপীস ছবি দিয়ে। যদি অপু সৃষ্টি না হত তবে দেবীকে সেই সম্মান দেওয়া হত। দেবী সত্যজিতের সবচেয়ে প্রাঞ্জল আর সরল ছবি। এর মধ্যে আছে এক আবেগের গভীরতা আর সৌন্দর্য যা তুলনাহীন।

রবীন্দ্রকাব্য সত্যজিৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প অবলম্বনে তৈরি করলেন তিন কন্যা (১৯৬১)—মণিহারা, পোস্টমাস্টার আর সমাপ্তি। মেলবোর্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেল তিন কন্যা। সমাপ্তি গল্পেই প্রথম অভিনয় করলেন কিশোরী অপর্ণা। এর পর একে একে মুক্তি পেতে থাকে কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২), অভিযান (১৯৬২), মহানগর (১৯৬৩), চারুলতা (১৯৬৪), কাপুরুষ ও মহাপুরুষ (১৯৬৫), নায়ক (১৯৬৬)। নায়ক সত্যজিত্যের এক সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ছবি। এক বিখ্যাত অভিনেতার জীবন যন্ত্রণার কাহিনী।

পথের পাঁচালীর পর গ্রাম্যজীবন নিয়ে দ্বিতীয় ছবি করেন বিভূতিভূষণের কাহিনী অবলম্বন করে অশনি সংকেত (১৯৭৩)। ৪৩-এর মন্বন্তর কিভাবে গ্রামের সহজ সরল জীবনকে ধ্বংস করে নিয়ে এল দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর ব্যভিচার, তারই এক জীবন্ত চিত্র। এই ছবির কোন চরিত্রকেই মনে হয়নি তারা অভিনয় করছে। সকলেই যেন জীবনের পাতা থেকে উঠে এসেছে। দুর্ভিক্ষের উপর এমন ছবি বিশ্বে খুবই কম তৈরি হয়েছিল। বার্লিন, শিকাগো দুটি চলচ্চিত্র উৎসবেই অশনি সংকেত পেয়েছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার। মুন্সী প্রেমচাঁদের কাহিনী অবলম্বন করে প্রথম হিন্দী ছবি করলেন শতরঞ্জ কে খিলাড়ী। দুই বিরাসী ওমরাহ সমাজ সংসার ভুলে দাবা খেলায় মত্ত হয়ে থাকে। অন্যদিকে ইংরেজরা রাজনৈতিক চালে এক একটি রাজ্য দখল করতে থাকে। নিতান্ত সাধারণ কাহিনী, ঘটনার ঘনঘটা নেই। কিন্তু প্রতিভার স্পর্শে অসাধারণ ছবি হয়ে উঠেছে শতরঞ্জ কে খিলাড়ী। সত্যজিতের ছবির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল অতি সামান্য বিষয়ও যাতে নিখুঁত হয় সেদিকে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। সেই কারণে স্যার রিচার্ড অ্যাটনবরো বলেছিলেন, "সত্যজিতের যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল তা প্রতিটি বিষয়ের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একমাত্র চ্যাপলিন ছাড়া আর কোন পরিচালকের সত্যজিতের মত সিনেমা পরিচালনার ব্যাপারে সকল বিষয়ে প্রতিভা আছে কিনা সন্দেহ।"

নিজেরই কাহিনী অবলম্বন করে সত্যজিৎ তৈরি করেছিলেন দুটি গোয়েন্দা ছবি সোনারকেল্লা আর জয় বাবা ফেলুনাথ। নিছক গোয়েন্দা লোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে তিনি কাহিনীকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। মনোমুগ্ধকর অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে যুক্ত করেছিলেন হাসি আর হেঁয়ালি। ছোটদের জন্যে এত সুন্দর গোয়েন্দা কাহিনী খুব কমই তৈরি হয়েছে।

সত্যজিৎ যখন ডি. জে. কীমারে চাকরি করতেন তখনই তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" অবলম্বনে ছবি করবেন। কিন্তু সেই সময় তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। অবশেষে ১৯৮৪ সালে

তৈরি করলেন ঘরে বাইরে। রবীন্দ্র রচনার মূল সুরটিকে এত নিপুণভাবে সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে তুলে ধরেছেন যা আর কোন পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। ক্রমশই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। ঘরে বাইরের পর বেশ কয়েক বছর কোন ছবি করেননি। ১৯৮৯ সালে ইবসেনের কাহিনী অবলম্বনের তৈরি করেছিলেন গণশত্রু (১৯৮৯), তারপর শাখা-প্রশাখা (১৯৯০), শেষ ছবি আগন্তুক (১৯৯১)।

চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে সত্যজিতের স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকজন পরিচালকের মধ্যে। তাঁর ছবিতে যে গভীর সূক্ষ্ম অনুভূতি, নান্দনিক সৌন্দর্য, জীবনের ব্যাপ্তি, বিষয়বস্তুর প্রতি নিষ্ঠার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তা তুলনাহীন। তাঁর ছবি যেন সংগীত, শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা। যতবার দেখা যায় ততবারই উন্মোচন হয় নতুন সৌন্দর্য, মনের জগতে উন্মোচিত করে এক নতুন সৌন্দর্য, মনের জগতে উন্মোচিত করে এক নতুন দিগন্ত। যার মধ্যে আমরা আমাদেরই খুঁজে পাই।

চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিতের খ্যাতি জগৎ জোড়া হলেও সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে তাঁর খ্যাতি কিছুমাত্র কম নয়। তাঁর পিতা-পিতামহের ঐতিহ্য অনুসরণে তিনিও নানান বিষয় নিয়ে লিখতেন। তাঁদের পারিবারিক পত্রিকা চালু হল। এই পত্রিকার জন্য নিজেই কলম ধরলেন সত্যজিৎ। নিজে ছোট ছোট ছড়া লিখতেন। এবার লিখলেন ধারাবাহিক বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস প্রফেসর শঙ্কু। পরবর্তীকালে প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে আরো কয়েকটি বই লিখেছেন। তবে সত্যজিতে আসল খ্যাতি তাঁর ফেলুদাকে নিয়ে। শিশু-কিশোরদের কাছে ফেলুদার আকর্ষণ অতুলনীয়। গোয়েন্দা গল্পের গোয়েন্দা ফেলুদা তার স্রষ্টার মতই বিখ্যাত। সত্যজিতের গল্প বলার ভঙ্গি অসাধারণ। সহজ সরল ভাষা, কাহিনীর নিটোল বুনন, অপূর্ব বর্ণনা, টানটান উত্তেজনা পাঠককে শেষ পর্যন্ত মুগ্ধ করে রাখে। তাঁর রচনা, চিরায়ত সাহিত্যের পর্যায়ে না পড়লেও দীর্ঘ দিন পর্যন্ত পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পারবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ফেলুদা শঙ্কু ছাড়াও সত্যজিৎ বেশ কিছু ছোট গল্প লিখেছেন, যেমন এক ডজন গপ্পো, আরো এক ডজন, আরো বারো—এই বইগুলির প্রতিটি গল্পই যেমন উপভোগ্য তেমনি সার্থক সৃষ্টি।

চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর প্রথম ইংরেজি বই "Our Films thier Films" বিশ্ব চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে এক মূল্যবান সংযোজন। এতে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে তাঁর সহজাত রসবোধ, অনদিকে গভীর পাণ্ডিত্য। তাঁর আত্মজীবনী "যখন ছোট ছিলাম" খুবই উপভোগ্য। বিরাট প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি চিত্রশিল্পী হিসাবেও ছিলেন অসাধারণ। নিজের বইয়ের সমস্ত ছবি নিজেই আঁকতেন। এছাড়া বহু বিখ্যাত বইয়ের প্রচ্ছেদ তাঁরই আঁকা। অসামান্য কীর্তির জন্য অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন সত্যজিৎ। পথের পাঁচালী দিয়ে ১৯৫৬ সালে পান প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার আর তার পরিসমাপ্তি ঘটে ৩০শে মার্চ ১৯৯২ অস্কার পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে। এর মাঝে তিনি দেশে-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন, নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য পুরস্কারের কথা বাদ দিলেও নানান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন 'ডি লিট' উপাধি। তার মধ্যে আছে অক্সফোর্ড, দিল্লী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শান্তিনিকেতন থেকে পেয়েছেন দেশিকোত্তম। ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাসী প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিঁতের কলকাতায় এসে সত্যজিৎকে দিলেন সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মান "লিজিয়ন অফ অনার"। এ এক দুর্লভ সম্মান জানিয়ে ফরাসী প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, "ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে সত্যজিৎ রায় এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। চলচ্চিত্র জগতে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর মতো এক মহান ব্যক্তিকে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মান জানাতে পেরে আমি ও আমার দেশবাসী আজ কৃতজ্ঞ বোধ করছি। জীবনের অন্তিম পর্বে এল হলিউডের সর্বোচ্চ সম্মান অস্কার। যা পৃথিবীর সব চলচ্চিত্র নির্মাতার কাছে চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাঁকে এই পুরস্কার দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিখ্যাত ৭০ জন মানুষ। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্পিলবার্গ, কপোলো, নিউম্যান, জর্জ লুকাস, আকিরা কুরোসাওয়া। সত্যজিতের সমগ্র সৃষ্টিকে মূল্যায়ন করে তাঁকে দেওয়া হয় সাম্মানিক অস্কার। তাঁর আগে মাত্র পাঁচজনকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়—গ্রেটা গার্বো (১৯৫৫), ক্যারি গ্রান্ট (১৯৬৯), চার্লি চ্যাপলিন (১৯৭২), জেমস স্টুয়ার্ট (১৯৮৪), কুরোসাওয়া (১৯৮৯)।

যখন অস্কার পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হল, সত্যজিৎ তখন অসুস্থ। বিছানায় শয্যাশায়ী। তিনি বলেছিলেন, "অস্কার পাওয়ার পর আমার পাওয়ার আর কিছুর রইল না।"

জীবনের সব পাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই পুরস্কার পাওয়ার মাত্র তেইশ দিন পর এই পার্থিব জীবন থেকে চিরবিদায় নিলেন সত্যজিৎ (২৩শে এপ্রিল ১৯৯২)।

৯৮

রম্যাঁ রোলাঁ

[১৮৬৬-১৯৪৪]

ফ্রান্সের বার্গান্ডী প্রদেশের একটি ছোট শহর ক্লামেসি। ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারি এই শহরেই জন্ম হয়েছিল সমান ফরাসী সাহিত্যিক মানবতার পূজারী রম্যাঁ রোলাঁর। জন্ম থেকেই ছিলেন রুগ্ন অসুস্থ। জীবনের কোন আশা ছিল না। কিন্তু মায়ের স্নেহ ভালবাসা যত্নে মৃত্যুকে জয় করলেন রোলাঁ। কিন্তু মা রক্ষা করতে পারলেন না তাঁর কোলের মেয়েটিকে। দু বছর বয়েসে মারা গেল একমাত্র কন্যা। রোলাঁর বয়স তখন পাঁচ। প্রথম মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করলেন। নিজের জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "আমার শৈশব যেন মৃত্যুর ছায়াঘেরা এক বন্দীশালা।"

রোলাঁ গান্ধীর প্রতি এতখানি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার কারণ গান্ধী যা চেয়েছিলেন তাই তিনি করতে পেরেছিলেন। তাই রোলাঁ বলেছেন তলস্তয় যেখানে ব্যর্থ গান্ধী সেখানে সফল।

এর পরবর্তীকালে তিনি আকৃষ্ট হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হল তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী। রামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন অধ্যাত্ম সাধনা আর মানব প্রেমের এক সম্মিলিত রূপ। বিবেকানন্দের মধ্যে পেয়েছিলেন তাঁর কর্মের বাণী। একদিন যখন রোলাঁ প্রাচ্যের ধ্যানে মগ্ন, অন্যদিকে তখন তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন যুদ্ধোত্তর ইউরোপের এক জীবন্ত চিত্র 'বিমুগ্ধ আত্মা' উপন্যাসে। এর প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে, তৃতীয় খণ্ড ১৯২৬, চতুর্থ ১৯৩৩।

'বিমুগ্ধ আত্মা' রোলাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা জাঁ ক্রিসতফে রোলাঁ পূর্ণতা পাননি কিন্তু বিমুগ্ধ আত্মাতে এসে পেলেন পূর্ণতা। এই উপন্যাস জাঁ ক্রিসতফের চেয়ে অনেক পরিণত। এই কাহিনীর নায়িকা আনেৎ। সে এক শিল্পীর কন্যা। সুন্দরী, ধনী পরিবারে তার বিয়ে স্থির হল। কিন্তু বিয়ের ঠিক পূর্বে তার প্রেমিক বিয়ের মানসিকতার সাথে একমত হতে পারল না। আসলে সে চেয়েছিল স্বাধীনতা। পূর্ণ নারীত্ব। স্ত্রী হিসাবে দাসত্ব নয়। তখন সে সন্তানসম্ভবা। সন্তানের কথা ভেবেও সে বিয়ে করল না। নিজের সন্তান মার্ককে নিয়ে শুরু হল তার জীবন সংগ্রাম। আনেৎ যেন চিরন্তন নারী সংগ্রামের প্রতীক। দেশে শুরু হয়েছে যুদ্ধ। তারই মধ্যে আনেৎ দেখেছে মানুষের কদর্য রূপ।

অবশেষে যুদ্ধ শেষ হল। আনেৎ নতুন যুগের স্বপ্ন দেখে। তার বিশ্বাস একদিন এই অন্ধকার পৃথিবী থেকে মানুষের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই উত্তরণ ঘটবে। এই উপন্যাস শেষ হয়েছে সেই সংগ্রামের ডাক দিয়ে। "ন্যায়পরায়ণ হওয়া তো ভাল কিন্তু প্রকৃত ন্যায়বিচার কি শুধু দাঁড়িপাল্লার কাছে বসে থাকে, আর দেখেই সন্তুষ্ট হয়? তাকে বিচার করতে দাও, সে হানুক আঘাত। স্বপ্ন তো যথেষ্ট দেখেছি আমরা, এবার আসুক জাগার পালা।"

১৯১৯ থেকে ১৯২৯ রোলাঁর জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণ। একদিকে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা অন্যদিকে বাস্তব পৃথিবীর হাজার সমস্যা। ইউরোপের বুকে নতুন চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ। তিনি উপলব্ধি করলেন গান্ধীবাদের আদর্শ যাকে একদিন তাঁর মনে হয়েছিল সমস্ত পৃথিবীকে পথ দেখাবে, ক্রমশই তার রং যেন ফিকে হয়ে আসছে।

ইউরোপের বুকে তখন ঘটে গিয়েছে রুশ বিপ্লব। এই নতুন আদর্শকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলেও তাকে মেনে নিতে পারেনি তিনি। তাঁর অন্তরে তখন গান্ধী আর তলস্তয়। রুশ সাহিত্যিক গোর্কির সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল রোলাঁর। গোর্কিই তাঁকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সাথে পরিচিত করালেন। প্রথমে সোভিয়েত সরকারকে মেনে নিতে না পারলেও ক্রমশই তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। ১৯২৯ সালে যখন ফ্রান্সে কমিউনিস্টদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল, তাদের বন্দী করা হল, শ্রমিক শ্রেণীর উপর শুরু হল নির্যাতন, সেই সময় ফ্রান্সের বিখ্যাত কয়েকজন কবি দার্শনিক লেখক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন।

রোলাঁ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কোন পথে তিনি যাবেন! প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল তিনি লেখক সাহিত্যিক, রাজনীতি তাঁর ধর্ম নয়। কিন্তু শেষে অনুভব করলেন যখন মানব জাতি বিপন্ন তখন সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠাই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে নেমে এলেন রাজনীতির আঙিনায়, অনুভব করলেন মার্কসবাদের মধ্যেই মানবজাতির

ভবিষ্যৎ নিহিত। রচনা করলেন তাঁর "শিল্পীর নবজন্ম"। রোলাঁ লিখেছেন, "সমস্ত জীবন ধরে আমি যে পথের সন্ধান করেছি, সমাজতন্ত্রের মধ্যেই তার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি।"

রোলাঁ যখন এই মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন তখন তিনি ৭০ বছরের বৃদ্ধ। শুরু হল চারদিকে প্রচার–রোলাঁ কমিউনিস্ট...দেশদ্রোহী।

কিন্তু নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত রোলাঁ শুধু ইউরোপ নয়, সমস্ত মানবের মুক্তির কামনায় মুখর হয়ে উঠলেন। "ভারতবর্ষ, চীন ইন্দোচীন প্রভৃতি শোষিত নিপীড়িত জাতির পাশে দাঁড়িয়ে আমি যুদ্ধ করব।"

১৯৩৬ সালে রোলাঁর ৭০তম জন্মদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আড়ম্বর করে পালন করা হল। তাঁকে বলা হল ফ্রান্সের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান, মানব কল্যাণের এক অক্লান্ত যোদ্ধা।

জার্মানির বুকে তখন শুরু হয়েছে হিটলারের তাণ্ডব। রোলাঁ অনুভব করতে পারছিলেন আগামী দিন ইউরোপের বুকে এক প্রলয়ঙ্করী ঝড় নেমে আসছে।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলান্ড আক্রমণ করল। শুরু হল বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪০ সালে জার্মানরা ফ্রান্স দখল করল। রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, সেটাই তাঁর শেষ চিঠি।

"আমি সংবাদপত্রে লিখতে পারছি না...তাই যৌবনের প্রথম সংগ্রামের দিনগুলিকে আমি পুনরায় জীবন্ত করে তুলছি, স্মৃতিকথা লিখছি।

অন্ধ হিংসা ও মিথ্যায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে আমাদের সত্য ও শান্তিকে রক্ষা করতেই হবে।"

রোলাঁ জীবনের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও নিজের গৃহ ছেড়ে কোথাও যাননি। তাঁর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হত। তাঁর প্রতিটি চিঠি পরীক্ষা করা হত, এমনকি তাঁকে খুনের হুমকি অবধি দেওয়া হত।

নিজের জন্যে কখনো চিন্তিত ছিলেন না রোলাঁ। মানুষের এই হত্যা নির্যাতন তাঁকে সবচেয়ে ব্যথিত করত। তাঁর মনে হত গ্যেটে বিঠোফেনের মহান দেশের এ অধঃপতন। একি সভ্যতার আসন্ন মৃত্যু!

এক বেদনার্ত হৃদয়ে নিঃসঙ্গভাবে সারাদিন নিজের ঘরে বসে থাকতেন। নিজেকে প্রকাশ করা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। চারদিকে অনাহার অভাব। জার্মান দূতাবাস তাঁকে সব কিছু দিতে চেয়েছিল, খাদ্য, কয়লা, পোশাক। কিন্তু হত্যাকারীর হাত থেকে কিছু গ্রহণ করতে তাঁর বিবেক বাধা দিয়েছিল। তাই জার্মানদের সমস্ত দানকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

অবশেষে ১৯৪৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ৭৮ বছর বয়সে যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তেও বিশ্বাস হারাননি। নতুন যুগের মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন–

"নতুন দিনের মানুষ, হে তরুণের দল, আমাদের পদদলিত করে তোমরা এগিয়ে চল। আমাদের চেয়েও বড় ও সুখী হও।"

৯৯

মাইকেলেঞ্জেলো

(১৪৭৫—১৫৬৪)

পুরো নাম মাইকেলেঞ্জেলো বুয়োনারত্তি। বাবার নাম লোদভিকো। মাইকেলেঞ্জেলোর জন্মের (১৪৭৫) পরেই তার মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়েই তাঁর জন্যে ধাত্রী নিয়োগ করা হল। ধাত্রী একজন পাথর খোদাইকারীর স্ত্রী। নিজেও অবসরে পাথরের কাজ করতো; ছয় বছর বয়েসে মা মারা গেলেন মাইকেলেঞ্জেলোর। তিন বছর এক অস্থির টানাপোড়েনে কেটে গেল। দশ বছর বয়েসে স্কুলে ভর্তি হলেন। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে পাশ করার পর ব্যবসা করবে। কিন্তু ছেলের ইচ্ছে অন্য রকম, পাড়ার একটি ছেলে গিরলানদাইও নামে এক শিল্পীর কাছে ছবি আঁকা শেখে।

মাইকেলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ক্রমশই সাভানারোলের প্রভাব বেড়ে চলে। লরেঞ্জ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অবস্থার মধ্যেই মাইকেল দুটি মূর্তি তৈরি করলেন— ম্যাডোনা, সেন্টরের যুদ্ধ। আর একটি নতুন মূর্তির কাজে হাত দিয়েছেন এমন সময় খবর এল লরেঞ্জ মারা গিয়েছেন। লরেঞ্জের বড় ছেলে পিয়েরো তার পিতার আসনে বসলেন। তবু মিকেলের মনে হল তাঁর

জীবনের আদর্শ পুরুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। এ আসন আর পূর্ণ হবার নয়। মাইকেলের মনে হল আর এখানে থাকা সম্ভব নয়, রওনা হলেন বেলেনায় কিন্তু সেখানেও অশান্তির আগুন। আবার ফ্লোরেন্সে ফিরে এলেন। নিজের কাছে সামান্য যেটুকু অর্থ ছিল তাই দিয়ে কিনলেন একটুকরো পাথর। কয়েকদিনের মধ্যেই তাই দিয়ে তৈরি করলেন এক "কিউপিড" এক শিশুমূর্তি মাথার তলায় হাত দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এক বন্ধু পরামর্শ দিল পুরনো জিনিস বলে বেঁচে দাও, ভাল দাম পাবে। মাইকেলেঞ্জেলো তাতে সায় দিলেন, ব্যবসাদার বন্ধু তখন নিজেই কিনে নিলেন। রোমে গিয়ে কার্ডিনাল বিয়ারিয়োকে বিক্রি করবার সময় ধরা পড়ে গেলেন। বিরারিয়ো বুঝতে পারলেন, এটি কোন প্রাচীন শিল্পকর্ম নয়। কিন্তু তার ভাল লাগল মূর্তির কাজ। শিল্পীকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় লোক পাঠালেন ফ্লোরেন্সে।

শেষ পর্যন্ত পোপের আদেশে সাভনারোলোকে বন্দী করা হল। অসহ্য নিপীড়ন করে ১৪৯৮ সালের ২৩ শে মে সাভানারোলকে পুড়িয়ে মারা হল। শেষ হল দুঃস্বপ্নের যুগ। কিন্তু সেখানে থাকতে আর মন চাইছিল না মাইকেলেঞ্জেলোর। এমন সময় রোম থেকে কার্ডিনালের ডাক এল। আর অপেক্ষা করলেন না। যাত্রা করলেন রোমের উদ্দেশ্যে।

কার্ডিনাল বিয়ারিয়ো তাকে একটা ৭ ফুট পাথর দিয়েছেন, কিন্তু কাজ আরম্ভ করবার অনুমতি দেননি।

মাইকেলেঞ্জেলোর মনে হল আর কিছুদিন এভাবে বসে থাকলে এতদিন ধরে যা কিছু শিখেছিলেন তার সব কিছু ভুলে যাবেন। মনের আনন্দে দিনরাত কাজ করে চলেন। মাত্র তিনদিনে শেষ হল কিউপিড। ছোট্ট এক শিশু, একরাশ উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে আছে তার কচিমুখে।

কৌতুকভরে কিম্বা কট্টরপন্থীদের যোগ্য জবাব দেবার জন্যেই আঁকলেন লেডা ও হাঁস। তাঁর কোন সৃষ্টিতেই কামনার প্রকাশ নেই। এ ছবিতেই প্রথম আঁকলেন নগ্ন লেডা শুয়ে আছে আর হাসরূপী দেবতা তাকে জড়িয়ে আছে। মিলনের আনন্দে তারা বিভোর। কিন্তু ধর্মীয় গোড়ামিতে এ ছবি চিরকালের মত হারিয়ে গিয়েছে।

লেডা ও হাঁসের মত মিকেলেঞ্জালোর আরো অনেক সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর যে সৃষ্টি কালকে অতিক্রম করে বেঁচে আছে তাতেই তিনি মহত্তম শ্রেষ্ঠতম।

জীবন শুরু করেছিলেন ভাস্কর্যের মধ্যে দিয়ে। তারপর চিত্রকর, তারপর কবি, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হলেন সেন্ট পিটার্স গীর্জার স্থপতি।

১৫৬৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি, গীর্জার কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। অসুস্থ মাইকেলেঞ্জেলো বিছানা থেকে জানলা দিয়ে গীর্জার দিকে তাকালেন।

মাইকেলেঞ্জেলোর মনে হল শিল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি সমস্ত জীবন ধরে যে পরিপূর্ণ মুক্তির অন্বেষণ করেছেন, এতদিনের তার পালা শেষ হয়েছে। এবার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। পরম তৃপ্তিতে চোখ বুজলেন মাইকেলেঞ্জেলো।

১০০

কাজী নজরুল ইসলাম

(১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রীঃ)

বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক ১৮৯৯ সালের ২৫শে মে বর্ধমান জেলার আসনসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কবি একাধিক ভাগ্যবান কবির ন্যায় সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম লাভ করেননি। চুরুলিয়ার কাজী বংশ এক কালে খুবই সম্ভ্রান্ত ছিল বটে; কিন্তু যে সময়ে কবি নজরুল ইসলাম শিশু হয়ে আবির্ভূত হন, সে সময় এ বংশটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নানা রকম বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হয়ে আভিজাত্যের পশ্চাৎপট থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে দৈন্যদশার একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পড়েছিল। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান এবং মর্মান্তিক দারিদ্র্যে মধ্য দিয়ে কবির বাল্য, কৈশোর ও প্রাক যৌবন কেটেছে। পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। 'কাজী' হচ্ছে তাঁদের বংশের উপাধি। পিতা ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম এবং মাজারের মুত্তাওয়াল্লি। ফলে ছোট বেলা থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারার ভিতর দিয়ে বড় হন।

বাল্যকালে তিনি বাড়ীর নিকটস্থ মাদ্রাসায় (মক্তব) শিক্ষা জীবন শুরু করেন। মাত্র ১০ বছর বয়সে তিনি সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন। বাল্যকালেই পবিত্র

কুরআনের অর্থ ও তার মর্মবাণী শিক্ষা লাভ করতে শুরু করেন। এছাড়া তিনি বাংলা ও আরবী ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি মক্তবে ফারসী ভাষাও শিখতে থাকেন। হঠাৎ করে তাঁর পিতা মারা যান তিনি নিতান্তই ইয়াতীম হয়ে পড়েন। সংসারে নেমে আসে অভাব অনটন ও দুঃখ-দুর্দশা। লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি 'লেটো' গানের দলে যোগ দেন এবং খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। 'লেটো' গানের দলে কোন অশ্লিল গান পরিবেশন হতো না বরং বিভিন্ন পালা গান, জারি গান, মুর্শিদী গান ইত্যাদি পরিবেশিত হত। অসামান্য প্রতিভার বলে তিনি 'লেটো' দলের প্রধান নির্বাচিত হন। 'লেটো' গানের দলে থেকেই তিনি বিভিন্ন বইপত্র পড়ে সাহিত্য চর্চা চালিয়ে যান। এ সময়ে তিনি কয়েকটি কবিতা, ছড়া গান, পালা গান রচনা করে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। এর পর তিনি শিক্ষা লাভের জন্যে গ্রামের কয়েকজন ব্যক্তির সহযোগিতায় রাণীগঞ্জের শিয়ালসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন।

শৈশব কাল থেকে তিনি ছিলেন একটু চঞ্চল প্রকৃতির। স্কুলের বাঁধা ধরা নিয়ম কানুন তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই হঠাৎ করে একদিন স্কুল থেকে উধাও হন তিনি। কিন্তু কোথায় যাবেন, কি খাবেন, কি করে চলবেন ইত্যাদি চিন্তা করে এবং আর্থিক অভাব অনটনের কারণে তিনি আসানসোলের এক রুটির দোকানে মাত্র ৫ টাকা মাসিক বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। রুটি তৈরির ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিভিন্ন কবিতা, গান, গজল, পুঁথি ইত্যাদি রচনা করেন এবং বিভিন্ন বইপত্র পড়ে তাঁর জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে জনৈক পুলিশ ইনস্পেক্টর তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। এরপর তিনি পুনরায় রাণীগঞ্জের শিয়ালসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন।

১৯১৭ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র। যুদ্ধের কারণে তাঁর আর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া হল না। তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টন রেজিমেন্টের হাবিলদার পদে প্রমোশন লাভ করেন। সৈনিক জীবনে তাঁকে চলে যেতে হয় পাকিস্তানের করাচিতে। কিন্তু তাঁর কবিতা ও সাহিত্য চর্চা থেমে যায়নি। করাচি সেনা নিবাসে সহকর্মী একজন পাঞ্জাবী মৌলিবী সাহেবের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর নিকট তিনি ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এবং মহা কবি হাফিজ, শেখ সাদী (রঃ) প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত কবিদের রচনাবলী চর্চা করেন। এরপর থেকেই তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, হামদ নাত, গজল, সাহিত্য ইত্যাদির ব্যাপক রচনার তাগিদ অনুভব করেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের তেমন কোন সুযোগ না পেলেও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে তিনি তাঁর কাব্য ও সাহিত্য চর্চা চালিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেমে গেলে ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে পল্টন রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেয়ার পর তিনি ফিরে আসেন নিজ মাতৃভূমি চুরুলিয়া গ্রামে। এরপর শুরু হয় তাঁর একনিষ্ঠ কাব্য চর্চা। তাঁর লেখা একাধারে 'দৈনিক বসুমতী', 'মুসলিম ভারত', 'মাসিক প্রবাসী', 'বিজলী', 'ধূমকেতু' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে।

নজরুলের কবিতা তদানীন্তন রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষদের জাগরণের তিনি ছিলেন মহান প্রবক্তা। ১৯২১ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত অমর কবিতা 'বিদ্রোহী' যা বাংলা সাহিত্যে তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে অমর করে রেখেছে।

বল বীর
বল চির উন্নত মম শির
শির নেহারি নত শির ওই
শিখর হিমাদ্রির।

দেশ প্রেমিক কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে তাঁর কলমকে অস্ত্র ও বুলেট হিসেবে ব্যবহার শুরু করলেন। ইতিমধ্যে সমগ্র দেশে শুরু হয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী তুমুল আন্দোলন। কাজী নজরুল ইসলাম 'সাপ্তাহিক ধূমকেতু' পত্রিকায় লিখতে লাগলেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। অন্যায়, অবিচার, অসাম্য ও অসভ্যের বিরুদ্ধে তিনি লিখনীর মাধ্যমে শুরু করলেন প্রচন্ড বিদ্রোহ। তিনি মুসলিম জাতিকে তাদের অতীতের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে শুনিয়েছেন জাগরণের বাণী। তিনি স্বদেশবাসীকে আহবান জানিয়েছেন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী এ দেশের বিশেষ করে মুসলমান কৃষকদের ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব করে

ফেলেছিল। মুসলমান কৃষকরা তাঁদের জায়গা জমি ও বাড়ী-ঘর সব কিছু হারিয়ে প্রায় পথে বসেছিল। কবি কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক চক্রের বিরুদ্ধে এ দেশের কৃষক সমাজকে বিদ্রোহ করার আহবান জানান। তিনি 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের 'কৃষাণের গান' নামক কবিতায় লিখেছেন–

চল্ চল্ চল্!
উর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ পাতে তরুণ দল
চল্-রে চল্-রে চল।
চল্ চল্ চল্॥

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বহু হামদ, নাত, গজল, আধুনিক গান, ইসলামী গান, গল্প, কবিতা, সাহিত্য ও উপন্যাস রচনা করে যান। এ সকল বিষয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা কয়েক সহস্র। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, দোলন চাঁপা চক্রান্ত, প্রলয় শিখা, ভাঙ্গার গান, নতুন চাঁদ, ফনীমনসা, রিক্তের বেদন, মৃত্যুক্ষুধা, সাম্যবাদী, সর্বহারা, সিন্দু হিন্দোল, রাজবন্দীর জবানবন্দী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে 'নজরুল ইনস্টিটিউট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তাঁর লেখার উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি ফারসী ভাষার মহাকবি হাফিজের কতকগুলো কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের অধিকাংশ কবিতা ও সাহিত্য রুশ ভাষাতে অনুদিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষায়ও তাঁর লেখার অনুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে। ১৯৪৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবি জগত্তারিণী পুরষ্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৬০ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭০ সালে বিশ্ব ভারতী কবিকে 'ডিলিট' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৭৩ সালে কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও 'ডিলিট' উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে কবিকে 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়।

আধুনিক বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে মুসলিম সাধনার সবচেয়ে বড় প্রেরণা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর আবির্ভাবে মুলসিম স্বাতন্ত্র কাব্য সাধনার দিগন্তে নবোদিত সূর্যের মহিমা বিচ্ছুরিত হয়েছে। ইসলামী বিভিন্ন বিষয়গুলোকে তিনিই প্রথমবার সত্যিকার সাহিত্যে রূপ দিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়াও প্রবীণদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন, মহাকবি কায়কোবাদ, কবি গোলাম মোস্তফা, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং নবীণদের মধ্যে কবি ফররুখ আহমেদ, সৈয়দ আলী আহসান তালিম হোসেন, কাদির নেওয়াজ প্রমূখ কবিগণ মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে বাণী নজরুল ইসলামের ন্যায় বজ্রকণ্ঠ ছিল না, ছিল অর্ধোচ্চারিত। নজরুল কাব্যে ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্য বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। নজরুল ছিলেন মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি এবং স্বাধীনতা চেতনার প্রতীক। বাংলা ভাষায় আরবী, ফারসী শব্দের সার্থক ব্যবহার, ইসলামী আদর্শ এবং মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়নে নজরুল ইসলামের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় লিখেছেন–

'আবু বকর, উসমান, উমর আলী হায়দার,
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারী গান-লা শরীক আল্লাহ।'

কারবালার মর্মান্তিক বিয়োগান্ত ঘটনা কবি কাজী নজরুল ইসলাম কি সুন্দর ভাবে তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন–

'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,
আম্মা! লাল তেরি খুনকিয়া খনিয়া।
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে
সে কাঁদনে আসু আনে সীমারের ছোরাতে।'

ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন–

'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা, আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বের করেছি জ্ঞাতি।
আমরা সেই সে জাতি॥'

কাজী নজরুল ইসলামের আল্লাহর প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের অশেষ নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তিনি লিখেছেন–

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহের বাণী ॥
এই শস্য–শ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালি খানি
খোদা তোমার মেহের বাণী ॥
তুমি কতই দিলে মানিক রতন, ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন
ক্ষুধা পেলে অন্ন জোগাও মানি না মানি
খোদা তোমার মেহের বাণী ॥

তিনি ইসলামের মৌলিক ইবাদত ও বিধানকেও বাংলা কাব্যে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

'মসজিদে ঐ শোন রে আযান, চল্ নামাযে চল্,
দুঃখে পাবি সান্ত্বনা তুই বক্ষে পাবি বল।
ওরে চল্ নামাযে চল্।

....

"তুই হাজার কাজের অছিলাতে নামায করিস কাজা,
খাজনা তারি দিলি না, যে দিন দুনিয়ার রাজা।
তারে পাঁচ বার তুই করবি মনে, তাতেও এত ছল
ওর চল, নামাযে চল্।"

এমনিভাবে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রতিটি ইসলামী গান, গজল, হামদ ও নাত প্রায় প্রত্যেক বাঙালী মুসলমানের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ওয়াজ মাহফিল ও মিলাদ মাহফিলে তাঁর লেখা হামদ, নাত ও গজল পঠিত হচ্ছে।

১৯৪২ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক দূরূহ ব্যধিতে আক্রান্ত হন এবং বাকশক্তি চিরদিন জন্যে হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে সুস্থ করে তোলার জন্যে দেশের সকল প্রকার চিকিৎসা ব্যর্থ হবার পর ১৯৫৩ সালে সুচিকিৎসার জন্যে সরকারী ব্যবস্থাধীনে লন্ডনে পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানেও কবিকে রোগমুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

তারপর ১৯৭২ সালে তাঁকে বিদেশ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং ঢাকার পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ই ভাদ্র মোতাবেক ১৯৭৬ইং সালের ২৯শে আগস্ট এ বিখ্যাত মনীষী পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর একটি ইসলামী সংগীতে অছিয়ত করে যান, তাঁকে মজিদের পার্শ্বে কবর দেয়ার জন্যে;যেন তিনি কবরে শুয়েও মুয়াজ্জিনের সুমধুর আযানের ধ্বনি শুনতে পান। তিনি লিখেছেন–

মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই ॥

....

আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাযীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর-আযাব থেকে এ গুণাহ্গার পাইবে রেহাই ॥

তাঁর সে অছিয়ত অনুযায়ীই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবিকে সমাহিত করা হয়। মসজিদের পার্শ্বে কবি আজ চির নিদ্রায় শায়িত। প্রতিদিন প্রায় অসংখ্য মানুষ নামাজান্তে কবির মাজার জিয়ারত করছে। আজ কবি পৃথিবীতে নেই; কিন্তু বাংলা কাব্যে কবি ইসলামী ভাবধারা ও মুসলিম স্বতন্ত্রবোধ সৃষ্টিতে যে অবদান রেখে গেছেন, প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের হৃদয়ে কবি অমর হয়ে থাকবেন।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ
১০০
মনীষীর জীবনী
মাইকেল এইচ. হার্ট
THE
HUNDRED